রামেন্দ্র-রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

রামেন্দ্র-রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১লা বৈশাখ, ১৩২০

মূল্য আট টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭
১২—২১।৯।১৯৫৯

ভূমিকা

'রামেন্দ্র-রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডও আমরা বিজ্ঞাপিত সময়ের মধ্যেই প্রকাশ করিতে পারিলাম। এই খণ্ডের সঙ্গেই পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের প্রদত্ত সাহায্য প্রায় নিঃশেষ হইল। অতঃপর আমাদিগকে বাকী চারি খণ্ড প্রকাশের জন্য আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ডে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের 'কর্ম্ম-কথা,' 'চরিত-কথা' এবং 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' ১ম ও ২য় পর্য্যায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কর্ম্ম-কথা ঃ

ইহার প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল—১৩২০ সাল (নবেম্বর ১৯১৩)। গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় ইহার আর কোন সংস্করণ হয় নাই। "যজ্ঞ" ব্যতীত পুস্তকের সকল প্রবন্ধই মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছিল, নির্দ্দেশ সূচীতে মিলিবে।

চরিত-কথা ঃ

ইহা গ্রন্থকারের জীবিতকালে এক বারই মুদ্রিত হইয়াছিল; প্রকাশকাল —১৩২০ সাল (নবেম্বর ১৯১৩)।

পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি কোন্ পত্রিকায় কবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহার নির্দ্দেশ গ্রন্থকার সূচীতে দিয়াছেন: কোন কোন প্রবন্ধের প্রকাশকাল মুদ্রণে যে ভুল ছিল, তাহা আমরা সংশোধন করিয়া দিয়াছি।

বিচিত্র প্রসঙ্গ, ১ম ও ২য় পর্য্যায় ঃ

পীড়িত অবস্থায় রামেন্দ্রসুন্দর কর্ত্তৃক বিবৃত ও বিপিনবিহারী গুপ্ত কর্ত্তৃক লিখিত।

প্রথম পর্য্যায়ের পুস্তকের প্রকাশকাল—ভাদ্র ১৩২১ (সেপ্টেম্বর ১৯১৪)। শেষ কয়েক পৃষ্ঠা ছাড়া পুস্তকের সমগ্র অংশ 'মানসী' পত্রিকায় প্রথমে মুদ্রিত

হয়—১৩২০ সালের আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন এবং ১৩২১ সালের আষাঢ়-ভাদ্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের পুস্তকের প্রকাশকাল—আষাঢ় ১৩৩৪ (ইং ১৯২৭)। ইহার অন্তর্গত তিনটি স্তবকের প্রথম স্তবকে রামেন্দ্রসুন্দরের বিবৃত তিনটি রচনা—"জীব-বিজ্ঞান," "হিব্রু" ও "ইহুদি ও গ্রীক" স্থান পাইয়াছে। এগুলি প্রথমে ১৩২০ সালের 'ভারতবর্ষে' (অগ্রহায়ণ, মাঘ ও চৈত্র) প্রকাশিত হইয়াছিল।

'বিচিত্র প্রসঙ্গ' সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ-কর্ত্তা বিপিনবিহারী গুপ্ত উক্ত পুস্তকের তৃতীয় স্তবকের শেষে "রামেন্দ্রসুন্দর" প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :—

> মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আমি বড় জোর করিয়া বলিয়াছিলাম—"আপনি চিন্তিত হবেন না ; আপনার এখন মৃত্যু হ'লে চল্‌বে না। 'ভারতবর্ষে' প্রবন্ধের উপর প্রবন্ধ সাজিয়ে আপনি যে জিনিষ গড়ে তুল্‌চেন, তা এই সমস্ত ভারতবর্ষে আর কেউ শেষ করতে পারবে না ; সে জিনিষ অসমাপ্ত রেখে সরে পড়া চল্‌বে না।" আমার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া, তাঁহার স্বভাবতঃ উজ্জ্বল চক্ষুর দীপ্তি যেন মৃত্যুঞ্জয়-ললাট-বহ্নির মত আসন্ন-মৃত্যু-কালিমাকে অপসারিত করিয়া প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অধরের কোণে ঈষৎ হাসির রেখা যেন দেখা দিল। তাঁহার হাস্য সুন্দর, তাঁহার বাক্য সুন্দর,—হায় রামেন্দ্রসুন্দর !
>
> 'বিচিত্র প্রসঙ্গে'র কথা তাঁহার মনে পড়িতেছিল। ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, বল দেখি, এই ব্যায়রামের মধ্যে যখন সমস্ত দেহ-যন্ত্র ব্যাধিগ্রস্ত ও অবসন্ন, তখন মাথাটা এত পরিষ্কার হয় কেন ?" উৎকট রোগের মধ্যে কেমন করিয়া তাঁহার মুখ হইতে 'বিচিত্র প্রসঙ্গ'-কথা শুনিয়া লইয়াছিলাম, তাহা অনেকেই জানেন। তাঁহার বাক্য সুন্দর,—সর্ব্বজনপ্রিয় তিনি—মাধুর্য্য-ধারায় তাঁহার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।
>
> আমি বলিলাম—" 'ভারতবর্ষে'র Seriesএর মধ্যে আপনি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, সেটা ত একটা Jumping-off ground ; একটি লাফে আপনি বেদান্ত-তত্ত্বের মাঝখানে গিয়ে পড়বেন। এমন ক'রে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত পন্থাগুলি অবলম্বন ক'রে সটান্ বেদান্তের সিংহদ্বারে এসে পৌঁছান,—এটা যে সম্ভবপর হ'তে পারে, বোধ হয় কেউ কখনও ভাব্‌তে পারে নি। এত দিনে এ কাজ শেষ হয়ে যেত ; কিন্তু আপনি

বৈদিক যজ্ঞ নিয়ে পড়লেন,—হুড়মুড় ক'রে অতগুলো প্রবন্ধ রচনা করলেন। মজা এই যে, ও-প্রবন্ধগুলিও আপনি ছাড়া আর কেউ লিখতে পারতেন না। বিচিত্র প্রসঙ্গের সময় আপনার চিন্তা-তরঙ্গ যে দিকে বেগে যেতে আরম্ভ করলে, ঐ বৈদিক প্রবন্ধগুলি ঠিক যে তার পরিণতি, তা নয়—ওর পরে আরও আপনার বল্‌বার অনেক ছিল!—যজ্ঞের ভিতরকার কথা বলা বাকী রয়েছে,—সে কথাও আপনাকে বল্‌তে হবে। কিন্তু ঐ Jumping-off groundএর কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না।" রামেন্দ্রবাবু বলিলেন—"দেখুন, কত দূর কি হয়। সে-বার ত সেরে উঠ্‌লুম; এবার কি হয়, দেখুন। ঠিক বলেছেন; বেদান্তে নামি নামি ক'রে এখনও নেমে পড়ি নি;—সব গুছিয়ে এনেছি।" সব গুছিয়ে এনেছেন! রামেন্দ্রসুন্দরের মুখ ফোটে-ফোটে ফোটে না। আজ সে মুখ চিরদিনের জন্য মৌন হইয়া গেল।

তিনি কি কি কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া চলিয়া গেলেন, তাহার হিসাব করিতে বসিলে, আক্ষেপের সীমা থাকে না। আমাদের দেশে তাঁহার মত স্বাধীন চিন্তয়িতা অত্যন্ত বিরল। স্বদেশের অতীত ইতিহাসের কথা তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিতেন। সভ্য মানব-সমাজের অতীত ইতিহাসের গুপ্ত মর্ম্ম কথাটুকু বলিবার ইচ্ছা তাঁহার খুব প্রবল ছিল। জীবতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মিশর, চিন্, গ্রীক, রোমকের ইতিহাসের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িতে হইবে, এই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি আলোচনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মধ্য পথে হঠাৎ থামিয়া পড়িলেন। এই দ্বিতীয় পর্য্যায় বিচিত্র প্রসঙ্গের রচনার ভাষা আমার বটে, কিন্তু প্রথম স্তবকের সমস্ত মালমসলা তিনি নিজে সংগ্রহ করিয়া, ধারাবাহিক ভাবে নিজের বক্তব্য ধীরে ধীরে বলিয়া যাইতেন; আমি তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া অবহিত চিত্তে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া নোট করিয়া লইতাম।

সূচী

সূচী

কর্ম্ম-কথা

[১৯১৩ সনের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ হইতে]

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"

উৎসর্গ

দেব নরেন্দ্রনারায়ণ,

ঊর্দ্ধে যাহার মূল, অবাক্ যাহার শাখা, সেই সনাতন অশ্বত্থের পত্রচ্ছায়ায় সংসারের আতপদগ্ধ নরনারী বিশ্রাম করিতেছে; ক্ষুৎপীড়িত মানবের জন্য পিপ্পল ফলের আহরণ করিতে দেবগণ সেই অক্ষয় তরুর শাখাবলম্বনে ধরাপৃষ্ঠে অবতরণ করেন। স্বর্গের সহিত মর্ত্ত্যলোকের সম্বন্ধ এইরূপে স্থাপিত হয়, তাহা স্বীকার করি।

বঙ্গের পল্লীসমাজের একদেশে পৃথিবীর সঞ্চিত ধূলিস্তূপে গার্হস্থ্য কর্ম্মতরুর প্রতিষ্ঠার্থ তোমার অবতরণের প্রয়োজন হইয়াছিল; শ্রদ্ধার ও নিষ্ঠার বারিসেকে আজীবন তুমি তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলে; নরনারীকে তাহার ফলচ্ছায়া ভোগ করিতে চক্ষে দেখিয়াছি।

আত্মীয় জনের ও আশ্রিতগণের যুগপৎ অধৃষ্য ও অভিগম্য তোমার দিব্য মূর্ত্তি এখন লোকলোচন হইতে অন্তর্হিত। তোমার প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মতরুর শাখাপল্লব তোমার অন্তর্দ্ধানে ছিন্ন হইয়া ভূলুণ্ঠন করিতেছে; পৃথিবীর মলিন ধূলি তাহাকে ধূসরিত করিতেছে। মিত্রাবরুণ তুল্য যে পুরুষদ্বয় তোমাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ধরায় আসিয়াছিলেন, যাও দেব, ত্বরায় যাও, যেখানে তাঁহারা তোমার অপেক্ষা করিতেছেন। কর্ম্ম তোমার অসমাপ্ত রহুক।

জানিলাম, ইহা নিয়তির বিধান;—নিয়তির জয় হউক।

ভাগ্যহীন পুত্র

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

নিবেদন

এই গ্রন্থখানি পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিবার সময় গ্রন্থকারের কিঞ্চিৎ বলিবার আছে। প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই জন্য বহু স্থলে পুনরুক্তি এবং কোথাও বা অসঙ্গতি দোষ দেখা যাইতে পারে। তবে মোটের উপর একটা সূত্রে সবগুলি বাঁধা আছে, ইহাই আমার বিশ্বাস।

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" এই বাক্যকে আমি ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধগুলি দাঁড় করাইয়াছি৭ কর্ম্ম পরিত্যাগে মনুষ্যের ক্ষমতাও নাই এবং অধিকারও নাই, ইহাই আমার মুখ্য বক্তব্য। যজ্ঞ-নামক অন্তিম প্রবন্ধে ইহা স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কতিপয় প্রবন্ধে বৈরাগ্যের উপর যে কটাক্ষ আছে, তাহা দেখিয়া কোন কোন পাঠক লেখকের প্রতি ভ্রূভঙ্গী করিতে পারেন; কিন্তু ঐহিক বা পারত্রিক স্বার্থপরতা হইতে যে বৈরাগ্যের জন্ম, যদ্দ্বারা মানুষে জীবনের কর্ম্মভার গ্রহণে কুণ্ঠিত হয়, স্বার্থপর শান্তির আশায় পরার্থপর অশান্তি স্বীকারে কুণ্ঠিত হয়, সেই বৈরাগ্যই আমার কটাক্ষের বিষয়। আমার বিশ্বাস, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এই বৈরাগ্যের কখনই প্রশ্রয় দেন নাই এবং সেই জন্যই গৃহস্থাশ্রমকে সকল আশ্রমের উচ্চে স্থান দিয়াছেন। জীবন-সমরে ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট মানব শান্তিপ্রয়াসী হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনে বিমুখ হয় এবং এই জন্য দারাসুতপরিবারকে বিধাতার কৃপায় অর্পণ করিয়া গৃহ হইতে পলায়নের প্রবৃত্তি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে অনেকের পক্ষে দেখা যায়। বস্তুতই সারা জীবন লড়াই করিয়া এক সময়ে যদি কাহারও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ছুটি লইবার ইচ্ছা হয়, সে সময়ে ছুটি না দিলে কতকটা নিষ্ঠুরতা হয়। কিন্তু যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন সময়ে এইরূপ ছুটি চাহিতে গেলে সমাজ থাকে না। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ সঙ্ঘের এবং ইউরোপে খৃষ্টান সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের ইতিহাস অবহিত হইয়া পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, এই শ্রেণীর সন্ন্যাসীর দল শেষ পর্য্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল সমাজ-শত্রুর দলে পরিণত হইয়া পড়ে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সংসারতাপদগ্ধ মানবকে যথাসময়ে ছুটি দিতে আপত্তি করিতেন না; বার্দ্ধক্যে যখন সেবা করিবার ক্ষমতা যায় এবং সেবা লইবার সময় আইসে, সেই সময়কেই প্রব্রজ্যাগ্রহণের কাল বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র সাধারণের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন; এবং গৃহধর্ম্মত্যাগের পর ও যতিধর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বে বানপ্রস্থের অতি কঠোর ব্রতের ও অতি দুষ্কর তপস্যার ব্যবস্থা করিয়া অনধিকারী ব্যক্তি যাহাতে প্রব্রজ্যাগ্রহণে সঙ্কুচিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বেদপন্থী সমাজের সমাজবন্ধনের একটা নিগূঢ় তত্ত্ব এইখানে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কর্ম্ম পরিত্যাগ

করিতে কেহ কোন কালেই পারে না। জীবনরক্ষার জন্য নিতান্ত আবশ্যক আহার-নিদ্রাদি স্বার্থপর কর্ম্মের পরিত্যাগ জীবের পক্ষে সাধ্যই নহে; তখন কেবল পরার্থপর কর্ম্ম পরিহার করা কখনই ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত হইতে পারে না। ঈশাবাস্য হইতে ভগবদ্গীতা পর্য্যন্ত সমুদয় উপনিষৎ এবং মন্বাদিপ্রণীত যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র এ বিষয়ে প্রমাণ। ভগবান্ তথাগত, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বা শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহাদের অনুবর্ত্তী অনেক মহাত্মা অকালে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করেন নাই; বরং তাঁহারা ক্ষুদ্র কর্ম্মের স্থলে বৃহৎ কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন; তাঁহাদের কৃত কর্ম্মের ফল সমস্ত মানবজাতি অদ্যাপি ভোগ করিতেছে এবং চিরকাল ভোগ করিবে। বস্তুতঃ শাস্ত্রানুমোদিত বিশুদ্ধ বৈরাগ্য নিষ্কাম কর্ম্মপরতা হইতে অভিন্ন। সেই বৈরাগ্যের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষপাত আমার পক্ষে সাধ্য নহে।

পরার্থ কর্ম্ম করিব কেন, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টাও স্থানে স্থানে করিয়াছি। আধুনিক কালের হিতবাদী পণ্ডিতেরা যেরূপে উত্তর দেন, তাহাতে তৃপ্তি হয় না। ডারুইনপন্থীরা কিরূপে হিতবাদের মূল অনুসন্ধানে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাও যথাশক্তি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বিজ্ঞান-বিদ্যাকে বোধ করি এইখানেই নিরস্ত হইতে হয়। আমি কেন পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিব, এ কথার চরম উত্তর বিজ্ঞান-বিদ্যার নিকট পাওয়া যায় না। পরার্থপরতার অর্থাৎ পরার্থে স্বার্থত্যাগে প্রেরণার মূল সৃষ্টিতত্ত্বের বীজের মধ্যে নিহিত আছে, এই গ্রন্থের অন্তিম প্রবন্ধে সেই কথা বুঝিবার জন্য কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছি। কত দূর সফল হইয়াছি জানি না।

অধ্যাপক ডয়সেন তাঁহার *Philosophy of the Upanishads* নামক বিখ্যাত পুস্তকের শেষ ভাগে বেদের কর্ম্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধের উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, মূশা-প্রবর্ত্তিত পুরাতন বিধান ও যীশু-প্রবর্ত্তিত নূতন বিধান, ইহাদের পরস্পর যে সম্পর্ক, বেদের কর্ম্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের সম্পর্ক কতকটা সেইরূপ; একের ভিত্তি **legality**, অপরের ভিত্তি **morality**; এই উভয়ের মধ্যে যে বিরোধ, তাহার সামঞ্জস্য হইতে পারে না। কেবল ডয়সেন কেন, এই বিরোধের সম্মুখে আসিয়া অনেক তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরই এইরূপ খটকা বাধে। কর্ম্মকাণ্ডের সঙ্কীর্ণ "গণ্ডী" ও তাহার জটিল বন্ধন দেখিয়া মুক্তিপ্রয়াসী বহু সাধু ব্যক্তি ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন না। অথচ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মানব-সমাজ এই কর্ম্মকাণ্ডকেই আঁকড়াইয়া জড়াইয়া থাকিতে যায়; সময়ে সময়ে কোন মহাপুরুষ আসিয়া প্রাচীরের বেড়া ভাঙ্গিয়া মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহার স্থলে হয় স্বেচ্ছাচারিতা আসিয়া সমাজধর্ম্মকে নষ্ট করিবার উপক্রম করে, অথবা নূতন একটা প্রাচীর উঠিয়া নূতন বেষ্টনের সৃষ্টি করে। যে সকল আচার-অনুষ্ঠান লইয়া এই কর্ম্মকাণ্ড, কোন সমাজই কোনরূপে তাহাদের একেবারে বর্জ্জন করিতে পারে না; উহারা কেবল মূর্ত্তি বদল করিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চায়।

মানবের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। এই ঐতিহাসিক সত্যকে ভিত্তিহীন বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না; মানব-সমাজ-রূপ জীবন্ত যন্ত্রের আত্মরক্ষণ-প্রয়াস হইতে ইহার উৎপত্তি। আচার এবং ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, এই দুই প্রবন্ধে এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু ইহার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা বলা ঘটে নাই। আমার বিশ্বাস, কর্ম্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে আপাততঃ যে বিরোধ দেখা যায়, সেই বিরোধের মূলে সামঞ্জস্য আবিষ্কার ভগবদ্গীতায় ঘটিয়াছে। Legality ও morality, এই উভয়বিধ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের মূলগত ঐক্য সংস্থাপনে ও সমন্বয় সাধনে গীতার মাহাত্ম্য। এ বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা কখনও বলিবার অবসর পাইব কি না জানি না।

কোন্ প্রবন্ধ কবে কোথায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সূচীপত্রে উল্লেখ করিয়াছি। প্রকৃতিপূজা নামক প্রবন্ধটি আমার 'জিজ্ঞাসা' নামক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে দিয়াছিলাম। সেখান হইতে সরাইয়া এই গ্রন্থে স্থাপন করিলাম। ধর্ম্মের জয় প্রবন্ধটি বৌবাজারের সরস্বতী ইন্‌ষ্টিটুটের অনুরোধে ক্লাসিক থিয়েটারে আহূত সভায় পাঠ করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঐ সভায় সভাপতি ছিলেন। যজ্ঞ প্রবন্ধটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ, বি-এল মহাশয়ের রচিত 'কালের স্রোত' নামক পুস্তকের উপক্রমণিকারূপে ঐ প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল। উহাই কাটিয়া ছাঁটিয়া যজ্ঞ নাম দিয়া বাহির করিলাম।

বিশ বৎসর মধ্যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছি; এই দীর্ঘকালে লেখকের মতের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী; আমি বৎসরাবধি শারীরিক পীড়ায় নিতান্ত অবসন্ন; ইচ্ছা সত্ত্বেও প্রবন্ধগুলির যথোচিত পরিবর্ত্তন বা সংশোধন সাধ্য হয় নাই।

১লা বৈশাখ, ১৩২০ শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

মনুষ্যজাতির আদিম পিতা মাতা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া ধরাতলে পাপ দুঃখ ও মৃত্যু আনয়ন করেন, এইরূপ একটা কিংবদন্তী বহু দিন হইতে প্রচলিত আছে।

এই কিংবদন্তীর ভিতর হইতে একটা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বাহির করিতে পারা যায়। জ্ঞান হইতে পাপের ও তজ্জাত দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে, অজ্ঞান অবস্থায় পাপ নাই, তজ্জাত দুঃখও নাই, ইহা জগতের অন্যতম বিভীষিকাময় সত্য।

স্থলান্তরে আবার ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর একটা তত্ত্ব-কথা প্রচলিত আছে। জ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি যেমন কোন কোন সমাজে প্রচলিত ধর্ম্মতত্ত্বের ভিত্তি, জ্ঞানের পূর্ণতায় দুঃখের বিনাশ সেইরূপ অন্য সমাজে প্রচলিত ধর্ম্মতত্ত্বের মূল।

কোন্ কথাটা সত্য, এখানে তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। উভয়েরই মূলে কতকটা সত্য নিহিত আছে, স্বীকার না করিলে চলিবে না।

তবে মানবজাতির অন্তর্গত দুই বৃহৎ সমাজকে এই দুই বাক্যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে লইয়া গিয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

জ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে; অতএব যোগেযাগে ধরাতল হইতে জ্ঞানের অন্তর্দ্ধান সাধন করিতে পারিলেই বোধ করি দুঃখ হইতে ত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। অন্ততঃ তর্কশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট যুক্তির বলে এইরূপ সিদ্ধান্ত আসিয়া দাঁড়ায়। তবে দুঃখ এই যে, জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভোজন করিয়া এক বার তাহার রসাস্বাদন করিয়া ফেলিলে রসনাকে পুনরায় সেই রসের অন্বেষণে নিবৃত্ত করা একরূপ অসাধ্য হইয়া উঠে। অতএব সেরূপ চেষ্টায় কোন ফল পাওয়া যায় না। তথাপি যখন দুঃখনিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ এবং সেই পরম পুরুষার্থ সাধনের উপায় বিধানই মানব-জাতির গুরুগণের ও শিক্ষকগণের জীবনের ব্রত, তখন সেই গুরুগণ ও শিক্ষকগণ মানবের দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য কিরূপ উপায় বিধান করিয়াছেন, ইউরোপের দেড় হাজার বৎসরের ইতিহাসে তাহা রক্তাক্ত অক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে।

ইউরোপে সভ্যতার প্রাক্কালে গ্রীসদেশে যে জ্ঞানের বাতি জ্বলিয়াছিল, তাহা কয়েক শত বৎসর ধরিয়া সমস্ত পশ্চিম দেশকে আলোকিত করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পন্থার অভ্যুদয়ে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও যাজকশক্তি একত্র সংহত হইয়া কিরূপে সেই জ্ঞানের বাতিকে নিবাইয়া দিয়া, গভীর অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে বর্ণিত আছে। দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া খ্রীষ্টীয় যাজকশক্তি কাহাকেও কোন আলো জ্বালিতে দেন নাই। যে এক মাত্র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া মনুষ্য আপনার মহত্ত্ব অব্যাহত রাখিয়া আসিতেছে ও এতাবৎ পর্য্যন্ত প্রকৃতির নিষ্ঠুর কবল হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছে, সেই ভিত্তিভূমির মূল উৎপাটনের জন্য নির্লজ্জভাবে আপনার সমুদয় শক্তি নিযুক্ত করিয়াছে, ইউরোপে খ্রীষ্টীয় পন্থার ইহাই ইতিবৃত্ত।

জ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া লইয়া, জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করিলেই সেই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি ঘটিবে, এই বিশ্বাসে মনুষ্য বহু যুগ ধরিয়া প্রতারিত হইয়াছে। যাঁহারা এইরূপে আপনাদিগকে প্রতারিত করিয়াছেন, তাঁহারা চীৎকার করিয়া বলিয়া আসিতেছেন যে, যদি দুঃখ হইতে মুক্তি চাও ত জ্ঞানমার্গ পরিহার করিয়া অন্ধ বিশ্বাসের পন্থা অবলম্বন কর; যদি পরম পুরুষার্থ লাভে তোমার বাঞ্ছা থাকে, তবে বুদ্ধিবৃত্তিকে নিরোধ কর, আর জ্ঞানের অন্বেষণে দিনক্ষয় করিও না; ব্যক্তিবিশেষে ও বাক্য-বিশেষে বিশ্বাস স্থাপনা করিয়া জীবনের পথে চলিলেই পরম পুরুষার্থ লব্ধ হইবে।

বস্তুতই মানবের মত হতভাগ্য জীব দুনিয়ার মধ্যে দুর্ল্লভ। মনুষ্য ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল; এবং সনাতন নিয়মমতে যে ক্ষুদ্র সে দুর্ভাগ্য, যে দুর্ব্বল সে দীন। তাহার অক্ষমতার কারণে সে পরের নিকট কৃপাভিক্ষার জন্য চিরকাল লালায়িত ও তাহার পরমুখপ্রেক্ষিতার ফলে চিরকাল প্রতারিত। মানবসন্তান প্রকৃতির হস্তে বিবিধ বিধানে উৎপীড়িত হইয়া দুঃখযন্ত্রণায় ত্রাহি-স্বরে ডাকিয়া আসিতেছে এবং যে-কোন ব্যক্তি আপন মূর্খতার ও নির্লজ্জতার উপর নির্ভর করিয়া আপনাকে এই সনাতন দুঃখব্যাধির এক মাত্র চিকিৎসক বলিয়া জাহির করিয়াছে, তাহারই প্ররোচনায় ভ্রান্ত হইয়া তৎপ্রদত্ত কুপথ্য সেবন করিয়া প্রতারিত হইয়াছে।

জ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে, স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিতে পারি; কিন্তু সেই দুঃখবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য জ্ঞানের আলোক ত্যাগ করিয়া

অজ্ঞানের অন্ধকারে প্রবেশ করিতে হইবে, এইরূপ আদেশ নতশিরে বহন করিতে সুস্থ ও মোহমুক্ত মানব নিশ্চিতই অসম্মত হইবে।

জ্ঞানের পন্থা পরিহার করিয়া দুঃখনাশের উপায় অন্বেষণ করিতে হইবে, সৌভাগ্যক্রমে সর্ব্বত্র সর্ব্বজাতির মধ্যে এই বাক্য স্বীকৃত হয় নাই। অপূর্ণ জ্ঞানে যাহার উৎপত্তি, জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশই তাহার ধ্বংসের এক মাত্র উপায়, এই মত অন্ততঃ একটা বৃহৎ সমাজে গৃহীত হইয়াছে।

তবে জ্ঞানের পূর্ণতায় দুঃখের নিবৃত্তি প্রকৃতপক্ষে সম্ভবপর কি না, ইহা আলোচনাযোগ্য। যতদূর দেখা যায়, জ্ঞানের বিকাশের সহিত দুঃখের মাত্রা বাড়িয়া যায় বলিয়াই বোধ হয়। নানা ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

কেহ কেহ পৃথিবীতে দুঃখের অস্তিত্ব একেবারে স্বীকার করিতেই চাহেন না ; মঙ্গলের রাজ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্ব স্বীকারে ইহারা কুণ্ঠিত। কিন্তু মানবের অনুভূতির তীব্রতম ও মুখ্যতম বিষয়ই দুঃখ ; ইহার অস্তিত্বে সন্দিহান হইলে চলিবে না। ইহুদী জব হইতে বাঙ্গালী রামপ্রসাদ পর্য্যন্ত সকলেই সমস্বরে ইহা মানিয়া লইয়াছেন। মনুষ্যকে ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া পদে পদে জীবনের প্রসারণ-বিরোধী সর্ব্বগ্রাসী জড় শক্তির ও সমাজ-শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, ইহা নিত্য ঘটনা ও প্রত্যক্ষ ব্যাপার। ইহাই মনুষ্যের জীবন। সংগ্রামে একটু শিথিলপ্রযত্ন হইলেই জীবনরক্ষা অসাধ্য হয়। এমন কি, সাবধানে ও সবিক্রমে যুদ্ধ চালাইলেও জীবনরক্ষা শেষ পর্য্যন্ত সাধ্য হয় না, ইহাই ত জীবনের বিশিষ্টতা। ইহার দুঃখ নাম দিতে না চাও, সে স্বতন্ত্র কথা ; তাহা ভাষাগত বিবাদের বিষয় ; আমরা যাহাকে দুঃখ নাম দিতেছি, তাহার অভাব ইহাতে প্রতিপন্ন হয় না।

তবে সকলে এই দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না এবং ইহার উৎপত্তির কারণ অন্যরূপে নির্দ্দেশ করেন।

জরথুস্ত্র কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত মতানুসারে বিশ্ব-জগতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বিধাতা প্রভুত্ব করিতেছেন ; একের কার্য্য সুখবিধান, অপরের কার্য্য দুঃখবিধান। [illegible] জয় হয় ; অতএব মনুষ্যের কর্ত্তব্য সেই সুখবিধাতার আশ্রয় গ্রহণ।

সেমিটিক জাতিরাও সম্ভবতঃ সেই মত গ্রহণ করিয়া দুই বিধাতার— খোদার ও শয়তানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। [illegible]

পরাক্রম দুঃখবিধাতার অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবেই অধিক। এমন কি, তিনি ইচ্ছা করিলে সমুদয় দুঃখের বিলোপসাধনও করিতে পারিতেন। তবে তাঁহার আদেশের অবহেলাই এই হতভাগ্য মনুষ্য জাতির প্রতি তাঁহার নিদারুণ ক্রোধের হেতু হইয়াছে, এবং এই ক্রোধের ফলেই নির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত মনুষ্যকে তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপে দুঃখভোগে বাধ্য থাকিতে হইবে, এই তাঁহার ব্যবস্থা ও আদেশ। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দুঃখবিধাতার প্ররোচনায় মানব-জাতির আদিম পিতা মাতা তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিয়াছিল, তজ্জন্যই মানব-জাতির উপর তাঁহার এই দুর্জ্জয় কোপ। আদিম পিতা মাতার পাপে ভবিষ্যৎ বংশপরম্পরা কিরূপে নিগ্রহভাজন হইতে পারে, এবং পরমকারুণিকত্বের সহিত এই তীব্র প্রতিহিংসার প্রবৃত্তির কিরূপে সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে, তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। বোধ হয়, ইহা খোদার একটা খেয়াল মাত্র, অথবা রহস্যময় জাগতিক বিধানাবলীর অন্তর্গত একটা রহস্যময় বিধান মাত্র। যাহাই হউক, প্রতিদ্বন্দ্বী দুঃখবিধাতা যে তাঁহার সাধের জগতে বাদ ঘটাইয়া অনর্থ ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা সর্ব্বশক্তিমানের অদূরদৃষ্টির ফল মনে করিতে হয়। তবে তিনি এই অনর্থের প্রতীকারে সমর্থ ও কোন সময়ে ইহার প্রতীকার করিয়া দিবেন, মনুষ্য এই ভরসায় আশ্বস্ত থাকিতে পাবে। মানব-জাতির আদি দম্পতিকে স্বাধীন ইচ্ছার সহিত অক্ষমতা প্রদান করিয়া সেই সুখবিধাতা কেন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর ঈর্ষ্যাবৃত্তি পরিতৃপ্তির সুযোগ দিয়াছিলেন, তাহাও চিন্তাব বিষয়।

বস্তুতই বিধাতার করুণাময়ত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়। সেই জন্য এই দুঃখের নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়া দুঃখের অস্তিত্ব ঢাকিয়া ফেলিবার অথবা উড়াইয়া দিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা হইয়াছে।

আর একরূপ ব্যাখ্যা আছে। দুঃখের পরিণতি পরম সুখ; দুঃখের অভাব ঘটিলে সুখানুভূতির ব্যাঘাত ঘটিত, সেই জন্য শেষ পর্য্যন্ত সুখের মাত্রা বাড়াইবার জন্যই এই দুঃখের সৃষ্টি হইয়াছে। চরমে পরম সুখ দানই দুঃখসৃষ্টির উদ্দেশ্য।

আজকাল যাঁহারা অভিব্যক্তিবাদকে ভিত্তি করিয়া দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিতে বসেন, তাঁহারাও ঐরূপ একটা কথা বলিয়া মানব-জাতিকে

আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। অভিব্যক্তির আর একটা নাম ক্রমোন্নতি। অভিব্যক্তির ফলে সুখের উন্নতি ও দুঃখের হ্রাস। কিন্তু মৃত্যুর ন্যায় মহাদুঃখজনক ব্যাপার যখন প্রত্যেক মনুষ্যের ও সমস্ত মানবকুলের সম্মুখে প্রতি মুহূর্ত্তে উপস্থিত রহিয়াছে ও সেই মৃত্যুর সহিত অবিরাম যুদ্ধই জীবের জীবন; এবং সেই মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টাতেই জীবের ক্রমোন্নতি বা অভিব্যক্তি, অথচ সেই মৃত্যুর হাত এড়াইবার কোন উপায় এ পর্য্যন্ত কোন জীব আবিষ্কার করিতে পারিল না; অভিব্যক্তির যখন এই পরিণাম, তখন ঐরূপে দুঃখের অপলাপ করিবার চেষ্টা নিষ্ফল।

ফলে দুঃখের সহিত সুখ আইসে, অবিমিশ্র দুঃখ জগতে নাই, এ কথাটা যেমন সত্য, সুখের সহিত দুঃখ আইসে, অবিমিশ্র সুখ জগতে নাই, এ কথাটাও তেমনই সত্য। ইহাতে সন্দেহ করিলে সত্যের অপলাপ হয়।

জ্ঞানের বৃদ্ধি দুঃখনাশের প্রয়াস মাত্র, এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিয়া বলা যায়; কিন্তু জ্ঞানের বৃদ্ধিতে দুঃখের হ্রাস ঘটিয়া সুখের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, এ কথা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না।

জ্ঞানের পূর্ণতায় দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ ঘটিবে, ইহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে চারি দিক্ হইতে সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। হয়ত মানব-জাতির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সমাজ এই কারণেই জ্ঞানের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া অতি নিরুপায় হইয়া বিশ্বাসের মার্গ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেছে। তুমি বলিতেছ যে, জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে দুঃখের হ্রাস হইবে, কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, জ্ঞানের সহিত দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত উহার মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে, এরূপ স্থলে জ্ঞানের পূর্ণতায় দুঃখের নাশ হইবে, ইহা কিরূপে মানিতে পারি?

এই প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর আছে কি না জানি না। তবে এইরূপে ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

তোমরা যাহাকে জ্ঞান বল, তাহা জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান। ঐ জ্ঞান না থাকিলে জগৎ থাকিত, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। সেই তথা-কথিত জ্ঞানের অভাবে জগতের অভাব যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে সেই জগতের সহিত সেই জ্ঞানের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দাঁড়ায়; একটিকে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব থাকে না। জ্ঞান হইতেই এই সুখ-দুঃখময় জগতের উৎপত্তি [illegible]। এই জগতের উৎপত্তির সহিত দুঃখের উৎপত্তি ও সুখের উৎপত্তি

হইয়াছে। সুখ-দুঃখ উভয়ই এই জ্ঞান নামধারী ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন। উভয়ই একরকম বিকারের ফল; একই বিক্রিয়ার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। এ-পিঠ হইতে দেখিলে যাহা সুখ, ও-পিঠ হইতে দেখিলে তাহা দুঃখ। যদি কেবল বিশুদ্ধ সুখ চাও, তাহা হইলে তাহা তুমি কোথাও পাইবে না; যদি বিশুদ্ধ দুঃখ চাও, তাহাও কোথাও মিলিবে না। একখানা কটাহের এক পৃষ্ঠ যেমন কুব্জ ও অপর পৃষ্ঠ ন্যুব্জ, এই কুব্জত্ব লোপ করিতে গেলে ন্যুব্জত্ব যায়, আর ন্যুব্জত্ব দূর করিতে গেলে কুব্জত্ব অন্তর্হিত হয়, আর একের লোপের সহিত উভয়েরই লোপ হইলে কটাহের আর কটাহত্ব থাকে না, সেইরূপ এই জগতের দুঃখভাগ লোপ করিতে গেলে সুখের ভাগ আপনা হইতেই লোপ পাইয়া যায়, সুখভাগ লোপ করিতে গেলে দুঃখের ভাগও লোপ পায়, এবং সুখদুঃখ লোপ করিতে গেলে সুখদুঃখময় জগতেরও আর অস্তিত্ব থাকে না। যে জগতে সুখও নাই, দুঃখও নাই, এবং সুখদুঃখ ভোগের জন্য চেতন কেহ নাই, সেই অচেতন জগতের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। জ্ঞান নামে পরিচিত ভ্রান্তি হইতে ইহার উৎপত্তি এবং সেই ভ্রান্তি যত ক্ষণ বর্ত্তমান থাকিবে, তত ক্ষণ সুখদুঃখ পরিহারের চেষ্টা বৃথা।

জ্ঞানের নামে পরিচিত এই ভ্রান্তির বিলোপ সাধন অসাধ্য না হইতে পারে। তবে তাহা বিলুপ্ত হইলে যেমন দুঃখ থাকিবে না সত্য, সেইরূপ সুখও থাকিবে না, তখন এই প্রত্যক্ষগোচর বিচিত্র সুখ-দুঃখের আশ্রয় যে জগৎ, তাহারও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে।

দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ মনুষ্যের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু দুঃখের পরিবর্ত্তে, দুঃখকে দূর করিয়া তাহার স্থানে সুখপ্রতিষ্ঠার আশা নিতান্ত মূঢ়তা। সুতরাং মুক্তি অর্থে কেবল দুঃখ হইতে মুক্তি নহে, উহা সুখ হইতেও মুক্তি; উহা ভ্রান্তির পাশ হইতে মুক্তি, উহা জগতের বন্ধন হইতে মুক্তি। এই সুখদুঃখবিনির্ম্মুক্ত হইয়া অবস্থান যদি কল্পনীয় হয়, তবেই পরম পুরুষার্থ সাধিত হইবে।

ভারতবর্ষে এক কালে এইরূপ মুক্তিতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল। এই মুক্তিবাদ ভারতবর্ষে জনসমাজকে গঠিত, নিয়মিত ও চালিত করিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের জনসঙ্ঘের অস্থিমজ্জায় এই মত গূঢ়ভাবে নিহিত থাকিয়া তাহাকে জীবনের পথে প্রেরিত করিতেছে। অন্য দেশে অন্য সমাজে এই মতের ক্ষীণ ধ্বনি যে শুনিতে পাওয়া যায় নাই, এরূপ বলিতে

চাহি না। কিন্তু অন্যত্র ইহা মানবের জীবনের গতির নিয়ামক হইয়াছে বা মানবের গন্তব্য নির্দ্দেশে বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছে, ইহা ইতিহাসে লেখে না। এই মত বিচারসহ কি না, এই পথ সুপথ কি না, তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

বৈরাগ্য

দারা-সুত পরিবার, কে বা কার, কে তোমার, কেহ সঙ্গে আসে নাই; কেহ সঙ্গে যাবেও না ; কেবল চক্রান্ত করিয়া তাহারা তোমাকে সংসার-কারাগারে মোহের শিকলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে ; যদি বুদ্ধি থাকে ও কল্যাণ চাও, সত্বর শিকল কাটিয়া আপনার পথ দেখ।

চিরদুঃখী মানব-জাতির হিতৈষী বন্ধুগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া আত্মীয়-স্বজনকে উন্মার্গগমনে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং এই উপদেশের ফলে বহু মানব আপন দারা-সুত-পরিবারকে বিধাতার করুণায় সমর্পণ করিয়া নিজ ইষ্টলাভের ও শ্রেয়োলাভের চেষ্টায় বহু দিন হইতে নিযুক্ত রহিয়াছে।

আর সমাজস্থ অবশিষ্ট মনুষ্যের মধ্যে যাহারা বুদ্ধির অভাবে বা প্রবৃত্তির তাড়নায় সেই মায়াবন্ধন কাটিতে অসমর্থ হইয়াও উক্ত উপদেশের ভাব গ্রহণে অধিকার ও তাৎপর্য্য গ্রহণে শক্তি রাখে, তাহারা ঐ স্বাধীন মুক্ত পুরুষদের অবস্থার সহিত আপনার যাতনাময় বদ্ধ দশার তুলনা করিয়া জীবনটা মিছা গেল বলিয়া হা হুতাশ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়।

এরূপ উপদেশও আছে যে, আজিকার দিনটা মনের আনন্দে চরিয়া খাও, কালিকার দিনের রুটির ব্যবস্থা বিধাতা করিয়া দিবেন। নহিলে বিধাতার করুণাময়তায় সন্দেহ প্রকাশ হইবে।

দারা-সুত-পরিবারকে দারত্ব, সুতত্ব ও পরিবারত্ব প্রদান করিবার সময় বিধাতার অভিপ্রায় বুঝিবার চেষ্টা হয় কি না জানি না ; কিন্তু সংসারেব সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দুই একটা লাঠির ঘা পাইবা মাত্র ভাগ্যহীন দারা-সুতকে অন্যের করুণায় ফেলিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে পারিলে বিধাতার দয়াময়ত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস দেখান হয় সন্দেহ নাই ও তৎসঙ্গে আত্মানং সততং রক্ষেৎ, এই নীতির প্রতি সম্মানেরও সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয়। তথাপি দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, সংসারতাপক্লিষ্ট বিশাল মানব-জাতির অধিকাংশই অদ্যাপি এমন সোজা কথাটা বুঝিল না ; অধিকাংশই এখনও পুত্র-কলত্রের বোঝা ঘাড়ে করিয়া সংসারের কণ্টকাকীর্ণ পথে বিচরণ করিতেছে !

বিজ্ঞানের চক্ষুতে লোষ্ট্র-কাঞ্চনের মধ্যে প্রথমকে ছাড়িয়া দ্বিতীয়ের প্রতি পক্ষপাতের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না ; বায়ুর মধ্যে যখন অম্লজান

নাইট্রোজেনের সহিত প্রচুর অঙ্গার পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে, তখন আর দশ বৎসরের ভিতরে বৈজ্ঞানিকেরা যে বায়ু হইতে চা'ল ডা'ল প্রস্তুত করিতে পারিবেন না, কোন ব্যক্তি সাহসের সহিত এই কথা বলিতে পারিবে না। আবার শরীরবিদ্যার কুত্রাপি কার্পাসবস্ত্র শরীরের অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। এইরূপে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চক্ষে নিরীক্ষণ করিলে লোষ্ট্র-কাঞ্চনে অপক্ষপাত, বায়ুভক্ষণের উপকারিতা এবং বস্ত্রব্যবহারের অনাবশ্যকতা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। লোষ্ট্র-কাঞ্চনে অপক্ষপাত, বায়ুভক্ষণ ও দিগসনত্ব শাস্ত্র ও বিজ্ঞান উভয়েরই অনুমত হইয়া দাঁড়ায়; আমরা শাস্ত্রের অনুশাসনও মানিব না এবং বিজ্ঞানকেও পায়ে ঠেলিয়া অকারণে জীবন-সমরের উগ্রতা বৃদ্ধি করিব, ইহাই দুঃখ!

অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দাও, এই ভারতবর্ষেই কয়েক কোটি না হউক, অন্ততঃ কয়েক লক্ষ ব্যক্তি আজিও সংসারের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বৈরাগ্যমার্গ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে; এই ত্যাগী পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কাঞ্চনের প্রতি সম্পূর্ণ পক্ষপাতবর্জ্জিত না হইলেও ললাটের স্বেদপাতনাদি কাঞ্চনলাভের লৌকিক উপায়ে একেবারে আস্থাশূন্য এবং দারগ্রহণাদি ব্যাপারেও কৃত্রিম সামাজিক প্রথায় বিরক্ত ও সহজ স্বভাবেরই অনুবর্ত্তী, সে কথা নাই বা তুলিলাম।

অন্য দেশের কথা তুলিব না, তবে আমাদের ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবের পর হইতে বহু শত বৎসর ধরিয়া গৃহস্থধর্ম্মের উপরে সন্ন্যাসধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা যে ঐতিহাসিক ফল প্রসব করিয়াছে, তাহা আলোচনার বিষয়। অন্যান্য প্রবল নবীন জাতির সহিত এই প্রাচীন দুর্ব্বল জাতি জীবনদ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হওয়ায় জীবনের দুর্গম পথ যখন আরও দুর্গম হইয়া উঠিতেছিল, জীবনের গতি আরও খরতর হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে এই ক্লেশকর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের অন্য উপায় বর্ত্তমান আছে, বৈরাগ্য-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণের প্রদত্ত এই উপদেশের প্রভাব জাতীয় জীবনের উপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা আমাদের আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত।

বৈরাগীকে তিরস্কার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বৈরাগ্যধর্ম্মের আচার্য্যগণের মাহাত্ম্যে সন্দেহ উৎপাদন করিয়া পাপভাক্ হইতে অভিলাষ করি না। গৃহাশ্রমত্যাগী কৃত্রিমতাশূন্য বিরক্ত পুরুষ সর্ব্বতোভাবে বরণীয়

ব্যক্তি। তাঁহার নিরীহতা ও নির্দোষ স্বভাব সর্ব্বথা অনুকরণীয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রবৃত্তিনিরোধক যতগুলি অনুশাসন আছে, তিনি তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেন; সাধারণ সংসারীর পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয় না। মনুষ্য-চরিত্রের উদ্দাম প্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে সম্মুখসংগ্রামে নিযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে সংযত, প্রতিহত, নিরস্ত রাখিবার যে প্রশংসা, তাহা সমাজমধ্যে কেবল তাঁহারই প্রাপ্য।

বস্তুতই মনুষ্য-জীবনে প্রবৃত্তিনিরোধ একটা ভয়াবহ ব্যাপার। মনুষ্য একাধারে স্বাভাবিক জীব ও সামাজিক জীব। জীবত্ব ও সামাজিকত্ব, এই উভয় ধর্ম্ম লইয়া ধরাধামে ভূমিষ্ঠ হইয়া মনুষ্য দুই চাপে পিষ্ট ও দুই টানে ছিন্ন হইতেছে। এই বিষয়ে মনুষ্যের ন্যায় দুর্ভাগ্য জীব আর নাই। তাহার উচ্চ পদবীই তাহার দুর্ভাগ্যের প্রধান কারণ। মুকুটধারী মস্তকের যেমন শান্তি নাই, জীবশ্রেণীতে শীর্ষস্থানীয় মানবেরও যাতনার তেমনই অবধি নাই। জীবসাধারণ প্রবৃত্তিগুলি তাহার পূর্ব্বগত পুরুষপরম্পরা হইতে আগত হইয়া তাহার অস্থিমজ্জায় নিহিত ও শোণিতে প্রবাহিত থাকিয়া তাহাকে সামাজিক বন্ধন হইতে প্রতি ক্ষণে ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতেছে; অপর দিকে প্রবল সমাজ-শক্তি তাহার উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাকে একই কেন্দ্রে আকৃষ্ট রাখিয়া একই মুখে ঘুরাইবার প্রয়াস পাইতেছে। পুরুষ-পরম্পরাগত প্রাকৃতিক শক্তি তাহাকে প্রবৃত্তির পথে লইয়া যায়; সামাজিক শক্তি তাহাকে নিবৃত্তির পথে চলিতে উপদেশ দেয়। মানুষের জীবন এইরূপে একটা ঘোর বিরোধে পরিণত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মনুষ্য-জাতির ইতিহাসে এমন দিন এক কালে ছিল, যখন তাহার জীবত্ব বা পাশবিকতা তাহার সামাজিকতাকে অভিভূত রাখিয়াছিল; এখন আমরা মনুষ্য-সমাজ বলিতে যাহা বুঝি, তখনও তাহা রীতিমত গঠিত হয় নাই। সে সময়ে মনুষ্য একরূপ স্বচ্ছন্দবিহারী স্বাধীন জীবরূপে আহার ও বিহার করিত। ধর্ম্মাধর্ম্মসম্পৃক্ত পাপপুণ্যঘটিত সূক্ষ্ম তত্ত্বের তখন উদ্ভাবনা হয় নাই। যেন তেন আত্মরক্ষা ও শরীরপোষণ ব্যাপারটা সম্পন্ন করিতে পারিলেই তাহার জীবনের কার্য্য একরূপ নিষ্পন্ন হইয়া যাইত; এবং প্রাকৃত নিয়মে আপনার বংশরক্ষার উপায় বিধান করিলেই সে জীবনের কর্ত্তব্য-দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইত। সমাজ নামক জটিল কৃত্রিম যন্ত্র নির্ম্মিত হওয়ার পর হইতে আত্মরক্ষার ও বংশরক্ষার জন্য সেই দুইটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া

অব্যাহতি পাওয়া মনুষ্যের পক্ষে বড়ই দুর্ঘট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজ দুইটার উপর আরও পঞ্চাশটা কর্ত্তব্য কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া মানুষের হাত-পা বাঁধিয়া দিয়াছে ও তাহার স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা নিয়মিত করিয়া দিয়াছে। এখন আর কেবল প্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া, প্রাকৃত নিয়মগুলি পালন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে গেলে চলে না ; সমস্ত সমাজ সমবেত হইয়া জোর করিয়া লাঠি তুলিয়া তাহাকে কতকগুলি কৃত্রিম বন্ধনের ভিতর আবদ্ধ রাখিতে চায়। তাহার এমন শক্তি বা সাহস নাই যে, সেই সমবেত বলের বিরুদ্ধাচারী হইয়া সে আত্মরক্ষা করিতে পারে। যদি কেহ এইরূপ দুঃসাহস অবলম্বন করিতে যায়, তাহার উপর সমস্ত সমাজ এমন ঘোর নির্যাতন উপস্থিত করে যে, তাহার জীবন-রক্ষাই দুরূহ হইয়া দাঁড়ায়। সুবুদ্ধির মত সমাজের মন যোগাইয়া আপনার স্বভাবলব্ধ প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত রাখিতে পারিলে সুশীল বলিয়া নাম পাওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু মানুষের মজ্জাগত চিরন্তন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি তাহার স্নায়ুতন্তুকে এরূপে উত্তেজিত ও তাহার মাংসপেশীগুলিকে এরূপে পরিচালিত করে যে, সমাজমধ্যে সুশীলতার জন্য পুরস্কার লাভ করা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কত সহস্র বৎসর ধরিয়া এই সমাজশক্তি কত রকম উপায়ে, কখন রাজতন্ত্র, কখন লোকতন্ত্র, কখন ধর্ম্মতন্ত্র আখ্যা ধারণ করিয়া, ভ্রূকুটী দেখাইয়া ও দণ্ড উদ্যত করিয়া, প্রত্যেক মনুষ্যকে শাসনে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু হায়, কয়টা মনুষ্য এই শাসনের সম্পূর্ণ অধীন হইতে পারিয়াছে ! কয় জন মনুষ্য প্রকৃতই ভাল ছেলে হইয়া সমাজ-জননীর অঙ্ক সুশীতল রাখিতে সমর্থ হইয়াছে !

মনুষ্যের যখন এইরূপ সাধারণ অবস্থা, তখন যে ব্যক্তি বস্তুতই তাহার দুর্দ্দম নৈসর্গিক প্রবৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করিয়া সম্পূর্ণ নিরীহ ভাবে সমস্ত জীবনটা কাটাইয়া দেয়, তাহার ক্ষমতার বাস্তবিকই পরিসীমা নাই। মনুষ্য-সমাজ যে তাহার মহত্ত্ব দুন্দুভিনাদে ঘোষিত করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

বাস্তবিকই স্নায়ুযন্ত্রের ও পেশীযন্ত্রের প্রবৃত্তিপ্রেরিত স্বাভাবিক ক্রিয়া রুদ্ধ করিতে একটা অসাধারণ শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি যাহার আছে, তাহাকে পূজা করিতে পাইলে মনুষ্য ধন্য হয়।

বৈরাগ্যের পক্ষে দাঁড়াইলে যুক্তিতর্কের অভাব হয় না। বৈরাগ্য অর্থে সংসারে আসক্তির অভাব। বস্তুতঃ সংসারে এমন কি আছে যে [illegible]

অনুরক্ত হইয়া আমাকে থাকিতে হইবে? সংসারে প্রলোভনের সামগ্রী এমন কি আছে যে, আমি লুব্ধ পতঙ্গের মত সেই মধু আহরণের জন্য ঘুরিয়া মরিব? হৃদয়ে হাত দিয়া কি বলা যায় যে, যাহাকে মধু বলিয়া আমার সম্মুখে ধরিয়া আমাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিতেছ, তাহা প্রকৃতপক্ষে হলাহল মাত্র নহে? যাহাকে স্নিগ্ধ বারিপূর্ণ সরোবর মনে করিতেছি, তাহা মরীচিকা মাত্র নহে? যাহার বর্ণের উজ্জ্বলতায় রূপমুগ্ধ পতঙ্গ ভুলিতেছে, তাহা জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা মাত্র নহে? এই ত সংসারের অবস্থা। উহা মৃগ ধরিবার ফাঁদ, উহা ব্যাধনির্ম্মিত বাগুরা; যে ব্যক্তি বুদ্ধিবলেই হউক বা অভিজ্ঞতাবলেই হউক, উহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়াছে, তাহাকে প্রলোভনের চেষ্টা বৃথা। ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্ঞানতঃ জালবদ্ধ হইতে কে চায়?

আর সরল ভাবে কি বলা যায় যে, সংসারে পুণ্যের জয়, পাপের ক্ষয় বলিয়া একটা যে প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, তাহা একটা প্রকাণ্ড প্রবঞ্চনা নহে? এ কথা কি প্রকৃত নহে যে, যে নিষ্ঠুর পাষণ্ড আপনার প্রতিবেশীর অস্থিপঞ্জর পদতলে দলিত করিয়া দ্বিধাহীন ও দৃক্‌পাতশূন্য হইয়া চলিয়া যায়, অনেক সময়ে তোমরা তাহারই জয়ডঙ্কা বাজাও? ইহা কি সত্য নহে যে, শান্ত নিরীহ দুর্ব্বল ব্যক্তি ভয়ে ভয়ে সংসারক্ষেত্রে পা ফেলিয়া চলিয়া যায়, কোথায় যে ব্যথা পাইবে, কোথায় যে ব্যথা দিবে, এই আশঙ্কায় যাহার জীবনের বলটুকু প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষীণ হইয়া যায়, তোমরা তাহার দুর্ব্বলতাকে মার্জ্জনা কর না, তাহার জীবনকে যাতনাসঙ্কুল করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটিগুলি তোমাদের হস্ত-নির্ম্মিত পরকলা দিয়া সমাজের চোখে বিকৃত ও প্রসারিত করিয়া দেখাও, এবং সংসারের পিচ্ছিল পথে চলিতে চলিতে যদি তাহার দৈবাৎ পদস্খলনের সম্ভাবনা হয়, তখন তোমরা পশ্চাৎ হইতে ধাক্কা দিয়া তাহাকে একেবারে ভূপাতিত করিয়া করতালি দিয়া থাক? তোমাদের উপকারের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যখন আমি তোমাদেরই অনুগ্রহের ভিখারী হই, তখন তোমরা আমাকে চিনিতে পার কি? বরং আমাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া গৃহদ্বার হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দাও না? সম্পদের বন্ধু বিপদে শত্রুতাচরণে ত্রুটি করে কি? তোমাদের আচরণ দেখিয়া টাইমনের মত মানবদ্রোহী হইতে ইচ্ছা করে না? সমাজের যখন এইরূপ ব্যবস্থা, তখন যদি কেহ বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া, যদি কেহ মানবদ্রোহী বা স্বজাতিদ্রোহী না হইয়া, সমাজের এক প্রান্তে পড়িয়া

থাকে, যেমন দান করিতে পারে না, তেমনই প্রতিদানও চাহে না, তাহাকে সমাজ কি এক মুষ্টি ভিক্ষা দিতে কাতর হইবে?

বস্তুতই টাইমনের জীবন কবির কল্পনা মাত্র নহে। পরার্থপরায়ণ সাধু ব্যক্তির প্রতিও এরূপ অত্যাচার ঘটে, যাহাতে সে গৃহবদ্ধ কুপিত মার্জ্জারের ন্যায় মনুষ্য-সমাজরূপ আততায়ীকে নখরপ্রহারে ও দন্তাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

বস্তুতই আমি দেখিতে পাইতেছি ও শিখিয়াছি, তোমরা সংসাররূপ নাট্যশালায় যে কয়খানি মোহন দৃশ্য পট ধরিয়া রাখিয়াছ, উহার সৌন্দর্য্য কৃত্রিম বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে; কিন্তু ক্ষণ কাল পরে প্রদীপটি ও পরকলাখানি সরিয়া গেলেই সমুদয় নাট্যশালা দুঃখের তমোজালে আচ্ছন্ন হইবে। আমি ইহা বুঝিয়াছি; সুতরাং ঐ নাট্যশালায় মনুষ্যকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য যে প্রতারণার অবতারণা হইতেছে, তাহাতে আমি আকৃষ্ট হইতে চাহি না। ইহাতে আমার দোষ কি? ইহা হইতে দূরে থাকাই আমার কর্ত্তব্য এবং আমি যদি ইচ্ছা করিয়া প্রতারিত হইতে না পারি, তাহাতে আমাকে দোষ দিও না।

সংসারে সুখ কোথায়? যদি কোথাও কিয়ৎ পরিমাণে থাকে, তাহার স্থায়িত্ব কোথায়? জনক জননী, স্ত্রী পুত্র আত্মীয় এবং স্বজন, স্নেহ বাৎসল্য, ভক্তি শ্রদ্ধা, প্রণয়ের কুহকে আচ্ছন্ন রাখিয়া কিছু দিনের জন্য অমৃত-ধারায় ডুবাইয়া রাখে সত্য, কিন্তু যাহাদের মায়াবন্ধনে বদ্ধ হইয়া আমি সংসারকে নন্দন-কানন ভাবিয়া দুই দিন উল্লাসে স্ফীত হই, দুই দিন পরে সেই স্নেহের পুতুলগুলি একে একে ফাঁকি দিয়া অন্তর্হিত হয়, আমার ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহার জন্য চিন্তা মাত্র করে না, তখন আমার উল্লাস কোথায় থাকে? তাহাদের অন্তর্দ্ধানজনিত শোকে যখন আমি অভিভূত হই, তখন সমস্ত জগৎকে নাস্তিত্বে পর্য্যবসিত হইতে দেখিবার বাঞ্ছা হয়, তখন তুমি কোথায় থাক? তখন তুমি নিষ্ঠুর সান্ত্বনা-বাণী লইয়া গম্ভীরভাবে জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া আমাকে সুস্থ করিতে আইস; কিন্তু তখন কি সে উপদেশ আমার কানে যায়? তখন কি জগৎকে একটা মাংসশোণিতহীন কঙ্কালময় পিশাচের প্রতিকৃতি বলিয়া বোধ হয় না? মনুষ্য মাত্রেরই অভিজ্ঞতার যখন এই শেষ ফল, তখন কেন আমি সাধ করিয়া আপন পায়ে শিকল পরিতে যাইব? আমি পরিণামে অন্তর্দাহকর দুঃখজ্বালা সহ্য করিতে

প্রস্তুত নহি, এবং সেই জন্য আমি সমাজের সুখের ভাগী হইতেও চাহি না। এইরূপ সমাজে বাস করিয়া তাহার প্রতি অনুরাগের অভাব জন্মিলে সমাজই তাহার জন্য দায়ী।

সামাজিক গৃহস্থ ব্যক্তি বিরক্ত পুরুষকে সম্বোধন করিয়া একটা কথা বলিতে পারে। সমাজের নানাবিধ অত্যাচার আছে সত্য; কিন্তু মোটের উপর সমাজ মনুষ্যের কল্যাণের জন্যই স্থাপিত। সামাজিক মনুষ্য দুর্ভাগ্য জীব হইতে পারে, কিন্তু সমাজহীন মনুষ্যের দুর্ভাগ্যের তুলনা নাই। সমাজ-মধ্যে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ ও সমাজের অনুগ্রহেই পালিত হইয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছ; সুতরাং সমাজ যদি কিছু অত্যাচার করে, তাহা তুমি সহ্য করিতে ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ বাধ্য। পুত্র যেমন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও জন্মদাতা ও বাল্যে পালনকর্ত্তা পিতার অত্যাচার সহিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য, তুমিও সেইরূপ তোমার নিরাশ্রয় অবস্থার আশ্রয়, তোমার মনুষ্যত্বের রক্ষক সেই সমাজের নিকট সর্ব্বদা অবনতমস্তকে থাকিতে বাধ্য। সমাজের হস্তে যে ভীতিজনক দণ্ড উদ্যত দেখিয়া ভয় পাইতেছ, তাহা স্নেহময় পিতা অথবা হিতৈষী শিক্ষকের করধৃত শাসনদণ্ডের তুল্য। হইতে পারে, তাহা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা সুবুদ্ধি দ্বারা চালিত ও প্রযুক্ত হয় না; অথবা মানবীয় অপূর্ণতা যেমন সর্ব্বত্র, তেমনই এ স্থলেও বিদ্যমান। কিন্তু তাহা বলিয়া সেই শাসনদণ্ডের অবাধ্য হইবার অথবা তাহা হইতে দূরে থাকিবার তোমার কোন অধিকার নাই। জননী প্রকৃতির যেমন এক হস্তে খড়্গ ও অপর হস্তে অভয়, সমাজেরও সেইরূপ ভীম ও কান্ত উভয় মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে; তোমার চক্ষু অন্ধ বা বিকৃত, তাই তুমি একটা মূর্ত্তি দেখিতেছ, অন্য মূর্ত্তি দেখিতেছ না। তুমি সমাজের নুন খাইয়াছ, এখন নিমকহারামি করিয়া সমাজকে পরিত্যাগ করিও না।

বিরক্ত সমাজত্যাগী এইরূপে ইহার উত্তর দিতে পারেন। হইতে পারে, আমি যখন আমার জীবনের অথবা আমার কর্ম্মের প্রভু ছিলাম না, এমন অবস্থায় মনুষ্য-সমাজ আমাকে কোলে লইয়া রক্ষা করিয়াছে ও আমাকে লালন-পালন করিয়া মনুষ্য-পদবীতে স্থাপিত করিয়াছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, আমি কখনও সমাজের নিকট এরূপ অনুগ্রহের প্রার্থী হইতে যাই নাই। আমার অজ্ঞাতসারে এবং আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর কিছু মাত্র নির্ভর না করিয়া সমাজ আমার সে উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য সমাজের চরণে

কোটি নমস্কার করিতেছি এবং সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, ভবিষ্যতে আর যেন আমাকে তিনি এরূপ অযাচিত অনুগ্রহ-ঋণে আবদ্ধ না করেন। আমি যে কারণেই হউক, জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু জীবনে আমি সুখের প্রয়াসী নহি, কেবল মাত্র শান্তির প্রয়াসী। সমাজ আমার শান্তিটুকু অপহরণ করিয়া আমার দুর্ব্বল স্কন্ধের উপর যেন আর অনুগ্রহের বোঝা আরোপণ না করেন। জননী প্রকৃতির অনুগ্রহে যখন আমার নাবালক ভাব সম্প্রতি শেষ হইয়াছে, এবং নিজকৃত কার্য্যের শুভাশুভ ফলের জন্য আমি সম্পূর্ণ দায়ী হইয়াছি, তখন আমাকে এই স্বাতন্ত্র্যটুকু প্রদান না করিলে বড়ই অবিচার করা হয়। তাই বা কতটুকু! আমি তোমার অনুগ্রহের বোঝাটুকু ঘাড়ে লইতে অসম্মত, এই পর্য্যন্ত স্বাতন্ত্র্য চাহিতেছি। তোমাদের মধ্যে সকলকেই সুখের জন্য লালায়িত দেখিতেছি ও নিজ নিজ সুখের জন্য তোমরা কাটাকাটি করিয়া মরিতেছ। স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে তোমরা সমাজভুক্ত মনুষ্য সকলেই স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত। আমিও তোমাদের মত জীবধর্ম্মা, সুতরাং সুখাভিলাষী, তবে তোমাদের মত কাটাকাটিতে যোগ দিতে আমি চাহি না। আমার সুখের অর্থ কেবল শান্তি। আমার ক্ষুদ্রত্ব লইয়া আমি তোমাদের কোন উপকার করিতে পারিব কি না সন্দেহ, কিন্তু তেমনই তোমাদের নিকটও আমার প্রার্থনীয় কিছুই নাই। পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান বায়ু এবং বন্য বৃক্ষের গলিত পত্র ও পতিত ফলই আমার খাদ্য পক্ষে যথেষ্ট, এবং লোকালয়ের বহির্ভাগে দূর অরণ্যমধ্যে প্রশস্ত তৃণভূমি, তাহাই আমার শয্যা ও নিবাসস্থল। আমার অস্তিত্ব তোমাদের কাহারও জীবনপথ কণ্টকিত করিবে না বা আমার জীবন রক্ষার জন্য তোমাদের সমাজকে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হইবে না। ইহাতেও যদি আমি তোমাদের নিকট যৎকিঞ্চিৎ শান্তি লাভের অধিকার পাইতে না পারি, তাহা হইলে আমার উপায় কি? ইহাতেও যদি আমার নিন্দা কর, উপায় নাই। আমি যশের প্রার্থী নহি, নিন্দাতেও আমার কেশাগ্র বিচলিত হইবে না।

এ কথার উত্তর দেওয়া যায় না। এরূপ শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির নিন্দাবাদ বাস্তবিকই নিষ্ঠুরতা হইয়া দাঁড়ায়। বোধ করি, এইরূপ উত্তর দিতে না পারিয়াই মানব-জাতি বৈরাগীকে নিন্দা করিতে চাহে না। যে ব্যক্তি সংসারের সমরক্ষেত্রে কিছু ক্ষণ দাঁড়াইয়া রণে ভঙ্গ দেয়, এবং আপনার তাপক্লিষ্ট জর্জ্জরিত আত্মা লইয়া দূরে লুক্কায়িত রহে, তাহার প্রতি নিন্দাবাদ কাপুরুষের কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়।

তবে কি জীবন-সংগ্রামে পলায়ন পাপ বলিয়া গণ্য হইবে না? যে ব্যক্তি সম্মুখ-সমর পরিত্যাগ করিয়া নিজের প্রাণ রক্ষার্থ লুক্কায়িত হইয়াছে, আমরা তাহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইব?

দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজধর্ম্ম স্বার্থমূলক। ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থে নহে, মনুষ্য-সমাজের স্বার্থে ইহার প্রতিষ্ঠা। এ স্থলে ধর্ম্ম অর্থে আমরা ইংরাজী রিলিজন্ বুঝিব না। ধর্ম্ম অর্থে যাহা সমাজকে ধরিয়া রাখে, যাহার উপর সমাজের প্রতিষ্ঠা ও যাহার বলে সমাজের স্থিতি ও গতি, তাহাই বুঝিতেছি। এক কথায় সামাজিক মনুষ্যের কর্ত্তব্য-সমষ্টিকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। যাহা সমাজের স্বার্থের বিরোধী ও প্রতিকূল, যাহাতে সমাজের গ্রন্থিগুলি ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, তাহাকেই মোটের উপর এখানে অধর্ম্ম বলিতেছি। অতএব এই অর্থে ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বার্থমূলক।

বিরক্ত পুরুষ নিরীহ ও নির্দ্দোষ ব্যক্তি; তাঁহা হইতে সমাজের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। অচেতন লোষ্ট্রখণ্ডের মত নির্দ্দোষ পদার্থ কিছুই নাই, এবং লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় নিষ্পাপ পদার্থের অস্তিত্বও বিরল। সংসারত্যাগী বৈরাগী কতকটা সেইরূপ। বরং লোষ্ট্রখণ্ড হইতে মনুষ্য কিছু-না-কিছু উপকারের প্রত্যাশা রাখে, কিন্তু যে ব্যক্তি বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়াছে, তাহার নিকট হইতে কখন কোন লোকহিতের প্রত্যাশা আছে বলিয়া বোধ হয় না। সমাজের স্বার্থ তাহা কর্ত্তৃক এক পাদপ্রমাণও অগ্রসর হয় না।

সমাজের ভিতর বাস করিয়া তাহার নিগ্রহ ও অত্যাচার সহ্য করিতে তোমার প্রবৃত্তি না থাকিতে পারে; কিন্তু সমাজ সে কৈফিয়তে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য নহে, এখানে স্বার্থের সহিত স্বার্থের বিরোধ। তোমার আপনার সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সহিত সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের বিরোধ। তুমি শান্তিলাভের আশায় স্বার্থের জন্য যেমন সমাজ হইতে দূরে পলাইতেছ, সমাজও সেইরূপ আপন স্বার্থসাধনের জন্য তোমাকে আপনার নিকট টানিতে চাহিতেছে। যদি তুমি ধরা না দাও, তাহাতে তাহার স্বার্থের ব্যাঘাত হয়, সুতরাং তোমাকে প্রশংসা না করিবার যথেষ্ট কারণ তাহার পক্ষে বর্ত্তমান আছে।

জননী প্রকৃতির কোটি সন্তানের মধ্যে দুই একটি বিগড়াইয়া গেলে বা বিদ্রোহাচরণ করিলে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই, আপাততঃ মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্য তেমন নহে। সূর্য্যের মত প্রকাণ্ড বস্তুটার কাছে

সাগরবেলায় স্তূপীকৃত কোটি কোটি বালুকণার অন্তর্গত একটি কণা নগণ্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নগণ্য নহে ; কিন্তু সেই কোটি কণিকার মধ্যে একটির গণনায় ভুল হইলে বিশ্ব-রাজ্যের হিসাব নিকাশের সময় গোল বাধিয়া যায়। বৃহৎ সূর্য্য এবং ক্ষুদ্র বালুকণা, উভয়ের মধ্যে যে-কোনটির অভাব হইলে বিশ্বযন্ত্র বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডল হইতে নগণ্য বালুকণা উভয়েরই জগৎযন্ত্রের স্থিতি ও গতি অব্যাহত রাখিবার জন্য সমান ভাবে প্রয়োজন। আমাদের সহিত প্রকৃতির এই বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভেদ বর্ত্তমান। প্রকৃতির নিকট কোটি টাকারও যে মূল্য, কড়াক্রান্তিরও ঠিক সেই মূল্য। হিসাবে একটা কপর্দ্দকের ভুল হইবার যো নাই।

সুতরাং আমার কোটিসংখ্যক ভ্রাতা বর্ত্তমান আছে বলিয়া আমি স্বাধীন হইয়া বিচরণের দাবী করিতে পারি না। কোটি ভ্রাতা বর্ত্তমান আছে বলিয়াই তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক দাঁড়াইয়া আমার বন্ধনও কোটিগুণ হইয়া পড়িয়াছে। আমার কর্ত্তব্য-পালনের জবাবদিহি আমার, অপরের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

যে কারণেই হউক, তুমি মানব-সমাজ হইতে দূরে রহিতে চাহিতেছ, কিন্তু মানব-সমাজ তোমাকে চাহে। তুমি আর পাঁচ জনকে দেখাইয়া দিয়া নিজে এড়াইতে চাহিলে চলিবে না। তুমি ছাড়িতে চাহ, কিন্তু মানব-জাতি তোমাকে ছাড়িবে না। যে মুহূর্ত্তে তুমি মানবত্ব লইয়া ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়াছ, সেই মুহূর্ত্ত হইতে মানব-জাতি তোমার উপর একটা স্বত্বাধিকার লাভ করিয়াছে। হইতে পারে, সেটা গায়ের জোর মাত্র ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভূমণ্ডলে সমুদয় স্বত্ব ও সমুদয় অধিকার গায়ের জোর হইতেই সমুৎপন্ন।

ভূপৃষ্ঠে ফল জল, সোনা রূপা, যেখানে যাহা পাওয়া যায় এবং যাহা তোমার দরকারে লাগে, তাহা আত্মসাৎ করিব, মানুষ এইরূপে সকল দ্রব্যের উপর স্বত্ব স্থাপন করিয়া লইয়াছে। উহা মানুষের গরজ। তাহার স্বার্থপর প্রবৃত্তি হইতে সে আপনাকে ঐরূপ অধিকারী ঠাওরাইয়াছে। মানুষ নিজের গরজে এই পার্থিব যাবতীয় পদার্থে আপনার চিরন্তন স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে। ঠিক সেইরূপ গরজে মনুষ্য-সমাজও তাহার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির উপরেও তাহার অধিকার স্থাপিত করিতে চায়। তুমি তাহা এড়াইতে চেষ্টা করিতে পার—তোমার শান্তির জন্য, তোমার নিজের স্বার্থের জন্য। মনুষ্য-সমাজ সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়—তাহার নিজের

স্বার্থের জন্য। তুমি যদি মনুষ্য-জাতিকে ফাঁকি দিতে চাও, সেও তোমাকে নিগ্রহ করিতে ছাড়িবে না। নিউটনের প্রতিভা ও নিউটনের ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া সেই প্রতিভার ও সেই ক্ষমতার অপব্যয় ও অপচয় করিলে অথবা সেই প্রতিভাকে ও ক্ষমতাকে মনুষ্য-জাতির উন্নতিকল্পে নিয়োজিত না করিলে উৎকট পাপাচরণ হয়, মনুষ্য-জাতি নিজের গরজে নিউটনকে এই কথাই বলিবে। তবে সকলে কিছু নিউটনের প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। তথাপি তোমার যে একটু ক্ষমতা আছে, সেইটুকু তোমাকে মনুষ্য-জাতির কার্য্যে নিয়োগ করিতে হইবে। এক হিসাবে জগতের কেন্দ্রবর্ত্তী সূর্য্যমণ্ডলের এবং সামান্য বালুকাকণার মধ্যে ব্যবধান বর্ত্তমান থাকিলেও আর এক হিসাবে উভয়েই তুল্যমূল্য। সেইরূপ তুমি নিউটনের প্রতিভার কণিকা মাত্র না পাইলেও মনুষ্য-জাতির নিকট তোমার নিউটনের সহিত সমান দর। জায়স্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মদ্বিধাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ, বাক্যটা এক অর্থে ঠিক বটে, কিন্তু মদ্বিধ ক্ষুদ্র জন্তুরও জীবনের মূল্যের পরিমাণ অন্য এক অর্থে নিউটনের প্রকাণ্ড জীবনের সমতুল্য।

মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার আমার ক্ষুদ্র শক্তির অসাধ্য সন্দেহ নাই, এবং আমার জীবন-কাহিনী ভবিষ্যতের ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। তথাপি আমার একটা সঙ্কীর্ণ পরিধিবিশিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সেই কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে আমাকে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে হইবে। ইহা মনুষ্য মাত্রের সাধারণ দায়িত্ব। আপনাকে কেন্দ্রবর্ত্তী রাখিয়া ক্ষুদ্র বাহুদ্বয় চতুর্দ্দিকে প্রসারণ করিয়া সেই পরিধি-রেখা আমাকে নিজ চেষ্টায় টানিয়া লইতে হইবে। মানব-জাতি বলিতেছে, ইহাই তোমার ধর্ম্ম, নতুবা মানব-সমাজ ধৃত রহিবে না।

পল্লীবাসী কৃষক খায়, খেলায়, আপনার ক্ষেতটুকু চাষ করিয়া ফসল তোলে ও কিছু কাল আপন পুত্র-কলত্রের ভার বহিয়া মরিয়া যায়। তাহার জীবনের ইতিবৃত্ত কেবল খানিকটা খাওয়া-দাওয়া, খানিকটা হাসি-কান্না ও খানিকটা বিবাদ-বিসংবাদ মাত্রেই পর্য্যবসিত। তাহার মৃত্যুর দুই চারি দিন পরে তাহার নাম কাহারও স্মরণে থাকে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার জীবনকে নিষ্ফল মনে করা চলিবে না। সে যে-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, সে যথাশক্তি তাহার সাধনাতে নিরত আছে। জড় রাজ্যে যেমন প্রত্যেক পরমাণুর স্থান আছে, এবং কোনটিই অযথাস্থানে সন্নিবেশিত নাই, তেমনই

ধর্ম্মরাজ্যে তাহারও আসন নিরূপিত রহিয়াছে, সেই আসন হইতে তাহাকে ভ্রষ্ট করিবার কাহারও অধিকার নাই। তাহার ক্ষুদ্র জীবন মনুষ্যের জাতীয় জীবনের অন্তর্গত; সেই ক্ষুদ্র জীবনটুকু গণনায় না ধরিলে জাতীয় জীবনের ঠিকে ভুল হয়।

সত্য বটে, সংসারে থাকিলে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অপরের সহিত বিবাদ করিতে হয়, চিরকাল প্রহার সহা চলে না, দুই একটা প্রহার দিতেও হয়। প্রহার দেওয়া স্থূলতঃ নিন্দনীয় কাজ। স্থূলতঃ নিন্দনীয় হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বত্র নিন্দনীয় নহে। এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে অপর গণ্ড পাতিয়া দিবে, এই উক্তি অতি উন্নত ধর্ম্মবৃত্তির পরিচায়ক। কিন্তু এখানেও একটা সীমা আছে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বত্র এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে মনুষ্য-সমাজের হিতের ব্যাঘাত হয়। সুতরাং সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় উহা সর্ব্বত্র ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

বর্ত্তমান অবস্থায় জীবনের নাম বিরোধ এবং সেই বিরোধে প্রবৃত্ত হওয়ায় অধর্ম্ম নাই। এই বিরোধে মনুষ্য প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছে; মনুষ্য ইচ্ছা করিলেও উহা এড়াইতে পারিবে না। জীবন রক্ষার জন্য এক কণিকা তণ্ডুল উদরসাৎ করিতে গেলে আর এক জন ক্ষুৎপীড়িত ব্যক্তিকে ঐ তণ্ডুলকণা হইতে বঞ্চিত করিতে হয়। কেন না, প্রকৃতির বিধানে তণ্ডুলকণার সংখ্যা পরিমিত। যত মানুষ বাচিয়া আছে, তাহাদের সকলকে বাঁচাইবার মত তণ্ডুলকণা বিদ্যমান নাই। কাজেই বর্ত্তমান অবস্থায় জীবন বিরোধ মাত্র। ঘা দিতে হইবে বলিয়া ঘা সহিতে কাতর হইলে চলিবে না; পদস্খলন হইবে বলিয়া পা ফেলিতে দ্বিধা বোধ করিলে চলিবে না। নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে জীবন-দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইহাই মনুষ্যের প্রতি প্রকৃতির আদেশবাণী।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন স্বজন-পরিচালিত কৌরব অক্ষৌহিণীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছিলেন, আমার শরীরে বেপথু এবং রোমহর্ষ উৎপন্ন হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিত হইতেছে, আমি বিজয়াভিলাষ করি না, রাজ্যভোগ ও সুখভোগ আমার বাঞ্ছনীয় নহে। এরূপ মহতী বাণী মনুষ্য-বদন হইতে সর্ব্বদা বহির্গত হয় না। তথাপি অর্জ্জুনের এই বৈরাগ্য ভগবানের অনুমোদিত হয় নাই। "দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে রক্ষা করুন, জলনীলমা নদী ও নির্ঝরবান্ পর্ব্বত আমাদিগকে রক্ষা করুন; সূর্য্য ও

উষাদেবী আমাদের অপরাধ লইবেন না"—আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জীবনে আসক্ত হইয়া এইরূপে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। "যাহাতে ভূতগণের পীড়া না হয়, একান্তপক্ষে অল্প মাত্র পীড়া জন্মে, এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জন করিবে।' অগর্হিত কর্ম্মের দ্বারা, শরীরকে ক্লেশ না দিয়া ধনসঞ্চয় করিবে। যেমন বায়ু আশ্রয় করিয়া সর্ব্ব জন্তু বাস করে, সেইরূপ গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া সমুদয় আশ্রম বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ, অতিথিগণ, সকলেই গৃহস্থের প্রত্যাশী; গৃহাশ্রমের পর আশ্রম নাই"—এইরূপ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান। "কর্ম্মে তোমার অধিকার হউক, ফল-কামনায় তোমার রতি না থাকে, ফলকামনা তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয়; কর্ম্ম পরিত্যাগে তোমার আসক্তি না জন্মে"—এইরূপ আমাদের ভগবদুক্তি।

জীবন যাতনাসঙ্কুল সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কর্ম্মত্যাগে তোমার অধিকার নাই। আসক্তি ত্যাগ কর; অর্থাৎ কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্মাচরণ কর; ফলকামনা করিও না; কর্ম্মত্যাগে কিন্তু তোমার অধিকার নাই। ইহাই ছিল সেকালের অনাসক্তি; সেকালের বৈরাগ্য; সেকালের কর্ম্মসন্ন্যাস। সেকালের, যে-কালে মনুষ্য-জীবনের মূল্য ছিল, মনুষ্য নির্ভীক চিত্তে বিশ্ব-জগতের প্রতি নিরীক্ষণ করিত; জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা আত্মার ঈশিত্ব দ্বারা আবৃত, এই মহাবাক্য যখন উচ্চারিত হইয়াছিল। শুদ্ধ জ্ঞান এই বৈরাগ্যের প্রসূতি; ভক্তি ও তৃপ্তি ও মুক্তি এই বৈরাগ্যের ফল।

কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তুমি শান্তি লাভ করিতে পার; তোমার স্বার্থসাধন ঘটিতে পারে; কিন্তু মানব-জাতি তোমাকে ক্ষমা করিবে না। তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিহার করিয়া তুমি আপনাকে লোষ্ট্রখণ্ডে পরিণত করিতে পার; কিন্তু মনুষ্য-সমাজ তোমাকে স্তুতি করিতে বাধ্য হইবে না।

একটা কথার এখনও উত্তর দেওয়া হয় নাই। দুঃখ-বিমুক্তিই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ; এবং সহস্র যুক্তি সত্ত্বেও মনুষ্য সেই দুঃখ-বিমুক্তির আশায় লালায়িত থাকিবে। সমাজধর্ম্ম যদি সকল দুঃখের নিদান হয়, তবে মনুষ্য কিসের আশায় সেই মোহপাশে আবদ্ধ থাকিবে?

মুক্তিকামনা মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক; কিন্তু মুক্তির পথ তত সরল নহে। মানবিকতার মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়া, মনুষ্যকে জীবনহীন লোষ্ট্রখণ্ডে পরিণত করিয়া, দুঃখ হইতে এক রকমের মুক্তি লাভ না ঘটিতে পারে, এমন

নহে ; কিন্তু তাহা জড়ের বাঞ্ছনীয়, মনুষ্যের বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত নহে। সংসারের শোণিত-কর্দ্দমময় পিচ্ছিল ক্ষেত্রে সহস্র বার স্খলিতপদ হইয়া, আততায়ীর নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, জীবন-দ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকাতেই মনুষ্যের গৌরব ; এবং এই জীবন-দ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিয়া যে শিক্ষা লাভ হয়, তাহারই চরম ফল দুঃখমুক্তি। এই শিক্ষার ফলে মনুষ্যের এমন অবস্থা এক সময়ে উপস্থিত হইবে, যখন সে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ত্তব্য সাধনই তাহার জীবনের স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করিবে ; তোমরা যাহাকে দুঃখ বল, সেই দুঃখের স্বীকারই জীবের উন্নতির ও অভিব্যক্তির প্রধান লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিবে ; দুঃখভোগশক্তিই মনুষ্যের প্রকৃত গৌরব বলিয়া মানিয়া লইবে ; এবং আপনার প্রতি, পুত্র-কলত্রের প্রতি, স্বজন বান্ধবের প্রতি, স্বজাতির প্রতি, বিশ্বের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানেই এমন এক পরম প্রীতি, এমন এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি, এমন এক অকৃত্রিম আনন্দ অনুভব করিবে, জড়োচিত শান্তি সেই আনন্দের নিকট ম্লান হইয়া প্রতীয়মান হইতে থাকিবে।

ইহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। আমাদের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস-গ্রন্থে এই বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ; আমাদের শ্রেষ্ঠ কাব্যে কবিকুলগুরু এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের মহামহিম আদর্শ অঙ্কিত করিয়া আমাদের গন্তব্য পথ দেখাইয়াছেন। সে পথ আমরা অনুসরণ না করি, সে আমাদেরই দুর্ভাগ্য।

জীবন ও ধর্ম্ম

তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ নির্ণয় ও সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াসের নাম আমার জীবন; এবং যদ্দারা সেই সম্বন্ধ স্থাপন ও সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রয়াস সফলতা লাভ করে, তাহার নাম ধর্ম্ম। তুমিই আমার এক মাত্র মিত্র, আর তুমিই আমার এক মাত্র শত্রু; উভয় সম্পর্কে সনাতন বিরোধ, আর উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান আবশ্যক; সামঞ্জস্যের পূর্ণতা কখন ঘটে না, তবে পূর্ণতার দিকে গতি, সেই মুখে চেষ্টা, সেই মুখে যত্ন, শ্রম, প্রয়াস। সেই প্রয়াসের ধারাবাহিক ইতিহাস জীবনের কাহিনী। জীবনের ইতিহাস সর্ব্বত্র এক কথা বলে না। বিভিন্ন স্থলে জীবন-কাহিনীর বিভিন্ন রূপ। চেষ্টা পূর্ণ সামঞ্জস্যের দিকে; চেষ্টার সফলতায় ধর্ম্মের পরিমাণ। সুতরাং জীবনের সহিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ বন্ধন।

তুমি আমি উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ এবং তুমি ও আমি, এই উভয় লইয়া জগৎ। এ হিসাবে জগতে তৃতীয়ের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং 'তুমি' ও 'আমি' শব্দ দুইটার অর্থ একটু পরিষ্কার বুঝা আবশ্যক।

'আমি' শব্দের পারিভাষিক নাম বিষয়ী অর্থাৎ যে কর্ত্তা, যে ভোক্তা, যে সুখী, যে দুঃখী, যাহার জন্য বিষয়রূপী সমস্ত জগৎ। 'তুমি' শব্দের অর্থ, আমার বাহিরে যা-কিছু আছে, তাহা; আমি ছাড়া আর সবই, অর্থাৎ যাহা কিছু আমার প্রত্যক্ষগোচর, আমার ভোগ্য বিষয়; কেবল তাহাই কেন,— যাহা আমার ধ্যান, আমার ধারণা, চিন্তা, অনুভূতি, কল্পনা, এবং কামনা। এই আমি ছাড়া সমগ্র জগৎকে 'তুমি' শব্দে নির্দ্দেশ করিলাম। কেন না, তোমার সহিত আমার যে সম্বন্ধ, আমার প্রত্যক্ষগোচর বা কল্পনাগোচর বা অনুমানগোচর বা স্বপ্নগোচর আর সকলেরই সহিত আমার এক হিসাবে সেই সম্বন্ধ। প্রকৃত পক্ষে আমা ছাড়া কিছুই নাই; যাহাকে আমি-ছাড়া অন্য কিছু বলিয়া মনে করিতেছি এবং স্বতন্ত্র নাম দিতেছি, তাহা সমস্তই আমারই ভিতরে, আমার অংশ মাত্র, সবটাই আমার অনুভূতি বা আমার কল্পনা, আমার নিজেরই লীলা বা খেলা বা কারিগরি। যুক্তি আমি-ছাড়া আমার বাহিরে আর কিছুরই অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে না। সুতরাং সমস্ত বাহ্য জগৎটা আমারই ভিতর, আমারই এক অংশ। অংশ বলিলেও হয়ত

ভুল হয়; কেন না, আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অনুমানের যে ভাগটাকে বাহ্য জগৎ আখ্যা দিই, সেটা বাদ দিলে আমার নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কতটুকু থাকে, নির্দ্দেশ করা সন্দেহ। আমি কতকগুলা সহবর্ত্তী ও ধারাবাহিক সুখময়, দুঃখময় ও না-সুখ-না-দুঃখ-ময় অনুভূতির বা বেদনার প্রত্যয়ের সমবায় মাত্র। এই অনুভূতি, বেদনা, প্রত্যয় ছাড়া আরও কতকগুলি পদার্থ আমাতে বর্ত্তমান আছে, যেমন স্মৃতি ও কল্পনা ও চিন্তা ও কামনা ও আশা। কিন্তু সেই প্রত্যয়গোচর অনুভূতিগুলার সহিত ইহারা এরূপে জড়িত যে, ইহাদের অস্তিত্ব না থাকিলে, উহাদেরও অস্তিত্ব থাকিত কি না সন্দেহ। তাহাদের অস্তিত্বে ইহাদের অস্তিত্ব, তাহাদিগকে লইয়া ইহারা। অনুভূতিগুলাকে স্থূলতঃ তিন ভাগে ফেলিতে পারা যায়। কতকগুলার নাম অতীত; কতকগুলার নাম বর্ত্তমান; কতকগুলা ভবিষ্যৎ। তিনের মধ্যে বিভেদ, আবার তিনে মেশামিশি। অতীত বর্ত্তমানকে জড়াইয়া আছে, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎকে টানিয়া সম্মুখে আনিতেছে। শুধু বর্ত্তমান লইয়া যদি কারবার থাকিত, অতীত ও ভবিষ্যৎ যদি বর্ত্তমানের সহিত এক কালে বিচ্ছিন্ন থাকিত, তাহা হইলে বোধ করি, জীবনের খেলা খেলিতে হইত না। অনুভূতি থাকিত, কেবল বর্ত্তমান অনুভূতি; সুতরাং আমি হয়ত থাকিতাম; কিন্তু আমার জীবন থাকিত না। বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ অনুভূতিগুলা যে পরস্পরকে জড়াইয়া জড়াইয়া পরস্পর মাখামাখি পাশাপাশি থাকিয়া, পরস্পর হাতাহাতি মুখোমুখি করিয়া, যে প্রবাহ ক্রমে চলিয়া যায়, সেই স্রোতটা, সেই প্রবাহটা লইয়া আমার সমগ্র জীবনব্যাপী আমি। অতীত অনুভূতি যে বর্ত্তমান অনুভূতিকে জড়াইতে চায়, সেইটুকু লইয়া আমার স্মৃতি। অতীতের উপর দাঁড়াইয়া বর্ত্তমান যাহা রচনা করে, তাহার নাম আমার কল্পনা। অতীতের বলে ভবিষ্যৎ অনুভূতির বর্ত্তমানে আকর্ষণের নাম কামনা। অতীতের উপর ভর করিয়া ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া বর্ত্তমানে বসিয়া থাকার নাম আশা। এবং বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, সঙ্গে সঙ্গে আশা ও কামনা ও স্মৃতি ও কল্পনার যে জড়াজড়ি সম্বন্ধ, যাহার ফলে এটার হাত ধরিয়া ওটা চলে, এটার ঘাড়ে ওটা চাপে, এটা ওটাকে টানিয়া আনে, ওটা এটাকে ঠেলিয়া দেয়, তাহার নাম চিন্তা। সুতরাং অনুভূতি লইয়াই সব। সুতরাং অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নাই। সুতরাং সমগ্র বাহ্য জগৎটা আমার অনুভূতি ও আমার অনুভূতিই সমগ্র বাহ্য জগৎ। এই অর্থে উভয়ে অভেদ। সুতরাং

আমি ও আমি-ছাড়া উভয়ই এক ; এককে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই, যুক্তির কথা এই পর্য্যন্ত।

কিন্তু ইহা ছাড়া আর একটা প্রবল যুক্তি আছে। আমি-ছাড়া প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যে স্বীকার করিতেছি, তা নয়। আমা ছাড়া অন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আমি বাধ্য নহি। তবে আমি আছি, এটা যেমন এক অর্থে ঠিক, তেমনই আমার বাহিরে আমা-ছাড়া একটা বাহ্য জগৎ খাড়া করিয়া সেই বাহ্য জগতে আমাকে একটা বিশেষ পথে চলিতে হইতেছে, ইহাও অন্য অর্থে ঠিক। আমি কেন আছি, এ কথার উত্তর নাই। আমি না থাকিলে কি হইত বা কি থাকিত, সে কথারও উত্তর নাই। বোধ করি, এরূপ প্রশ্নের অর্থই নাই। আবশ্যকতাও নাই। একটা আছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, এবং সেটা আমি। যে কতকগুলা সহচারী ও পারস্পরিক অনুভূতির সমবায় ও প্রবাহ লইয়া আমার জীবনের ধারা, তাহাদের সমবায় ও পর্য্যায়ের মধ্যে যে একটা শৃঙ্খলা, প্রণালী, সম্বন্ধ, ধারা বা নিয়ম বা বিশিষ্টতা দেখা যায়, সেইটাই আমার বিশেষণ। আমি আছি ও আমার একটা নির্দ্দিষ্ট বিশেষণ আছে ; কেন আছে, কেন এইরূপ হইল কেন অন্যরূপ হইল না, এ প্রশ্নের উত্তর নাই। হয়ত অজ্ঞতা আছে ও অজ্ঞতাবশতঃ উত্তর দিবার নানাবিধ আয়াস আছে। সেই অজ্ঞতাকে জ্ঞানের আবরণ দিয়া পুরাকালের সাংখ্যদর্শন একটা কাল্পনিক নাম খাড়া করিয়াছেন, তাহার নাম প্রকৃতি। হালের বিজ্ঞানও সেই নামটি গ্রহণ করিয়া যাহার উত্তর নাই, তাহার উত্তর দিতে গিয়াছেন। আমি আছি কেন ?—প্রকৃতি বিধাতা। আমি এমন কেন ?—প্রকৃতি জানেন। আমি এরূপে এ পথে চলি কেন ?—প্রকৃতি প্রভু। প্রকৃতির বশতাপন্ন আমি আছি, প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট পথে আমি চলি। না চলিয়া আমার চলে না। আমি চলি, এবং আমি ছাড়া অপরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাহার সহিত কারবার করিতে করিতে চলি। প্রকৃতির উপদেশে। প্রকৃতির নিয়োগে। প্রকৃতির বিধানে। কেন না, প্রকৃতি প্রভু। কেন না, প্রকৃতির প্রভুত্ব বিনা আমার এইরূপ যে অস্তিত্ব, তাহা বজায় থাকে না।

তাই প্রকৃতির নিয়োগে তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আমিও যেমন সুখদুঃখভোগী একটা কিছু, তুমিও সেইরূপ সুখদুঃখভোগী একটা কিছু। অথচ তুমি আমার কল্পিত, তুমি আমার সৃষ্ট, তুমি আমার অন্তর্গত। আমি

যেন দর্পণ, তুমি তাহাতে প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব দর্পণ ছাড়া আর কিছু নহে; দর্পণের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই; দর্পণের পশ্চাতে গিয়া খুঁজিলে তাহাকে পাওয়া যাইবে না। বুঝি প্রতিবিম্ব বলিলেও ভুল হয়; কেন না, প্রতিবিম্ব বলিলে দর্পণের বাহিরে ও সম্মুখে এমন একটা স্বতন্ত্র পদার্থ আসিয়া পড়ে, প্রতিবিম্বটা যাহার দর্পণপৃষ্ঠে প্রতিফলিত মূর্ত্তি মাত্র। তেমনই তুমি আমার ভিতরে একটা প্রতিবিম্ব বা ছায়াস্বরূপ মনে করিলে, আমার বাহিরে স্বতন্ত্র একটা কিছু মনে আইসে, যাহা হইতে আমার মধ্যে তোমার উৎপত্তি। অথচ আমার বাহিরে সম্মুখে ও আমা হইতে স্বতন্ত্র কিছু খুঁজিয়া মেলে না। সে যাই হউক, বাহিরে কিছু থাক্ বা নাই থাক্, প্রকৃতির নিয়োগে আমি তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আমি ছাড়া আর এক জন আছে, ইহা মানিয়া লই। আমাতে আমার যেমন বিশ্বাস, তোমাতেও আমার তেমনই বিশ্বাস। আমি আছি, এবং আমি ছাড়া তুমিও আছ। আমা হইতে তুমি বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন পৃথক্ হইয়া আছ।

তুমি আছ, সুতরাং উনি, তিনি, ইঁহারা, তাঁহারা, সকলেই আছেন। মৎস্য, কুম্ভীর, কচ্ছপ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, নদী, পর্ব্বত, গহ্বর, সকলই আছেন। কেন না, সকলেই কোন-না-কোন সময়ে তুমি-স্থলীয়। তোমার সহিত আমার যে সম্বন্ধ, সকলেরই সহিত আমার সেই সম্বন্ধ। তুমিও যেমন আমার বিষয়, তাহারা তেমনই আমার বিষয়। তুমিও যে অর্থে আমার সুখ-দুঃখের বিধাতা, তাহারাও সেই অর্থে আমার সুখ-দুঃখের বিধাতা। সকলেই আমার প্রত্যক্ষ বিষয়, অনুভূতির সামগ্রী, সমান ভাবে তুমিত্বের দাওয়া করেন। সুতরাং যেটাকে আমি-ছাড়া বাহ্য জগৎ বলি, সেটা এই বিশিষ্ট অর্থে আমা হইতে স্বতন্ত্ররূপে স্বাধীনভাবে বিদ্যমান। এই অর্থে বাহ্য জগৎটাই তুমি। অন্ততঃ এই বিস্তৃত পারিভাষিক অর্থে এই প্রবন্ধে 'তুমি' শব্দের ব্যবহার করিয়াছি।

আমি ও তুমি শব্দ দুইটার অর্থ একরকম বুঝা গেল। 'আমি' অর্থে আমি; আর 'তুমি' অর্থে এ স্থলে আমি-ছাড়া আর সব। কিন্তু মূলে বিরোধ। আমাতে তুমি ও তোমা লইয়া আমি; এই অর্থে উভয়ে ভেদ নাই। আবার—আমা ছাড়া তুমি স্বতন্ত্র; তোমার অস্তিত্ব আমাকে ছাড়িয়া, এই অর্থে উভয়ে সম্পূর্ণ প্রভেদ। এই বিরোধ লইয়া জীবনের উৎপত্তি; এই বিরোধেই জীবনের সমাপ্তি। ইহারই নাম প্রকৃতির খেলা।

প্রকৃতির উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় বুঝিবার প্রয়াস পাইও না; প্রকৃতির খেলা দেখিয়া স্থির থাক।

মূলের এই বিরোধ সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বিদ্যমান। যেখানেই যাই, যেখানেই থাকি, এই বিরোধ কোন-না-কোন মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান। আমায় তোমায় একতা, অথচ আমায় তোমায় ভিন্ন ভাব। তোমার স্বার্থে আমার স্বার্থ; অথচ তোমার সংহারে আমার পূর্ত্তি। খেলা নয় ত কি বলিব?

আর একটা কথা এইখানে প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখা আবশ্যক। আমার এই ভৌতিক শরীরটা, প্রত্যক্ষতঃ যাহাকে আশ্রয় করিয়া আমি রহিয়াছি; ইহাকেই এই হিসাবে আমার অন্তর্গত মনে না করিয়া, তোমার অন্তর্গত মনে করিতে পারি। ইহাও আমার কল্পিত, সৃষ্ট, অনুভূতিগত, প্রত্যক্ষ বাহ্য জগতেরই অংশীভূত। আর সবই যেমন আমার প্রত্যক্ষগত ও বহিঃস্থ, ইহাও তেমনই আমার প্রত্যক্ষগত এবং বহিঃস্থ।

আধুনিক জীববিদ্যা এ কথা অনেকটা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। শরীরের সহিত হাত-পায়ের যেরূপ সম্বন্ধ, গাছের সহিত তাহার শাখা পত্র ফুলের যে সম্বন্ধ, পিতামাতার সহিত সন্তানের সেই সম্বন্ধ। শাখা যেমন গাছের অবয়ব, পত্র পুষ্প যেমন গাছের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বীজ ও তজ্জাত বৃক্ষ আপাততঃ স্বতন্ত্র অস্তিত্বযুক্ত হইলেও, সেই একই সম্বন্ধে পিতৃ-বৃক্ষের অংশীভূত। আবার এক প্রোটোপ্লাজম্ হইতে যখন জীব মাত্রের উদ্ভব স্বীকার করিতে হয়, তখন প্রাণী মাত্রকেই এক এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। আমার, তোমার, তাঁহার, সকলেরই শরীর সেই এক পিতৃশরীর হইতে উদ্ভূত, অভিব্যক্ত। আবার জড় জগৎ ও জীব-জগতের মাঝখানে একটা রেখা টানিয়া দুইটাকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখিলে, জাগতিক ব্যাপারকে সমস্যার উপর সমস্যা করিয়া তোলা হয়, এবং জ্ঞানের চোখে আঙ্গুল দিয়া বিকৃতদৃষ্টি উৎপাদনের পাতক অর্শে। সুতরাং সমগ্র বাহ্য জগৎ—জীব-শরীর ও জড় শরীর উভয় লইয়া জ্ঞানের বিষয়ীভূত সমগ্র জড় জগৎটা—এক মাত্র। এই হিসাবে আমার শরীরও সেই জড় জগতের অন্তর্ভুক্ত ও তাহার সহিত এক।

অর্থাৎ, সমগ্র জগৎটারই আমার সহিত সম্পর্ক বড়ই ঘনিষ্ঠ। জগৎটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডের সহিত যদি আমার মুখ্যভাবে ও গৌণভাবে সম্বন্ধ আলোচনা করা যায়, তবে এইরূপ দাঁড়ায়। আমার সহিত

মুখ্য সম্বন্ধ প্রথমে আমার শরীরের ; পরে আমার পুত্র-পৌত্রাদির, পরে আমার পত্নী, বন্ধু, আত্মীয়বর্গের। এইরূপে ক্রমশঃ মুখ্য-গৌণ-পরম্পরায় জ্ঞাতি, গোষ্ঠী, গোত্র, কুল, বর্গ, এইরূপে চলিয়া শেষে মানব-জাতি, জীবকুল ও জড় জগতে গিয়া শেষ হয়। শেষ হয়—ঠিক বলা যায় না ; কেন না, প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগৎ ছাড়িয়া আর একটা এমন প্রকাণ্ডতর জগৎ রহিয়াছে, যাহা হয়ত কোন কালেই প্রত্যক্ষগোচর হইবে না। প্রত্যক্ষের অতীত অতীন্দ্রিয় এই প্রকাণ্ডতর জগৎ রহিয়াছে, যাহা আমার কল্পনার বিষয়, সুখ-দুঃখের হেতু, আমার চিন্তার ধ্যান ও আমার আশার লক্ষ্য। প্রত্যক্ষ জগতের সহিত দৈনন্দিন নিত্য আবশ্যক কাটা-ছাঁটা রুটিন-অনুযায়ী কারবার সমাপ্ত করিয়া একটু অবকাশ পাইলেই, আমি সেই অতীন্দ্রিয় জগতে আশ্রয় লইয়া স্বচ্ছন্দ ভাবে গা খুলিয়া বিহার করিয়া বেড়াই ও হাওয়া খাই।

সম্বন্ধ অবশ্য সেইখানে মুখ্যতর, যেখানে ঘনিষ্ঠতা অধিক, যেখানে কারবার ও নিত্য আদান-প্রদান অধিক। সুতরাং আমি-ছাড়া সমগ্র জগতের মধ্যে, অর্থাৎ সমগ্র তোমার মধ্যে, প্রথমে দাঁড়ায় আমি, পরে পুত্র পরিবার লইয়া মানব-জাতি, পরে জীবসমূহ লইয়া জড় জগৎ ও সর্ব্বশেষে সর্ব্বতোভাবে আমার রচিত ও কল্পিত সেই অতীন্দ্রিয় মানসরাজ্য।

এই ভাবে তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ নির্ণয়ে আমার জীবন। এই সম্বন্ধ নির্ণয় হইতে ধর্ম্মের ব্যবস্থা। সুতরাং ধর্ম্মের সহিত জীবনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

কিন্তু ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্। যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে অদ্যাপি। অথবা মানব-সমাজের আদি হইতে আজি পর্য্যন্ত। কেন না, তোমাতে আমাতে এক ও অভিন্ন, অথচ তোমা হইতে আমি স্বতন্ত্র। মূলে বিরোধ। উপরে বলিয়াছি, ইহা প্রকৃতির খেলা। বিরোধ বড় যেমন-তেমন নহে। তুমি আমার, অথচ তুমি আমার নহ। তোমায় আমায় অভেদ ; অতএব তোমার উৎকর্ষে আমার উৎকর্ষ, তোমার ভালয় আমার ভাল, তোমার অভিব্যক্তিতে আমার অভিব্যক্তি। অথচ অন্য দিকে দেখিলে তোমার স্বার্থে আমার অনর্থ ; তোমার মঙ্গলে আমার অমঙ্গল ; তুমিই আমার পরম শত্রু। মিথ্যা কথা নহে ; মানব-জীবনে ইহা প্রকাণ্ড সত্য।

অধিক কথা বলিতে হইবে না। মাতার শোণিত শোষণ করিয়া সন্তানের দেহের পুষ্টি। তোমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিতে গেলে

আমার দেহ বহে না। আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া না লইলে তোমার চলে না, তাই তুমি আমার ছিদ্র অন্বেষণে নিরত। আমি আমার পরম শত্রু তোমা হইতে আত্মরক্ষণে সর্ব্বদা নিরত। সমগ্র জীব-সমষ্টি আমাকে উদরসাৎ করিবার জন্য লোল জিহ্বা বাহির করিয়া আছে; সমগ্র জড় জগৎ আমাকে আত্মসাৎ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। পদস্খলন আর মৃত্যু। ইহার নাম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন; ইহা হইতে অভিব্যক্তি। ইহার নাম ঈর্ষা, ঘৃণা, কপটতা, ক্রোধ, হিংসা, রক্তপাত। কিন্তু ইহা হইতেই স্নেহ, মায়া, বাৎসল্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম। ইহার নাম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, ইহার নাম প্রকৃতির লীলা। ইহার উপরে তোমার আমার হাত নাই।

তুমি আমার মিত্র ও তুমি আমার ঘোর শত্রু। তোমাকে লইয়া আমি। তোমাকে ছাড়িলে আমার কিছু থাকে না; অথচ তোমা হইতে স্বতন্ত্র ভাবেই আমার অস্তিত্ব; তোমার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়াই আমার জীবনের ব্রত। এরূপ ক্ষেত্রে তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ নির্ণয়ই সমস্যা; তোমার প্রতি আমার কর্ত্তব্য নির্ণয়ই আমার জীবন। সেই সম্বন্ধ নির্ণয় ও কর্ত্তব্য নির্ণয়ের অপর নাম ধর্ম্মব্যবস্থা।

তোমার প্রতি কর্ত্তব্য, ইহার অর্থ আমার নিজের প্রতি কর্ত্তব্য; আমার জাতি, জ্ঞাতি, বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য; মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য; জীব ও জড়ের উপর কর্ত্তব্য ও আমার আশা ভয় স্বপ্ন কল্পনার প্রতি কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের সমষ্টি ধর্ম্ম। মূলে বিরোধ; সামঞ্জস্যের অভাব। ধর্ম্ম সামঞ্জস্য স্থাপনের উপায়। ধর্ম্মের গতি সামঞ্জস্যের পূর্ণতার অভিমুখে; নেত্রী প্রকৃতি স্বয়ং। পথ দুর্গম, পিচ্ছিল। পাঁচটা পথ পাঁচ দিক্ হইতে আসিয়া সমস্যা বাধায়। মনুষ্য কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কোন্ পথে যাই? ভিতর হইতে কে এক জন উত্তর দেয়, ধর্ম্মের পথে চল। প্রশ্ন উঠে, ধর্ম্ম কোথায়? ধর্ম্মের তত্ত্ব কোথায়? তখন উত্তর আসে, ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।

স্বার্থ ও পরার্থ

স্বার্থ ও পরার্থ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এই দুইটা বিরোধ বহু দিন চলিয়া আসিতেছে। অথবা যে দিন হইতে এই বিরোধের আরম্ভ, মনুষ্যের সমাজেরও আরম্ভ সেই দিনে। এই বিরোধের ধারাবাহিক প্রবাহকেই সমাজের জীবন বলিলে বলা চলে। ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজগত জীবনে ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের যে সনাতন বিরোধ দেখা যায়, তাহাও মোটের উপর ইহাই। স্থূলতঃ, স্বার্থের অভিমুখে, প্রবৃত্তির অভিমুখে যে চেষ্টা, তাহার নাম অধর্ম্ম। পরার্থের অভিমুখে, নিবৃত্তির অভিমুখে যে চেষ্টা, তাহার নাম ধর্ম্ম। হয়ত ধর্ম্মাধর্ম্মের এইরূপ সংজ্ঞা সকল ক্ষেত্রে খাটিবে না; স্বার্থপ্রবৃত্তি মাত্রকে অধর্ম্মপর্য্যায়ভুক্ত করিলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তুমুল সমস্যা হইয়া পড়ে; আবার স্বার্থপ্রবৃত্তি মাত্রকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, ধার্ম্মিকের সংখ্যায় বিব্রত হইতে হয়। তবে দুই চারিটা ব্যতিক্রমের উদাহরণ হাতে রাখিয়া ধরিলে মোটামুটি অধিক ভুল না হইতে পারে। বিচারের কথা ছাড়িয়া, নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি যে সকলের ভিন্ন ভিন্ন সমাজে অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহাদের দিকে চাহিলেও সেই কথাই সমর্থিত হয়। প্রবৃত্তির নাম অধর্ম্ম ও নিবৃত্তির নাম ধর্ম্ম, এইরূপ ব্যাখ্যা বড় নূতন নহে।

বলা বাহুল্য, স্বার্থ পরার্থের এই ঝগড়া মানুষ ভিন্ন অন্য জীবে বড় লক্ষিত হয় না। ইতর জীবের জীবন স্বার্থময়; পরার্থপ্রবৃত্তি যদি কোথাও দেখা যায়, সেখানে পর অর্থে নিজের সন্তান, অথবা সহচর বা সহচরী। ইতর জীবের মধ্যে যাহারা দল বাঁধিয়া বা সমাজ বাঁধিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে যে স্বার্থত্যাগের উদাহরণ দেখা যায়, নৈতিক কাব্য-লেখকেরা যে সকল উদাহরণ দুঃশীল মানুষের সম্মুখে উৎসাহের সহিত স্থাপিত করেন, সে সমস্তই তাহাদের স্বাভাবিক সংস্কারজাত; মানুষের মত স্বাধীন-ইচ্ছা-প্রসূত নহে; তাই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে তাহাদের স্থান নাই। স্বাধীন ইচ্ছা কথাটা উচ্চারণ করিতে ভয় হয়; কেন না, এই কথাটা উৎকট তর্ক-সমরের ক্ষেত্র। এ স্থলে সে তর্কে প্রবেশের কোন আবশ্যকতা নাই। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতেছে যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইতর জীবে নাই, মনুষ্য-সমাজে আছে: কেন না, জাতি-বিশেষে ইতর জীব হয় সকলেই ধার্ম্মিক, নয় সকলেই অধার্ম্মিক; মানুষে

কেহ ধাৰ্ম্মিক, কেহ অধাৰ্ম্মিক। ইতর জীবে যেমন স্বার্থে পরার্থে বিরোধ নাই, যে সব মানুষের অবস্থা এখনও ইতর জীবের সদৃশ, তাহাদের মধ্যেও তেমনই এই বিরোধের প্রখরতা দেখা যায় না। কেন না, এই বিরোধের সূত্রপাতেই সমাজের সৃষ্টি; এই বিরোধের স্থায়িত্বেই সমাজের জীবন; এই বিরোধের বর্ণনাই সমাজের ইতিহাস। এবং যাহাকে সভ্যতা বলে, তাহাও এই বিরোধের পরিণতি ও আনুষঙ্গিক ফল।

আর একটা কথা আছে। মানুষের জীবনের সমুদয় কার্য্য স্বার্থপ্রবৃত্তি ও পরার্থপ্রবৃত্তি, এই দুইটি মাত্র পর্য্যায়ে ফেলা চলে না। সূক্ষ্ম হিসাবে স্বার্থপ্রবৃত্তি, স্বার্থনিবৃত্তি ও পরার্থপ্রবৃত্তি, এই তিনটা পর্য্যায় আনিতে হয়।

প্রথম, স্বার্থপ্রবৃত্তি;—যেমন, ক্ষুধা পাইলে আহার করিও। বলা বাহুল্য, এই উপদেশ দিবার জন্য বিশেষ আড়ম্বরের দরকার নাই; ভোজনকালে বৃদ্ধের বচন সর্ব্বত্র অগ্রাহ্য।

দ্বিতীয়, স্বার্থনিবৃত্তি;—যেমন, চুরি করিও না, মিছা কথা কহিও না। যাজক-সম্প্রদায়, লোকশাসন ও রাজশাসন, পুলিস ও আদালত, এই শিক্ষাদানে নিযুক্ত। নীতিশাস্ত্র ও ধৰ্ম্মশাস্ত্রের অধিক ভাগই এই উপদেশ।

তৃতীয়, পরার্থপ্রবৃত্তি;—যথা, দুঃখীর প্রতি দয়া করিবে। ধৰ্ম্মশাস্ত্র মাত্রেই এরূপ বাক্য দুই চারিটা পাওয়া যায়। তবে মানুষের এখন যে অবস্থা, তাহাতে পরার্থপ্রবৃত্তির অপেক্ষা স্বার্থনিবৃত্তির দিকেই ধৰ্ম্মশাস্ত্রের অধিক টান দেখা যায়।

এই তিনের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টাতে জীবন। স্বার্থ কিছু বজায় রাখিতে হইবে, প্রকৃতির নিয়ম এই; নতুবা জীবন টিকে না। পরার্থের জন্য স্বার্থ উৎসর্গ করিতে হইবে, নতুবা সমাজ চলিবে না, সমাজের মঙ্গল হইবে না; আর, সমাজের মঙ্গল না হইলে সমাজভুক্ত ব্যক্তিরও মঙ্গল নাই। স্বার্থসাধন ব্যক্তিজীবন রক্ষার উপযোগী; পরার্থসাধন সমাজের জীবনের জন্য আবশ্যক। মানুষ দুর্ব্বল জীব; সমাজে না থাকিলে উৎকট জীবন-সংগ্রামে তাহার কল্যাণ নাই; তাই যেমন করিয়াই হউক, নিজের লোকসান স্বীকার করিয়াও সমাজের সমবেত বলের নিকট মাথা নোয়াইতে হইবে; নিজের মুখের গ্রাস সময়ে সময়ে পরের মুখে না দিলে চলিবে না। ব্যাখ্যাটা নিতান্ত ইউটিলিটি মতানুযায়ী হইল। কিন্তু অভিব্যক্তির প্রণালী সর্ব্বত্রই এইরূপ; ভালর মূলে মন্দ। তাহাতে পরিতাপ করিয়া বিশেষ ফল নাই।

সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা লইয়া জীবন; কিন্তু সামঞ্জস্যবিধান দুরূহ ব্যাপার; একেবারে ঘটে কি না সন্দেহ। কতটুকু নিজের জন্য রাখিব, কতটুকু পরের জন্য রাখিব, মীমাংসা সহজ নহে। পাঁচ জনের পাঁচ মত। আবার মত অনুসারে কাজ হয় না। মতের সহিত কাজের মিল নাই। কাজ প্রধানতঃ প্রবৃত্তির অভিমুখে; মত প্রধানতঃ নিবৃত্তির অভিমুখে। উপদেশ দানে যিনি পরম সন্ন্যাসী, কাজের বেলায় তিনি ঘোর বিষয়ী। সংসারের এই একটা প্রধান রহস্য বা আমোদ।

নিবৃত্তিমার্গে প্রবর্ত্তনার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। সংখ্যাতীত নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র গঠিত হইয়াছে। অনেক স্থলে পরার্থপরতার প্রচার করিতে গিয়া পরের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ রক্তপাত পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। স্বার্থ বিসর্জ্জন কর, পরার্থে জীবন উৎসর্গ কর, এই গুরুগম্ভীর উপদেশের অপ্রতুল দেখা যায় না।

স্বার্থ বিসর্জ্জন করিব কেন, সহজেই এই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। প্রশ্নটার সঙ্গত উত্তর না দিলে উপদেশ নিষ্ফল হয়। তাই ঘোর পরার্থবাদীরাও ইহার উত্তর দিয়াছেন বা নানারূপে দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উত্তর দুই চারিটার একটু সমালোচনা করিলে শিক্ষা ত আছেই, আমোদও কিছু আছে।

প্রবৃত্তির নাম অধর্ম্ম, নিবৃত্তির নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্ম আচরণ কর, সুখে থাকিবে। ধর্ম্মের পথ কণ্টকাকীর্ণ; প্রথমে দুঃখ আছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সুখ। সুখই যখন জীবনের উদ্দেশ্য, সুখ লাভের ইচ্ছাই প্রবৃত্তি, তখন ভবিষ্যৎ সুখের জন্য বর্ত্তমান দুঃখে ভয় পাইও না। অর্থাৎ, তোমাকে নিবৃত্তি উপদেশ দিতেছি কেন,—না, শেষ পর্য্যন্ত প্রবৃত্তির অনুযায়ী ফল পাইবে বলিয়া। সংসারের বন্দোবস্তটা খারাপ; কষ্ট না করিলে সুখ হয় না; সেই জন্য কষ্ট করিতে বলিতেছি। পরার্থসাধনে যে বিশেষ মাহাত্ম্য আছে এমন নহে; তবে সেটা নইলে স্বার্থসিদ্ধি ঘটে না। অন্যরূপ বন্দোবস্ত থাকিলে তোমাকে এ উপদেশ দিতাম না। উত্তরটা কত দূর ধর্ম্মসঙ্গত বলা যায় না; তবে মানুষের মনের মত বটে। প্রলোভন দেখাইয়া কাজ পাওয়া যায়, এ হিসাবে বুদ্ধিমানের উপযুক্তও বলা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রলোভনটা প্রলোভন মাত্রই; ধর্ম্মপথে সুখ লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; কষ্ট পাওয়াই সার হয়, ফললাভ সর্ব্বদা হয় না। অধিক বলা আবশ্যক নহে; ধর্ম্মের জয় সংসারের অখণ্ড নিয়ম হইলে, উপদেশের এত বাড়াবাড়ি হইত না।

সুতরাং উত্তরটা নিখুঁত হইল না। কাজেই প্রলোভনের মাত্রাটা চড়াইয়া কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। ইহলোকে সুখ দুর্ঘট বটে, কিন্তু পরলোকে সুখ অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্মপথে চল, পরকালে সুখে থাকিবে। পরকালের সুখ নানাবিধ;—স্বর্গ, নন্দনকানন, পারিজাত, অপ্সরা, ইন্দ্রত্ব। কেহ এত দূর নামিতে সাহস করেন না; তাঁহাদের মতে দেবত্বলাভ, মুক্তি, নির্ব্বাণ। এক শ্রেণীর মতে সুখপ্রাপ্তি; অন্যের মতে দুঃখনিবৃত্তি মাত্র। আবার অন্য উপায়ও আছে। উপদেশমত কাজ কর ভালই, নতুবা পরকালে ঠকিবে। রৌরব, কুম্ভীপাক, ডাঙ্গশ, গন্ধকের আগুন; অগত্যা ন্যূনপক্ষে পুনর্জন্ম। কিন্তু হইলে কি হয়, দুরন্ত মানব ইহাতেও বশ হয় না। গুরু-সমীপে উপদেশের যাথার্থ্য সকলেই মানিয়া লয়; কিন্তু কার্য্যকালে "যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য" ন্যায় অবলম্বন করে। সুতরাং উত্তরটা যেমনই যুক্তিযুক্ত হউক, কাজে বড় সফলতা লাভ করে না। মানুষের স্বভাব এমনই দুর্দ্দম।

তৃতীয় উত্তর সেই একই কথা, আর একটু ঘুরাইয়া। ধর্ম্মের জয় সত্য; কিন্তু সঙ্কীর্ণভাবে গ্রহণ করিলে হইবে না। পরকালের ভরসায় প্রস্তুত নহ; ইহকালে সুখের দাবি করিলেও ঠিক থাকিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মের জয় মিথ্যা নহে। সর্ব্বত্র জয় না হইতে পারে, তবে মোটের উপর জয়; আজিকালি না হইতে পারে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের জয় অব্যাহত। এইরূপে অর্থের পরিসর বাড়াইয়া ব্যাখ্যা করিলে আর আপত্তি বড় চলে না। ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম সমাজ লইয়া। যেখানে সমাজ নাই, যেখানে ব্যক্তিগত জীবন সমষ্টীকৃত হইয়া সমাজ-জীবনে পরিণত হয় নাই, সেখানে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রয়োগ বা অস্তিত্ব নাই। যেখানে সমাজ বাঁধে নাই, সেখানে স্বতন্ত্রতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান; পরতন্ত্রতার লেশ নাই। সমাজের আঁটাআঁটির সহিত পরতন্ত্রতা আসে, পরাধীনতা আসে, পরের জন্য স্বার্থসংহার আসে, ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়। আবার যাহা সমাজরক্ষার অনুকূল, স্থূলতঃ তাহারই নাম ধর্ম্ম; যাহা প্রতিকূল, স্থূলতঃ তাহাই অধর্ম্ম। আবার সমাজের অবস্থা-ভেদে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রকৃতিভেদ; সমাজের গতি ও অভিব্যক্তির সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের অভিব্যক্তি। সুতরাং যে সমাজে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, তাহারই গতি ঊর্দ্ধমুখে; যেখানে লাঞ্ছনা, তাহার গতি অধোমুখে। ইহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিতে পার; বস্তুতঃ প্রকৃতির নির্ব্বাচনপ্রণালী, যাহা জীবরাজ্যে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, সমাজের পক্ষে ইহা তাহারই প্রয়োগ মাত্র।

এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, প্রবৃত্তি নিরোধ কর, তাহাতে ভাল হইবে। তোমার ভাল হইবে, ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না, তবে আমাদের ভাল হইবে। আমাদের ভাল হইলে কতকাংশে তোমারও ভাল। সেই পর্য্যন্ত তোমার পক্ষে প্রলোভন। অন্য প্রলোভন তোমাকে যা দিই, সেটা আমাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। সেটা আমাদের পলিসি। পরের মন্দ করিও না, করিলে শাস্তি দিব ; পরের ভাল করিও, তোমাকে সুশীল বলিব।

এইরূপ উত্তরে যুক্তি আছে, সরলতা আছে ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইউটিলিটি ও ক্ষতিলাভ গণনাও আছে। আবার আত্মপক্ষে লাভাঙ্ক অপেক্ষা ক্ষতির অঙ্ক গুরু দেখায় ; তাই এরূপ উত্তর ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তনায় সাহায্য করে না ; কাজেই ধর্ম্মোপদেশের মধ্যে গণ্য হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার স্থান নাই।

চতুর্থ এক সম্প্রদায়ের একরকম উত্তর আছে ; সেই উত্তর এ তিনের হইতে স্বতন্ত্র। ধর্ম্ম আচরণ কর ; কেন না, ধর্ম্ম আচরণ কর্ত্তব্য। সুখের আশা করিও না ; সুখ অনিশ্চিত। দুঃখ দেখিয়া ডরাইও না ; দুঃখ জীবনের সহচর। এই কর্ম্ম কর্ত্তব্য, এই মাত্র বোধে ধর্ম্মাচরণ কর ; ফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না। এমন কি, ইহকালে কি পরকালে সুখপ্রাপ্তি তোমার যদি ধর্ম্মকর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তোমাকে ধর্ম্মচারী বলিব না। সমাজের লাভ হইবে কি না গণনা করিয়া, ইউটিলিটির হিসাব ধরিয়া, যদি তুমি ধর্ম্মকর্ম্মে প্রস্তুত হও, তোমাকে ধার্ম্মিকের শ্রেণীতে ফেলিতে চাহিব না। কর্ত্তব্য সম্পাদন কর, কর্ত্তব্যপালনই তোমার প্রকৃতিগত হউক, কর্ত্তব্যপালন বিনা তোমার যেন শান্তি না জন্মে। কেন করিব, জিজ্ঞাসা করিও না ; যুক্তি তর্ক অন্বেষণ করিও না ; ফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না।

বলা বাহুল্য, সকল শাস্ত্র এইরূপে ধর্ম্মের উপদেশ দেয় না। যে শাস্ত্র দেয়, সেই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। কোন্ শাস্ত্রে এই উপদেশ দিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের অধিবাসীকে বলিতে হইবে না।

কাব্যগ্রন্থ মধ্যে রামায়ণ এই উপদেশ দেয়। তাই রামায়ণ কাব্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ।

হইতে পারে, এরূপ উপদেশে প্রলোভন নাই, প্রবোধ নাই, সান্ত্বনা নাই। কিন্তু আদর্শ মানুষ সান্ত্বনা খুঁজে না ; কর্ত্তব্য পালন করে। সংসারে প্রবোধ ও সান্ত্বনার অস্তিত্ব নাই।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি

রাজা দিলীপ বশিষ্ঠের হোমধেনুকে বাঁচাইবার জন্য আপনার জীবনদানে উদ্যত হইলে, মায়াসিংহ তাঁহাকে বলিয়াছিল, একটা গরুর জন্য জীবন দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না, তুমি বাঁচিয়া থাকিলে তোমার প্রজাগণকে কত বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে।

দিলীপ দুই কথায় ইহার জবাব দিয়াছিলেন। প্রথম, আমি ক্ষত্রিয়, আর্ত্তত্রাণ আমার ধর্ম্ম; দ্বিতীয়, আমি এক্ষণে পরাধীন, প্রাণপাতেও প্রভুর নিয়োগপালনে আমি বাধ্য।

আজকাল যাহাকে ইউটিলিটি বা হিতবাদ বলে, যাহার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা অধিক লোকের অধিক হিত, সেই অনুসারে ধরিলে, দিলীপের হিসাবে ভুল হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। একটা ভুয়া সেন্টিমেণ্টের বা ভাবপ্রবণতার জন্য এতটা সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বিচারমূঢ়তাই দেখাইয়াছিলেন। গরুর জীবনের অপেক্ষা তাঁহার জীবনের মূল্য, বশিষ্ঠের নিকট না হউক, সমস্ত সমাজের নিকট অনেক অধিক ছিল, তাহা বোধ হয় বশিষ্ঠকেও স্বীকার করিতে হইত।

দিলীপ ঠিক বুঝেন নাই, কিন্তু তথাপি অদ্যাপি এই ইউটিলিটি-তত্ত্বের জয়-জয়কারের দিনেও এমন লোক অনেক দেখা যায় যে, কর্ত্তব্য নির্ণয়ের সময় ইউটিলিটির বা সমাজের হিতপরিমাণের হিসাব না করিয়া সেন্টিমেণ্টেরই বা ভাবপ্রবণতারই বশবর্ত্তী হইয়া থাকে।

বস্তুতই এই প্রাচীনা বসুন্ধরায় মনুষ্য বহু দিন যাবৎ বাস করিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে; তথাপি তাহার জীবনে কোন্ কাজটা করা উচিত, এবং কেনই বা করা উচিত, এই সাধারণ তত্ত্বের অদ্যাপি মীমাংসা হইল না।

তবে সমাজ-বিশেষে কতিপয় স্থলে মনুষ্যের কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ শাস্ত্রের বিধান দ্বারা বিহিত হইয়াছে। এবং সেই বিধানের উপর হস্তক্ষেপ করিবার অথবা তাহার যুক্তিযুক্ততাবিষয়ে সন্দেহ স্থাপন করিবার অবকাশ সামাজিক মনুষ্যের একবারে নাই। পরের গাছের আম পাড়িয়া খাইব কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে এই শাস্ত্রে ব্যবস্থা দেয় যে, ধরা পড়িলেই বেত্রাঘাত।

বলা বাহুল্য, এই শাস্ত্রের নাম পীনাল কোড ; এবং এই দণ্ডবিধির আইন বিধিবদ্ধ থাকায় অন্ততঃ কতকগুলা সাংসারিক কাজে কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য বিশেষ মাথাব্যথার দরকার হয় না।

কিন্তু পীনাল কোডের মধ্যে নির্দ্দেশ নাই, এরূপ সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কার্য্য মনুষ্যের সম্মুখে সদা সর্ব্বদা উপস্থিত হয় ; সে স্থলে মানুষ কোন্ পথে যাইবে, স্থির করিতে না পারিয়া আকুল ও দিশাহারা হয়। পথের সংখ্যা এত অধিক, এবং বিশ্বাসী পথ-প্রদর্শকের এত অভাব যে, পথিকের অবস্থা এ স্থলে শোচনীয়।

এক সম্প্রদায় পথপ্রদর্শক এইরূপ আশ্বাস দেন যে, এরূপ স্থলেও মনুষ্যের এক উপায় আছে। তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র-নামক আর একটা পীনাল কোড খাড়া করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, এই কোডের ব্যবস্থা অনুসারে চল, তাহাতে মঙ্গল হইবে। ইহা মানিয়া চলিলে ইহ-পরত্র পুরস্কার, না মানিলে শাস্তি। কেন মানিব, এ কথা জিজ্ঞাসা করিও না। পীনাল কোডের ব্যবস্থা যেমন রাজশক্তি হইতে আসিয়াছে, ইহার ব্যবস্থাও সেইরূপ অপর কোন শক্তি হইতে আসিয়াছে, যাহার উপর তোমার কোন প্রভুত্ব নাই। কোনরূপ দ্বিধা ও দ্বিরুক্তি না করিয়া মানিয়া চল, তোমার মঙ্গল হইবে।

এইরূপে কোন একটা শাস্ত্রবিশেষ মানিয়া চলিতে পারিলে অনেকটা সুবিধা হয় ; অন্ততঃ নিজের বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হয় না, সুতরাং নিজের দায়িত্বের বোঝা হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শান্তি লাভ করা যায়, এ কথা স্বীকার্য্য। কিন্তু অনেক সময়ে অন্তরাত্মা এইরূপ শাস্ত্রের শাসন সকল সময়ে মানিতে চাহে না ; বরং অনেক সময়ে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সকল সমাজেরই ধর্ম্মশাস্ত্র কতকগুলা কার্য্যকে পাপ ও কতকগুলাকে পুণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে ; কিন্তু শাস্ত্রে শাস্ত্রে ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভয়ানক মতভেদ আছে। আবার যখন শুনা যায় যে, রবিবারে স্কুলে যাওয়াকে নরহত্যার সহিত এক শ্রেণীতে স্থান দিয়া শাস্ত্রবিশেষে উভয়ের জন্য শাস্তির বিধান করিয়াছে, তখন সেই ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহাচরণই কর্ত্তব্য বলিয়া উৎকট আগ্রহ উপস্থিত হয়।

ফলে, মনুষ্যের অন্তর মধ্যে conscience নামে একটা কি আছে, সে সকল সময়েই মনুষ্যের মনোমধ্যে অশান্তি জাগাইয়া রাখিতেছে। এই

কন্‌সেন্সের দর্শনশাস্ত্রসঙ্গত দেশী নাম যাহাই হউক, চলিত বাঙ্গালাতে আমরা ইহাকে 'সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি' আখ্যা দিতে পারি। আমাদের শাস্ত্রে যাঁহাকে অন্তর্যামী বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহার স্বরূপই বোধ করি এই সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি। মানুষ যখন এ-দিকে যাইতে চায়, তখন এই প্রবৃত্তি তাহাকে ও-দিকে টানে। ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, লোকশাস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় পীনাল কোড, যখন মানুষকে এ পথে যাইতে বলে, তখন উহা অন্য পথ দেখাইয়া দেয়। বস্তুতই মনুষ্যের ঘরে ও বাহিরে কুত্রাপি শান্তি নাই। মনুষ্যের অন্তরে এই একটা কিম্ভূতকিমাকার প্রবৃত্তি অন্যান্য প্রবৃত্তির সঙ্গে সর্ব্বদা কলহে ব্যাপৃত রহিয়াছে; এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ অনুরোধ ও উপদেশ ও ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছেন, এই সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সে সকল অনুরোধ ও সকল উপদেশ উপেক্ষা করিয়া এবং সকল ভীতিপ্রদর্শন তাচ্ছিল্য করিয়া অন্য পথ দেখাইয়া দিতেছে।

মানুষ যখন নিজের প্রবৃত্তিসমূহের প্ররোচনায়, অথবা বন্ধুবর্গের উপদেশ-বাক্যে একটা গন্তব্য স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, এমন সময়ে তাহার অন্তরতম প্রদেশের কোথা হইতে কাহার গম্ভীর স্বর নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দেয়। প্রবৃত্তির প্ররোচনা তখন আর তাহাকে চালাইতে পারে না; হিতৈষীর হিতবাণী তখন আর ভাল লাগে না; শাস্ত্রের শাসন তখন আর সম্মান পায় না; ইউটিলিটি-তত্ত্ব বা অন্যান্য দার্শনিক তত্ত্বের ক্ষতি-লাভ গণনা ও হিসাব-নিকাশের তখন অবকাশ মিলে না।

মায়াসিংহ যখন দিলীপকে নানা ছন্দে নানা ভঙ্গে ক্ষতি-লাভ গণনা ও হিসাব-নিকাশের কথা আনিয়া কর্ত্তব্যনির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে দিলীপের সহজ সরল স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। এবং মনুষ্যের সৌভাগ্য এই যে, বিবিধ নীতি ও বিবিধ উপদেশ ও বিবিধ শাস্ত্র যখন মায়াজাল বিস্তার করিয়া মনুষ্যের চক্ষুকে অন্ধীভূত করে ও তাহাকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হয়, তখন তাহার সেই অকৃত্রিম সরল সুস্থ ধর্ম্মসংস্কারই তাহাকে সে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের এই স্বাভাবিক সহজ সংস্কার বা প্রবৃত্তি, ইহার উৎপত্তি কোথা হইতে? এ প্রশ্নের কি উত্তর নাই?

এই স্থানে মনুষ্য-প্রকৃতির একটু আলোচনা আবশ্যক। মনুষ্য স্বভাবতঃ সুখান্বেষী। সুখ শব্দের ও দুঃখ শব্দের দার্শনিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার

দরকার নাই। সুখ শব্দে কি বুঝায় ও দুঃখ শব্দে কি বুঝায়, তাহা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা স্থির না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্য স্বভাবতই সুখ অন্বেষণ করে ও দুঃখ হইতে দূরে রহিতে চেষ্টা করে। ইহাতে মানুষের দোষ নাই। প্রকৃতি কর্ত্তৃক মনুষ্য ইহাতে নিযুক্ত। মনুষ্যের অপর ধর্ম্ম যাহাই হউক, আপন জীবন রক্ষা করিয়া চলিতেই হইবে, ইহা তাহার প্রথম ধর্ম্ম ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এবং জীবন রক্ষার জন্যই সে সুখের অন্বেষণ ও দুঃখের পরিহার করিয়া থাকে। যদি প্রকৃতির ব্যবস্থা অন্যরূপ হইত, যদি জীবনরক্ষায় মনুষ্যের প্রবৃত্তি না থাকিত, যদি মনুষ্য সুখ ত্যাগ করিয়া স্বভাবের তাড়নায় দুঃখেরই প্রতি ধাবিত হইত, তাহা হইলে জগতের ইতিহাসে মনুষ্যজাতি-সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটা বোধ হয় অস্তিত্বহীন হইত। যাহা জীবনের অনুকূল, তাহারই নাম সুখ; যাহা জীবনের প্রতিকূল, তাহারই নাম দুঃখ। কাজেই যাহাকে জীবন ধরিতে হইবে, সে সুখসাধনে ও দুঃখবর্জ্জনে বাধ্য। তাহার গত্যন্তর নাই। সময়ে সময়ে দেখা যায় বটে, সুখান্বেষণেই মনুষ্যের বিপদ্ ঘটে, জীবন বিপৎসঙ্কুল হয়; কিন্তু তাহা প্রকৃতির বন্দোবস্তের দোষে; প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য সুখান্বেষণেই প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত আছে।

মানুষ মনুষ্যত্বলাভের পূর্ব্বেই জীবত্ব লাভ করিয়াছিল। সংসারমধ্যে মনুষ্য একটা জীব। তাহার জীবনরক্ষা বিষয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে। এই প্রবৃত্তি না থাকিলে তাহাকে এত দিন সংসারে টিকিতে হইত না ও পাপপুণ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে বিচার লইয়া আমাদিগকেও তর্কে প্রবৃত্ত হইতে হইত না। জীবনরক্ষাই মানবরূপী জীবের প্রথম ও প্রধান ধর্ম্ম। অন্যান্য জীবের সহিত এই স্থলে তাহার সাধারণত্ব। জীবনরক্ষার অনুকূল পথে তাহাকে চলিতে হইবে, নতুবা তাহার অস্তিত্ব থাকিবে না, প্রকৃতি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন; এবং প্রকৃতি এই জন্য তাহাকে সুখান্বেষী করিয়াছেন। কোন্ পথ জীবনের অনুকূল, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার ক্ষমতা সকলের নাই; অথবা তাহা পদে পদে বিচার করিয়া জানিতে গেলে জীবন রক্ষা হয় না; জীবন-সমর এমনই ভয়ানক। সেই জন্য প্রকৃতিই তাহার কতকগুলি মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। সে জীবনরক্ষার্থ সেই প্রকৃতি-প্রদত্ত মনোবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়া থাকে।

সেই স্বভাবজাত মনোবৃত্তির নাম সুখান্বেষণ-প্রবৃত্তি বা দুঃখ-পরিহার-প্রবৃত্তি। জীব সেই প্রবৃত্তির বশে চলে বলিয়াই আজি পর্য্যন্ত তাহার

অস্তিত্ব। সত্য বটে, এই সুখান্বেষণ-প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা তাহাকে ঠিক পথে, জীবনের অনুকূল পথে লইয়া যায় না। সে প্রকৃতির ব্যবস্থার দোষ। কিন্তু তাহার পক্ষে অন্য উপায় নাই। জীবন থাকুক আর নষ্টই হউক, সে সুখান্বেষণে বাধ্য। এবং সর্ব্বত্র না হউক, অধিকাংশ স্থলেই সুখ জীবনের অনুকূল, দুঃখ জীবনের প্রতিকূল। সুতরাং জীব যে সুখ চাহে ও জীবধর্ম্মা মনুষ্যও অন্য জীবের মত সুখান্বেষণ করে, ইহাতে মনুষ্যের দোষ নাই। ইহা প্রকৃতির বিধান। ইহাতে মঙ্গল; ইহা সত্য কথা; ইহার অপলাপ করিও না।

মনুষ্য জীব ও সুখান্বেষী জীব, প্রকৃতির ব্যবস্থা এইরূপ। এই পর্য্যন্ত কোন গোল নাই। কিন্তু প্রকৃতির ব্যবস্থা বড় ভয়ঙ্কর। এক জীবের জীবন নষ্ট না করিলে অন্য জীবের রক্ষা হয় না; একের যাহাতে সুখ, অন্যের তাহাতে দুঃখ; অপরকে দুঃখ না দিলে নিজের সুখ নাই। ইহাই প্রকৃতির ব্যবস্থা, এবং এই ব্যবস্থার উপর জগৎসংসার প্রতিষ্ঠিত। আহার বিনা জীবন রক্ষা হয় না, এবং জীবের আহার জীব।

ব্যবস্থা ভয়ঙ্কর, কিন্তু ইহার উপর তোমার আমার হাত নাই। প্রকৃতির ব্যবস্থার উপর তোমার আমার প্রভুত্ব নাই। জীবন রাখিতে হইবে, অথচ অন্যকে নাশ না করিলে জীবন থাকিবে না। জীব মাত্রের এই চেষ্টা, জীব মাত্রেরই এই দিকে গতি; ফলে ঘোর জীবন-সংগ্রাম। মূলে এই দ্বন্দ্ব; এবং এই দ্বন্দ্বের উপর সমগ্র জাগতিক ব্যাপার প্রতিষ্ঠিত। জগৎব্যাপারের আগাগোড়া, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার অস্তিত্ব দেখা যায়, এই স্থলেই তাহার মূল। এইখান হইতেই ভাল ও মন্দ, সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুণ্যের উৎপত্তি।

মূলে দ্বন্দ্ব; সংগ্রাম, বিবাদ, রক্তপাত; অথচ ইহা নহিলেও যেন চলে না। দ্বন্দ্ব হইতে দুঃখ, দ্বন্দ্ব হইতে মৃত্যু, দ্বন্দ্ব হইতে পাপ। অথচ দ্বন্দ্বহীন, দুঃখহীন, মৃত্যুহীন, পাপহীন জগৎ কেমন হইত, তাহা ত কল্পনায় আসে না। কবির কল্পনায় হয়ত আসিতে পারে। যে জগতে দ্বন্দ্ব নাই, দুঃখ নাই, জরা নাই, মরণ নাই, পাপ নাই,—সবই সুখ, সবই শান্তি, নিরবচ্ছিন্ন যৌবন, আর বসন্ত, আর মলয়পবন—সে জগৎ কবি-কল্পনায় হয়ত আসিতে পারে; কিন্তু সে জগতের প্রকৃতি কেমন, তাহা জ্ঞানবিজ্ঞানের অগোচর। জরামরণ-হীন দুঃখদ্বন্দ্বহীন অস্তিত্বের সহিত নাস্তিত্বের কি প্রভেদ, আমাকে কেহ বুঝাইয়া দিলে উপকৃত হইব।

প্রকৃতির এই অভিব্যক্তি, এই বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য, জীবনের এই উচ্ছ্বাস ও বিকাশ, সেই সনাতন দ্বন্দ্ব ও বিরোধ হইতেই উৎপন্ন। মৃত্যু ছাড়িয়া জীবন নাই, দুঃখ ছাড়া সুখ নাই, পাপ ছাড়িয়া পুণ্য নাই, জগতের এই সর্ব্বপ্রধান সত্য।

জীবন রক্ষার জন্য জীবে জীবে দ্বন্দ্ব, নখানখি, দন্তাদন্তি, রক্তারক্তি ; ফলে জীবমধ্যে অভিব্যক্তি, উচ্চের আবির্ভাব, নীচের তিরোভাব ; দুর্ব্বলের পরাজয়, সবলের জয়। জীবন-সংগ্রাম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। অভিব্যক্তি, বিকাশ, উন্নতি ; সঙ্গে সঙ্গে নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন আশা, নূতন অশান্তি, নূতন দ্বন্দ্ব। জীবমধ্যে এই দ্বন্দ্ব সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বর্ত্তমান, এবং জীবসমাজে মনুষ্যমধ্যে এই দ্বন্দ্বের পরাকাষ্ঠা।

এই নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বকোলাহল মধ্যে প্রকৃতির কি উদ্দেশ্য দেখিতেছ ? জীবের প্রতি দয়া ? ব্যক্তি-জীবনের রক্ষণপ্রয়াস ? বাতুলের কথা। জীবন-রক্ষার উৎকট প্রয়াসে জীবমণ্ডলী ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে ; কিন্তু জীবন-রক্ষা ত হয় না। সুখান্বেষণে প্রবৃত্তির নির্দ্দিষ্ট পন্থায় জীব মাত্রই ছুটিতেছে ; আপন জীবনরক্ষার জন্য ছুটিতেছে ; পরের জীবনে দয়া করিবার তাহার অবসর নাই। কিন্তু সেই আপন জীবনই কি রক্ষা পায় ? উত্তরে বলিব, পায় না। অভিব্যক্তি ? উন্নতি ? কাহার ? উত্তরে বলিব, ব্যক্তির নহে ; জাতির। জীবন-সংগ্রামে ব্যক্তিজীবনের জীবনব্যাপী প্রয়াসের চরম ফল মৃত্যু ; মৃত্যুর চরম ফল জাতি-জীবনের অভ্যুদয়। ব্যক্তি যায়, জাতি থাকে। প্রকৃতির উদ্দেশ্য জাতীয় অভিব্যক্তি, জাতীয় উন্নতি। ব্যক্তির জীবন তাহার নিকট মূল্যহীন। ব্যক্তির জীবন খেলার পুতুল, ক্রীড়নক। ব্যক্তির দ্বারা প্রকৃতি আপন নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধিয়া লয়। সে উদ্দেশ্য ব্যক্তির নাশ, জাতির বিকাশ। মনুষ্য-জাতি আজিও আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের তীব্র ও উৎকট উত্তেজনা লইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু রঘুপতেঃ ক গতোত্তর-কোশলা। তুমি মরণের কুক্ষিতে বিস্মৃতির গর্ভে অন্তর্হিত হও ; তোমাকে লইয়া প্রকৃতির আর কোন দরকার নাই। তোমার জীবনের যেটুকু কাজ, তাহা তোমাদ্বারা প্রকৃতি সাধিয়া লইয়াছে। তুমি যাও, অপরকে স্থান দাও। অন্তিম কালে ব্যক্তি মাত্রের প্রতি প্রকৃতির এই নির্ম্মম বাণী।

প্রকৃতির নিকট ব্যক্তির জীবন মূল্যহীন ; জাতির অভ্যুদয় তাহার উদ্দেশ্য। তবে জাতির অভ্যুদয় সাধনের জন্য ব্যক্তি মাত্রকে কিছু দিন বাঁচাইয়া

রাখিয়া খাটাইয়া লইতে হয় ; তাই প্রকৃতির প্ররোচনায় ব্যক্তি মাত্রই জীবন ব্যাপিয়া খাটিতেছে। সে মনে করে, আমি আপন জীবনের উৎকর্ষের জন্য এত প্রয়াস, এত যত্ন করিতেছি। কিন্তু হায়, সে জানে না, কি বিষম প্রতারণায় সে প্রতারিত। জীব প্রকৃতির তাড়নায় কাজ করে ; তাহাতেই তাহার সুখলাভ। তাহাতেই তাহার জীবন কিছু দিনের জন্য রক্ষিত হয় ; প্রকৃতির গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহার যত দিন বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক, তত দিন তাহার জীবন রক্ষিত হয়। কিছু কাল তাহার জীবন পুষ্টি পায়। সে জানে না, কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে জীবিত রহিয়াছে। ক্ষুধার উত্তেজনায় ব্যাঘ্র ছাগশিশুর উপর লম্ফ দিয়া পড়ে ; স্বভাবের উত্তেজনায়, প্রকৃতির তাড়নায় সে এমন করে ; এমন না করিয়া তাহার উপায় নাই। সে প্রকৃতির দাস ; প্রকৃতি কর্তৃক সে অন্ধভাবে ছাগ-হত্যায় নিয়োজিত। সে ক্রীড়াতে তাহার স্বাধীনতা নাই। তাহার নিজের জীবন এইরূপে কিছু দিন ধরিয়া রক্ষা করিতে হইবে। কেন না, প্রকৃতির একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য এই যে, যত দিন তাহার সন্তান না জন্মে, তত দিন তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। তাহার বংশরক্ষার ও জাতিরক্ষার জন্য তাহার কিছু দিন বাঁচা আবশ্যক। যত দিন সে উদ্দেশ্য সাধিত না হয়, সে ক্ষুধার উত্তেজনায় ছাগশিশু হত্যা করিয়া নিজ জীবন বর্দ্ধন করিতে থাকুক। আবার আততায়ী যখন ব্যাঘ্রশিশুকে আক্রমণ করে, তখন কুপিতা ব্যাঘ্রী তাহার উপর লাফ দেয় ; তখন নিজের জীবনের জন্য তাহার মমতা থাকে না। এখানে ব্যাঘ্রীও সেইরূপ স্বাধীনতাবর্জ্জিত ক্রীড়নক মাত্র। প্রকৃতি তাহাকে সন্তানের জীবনের জন্য আত্মজীবনে মমত্বহীন করে ; সে স্বার্থান্বেষণে অবসর পায় না। ইহাতেই তাহার সুখ ; শিশুর জীবন রাখিবার জন্য আপন জীবন দান করিতে তাহার সুখ। প্রকৃতি নিজ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাহাকে এইরূপ প্রবৃত্তি দিয়াছেন। সে প্রকৃতির অনুজ্ঞা পালনে বাধ্য।

মনুষ্যে এই দ্বন্দ্বের পরাকাষ্ঠা। জীবমধ্যে মনুষ্যের স্থান সকলের উপরে ; কিন্তু মনুষ্যের অবস্থা বোধ করি, সকলের অপেক্ষা শোচনীয়। এই অবস্থার শোচনীয়তাতেই তাহার মনুষ্যত্ব। ইতর জীব জীবনের চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছে ; কিন্তু ইতর জীব বোধ করি জানে না, তাহার সমস্ত চেষ্টার পরিণতি মৃত্যু। মনুষ্যও তাহার মতই জীবনযুদ্ধে নিরত ; কিন্তু মনুষ্য জানে যে, মরণ অবশ্যম্ভাবী। ইতর জীব প্রবৃত্তির বশে কাজ করে ; কিন্তু সেই

কাজের ফল কি হইবে না হইবে, তাহা সে জানে না ও ভাবে না; তাহার জন্য সে দায়িত্বশূন্য। মনুষ্যও প্রবৃত্তির বশে কাজ করে; কিন্তু সে আপন কার্য্যের ফল আপন চোখে দেখিতে পায়; এবং সময়ে সময়ে সেই ভবিষ্যৎ ফল পূর্ব্ব হইতে গণনা করিয়া বিচারশক্তি দ্বারা প্রবৃত্তির মুখ ফিরাইয়া লয়। ইতর জীবের পথ একটা; মানুষের পথ অনেকগুলি। আপনার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার সাহায্যে প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া মানুষকে আপনার পথ পছন্দ করিয়া লইতে হয়। সেই দায়িত্ব তাহার স্কন্ধের উপর। মনুষ্য জীব বটে, কিন্তু বুদ্ধিজীবী বিচারপরায়ণ দায়িত্বপূর্ণ জীব।

এতদ্ভিন্ন মনুষ্যের সহিত ইতর জীবের আর একটা প্রভেদ আছে। মনুষ্য শারীরিক বলে দুর্ব্বল। মানুষের নখে ও দাঁতে ধার নাই ও মাংসপেশীতে জোর নাই। বুদ্ধিবৃত্তি জীবন-সংগ্রামে মানুষের সহায়; কিন্তু কেবল বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে জীবন ধারণ সহজ কথা নহে। সেই জন্য মনুষ্যকে দল বাঁধিয়া থাকিতে হয়। মনুষ্য একা যাহা পারে না, দল বাঁধিয়া তাহা পারে। এই জন্য মনুষ্যমধ্যে সমাজের উৎপত্তি। অন্যান্য কোন কোন জীবের মধ্যেও সমাজের অঙ্কুরোদ্গম দেখা যায়; কিন্তু অন্যত্র যাহার অঙ্কুর, মনুষ্যে তাহা পল্লবিত বৃক্ষ। মুখ্যতঃ সমাজ বাঁধিয়া মনুষ্য জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে; তাহার জীবত্ব পূর্ব্ব হইতেই ছিল; কিন্তু এই সামাজিকত্বের উৎপত্তির সহিত তাহার পূর্ণ মনুষ্যত্বের আরম্ভ।

মনুষ্য জীব, কিন্তু বুদ্ধিজীবী বিচারপরায়ণ সমাজবদ্ধ জীব। অন্য জীবের মতই মনুষ্য স্বার্থরক্ষার জন্য অর্থাৎ জীবনরক্ষার জন্য নিযুক্ত; অধিকন্তু মনুষ্য সমাজরক্ষণেও বাধ্য; কেন না, সমাজরক্ষা না হইলে তাহার জীবনরক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে। একটা দ্বন্দ্ব পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু এইখানে আর একটা নূতন দ্বন্দ্বের আবির্ভাব। কেন না, ব্যক্তির রক্ষার জন্য সমাজের প্রয়োজন; তথাপি ব্যক্তির স্বার্থ সর্ব্বদা সমাজের স্বার্থের সহিত এক হয় না। সমাজ রাখিতে হইলে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য কতকটা সংহার করিতে হইবে। সর্ব্বতোভাবে আপনার দিকে চাহিলে চলিবে না।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দিন ছিল, যখন মনুষ্যের সহিত ইতর জীবের তেমন ভেদ ছিল না; মনুষ্য যখন সমাজবদ্ধ জীবমধ্যে গণ্য হয় নাই; তখন তাহার আপনার সুখের অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকিলেই চলিত; তজ্জন্য প্রকৃতি তাহাকে যে সকল প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, সেই সকল প্রবৃত্তির আদেশে চলিলেই

তাহার জীবনের কাজ সম্পাদিত হইত। কিন্তু একবার সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিলেই মানুষের আর ঠিক সে অবস্থা থাকে না। মনুষ্যের জৈব প্রবৃত্তিগুলি তাহাকে সমাজের বাহিরে আনিতে চায়; কিন্তু সমগ্র সামাজিক শক্তি তাহাকে সমাজের ভিতরে ধরিয়া রাখে। একটা বল তাহার আত্ম-জীবনকে কেন্দ্রে রাখিয়া কাজ করে; আর একটা বল তাহাকে সেই কেন্দ্র হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত করিয়া অপরের দিকে আকর্ষণ করে। ব্যক্তিগত ভাবের সহিত সামাজিকত্বের এইরূপ দ্বন্দ্ব। দুইটার মধ্যে একরকম সামঞ্জস্য রাখিয়া মানুষকে চলিতে হয়। তাহার পা দুই নৌকায়; এবং দুই নৌকায় যত ক্ষণ পা থাকে, জীবনও তত ক্ষণ বড় সুখের হয় না।

এই সামঞ্জস্যরক্ষা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কোটি-পুরুষ-পরম্পরায় বিকাশপ্রাপ্ত জীবসাধারণের জৈব প্রবৃত্তিসমুদয় মানুষকে আত্মমুখে ও স্বার্থমুখে প্রেরিত করে; সামাজিক শক্তিসকল তাহাকে অপরের দিকে ও পরার্থমুখে টানিয়া ধরে। জৈব প্রবৃত্তিগুলি প্রবল ও বেগবান্; কোটি কোটি বৎসরে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে তাহারা মানুষের প্রাণের সহিত গাঁথিয়া গিয়াছে; তাহাদের প্ররোচনা অতিক্রম করিয়া চলা মানুষের পক্ষে সহজ নহে। এই প্রবৃত্তিগুলি স্বাভাবিক সংস্কার স্বরূপে জন্মাবধি মানুষকে চালিত করে; মানুষের ক্ষমতা নাই যে, ইহাদিগকে সকল সময়ে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রাখে। অথচ সমাজের জীবন ব্যক্তিজীবনের অপেক্ষা মূল্যবান্ পদার্থ; সমাজের জন্য ব্যক্তিজীবনে স্বার্থসংহার নিতান্তই আবশ্যক। মানুষের জীবত্ব কত কাল হইল স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে; তাহার তুলনায় তাহার সামাজিকত্ব আধুনিক ব্যাপার। এখনও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন তাহার সামাজিকত্বের অভিব্যক্তিতে হাত খেলাইবার তেমন অবসর পায় নাই। সামাজিকত্ব এখনও সম্পূর্ণভাবে পুষ্টিলাভ ও স্ফূর্ত্তিলাভ করে নাই। এইখানেই মনুষ্যজীবনের প্রধান সমস্যা। এইখানে মনুষ্যত্বের দায়িত্বের সূত্রপাত। এইখানেই ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপপুণ্যের ভিত্তিস্থাপন। ব্যক্তিভাব ও সামাজিকত্ব, individualism ও socialism লইয়া যে ঘোর কোলাহল মনুষ্যের ইতিহাসের আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত সমানভাবে চলিতেছে, এইখানেই তাহার আরম্ভ।

মনুষ্য কি পরিমাণে স্বতন্ত্র থাকিবে ও কি পরিমাণে পরতন্ত্র থাকিবে, তাহার মীমাংসা আবশ্যক, অথচ মীমাংসার কোন উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রকৃতির সর্ব্বত্র যেমন বিধান, এখানেও সেইরূপ। দুই দিকে

টানাটানি; বলে বলে, শক্তিতে শক্তিতে সংঘর্ষ; এক পক্ষ শেষ পর্য্যন্ত জিতিয়া যায়। জীবন-সমরে বাঘের জয়, কি ছাগলের জয়, প্রকৃতি একবারে মীমাংসা করিয়া দেন না। তিনি জগতে বাঘকে ও ছাগলকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহারা পুরুষপরম্পরায় মারামারি করিয়া মরুক। শেষ পর্য্যন্ত একের জয় হইবে, অথবা উভয়েই লোপ পাইবে, অথবা উভয়ের রক্তবীজ হইতে উন্নততর জীবের উদ্ভব হইবে। সেইরূপ মানুষের সামাজিক দ্বন্দ্বে ব্যক্তির জয়, কি সমাজের জয় হইবে, প্রকৃতি কিছুই বলেন না। মনুষ্যত্বের বিকাশ আবশ্যক। মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য ব্যক্তিরও অভিব্যক্তি আবশ্যক, সামাজিকত্বেরও অভিব্যক্তি আবশ্যক। ব্যক্তি সামাজিকত্বের সহিত চিরকাল দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত থাকুক; দ্বন্দ্বে ক্রমে উভয়েই স্ফূর্ত্তি লাভ করুক, পুষ্টি লাভ করুক, অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হউক। প্রকৃতির ব্যবস্থা সর্ব্বত্র এইরূপ।

জীবের স্বার্থমূলক প্রবৃত্তিসমূহ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে অভিব্যক্ত; মনুষ্য সেই সকল প্রবৃত্তির প্ররোচনায় চলে, অন্যান্য জীবের মতই চলে। তাহাদের প্ররোচনাতে চলিয়াই মনুষ্যের সুখ; স্বার্থসংহারে মনুষ্যের অসুখ। অথচ স্বার্থসংহার আবশ্যক। নতুবা সমাজ থাকে না। সমাজ না থাকিলে আবার দুর্ব্বল মনুষ্যের জীবনও সবল ইতর জীবের সহিত দুরন্ত সমরে ক্ষণেকের বেশী টিকিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং স্বার্থসংহার আবশ্যক; কিন্তু স্বার্থ-সংহার মনুষ্যের জৈব প্রবৃত্তির বিরোধী; স্বার্থসংহারে মনুষ্যের সুখ নাই। মানুষকে জোর করিয়া স্বার্থ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে হইবে। অঙ্কুশাঘাতে ও কশাঘাতে মনুষ্যকে তাহার প্রবৃত্তির পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে হইবে। এই নিবর্ত্তন-প্রণালীর নাম শাসন। রাজ-শাসন, লোক-শাসন, নীতির শাসন, ধর্ম্ম-শাসন, বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া, বিবিধ প্রণালীর উদ্ভাবন দ্বারা মানুষকে শাসনে রাখিতে হইবে। কখন পুরস্কার, কখন তিরস্কার; কখন প্রলোভনের উত্তেজনা, কখন বা বিভীষিকার নির্যাতনা। রাজদণ্ড-হস্তে রাজা বলিতেছেন, আমার আদেশে তোমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সংযত কর, নতুবা বেত্রাঘাত, কারাবাস, প্রাণদণ্ড। সমাজপতি বলিতেছেন, আমার নিষেধ মানিয়া জীবনবৃত্তি নিয়মিত কর, নতুবা সামাজিক নির্যাতন, সমাজ হইতে নির্ব্বাসন। ধর্ম্মপ্রচারক বলিতেছেন, আমার কথা অনুসারে জীবন-প্রণালী সাজাইয়া লও, নতুবা ইহলোকে বা পরলোকে মঙ্গল নাই। ধর্ম্ম-যাজক থাকিয়া থাকিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিতেছেন, আমার আদেশের সম্মান

সকলের আগে ; নতুবা কুম্ভীপাক তোমার জন্য প্রস্তুত। প্রবৃত্তির উত্তেজনা স্বাভাবিক, তাহা না মানিলে নয় ; সমাজের শাসন কৃত্রিম, কিন্তু তাহা না মানিলে সমাজে স্থান হয় না। মানুষের মত দুঃখী জীব কোথায় ?

স্বভাবের সহিত কৃত্রিমতার এইরূপ দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে মনুষ্য-জীবন সুখে-দুঃখে একরূপে চলিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতিও এদিকে নিশ্চিন্ত থাকেন না। ব্যক্তির অভিব্যক্তি যেমন জাতি-রক্ষার জন্য আবশ্যক, সামাজিকত্বের বিকাশও সেইরূপ জাতি-রক্ষার জন্যই ততোধিক আবশ্যক! সেই জন্য কতকগুলা কৃত্রিম শক্তির হস্তে সামাজিকত্বের অভিব্যক্তির ভার দিয়া প্রকৃতি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। মনুষ্য বুদ্ধিজীবী ও বিচারপরায়ণ জীব। সে অতীতের স্মৃতি রাখে, ভবিষ্যৎ গণিতে পারে। এক পার্শ্বে অতীতের অভিজ্ঞতা, অপর পার্শ্বে ভবিষ্যতের পুরোদর্শন। উভয়ের সাহায্য পাইয়া সে কর্ত্তব্য বিচার করিয়া থাকে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানিয়া চলিলে আশু সুখলাভ নিশ্চিত ; কিন্তু সমাজের শাসন না মানিলে ভবিষ্যতে বিপদ্। ভবিষ্যতের ভয়ের প্রতিমূর্ত্তি কল্পনায় প্রতিফলিত হইয়া আশু সুখের প্রলোভনকে আচ্ছাদিত করে। মনুষ্য তখন প্রবৃত্তির পথ ছাড়িয়া নিবৃত্তি-মার্গে চলিতে থাকে। কিন্তু এমন করিয়া কত দিন চলে ? প্রবৃত্তির বেগ উৎকট বেগ ; বর্ত্তমান সুখের প্রলোভন তীব্র। মনুষ্যকে পদে পদে পথভ্রান্ত হইয়া সমাজের নিকট তিরস্কৃত হইতে হয়, এবং আপন সর্ব্বনাশের সহকারে সমাজের সর্ব্বনাশও আসিয়া পড়ে। এরূপ বন্দোবস্ত চিরকাল চলে না। স্বভাবের সম্মুখে কৃত্রিমতাকে দণ্ডায়মান রাখিয়া চিরকাল প্রকৃতি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। প্রকৃতি ধীরে ধীরে কাজ করেন। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ধীরে ধীরে চলিতে থাকে।

ব্যক্তির সহিত সমাজের বিরোধ ; যে সমাজে ব্যক্তি যত উচ্ছৃঙ্খল, সে সমাজ সেই পরিমাণে দুর্ব্বল। জীবে জীবে যেমন দ্বন্দ্ব, মনুষ্যে মনুষ্যেও তেমনই দ্বন্দ্ব ; এই দ্বন্দ্বের ফলে ব্যক্তিগত পুষ্টি। আবার সমাজের সহিত সমাজের দ্বন্দ্ব মনুষ্যের ইতিহাসের সহব্যাপী। ভিতরে যেমন জনে জনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাহিরে তেমনই দলে দলে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, বর্ণে বর্ণে, সমাজে সমাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দুর্ব্বলের পরাজয়, সবলের জয়। কোন্ সমাজ দুর্ব্বল ? যাহার মধ্যে ব্যক্তির প্রভাব অধিক, সামাজিকত্ব যেখানে জমে নাই। কোন্ সমাজ সবল ? যাহার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সমবেত

সমাজশক্তির করায়ত্ত। কাহার পরাজয়? যেখানে ব্যক্তিজীবন সমাজ-জীবনের প্রতিকূল, যেখানে ব্যক্তিজীবন আপনাকে কেন্দ্রগত করিয়া ঘুরিয়া থাকে। কাহার জয়? যেখানে ব্যক্তিজীবন সমাজ-জীবনের অনুকূল, যেখানে প্রবৃত্তি নিরঙ্কুশ নহে, যেখানে নিবৃত্তি প্রবৃত্তিকে নিয়মিত রাখে। কালে স্বার্থপ্রবৃত্তি ক্রমশঃ সংযত হইতে থাকে; জীবনের পরিধি প্রসার লাভ করে; জীবনের আয়তন বর্দ্ধমান হয়। নিবৃত্তি আসিয়া প্রবৃত্তির বেগ কমাইয়া দেয়। নিবৃত্তিই ক্রমশঃ প্রবৃত্তিতে পরিণতি লাভ করে। প্রকৃতির নির্ব্বাচনে নিবৃত্তি পরিপুষ্ট হয়; কেন না, ব্যক্তিগত নিবৃত্তি ও সংযমের বলে যে সমাজ দৃঢ় হয়, সেই সমাজেরই জয় হয়। নিবৃত্তি ক্রমশঃ কৃত্রিম সমাজশাসনের মুখাপেক্ষা পরিহার করিয়া স্বভাবের বলে বলীয়ান্ হয়। মনুষ্যের অন্তরমধ্যে প্রবৃত্তির পার্শ্বে নিবৃত্তি আসিয়া দেখা দেয়। যাহা আত্মমুখ হইতে নিবৃত্তি, তাহাই পরমুখে প্রবৃত্তি। আত্মমুখী প্রবৃত্তির পার্শ্বে এই নবোদ্গত পরমুখী প্রবৃত্তি আসিয়া দেখা দিলে মনুষ্যের অন্তঃকরণে নূতন বলের সঞ্চার হয়। এত দিন মনুষ্যের ইতিহাস জীবের ইতিহাস; আজ হইতে মনুষ্যের ইতিহাস মনুষ্যের ইতিহাস। জগতে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা; জগতের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভ।

মনুষ্যের জৈব প্রবৃত্তি এত দিন তাহাকে স্বার্থসাধনে নিযুক্ত রাখিয়াছিল; তাহাতেই তাহার সুখ ছিল, তাহাতেই তাহার শান্তি ছিল। সমাজের কৃত্রিম শাসন জোর করিয়া, ভয় দেখাইয়া, লোভ দেখাইয়া তাহাকে শাসনে রাখিত, তাহার জীবনের গতি কতকটা পরমুখে লওয়াইত। আজ হইতে তাহার স্বভাবই তাহাকে পরমুখে চলিতে বলে। নূতন একটা প্রবৃত্তি তাহাকে পরের মুখে চালিত করিতে থাকে। এই নূতন প্রবৃত্তি, সমাজরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে কালসহকারে যাহার বিকাশ, ইহাকেই মানবিক প্রবৃত্তি বলিতে পার; কেন না, মনুষ্য ভিন্ন ইতর জীবে ইহার অস্তিত্ব নাই। মনুষ্যের ইহাই বিশিষ্টতা। মনুষ্যত্বের ইহাই প্রধানতম লক্ষণ। ইহারই নাম স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, ইংরেজীতে বলে conscience। ইনিই অন্তর্যামী হৃষীকেশ। মনুষ্যের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কে আসিয়া নবাগত অপরিচিতের মত দেখা দেয়, মানুষ তাহাকে ভাল করিয়া যেন চেনে না; মানুষের কাছে সে যেন নূতন। স্নিগ্ধ গম্ভীর ধ্বনিতে যখন সে ভিতর হইতে কথা কয়, মনুষ্য তখন স্তম্ভিত হয়; মনুষ্য মন্ত্রমুগ্ধের মত

তখন তাহার আদেশবাণী মানিয়া চলে। জৈব প্রবৃত্তি মনুষ্যকে যখন আত্মমুখে চালাইতে যায়, তখন সে সেই প্রবৃত্তির মুখে বল্‌গা ধরিয়া দাঁড়ায়, তাহার গতি রোধ করে, তাহার বেগ সংযত করে। সে নবাগত অপরিচিত, কিন্তু কৃত্রিমতাশূন্য ; স্বভাব হইতে তাহার উৎপত্তি ; পৃথিবীর মলিন মৃত্তিকায় তাহার অঙ্গ গঠিত হয় নাই। মনুষ্য তাহাকে ভয় করে, তাহাকে সম্মান করে, তাহাকে শ্রদ্ধা করে, তাহাকে ভক্তি করে, অবহেলে তাহাকে প্রেমের আলিঙ্গন দিতে শিক্ষা করে। মানবের প্রিয়তম সখা, এত দিন তুমি কোথায় ছিলে ? এত দিন তোমার অদর্শনে মানব যেন ব্যাকুল ছিল। তোমার সিংহাসনে তুমি দৃঢ় হইয়া আসন গ্রহণ কর। মানবাত্মার সহিত তোমার প্রীতির বন্ধন যেন কখন ছিন্ন না হয়। জীবনের সমরক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক, তুমি দুর্ব্বল মানবরূপী জীবকে পথ দেখাইয়া দাও, তোমার অনুজ্ঞা পালন করিয়া সে নিশ্চিন্ত, ধন্য ও কৃতার্থ হউক। মরীচিকাভ্রান্ত মৃগের মত মানব এত দিন মিথ্যা প্রলোভনের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আজি কাল্পনিক আশা, কালি কাল্পনিক বিভীষিকা তাহাকে মরুক্ষেত্রে ঘুরাইয়া বেড়াইতেছিল। আজ সে শ্রদ্ধেয় আত্মীয় সহচর পাইয়াছে। আজ সে জীবনে শান্তিলাভ করিবে। আজ তাহার জীবনে দুঃখের রজনী পোহাইবে।

রাজশাসন ও লোকশাসন, নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র মনুষ্য-সমাজে কত কাল আধিপত্য করিয়াছে ; জীবধর্ম্মা মনুষ্যের উদ্দাম প্রবৃত্তিকে সংযত রাখিবার জন্য এত দিন তাহাদের আধিপত্যের প্রয়োজন ছিল। এখনও মনুষ্য-সমাজ এমন অভিব্যক্ত হয় নাই, এখনও মনুষ্য-প্রকৃতি এমন পুষ্টিলাভ করে নাই যে, সেই সকল কৃত্রিম শাসনের কাল্পনিক আশার ও কাল্পনিক বিভীষিকার প্রভুত্বের আর প্রয়োজন নাই, এরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি মনুষ্যের প্রতি দয়াপরা ; ব্যক্তির জীবনের প্রতি না হউক, জাতীয় জীবনের প্রতি সদয়া। কৃত্রিমতার স্থানে স্বভাবের প্রভুত্ব স্থান পাইবে। কল্পনার স্থানে সত্য আসিয়া শোভা পাইবে। জৈব প্রবৃত্তি এত কাল মানুষকে চালাইয়াছে, এখন মানবিক প্রবৃত্তি মানুষকে চালাইবে। অন্তরমধ্যে উভয় প্রবৃত্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছু দিন ধরিয়া অনিবার্য্য। তত দিন ধরিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের বিরোধ, পাপের সহিত পুণ্যের সমর। প্রকৃতির খেলায় এই দ্বন্দ্বের ফলে মানবিক প্রবৃত্তির বিকাশ, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অভ্যুদয় ও স্ফূর্ত্তিলাভ।

প্রবৃত্তির আদেশ পালনে সুখ। জৈব প্রবৃত্তির আদেশপালনে এত কাল মনুষ্যরূপী জীবেরও সুখ ছিল; কিন্তু মানবিক প্রবৃত্তির আদেশ পালনেই কি সুখ জন্মিবে না? এই মানবিক প্রবৃত্তি পরার্থমুখী; এই প্রবৃত্তির আদেশে পরার্থপালনেই মানব সুখ পাইবে। মনুষ্য সুখান্বেষী রহুক, ক্ষতি নাই; এত দিন স্বার্থসাধনে তাহার সুখ ছিল, এখন পরার্থসাধনেই তাহার আনন্দ জন্মিবে।

এমন দিন কি মনুষ্যের অদৃষ্টে আসিবে না, যখন জীবধর্ম্ম ও মানবধর্ম্ম পরস্পর সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইবে; উভয়ে যখন মিশিয়া এক হইয়া যাইবে? স্বার্থসাধনে যখন পরার্থে ব্যাঘাত পড়িবে না, পরার্থসাধনে যখন স্বার্থ অব্যাহত থাকিবে। মানুষ এখন যেমন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বভাবের অঙ্কুশ-তাড়নায় আত্ম-সুখান্বেষণে রত থাকে, তখনও সেইরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই স্বভাবেরই অনুবর্ত্তী হইয়া পরসুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে। ব্যাঘ্রী যেমন স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া শিশু সন্তানের প্রাণের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করিয়া সুখ লাভ করে, মানুষও তখন কেবল আপন শিশুর জন্য নহে, আপন পিতা বা ভ্রাতা বা বান্ধবের জন্য নহে, দূরস্থিত অপরিচিত মনুষ্যের হিতের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিবে। পরই তখন আপন হইবে, আত্মপরে তখন বিভেদ থাকিবে না। সন্তান পিতামাতার অঙ্গীভূত, ফল যেমন বৃক্ষের অঙ্গীভূত। সন্তান পিতা-মাতার পক্ষে পর নহে, শাখাও যেমন বৃক্ষের অনাত্মীয় নহে। মনুষ্য-সমাজে ছোট বড় যে যেখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সকলেই এক প্রকাণ্ড মানব-জাতিরূপ মহা অশ্বত্থের শাখাভূত অঙ্গ মাত্র। আপন পর কোনও বিভেদ নাই। পরার্থে ও স্বার্থে বিভেদ নাই। স্বার্থ পরার্থের অনুকূল, পরার্থ স্বার্থকে জাগ্রত করে। স্বার্থান্বেষণে সুখ; পরার্থান্বেষণে কেনই বা সুখ না হইবে?

যাহাতে সমাজের মঙ্গল, তাহাই ধর্ম্ম; তাহারই অনুষ্ঠানে মনুষ্য বাধ্য। তাহারই অনুষ্ঠানে মনুষ্যের স্বাভাবিক সুস্থ সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উপদেশ দেয়। সমাজের মঙ্গল কোন্ কাজে? কে বলিয়া দিবে কোন্ কাজে? এখানে মনুষ্যের বিচারশক্তির উপর বিশ্বাস নাই। ক্ষতি-লাভ-গণনা সহজ কাজ নহে; সামাজিক গণিতশাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করিতে এখনও অনেক সময় আবশ্যক। সমাজের মঙ্গলে ধর্ম্ম; এবং সমাজের মঙ্গলের অর্থ greatest

good of the greatest number, অধিক লোকের অধিক হিত। ইউটিলিটি-তত্ত্ব এই অর্থে ঠিক। কিন্তু কোন্ কার্য্যে অধিক লোকের অধিক হিত, কে গণনা করিয়া নিঃসংশয়ে অবধারণ করিবে? বিচারশক্তির উপর বিশ্বাস করিও না; বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করিও না। সুস্থ সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, মনুষ্য যাহা স্বভাবের নিকট পাইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর কর; সে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে। তাহার নির্দ্দেশে অন্তঃশরীর স্বাস্থ্য লাভ করিবে; জীবন বল লাভ করিবে। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, প্রকৃতি তোমার প্রতি নিষ্ঠুর; কিন্তু তিনি তোমার যশঃশরীরে দয়ালু। প্রকৃতি তোমার যশঃশরীর রক্ষা করিবেন। তুমি তাঁহার আদেশ পালন কর।

রাজা দিলীপ তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছিলেন; ইউটিলিটি-তত্ত্বে নির্ভর করিয়া ক্ষতি-লাভ-গণনায় তিনি সাহসী হয়েন নাই। মায়াসিংহের নিকট তিনি বিচারমূঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু মনুষ্যের সমাজ-জীবন যত দিন অভিব্যক্তির অভিমুখ, তত দিন সুস্থ সবল মানবাত্মা এইরূপ বিচারমূঢ়তা প্রদর্শন করিতে লজ্জিত হইবে না।

আচার

মনুষ্য-সমাজের, বিশেষতঃ ভদ্রসমাজের ও সভ্যসমাজের নিয়ম অতি বিচিত্র; এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কোন কাজ করিবার উপায় নাই। যে কাজে ইচ্ছা নাই, তাহা করিতে হইবে; আর যাহাতে ইচ্ছা আছে, তাহার সম্পাদন নিন্দনীয় হইবে। বিবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বন্ধনে আমাদিগকে সর্ব্বদা আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। এই সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সামাজিক বন্ধনের সাধারণ নাম আচার। বাঙ্গলা কথা ইংরেজীতে বলিলে আমরা অনেক সময় ভাল বুঝি। আচারের ইংরেজী নাম ceremony.

সভ্যসমাজে এই সকল আচারের সংখ্যা কেহ গণিয়া শেষ করিতে পারে না ও ইহাদের বৈচিত্র্যেরও ইয়ত্তা নাই। জীবনের মধ্যে যে সকল কার্য্য প্রকৃতির অদেশে বা প্রয়োজনের অনুরোধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্পাদন করিতে হয়, আর যে সকল কার্য্য সমাজের আদেশে কৃত্রিম অভাব পূরণের জন্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহাকে পাশাপাশি তুলনা করিলে কোন্ দিক্‌টা গুরুত্বে অধিক হইয়া পড়ে, তাহা বলা খুবই কঠিন।

এই সকল আচারের প্রধান লক্ষণ যুক্তিহীনতা। এ পর্য্যন্ত অনেক পণ্ডিতে সামাজিক আচারের সমর্থন জন্য বিবিধ যুক্তি প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কোন যুক্তিটাই কাজের বলিয়া বোধ হয় না।

মনে কর, ভদ্রসমাজের একটা নিয়ম আছে যে, কোন ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নমস্কার দ্বারা তাঁহাকে অভিবাদন করিতে হইবে। এই স্থলে নমস্কার একটা আচার এবং ইহা দ্বারা বিনয় ও শ্রদ্ধা প্রকাশ হইয়া থাকে। স্বাভাবিক নিয়মবশে অনেক সময়ে মানসিক ভাব বাহ্য ইঙ্গিত বা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। আনন্দে আমাদের হাসি পায়, দুঃখে কান্না আসে, রাগে শরীর কাঁপে, ইত্যাদি উদাহরণ। কিন্তু এই সকল শারীরিক বিকার স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া থাকে। এই সকল শারীরিক বিকৃতির উপর আমাদের ততটা কর্ত্তৃত্ব নাই। বৃক্ষস্থিত ফলের ভূতলে পতনের প্রবৃত্তি যেমন স্বভাবের নিয়মের অনুযায়ী, ঐ ফল সম্মুখস্থ হইলে উহার রসনেন্দ্রিয়কে আর্দ্রীকরণের শক্তিও ঠিক সেইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। সুতরাং উভয় ব্যাপারই বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচ্য ও

বিচার্য্য। কিন্তু নমস্কার প্রথার সহিত বিনয় ও শ্রদ্ধা নামক মানসিক ব্যাপারের ঐরূপ কোনও স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হয় না। কেন না, আমরা সম্পূর্ণ বিসদৃশ উপায়েও শ্রদ্ধাপ্রকাশ ও বিনয়প্রদর্শনে সমর্থ হইয়া থাকি, এবং ইহাও অপ্রসিদ্ধ নহে যে, বাহ্য অনুষ্ঠান দ্বারা প্রকাশিত অতিভক্তি অনেক সময় চোরের লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। ফল কথা, ললাট ও অঙ্গুলিপ্রান্তের মধ্যগত ব্যবধানের সহিত কোনরূপ আন্তরিক মানসিক ভাবের নৈসর্গিক সম্বন্ধ আছে; তাহা কোন বিজ্ঞানই স্বীকার করিতে চাহিবে, এরূপ ভরসা হয় না।

প্রথাটা স্বাভাবিক নহে, এবং উহাতে কোনরূপ লাভ বা উপকারও নাই। কি ইহকালে, কি পরকালে। তবে করাঙ্গুলির স্পর্শে ললাটমধ্যে কোনরূপে ইলেক্‌ট্রিসিটি সঞ্চারের সাহায্য হয় কি না, তাহা জানি না।

আমরা এই সামাজিক প্রথাকে একটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক যুক্তিহীন অর্থশূন্য অনুষ্ঠান বলিয়াই গ্রহণ করিব। ইহাতে লাভ নাই; পরন্তু প্রভূত লোকসান আছে। কলিকালে ইংরেজীনবিসদের নিকট বিনয়প্রকাশের যে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে তত অসুবিধা নাই বটে; কিন্তু সত্যকালের অনুমোদিত দণ্ডবৎ প্রণাম বা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ব্যাপারটা বস্তুতই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত মেরুদণ্ডের পক্ষে স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। আবার সমাজের অবস্থা এমন ভয়ঙ্কর দাঁড়াইয়াছে যে, এই সকল কৃত্রিম অনুষ্ঠানের সম্পাদনে অভ্যাগতের তৃপ্তিসাধন যতটা না হউক, অনুষ্ঠানে সামান্য ত্রুটি অনেক সময় অতৃপ্তি ও অশান্তি, মনোভঙ্গ ও মনোমালিন্যের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এ কথাটা আপাততঃ সামান্য মনে হইলেও ফেলিবার নহে। সংসার-তাপক্লিষ্ট ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে রোগশোক পরিতাপ বন্ধন ব্যসন কিছুরই ত অভাব নাই; তাহার উপর আর কতকগুলি বন্ধনের ও পরিতাপের কারণ সৃষ্টি করিয়া সংসার-যাতনা বাড়াইলে বিশেষ কি লাভ হইল, বুঝি না।

আরও একটা গুরুতর দোষ আছে। শ্রদ্ধা বিনয় প্রীতি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলি মনুষ্য-হৃদয়ের অতি আদরের সম্পত্তি। সংসারমধ্যে বাহ্য ঐশ্বর্য্য ও বাহ্য সম্পদের ততটা অভাব না থাকিতে পারে, কিন্তু এই সকল আন্তরিক সম্পত্তির প্রকৃতই বড় অভাব। এত অভাব যে, ইহাদের অযথা স্থলে ও অপাত্রে বিতরণ নিতান্তই স্পৃহণীয় নহে। আবার ইহসংসারে খাঁটি অপেক্ষা মেকির প্রচলন এত অধিক যে, যে-কোন স্থানে খাঁটি জিনিষের অস্তিত্বের

পরিচয় পাওয়া যায়, সংসারের বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে সেইখানেই যেন লক্ষ্মী আসিয়া অধিষ্ঠান করেন। মনুষ্য-হৃদয়ে পরম আদরের মহার্ঘ সম্পত্তির অপাত্রে বিন্যাস যেমন কষ্টের কারণ, সেইরূপ খাঁটির জায়গায় মেকির প্রচলন আরও যাতনাপ্রদ। আবার অকৃত্রিম জিনিষকে কৃত্রিম অলঙ্কারে শোভিত করিয়া যদি অবিশুদ্ধ কৃত্রিমের পাশে স্থান দিতে হয়, এবং উভয়েরই যদি সমান দরে বিক্রয় হয়, তাহা হইলে বাস্তবিকই নৈরাশ্যে ম্রিয়মাণ হইতে হয়। এই কারণে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, অকৃত্রিম প্রীতি, অকৃত্রিম বিনয় সর্ব্বদা আত্মগোপনই অভ্যাস করে, আপনাকে জনসমাজে জাহির করিতে চাহে না; বাহ্য কৃত্রিম অস্বাভাবিক অনুষ্ঠান সাহায্যে আপনাকে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে ও অবজ্ঞা প্রকাশ করে ও অবমাননা বোধ করে। যক্ষের ধনের মত চিরকাল জনসমাজের চক্ষুর অন্তরালে ভূগর্ভে নিহিত থাকিতেও বরং সম্মত হয়, কিন্তু বিপণি সাজাইয়া লোক ভুলাইতে একান্তই কুণ্ঠিত থাকে।

ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, সংসারে যেখানে যতটা প্রেম, সেখানে ততটাই কৃত্রিম আড়ম্বরের অভাব, এবং যেখানে আড়ম্বরের মাত্রাধিক্য, সেইখানেই চাতুরী ও প্রবঞ্চনা। যাহাকে আমরা ভালবাসি, তাহার নিকট কৃত্রিম অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। যেখানে কৃত্রিম অনুষ্ঠানের আড়ম্বর, সেইখানেই ভালবাসার বিশুদ্ধিও সন্দেহজনক।

আন্তরিক ভাবের সূচনা ও প্রকাশ বাহ্য অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইলেও ফলে তাহার বিপরীত দাঁড়াইয়াছে। ভাব-গোপনের জন্যই যেন আচারের সৃষ্টি ও ব্যবহার প্রচলিত। তোমাকে আমি দুটি চক্ষে দেখিতে পারি না; অথচ সামাজিক নিয়মের খাতিরে পত্র লিখিবার সময় আমি তোমার একান্ত অনুগত ভৃত্য সাজি। তোমার প্রতি আমার বিজাতীয় ঘৃণা ও অবজ্ঞা মনে থাকিলেও আমি তাহা লৌকিক আচারের আবরণমধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া লোকের চোখে ধূলা দিই।

এই একটা সামান্য উদাহরণেই আচারের স্বভাব কতকটা বোঝা গেল। আচার অর্থশূন্য, যুক্তিহীন; ইহাতে উপকার নাই, ক্ষতি আছে; ইহা অকারণে স্বাধীনতা সংহার করে ও বন্ধনস্বরূপ হয়; ইহা অকারণে সংসার-যাতনা বাড়ায়; ইহা সত্যগোপন ও প্রবঞ্চনার জন্য ব্যবহৃত হয়; এবং কৃত্রিম হইয়াও অকৃত্রিমের সমান আসন লইতে স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে।

একটা উদাহরণ দেওয়া গেল, কিন্তু ইচ্ছা করিলে সহস্র উদাহরণের সংগ্রহ চলিতে পারে। সর্ব্বত্রই এক ভাব; আচার মাত্রই বুঝি, অস্বাভাবিক অর্থহীন ও কৃত্রিম, অপিচ সহস্র স্থানে ছলনার ও প্রবঞ্চনার অনুকূল। অথচ মনুষ্য-জীবনে, বিশেষতঃ উন্নত মানব-জীবনে, আচারের শাসন বোধ হয় প্রকৃতির শাসনকেও পরাজয় করে। বরং দুই দিন অনাহারে থাকিতে পারি, অথচ সমাজের কৃত্রিম নিয়ম লঙ্ঘন করিবার যো নাই। এমনই দুরন্ত শাসন। আর সেই শাসনের এলাকাই বা কত বিস্তৃত। মনুষ্য-জীবনে এমন একটা মুহূর্ত্ত খুঁজিয়া পাওয়া ভার, যখন সাধারণের চোখের আড়ালে থাকিয়া নিজের ইচ্ছামত দুটা কাজ করি বা দুটা কথা কহি। সমাজ তাহা দিবে না। এক দণ্ড নির্জ্জনে দাঁড়াইয়া আপনাকে আপনার নিকট খুলিয়া দেখিতে অবকাশ পাই না। অষ্ট প্রহর মুখোস পরিয়া কোটি লোকের সমক্ষে নৃত্য করিতে হইবে। আবার নর্ত্তনের সময় চরণ দুখানি শিকলে বাঁধা থাকিবে। কি সুন্দর বন্দোবস্ত !

আপনার আহার-নিদ্রাদি নিত্যানুষ্ঠেয় ব্যাপার সম্পাদনের সময়ও সমাজের হুকুম বাহির হয়—এমনই করিয়া খাও, এমনই করিয়া শয্যা রচনা কর। অথচ আমাকে অন্নাভাবে উপবাসী থাকিতে হইলে পৃথিবীর দেড় শত কোটি লোকের মধ্যে এক জনেরও মাথাব্যথা হয় না; এবং আমাকে শয়নের জন্য হট্টমন্দির অনুসন্ধান করিতে হইলেও আমার কোন প্রতিবেশীর সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। শুধু শারীরিক ব্যাপারে নহে; আমার জীবনের যে সকল ঘটনা আমার নিকট অত্যন্ত পবিত্র, নিঃসম্পর্ক জনসমাজের সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ নাই, বরং তাহাদের হস্তার্পণে আমার আত্মা ব্যথিত ও ম্রিয়মাণ হয়, সেখানেও জনসমাজ আমাকে ছাড়িবে না। পত্নী পতির জন্য, পুত্র পিতার জন্য, মাতা সন্তানের জন্য শোক করিবে; সমাজ শোক সম্বন্ধে কতকগুলি রেগুলেশন বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রণয়ী আপনার বাঞ্ছিতের সহিত জীবনব্যাপী সম্বন্ধে মিলিত হইবে; সমাজ তখনই চাপরাস ও ইউনিফর্ম লাগাইয়া খাতাপত্র বগলে লইয়া সম্মুখে উপস্থিত। সংসারযাতনায় আকুল হইয়া একবার বিজনে বিধাতাকে ডাকিতে চাহিব; সমাজ অমনই প্রার্থনার ফারম্ পূরণের জন্য কালিকলম লইয়া হাজির। এও কি সহ্য হয় ?

মনুষ্য কাজেই বিদ্রোহী না হইয়া থাকিতে পারে না। জরা-মরণের ন্যায় বিকট সত্য সম্মুখে থাকিতে মিথ্যা বিভীষিকার সৃষ্টি করিতে, প্রকৃতি-বিহিত

বিবিধ শৃঙ্খল বর্ত্তমান থাকিতে অকারণে নূতন শিকল গড়াইতে মনুষ্য সকল সময়ে চাহে না। শাসন দুরন্ত ; কাজেই বিদ্রোহে সাহস আবশ্যক। কিন্তু এই অধম মনুষ্য-সমাজেও এমন এক-একটা মানুষ সময়ে সময়ে জন্মগ্রহণ করে, যাহার মেরুদণ্ড সমাজ-প্রেরিত লৌহমুদ্গরে ভাঙ্গিতে পারে না, যে সমাজের রচিত শৃঙ্খল জোরের সহিত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, কৃত্রিম মুখোস ঘৃণার সহিত নিক্ষেপ করিয়া, স্পর্দ্ধার সহিত নির্ভীকচিত্তে নিরাবরণ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ঋজু পথে চলিতে চাহে। কবির ভাষায় তিনি পুরাতন অচলায়তনের বেড়া ভাঙ্গিয়া মুক্ত হয়েন ও অপর সাধারণকে মুক্তি দেন। আমরা এইরূপ ব্যক্তির অনুকরণে সাহসী হই না ; প্রকাশ্যে বিদ্রূপবাদের ও নিন্দাবাদের দ্বারা তাঁহার পুরোগমনে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়া শার্দ্দুলের পশ্চাদ্বর্ত্তী জম্বুকের বৃত্তি অনুকরণ করি ও অন্তরে ভয়ের সহিত তাঁহাকে সম্মান করিয়া থাকি।

সবই সত্য। আমরা দুর্ব্বল ও ভীরু ও হীনজীবী, অতএব দয়ার যোগ্য। মহৎ ব্যক্তির অনুকরণেও আমরা সর্ব্বদা অসমর্থ। কিন্তু সংসারের অধিকাংশ মনুষ্যই দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের শ্রেণীরই অন্তর্গত ; এবং দুর্ব্বলের পক্ষে কি দুটা কথা খুঁজিয়া বাহির করা একেবারেই অসম্ভব ? আমরা সমাজভয়ে মিথ্যাচারী ও কৃত্রিমাচারী। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এই কৃত্রিমতার পক্ষে দুটা কথা কি বলিতে পারা যায় না ?

উপরে বলিয়াছি যে, সামাজিক প্রথাসমূহ অর্থশূন্য। উদাহরণস্বরূপ দেখান গিয়াছে যে, যে একটা নির্দ্দিষ্ট শারীরিক ইঙ্গিত অভ্যাগতের সম্ভাষণকালে বিনয় প্রকাশের জন্য বর্ত্তমান কালে ব্যবহৃত হয়, সেই ইঙ্গিতের সহিত সেই মানসিক বৃত্তির কোনরূপ নৈসর্গিক সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মস্তক নামাইলেই বিনয় প্রকাশ হইবে, এ কিরূপ বিধান ? উভয়ের মধ্যে যদি কিছু সম্বন্ধ থাকে, তাহা কল্পিত সম্বন্ধ বা আরোপিত সম্বন্ধ। দশে মিলিয়া স্থির করিয়া দিয়াছে, এইরূপ আচরণ এইরূপ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে ; মাথা নোয়াইলেই বিনয়প্রকাশ হইবে। তাই আমরা দশের নির্দ্ধারিত আচার মানিয়া চলি ; দশের কথা না মানিলে সমাজের নির্যাতন ভুগিতে হয়।

কথাটা সত্য বটে, আবার সম্পূর্ণ সত্যও নহে। কেন না, ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া এমন দিন নির্দ্দিষ্ট করিতে পারা যায় না, যে দিন দশ জনে

একত্র পরামর্শ আঁটিয়া এই অপরূপ অস্বাভাবিক প্রথার উদ্ভাবন করিয়াছে। প্রত্যুত ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, মানব-সমাজের অতি প্রাচীন অবস্থায় এই প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তখন ইহা সম্পূর্ণ অর্থশূন্য বা নিষ্প্রয়োজন ছিল না।

দুর্ব্বলের পৃষ্ঠের প্রতি সবলের চরণযুগলের বেগে পতনপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান কালেও না আছে, তাহা নহে; তবে মনুষ্য-সমাজের আদিম অবস্থায় যখন পুলিসের ও আইনের এতটা আঁটাআঁটি ছিল না, তখন এই পতনের দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই ঘটিত। সবলের চরণ দুর্ব্বলের পৃষ্ঠে কিঞ্চিৎ বেগের সহিত প্রযুক্ত হইলে দুর্ব্বলের শরীরের ভারকেন্দ্র আপনা হইতেই ভূতল অন্বেষণে তৎপর হয়, ইহা পদার্থবিজ্ঞানসম্মত প্রাকৃতিক নিয়ম। কাজেই শরীরের ভারকেন্দ্রের অবনতির সহিত দৌর্ব্বল্যের ও অধীনতার স্বাভাবিক সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধকে নিতান্ত অর্থশূন্য বা অনৈসর্গিক বলিতে পারা যায় না। দুর্ব্বল ব্যক্তি সবলের দর্শন মাত্রেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনার ভারকেন্দ্রটাকে নামাইয়া যদি গোড়াতেই অবনতি স্বীকার করিয়া লয়, তাহার এই কার্য্যটা জীবনরক্ষার নিমিত্ত নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয় না। অতএব প্রণিপাত আচরণ এক কালে স্বাভাবিক ও সার্থক ও আবশ্যক ছিল। কালের কুটিল চক্রে সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। একালে দুর্ব্বলের প্রতি এরূপ আচরণ প্রয়োগ করিতে গেলে পাহারাওয়ালা আসিয়া বিসম্বাদী হয়। বলা বাহুল্য, সেকালের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের বর্ত্তমান কালোচিত কৃত্রিম সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নমস্কার।

অতএব স্বীকার্য্য যে, কৃত্রিম সামাজিক প্রথারও একটা ঐতিহাসিক স্বাভাবিক মূল আছে। একালের সমাজতাত্ত্বিকগণ মনুষ্যের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সামাজিক প্রথার মূলে বিবিধ বিচিত্র তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন। এইরূপ পণ্ডিতগণের গবেষণায় আবিষ্কৃত কতিপয় সিদ্ধান্ত বাস্তবিকই লোমহর্ষক। পরস্পর অধরোষ্ঠের সম্মিলন প্রণয়াস্পদের প্রতি অনুরাগ-প্রকাশের প্রধান উপায় বলিয়া সর্ব্বদেশে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু কবিকুল শুনিয়া শিহরিবেন যে, কোন কোন আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকের মতে এই অনুরাগ-প্রকাশের প্রথাটা মনুষ্যের পুরাকালের নরমাংসপ্রিয়তার অর্থাৎ রাক্ষস-ভাবের শেষ নিদর্শন মাত্র। অর্থাৎ একের ফুল্লরক্তবিম্বাধর যখন অপরের ফুল্লরক্ত-

বিম্বাধরে সানুরাগে অর্পিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, ইনি উঁহাকে প্রকারান্তরে বলিতেছেন, আহা, তোমার কাঁচা মাংস না জানি কেমন কোমল ও মিষ্ট, কেবল পুলিসের ভয়ে চিবাইতে পারিতেছি না।

সামাজিক আচারগুলি বর্ত্তমান কালে যতই অর্থশূন্য ও অনাবশ্যক হউক না কেন, এক কালে হয়ত উহারা অর্থযুক্ত ও অত্যাবশ্যক ছিল। তবে একালে সে অর্থও নাই, সে প্রয়োজনও নাই।

বস্তুতঃ মানব-প্রকৃতিতে স্থিতিপ্রবণতা অত্যন্ত প্রবল মাত্রায় বিদ্যমান আছে। মনুষ্য পুরাতনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ; নবীনের যতই প্রলোভন ও যতই আকর্ষণ থাক্, মানুষ পরিচিত পুরাতনকে ত্যাগ করিয়া অপরিচিত নূতনকে গ্রহণ করিতে অত্যন্ত আশঙ্কা করিয়া থাকে। ইহা মানুষের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই ; কিন্তু দুর্ব্বলের জীবনরক্ষার জন্য এইরূপ সাবধানতা নিতান্ত আবশ্যক। অরণ্যমধ্যে সিংহ শার্দ্দূল নির্ভয়ে বিহার করে, কিন্তু দুর্ব্বল মৃগশিশু সর্ব্বদা ত্রস্ত থাকে। প্রকৃতি তাহাকে শার্দ্দূলমুখরোচক কোমল ললিত বপুখানি যে দিন দিয়াছেন, সেই দিনই তাহাকে আত্মরক্ষার জন্য চঞ্চল চরণ ও সচকিত অন্তঃকরণ প্রদান করিয়া ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। মনুষ্য স্বভাবতই দুর্ব্বল। অপরিচিতের সম্মুখীন হইয়া তাহার সহিত সম্বন্ধ পাতিতে সে সহসা সাহসী হয় না। কাজেই সে পরিচিত পুরাতনকেই চিরকাল জড়াইয়া থাকিতে চাহে। সেই জন্য মনুষ্য-প্রকৃতিতে এতটা স্থিতিপ্রবণতা বিদ্যমান ; সেই জন্যই মানুষের নিকট প্রাচীনের এত আদর। মনুষ্যের প্রাচীন ইতিহাস মনুষ্যকে গঠিত করিয়া বর্ত্তমান পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মনুষ্য সেই ইতিহাসের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দেয় মাত্র, স্বয়ং বল প্রকাশপূর্ব্বক স্রোতকে ঠেলিয়া অগ্রগামী হইতে সাহসী হয় না। তাহাকে দুর্ব্বল বল, ক্ষতি নাই ; কেন না, তাহা সত্য কথা। কিন্তু তাহাকে দয়া করিও।

কাজেই আবহমান কাল হইতে যে প্রথা চলিয়া আসিতেছে, বর্ত্তমান কালে তাহার উপযোগিতা আছে কি না, তাহা মানুষে ভাল করিয়া দেখিতে চাহে না ; অথবা অনুপযোগিতা প্রতিপন্ন হইলেও তাহাকে স্থানচ্যুত করিয়া নূতনের আশ্রয় গ্রহণে সর্ব্বদা সাহসী হয় না।

যে সকল পুরাতন অনুষ্ঠান আবহমান কাল হইতে সমাজমধ্যে আচরিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের সহিত সমাজ-শরীরের রক্তমাংসের অস্থিমজ্জার

এরূপ একটা সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া নূতন অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন সুবুদ্ধির কাজ বলিয়া বিবেচিত হয় না। পুরাতন মন্দ হইতে পারে, কিন্তু নূতনের ভিতর কি আছে কে জানে? পুরাতনে অর্থ দেখিতে পাইতেছি না; উপযোগিতা দেখিতে পাইতেছি না। ক্ষতি নাই,— এত কাল ত একরকমে চলিয়া আসিতেছে, এখনও চলিতে দাও।

সামাজিক আচার যুক্তিহীন ও অর্থশূন্য, তাহা স্বীকার করা গেল, এবং দুর্ব্বল মনুষ্য তাহার জীবন রক্ষার অনুরোধে আশঙ্কাবশে সেই পুরাতন আচার ছাড়িতে চায় না, তাহাও স্বীকার করা গেল। কিন্তু তাহা বলিয়া কি কৃত্রিম পদার্থকেও মানুষ কোন কাজেই লাগাইতে পারে না? একটু ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

মনে হইতেছে, হার্বার্ট স্পেনসার এক স্থলে বলিয়াছেন, মানুষের এক কালে যাহা জীবন-মরণের সামগ্রী থাকে, পরবর্ত্তী কালে তাহা খেলার জন্য ব্যবহৃত হয়; যাহা এক কালে আতঙ্কের বিষয় থাকে, পরবর্ত্তী কালে তাহার আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য বিনিয়োগ ঘটে। এক কালে নেপোলিয়নের জীবন্ত মূর্ত্তি ইউরোপবাসীর আতঙ্কজনক ছিল, কিন্তু ভাস্কর ও চিত্রকর মৃত নেপোলিয়নের মূর্ত্তি আপন আপন সুকুমার কলার বিষয় করিয়া ইউরোপবাসীর আনন্দ-বর্দ্ধনে নিযুক্ত আছে। ওয়াটার্লুর যুদ্ধক্ষেত্রে একদা ইউরোপের সভ্যতার নিয়তি পরীক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু সম্প্রতি ওয়াটার্লুর যুদ্ধের চিত্রপট বৈঠকখানার দেওয়াল সাজাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সমাজতত্ত্বের গবেষণাদ্বারা আধুনিক সামাজিক প্রথার ও আচার অনুষ্ঠানের সেকালের পক্ষে সম্যক্ প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কৃত হইতে পারে; এক কালে হয়ত সমাজ রক্ষার জন্য ঐরূপ অনুষ্ঠান নিতান্তই আবশ্যক ছিল, কিন্তু একালে সে আবশ্যকতা নাই। আমার বোধ হয়, আধুনিক কালে তাহাদের প্রধান উপযোগিতা—জীবনের শোভা ও সৌন্দর্য্য ও আনন্দের বর্দ্ধন। একালে তাহা অর্থশূন্য; কিন্তু এই অর্থশূন্যতাতেই উহার আনন্দবর্দ্ধনে ক্ষমতা। একটা মোটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক।

বস্ত্রব্যবহারের সহিত মনুষ্যের স্বাস্থ্যের তেমন নৈসর্গিক সম্বন্ধ নাই, তাহা আণ্ডামানের আদিম অধিবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়। সরলচিত্ত লোকে নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন, আমাদের দেশের দারুণ গ্রীষ্মের সময় এই সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও অর্থশূন্য আচারের কতকটা শৈথিল্য হইলে নিতান্ত

মন্দ হয় না। স্বাস্থ্যের জন্য না হউক, লজ্জা নামক একটা মনোবৃত্তির অনুরোধে এই আচার আমাদিগকে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হয়। কিন্তু এই লজ্জাটাই কি নিতান্ত কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি নহে? এবং এই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বৃত্তির অনুরোধে যে প্রথার প্রচলন ঘটিয়াছে, তাহাও কি একবারে সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও যুক্তিবিবর্জ্জিত নহে? অন্ততঃ খ্রীষ্টানেরা মানিবেন যে, সৃষ্টির দিনে বিধাতা মানব-দম্পতিকে এই লজ্জাবৃত্তি দেন নাই।

কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, নিতান্ত অনাবশ্যক বস্ত্র নিতান্ত আবশ্যক অন্নের সহিত এক শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে; বরং অন্ন বিনা চলে, কিন্তু বস্ত্র বিনা অচল হয়। এই হতভাগ্য অন্নহীন দেশের অধিবাসীদের জঠরজ্বালা চিরদিনই জ্বলিতেছে, অথচ এই যুক্তিহীন আচারের অনুরোধে নিত্যদুর্ভিক্ষপীড়িতের অন্নরাশি বস্ত্রের বিনিময়ে মাঞ্চেষ্টাবেব উদরপোষণে ব্যয়িত হইতেছে। কথাটা নিতান্ত তামাসার নহে।

বস্ত্রব্যবহার-প্রথার ঔচিত্য সম্বন্ধে কোন সমাজসংস্কারক কোনরূপ প্রস্তাব করিবেন কি না জানি না; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, সম্প্রতি এই প্রথা উঠাইবার প্রস্তাব করিলে স্থিতিপ্রবণ মনুষ্য-সমাজে ঘোর কোলাহল উত্থিত হইবে। কেন হইবে? উত্তরে বলিব যে, যে-কারণেই হউক, নিরাবরণ নরদেহ আমাদের সৌন্দর্য্যবুদ্ধির প্রতি নিতান্ত নির্ম্মমভাবে আঘাত দেয়; এবং মনুষ্যের এই সৌন্দর্য্যবোধের খাতিবে যে জঠবজ্বালাকেও পবাজিত হইতে হয়, মনুষ্যত্বের সহিত পশুত্বের এইখানেই বিভেদ। মনুষ্য যদি আপনার মনুষ্যত্ব রাখিতে চায়, তাহা হইলে এই সৌন্দর্য্যবোধকে বিসর্জ্জন দিলে চলিবে না।

জ্ঞানের চক্ষে সুন্দরে ও কুৎসিতে কোন ভেদ নাই; এবং এমন কোন স্বাভাবিক লক্ষণ নাই, যাহা দ্বারা এইটা সুন্দর এবং স্পৃহণীয় ও এইটা কুৎসিত ও পরিত্যাজ্য, বিচারদ্বারা এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কোন একটা জিনিষ সুন্দর, কি কুৎসিত, তাহা সেই জিনিষের স্বভাবের উপর যতটা নির্ভর করে, দর্শকের মানসিক প্রকৃতির উপর তদপেক্ষা অধিক নির্ভর করে। আমি চেষ্টা দ্বারা কুৎসিতকে সুন্দর করিয়া লইতে পারি। রসায়ন-শাস্ত্র এ পর্য্যন্ত লোহাকে সোনায় পরিণত করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু মানব-চিত্ত অবলীলাক্রমে কুৎসিতের কদর্য্যতা দূর করিতে সমর্থ হয়। এই আধ্যাত্মিক রসায়নের প্রয়োগে যে যত পটু, মনুষ্য-পদবীতে সে-ই তত উন্নত।

এইখানেই মনুষ্য ও মনুষ্য-পশুর মধ্যে প্রভেদ। মনুষ্য-জীবনের প্রধান কার্য্যই জগৎকে সুন্দর করিয়া লওয়া। যে শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়ে, তাহার শিল্পচাতুরীর প্রশংসা করি না; এবং যে বৈরাগীর দল জগতের বিরূপতা ও বীভৎসতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে মানব-জাতির শত্রু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিব।

কালিদাস হিমালয়ের সৌন্দর্য্য-বর্ণনা লইয়া তাঁহার মহাকাব্যের আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে যদি যুক্তি দ্বারা এই সৌন্দর্য্য প্রতিপন্ন করিতে হইত, তাহা হইলে তাঁহার মহাকাব্যের অবস্থা শোচনীয় হইত সংশয় নাই। অমুক জিনিষটা আমাকে ভাল লাগিতেছে; তোমার ভাল লাগে না, ইহা তোমার দুর্ভাগ্য, কিন্তু যুক্তিদ্বারা তাহার সৌন্দর্য্য প্রতিপাদন আমার ক্ষমতার অতীত। সৌন্দর্য্য সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র যুক্তিহীন। ভূতত্ত্ববিদের নিকট হিমালয় ভূগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত শতধা বিদীর্ণ ও জীর্ণ পাষাণরাশির কঙ্কাল মাত্র; পৃথিবীর মানদণ্ডরূপে হিমালয়কে ব্যবহার করিতে তাঁহার আপত্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু গোরূপিণী ধরিত্রীর বৎসরূপে হিমালয়কে কল্পনা করিতে তিনি শিহরিয়া উঠিবেন। ইহা তাঁহার দুর্ভাগ্য।

নরদেহকে অনাবশ্যক বসনভূষণে সজ্জিত করিলে তাহার সৌন্দর্য্য বাড়ে; কেন বাড়ে, তাহা যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হয় না।

মনুষ্য-সমাজের যে সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক আচার ও অনুষ্ঠান এক্ষণে সমাজের হিতকল্পে আবশ্যকতারহিত হইয়াও বর্ত্তমান আছে, তাহাদেরও পক্ষে কোন যুক্তির অনুসন্ধানের প্রয়োজন দেখি না। এখন তাহাদের প্রধান কাজ জীবনের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন। মনুষ্যের দুর্ভাগ্য এই যে, সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিতে গেলে অনেক সময়ে কৃত্রিম ছদ্মবেশের ছলনা আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং অলঙ্কারের শোভার সহিত অলঙ্কারের ভার দুর্বহ হইয়া পড়ে। সংসারের বন্ধুর পথে কৃত্রিম ভার ও কৃত্রিম বন্ধন মনুষ্যের গতিকে পদে পদে ঠেকাইয়া দেয়। এই সকল কৃত্রিম বন্ধন সামাজিক মনুষ্যের স্বাধীন গতিকে সময়ে সময়ে এমন ব্যাহত করে যে, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি সমস্ত সমাজ-বিধান চূর্ণ করিয়া মানবিকতাকে নিরাবরণ পাশবিকতায় পরিণত করিতে উৎসুক হইয়া উঠেন।

বাস্তবিক পশুসমাজে যেমন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, মনুষ্য-সমাজে তাহার কিছুই নাই। পশুসমাজের সদস্যগণ কোনরূপ কৃত্রিম

আচারের দাস নহে। এ বিষয়ে তাহাদিগকে ষোল আনা প্রশংসাপত্র দেওয়া যাইতে পারে। লোকাচার ও দেশাচারের যত কিছু খুঁটি-নাটি, যত কিছু বন্ধন, সমস্তই এই মনুষ্য-সমাজেই বর্ত্তমান।

কিন্তু এই সকল খুঁটি-নাটি, এই সকল বন্ধন যতই কষ্টের কারণ হউক না, ঐ শ্রেণীর সমাজতাত্ত্বিকের উপদেশমতে ইহাদিগকে ত্যাগ করিলে একবারে সেই প্রাচীন সত্যযুগ আসিয়া পড়িবে, যখন মানবের আদিম বৃদ্ধপিতামহগণ স্বচ্ছন্দমনে বনস্পতির শাখায় শাখায় লম্ফ প্রদান করিয়া অনুপম হর্ষানুভব করিতেন। কিন্তু হায়, প্রকৃতির যুগব্যাপী চেষ্টার ফলে পুচ্ছদেশবিলম্বী সুদীর্ঘ কর্ম্মেন্দ্রিয়টির সহকারে সেই আদিম হর্ষানুভবও লোপ পাইয়াছে, এবং বর্ত্তমান যুগের বিধানে মানবের স্বভাবদত্ত স্বাধীনতা বিবিধ কৃত্রিম বন্ধন দ্বারা নিয়মিত হইয়াছে।

সম্প্রতি আমরা এই সকল কৃত্রিম আচার পরিত্যাগ করিতে পারি না। অনেক কষ্ট ও অনেক মনোহানি সত্ত্বেও এই কৃত্রিমতাই আমাদের মনুষ্যত্বের ভূষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজ হইতে এই সকল কৃত্রিম আচার উঠাইয়া দিলে মানব-সমাজ একবারে পশুসমাজে পরিণত হইবে। স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইতে পারে, আরাম বৃদ্ধি পাইতে পারে; কিন্তু যাহাতে মনুষ্যত্বের শোভা হয়, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইবে।

আমার বোধ হয়, এই কারণেই সমাজের সর্ব্বত্রই কৃত্রিমতার এত বন্ধন। প্রতিবেশীর সহিত, নিতান্ত অন্তরঙ্গের সহিত, এমন কি, নিজের প্রতি ব্যবহারেও প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক কার্য্য সমাজকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অনুসারে সংযত করিয়া লইতে হয়। নতুবা শোভন হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি আপন আপন রুচি ও ইচ্ছানুসারে আপন কর্ত্তব্য স্থির করিতে চাহে, তাহাতে শৃঙ্খলা থাকে না, শোভা থাকে না, সমস্তই বিপর্য্যস্ত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। যে সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের সম্মতি আবশ্যক, ব্যক্তিগত স্বাধীন প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিলে চলে না। মানব-প্রকৃতির স্থিতিপ্রবণতা বিনায়াসে এই সকল নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেয়। আবহমান কাল হইতে আচরিত প্রথার প্রতি মনুষ্যের স্বাভাবিক ভক্তি মনুষ্যকে কোথায় কোন্ পথে চলিতে হইবে, তাহা দেখাইয়া দেয়।

এই দীর্ঘ সন্দর্ভে পল্লবিত বাক্যের আড়ম্বর দ্বারা আমি কেবল একটা মোটা কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। সে কথাটা সংক্ষেপে বলিলে

তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করিব। সমাজসংস্কারকগণের মধ্যে যাঁহারা ভাবপ্রবণতার একান্ত বশীভূত হইয়া অচলায়তনের বেড়া ভাঙিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া উঠেন, সমাজরক্ষক ব্রাহ্মণের প্রণীত শাস্ত্রের প্রতি তাঁহাদের আক্রমণ কতটা যুক্তিযুক্ত, তাহা এখনও বোধ করি, সুধী জনের বিবেচ্য।

ধর্ম্মের প্রমাণ

জীবন-সংগ্রামের তাড়নায় বিড়াল তপস্বিব্রত গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল; কিন্তু সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, সে এই নিমিত্ত চিরদিন ভণ্ডামির দৃষ্টান্ত-স্বরূপে গৃহীত হইবে।

হিতোপদেশের গলিতনখদন্ত ব্যাঘ্র হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ দ্বারা অনেক গোমানুষভোজনরূপ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু ব্যাঘ্রসমাজের কোন ধর্ম্মসংহিতা হবিষ্যভোজনের ঔচিত্য সম্বন্ধে উপদেশ দেয় নাই।

ঈসপের কথামালায় বঞ্চনাপরতার জন্য জম্বুক পুনঃ পুনঃ নিন্দিত হইয়াছে; কিন্তু বঞ্চনাবৃত্তি নিন্দা বা প্রশংসার বিষয় হইতে পারে, জম্বুক-সমাজমধ্যে বোধ হয়, এই প্রশ্ন লইয়া কোন তর্কই আজি পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই।

পুনশ্চ প্রভুভক্তির জন্য কুক্কুরের সমাধির উপর মনুমেণ্ট পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছে, এইরূপ ইতিহাসে লেখে; কিন্তু চিত্রগুপ্ত তাঁহার পাপ-পুণ্যের খাতায় কোন সারমেয়ের এই প্রভুভক্তি পুণ্যের অঙ্কে জমা করেন নাই।

এক নিশ্বাসে বলা যাইতে পারে, মনুষ্যেতর জীবের জীবনে পাপ-পুণ্যের কোন কথা উঠিতে পারে না। কুকুর অন্নদাতার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও পুণ্যশীল হয় না; ব্যাঘ্র সারাজীবন ধরিয়া জীবহিংসা করিয়াও পাপী হয় না। প্রকৃতি প্রত্যেক ইতর জীবের কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন; কোন পাঠশালায় বা গির্জ্জায় কর্ত্তব্যবিচার শিখিবার জন্য ইতর জীবকে অপেক্ষা করিতে হয় না। সে ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র আপনার কর্ত্তব্যজ্ঞান লইয়া জীবলীলা আরম্ভ করে; তাহার স্বভাব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সে কর্ত্তব্য সম্পাদন ও অকর্ত্তব্য পরিহার করে: এ কাজটা ভাল কি মন্দ, উচিত কি অনুচিত, এরূপ দ্বিধাবোধ বা সংশয় তাহার মনের মধ্যে কখনই উদিত হয় না।

ইতর জীবের চেষ্টা তাহার স্বভাব কর্ত্তৃক নিয়মিত হয়; তাহার স্বভাবের এই অংশের ইংরেজী নাম instinct; বাঙ্গালা নাম সংস্কার। 'সহজাত' বা 'সহজ' এইরূপ একটা বিশেষণ দিলে সংস্কারের অর্থটা আরও পরিষ্কার

হয়। তাহার সংস্কার সহজাত অর্থাৎ জন্মসহকারে লব্ধ; তাহা শিক্ষা দ্বারা উপার্জ্জন করিতে হয় না; প্রকৃতি যেমন তাহাকে হাত-পা, দাঁত, রক্ত-মাংস দিয়াছেন, সেইরূপ কতকগুলি সংস্কার সমেত ভবলীলায় প্রেরণ করিয়াছেন। এক জোড়া শিং ও চারি জোড়া খুর উপার্জ্জন করিতে যেমন বলীবর্দ্দের কোন পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই, ধারাল নখর ও তীক্ষ্ণ দন্তপংক্তি লাভ করিয়া বাঘের যেমন কোনই ব্যক্তিগত বাহাদুরি নাই, সেইরূপ সমুদয় মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া ঘাসের প্রতি অনুরাগের জন্য গরুকে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয় নাই, এবং হরিণ-মাংস ও মেষ-মাংসের উপকারিতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ব্যাঘ্র-শিশুও কোন ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে নাই। আপনার সহজ সংস্কার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বলদ চিরকাল যথানিয়মে ঘাস খাইয়া আসিতেছে ও বাঘ চিরকাল মেষ-মাংসে স্পৃহা দেখাইয়া আসিতেছে। এ পর্য্যন্ত তত্তৎসমাজে কোন রিফর্ম্মার জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের আচার সংশোধনের চেষ্টা করেন নাই।

এই সহজাত সংস্কারের একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, যে ব্যক্তি এই সংস্কারের বশীভূত, তাহার কিছু মাত্র স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য নাই; সে সর্ব্বতোভাবেই এই সংস্কারের অধীন; এই সংস্কারের অধীনভাবে না চলিয়া তাহার উপায়ই নাই; এই সংস্কারের বশে চলা না যাইতে পারে, এরূপ সন্দেহও তাহার মনে কখনও স্থান পায় না। গরুর ঘাস না খাইলে ও রোমন্থন না করিলে উপায় নাই; বাঘের পক্ষে হিংসাপরিত্যাগ ও হবিষ্যভোজন একেবারে অসম্ভব; মৌমাছিকে ফুলের আকর্ষণে উড়িতেই হইবে ও মধু সংগ্রহ করিয়া মৌচাক নির্ম্মাণ করিতেই হইবে; পিপীলিকাকে অজ্ঞাতসারে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেই হইবে; সে হয়ত জানেই না যে, কি উদ্দেশ্যে সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই সকল প্রাণী নিতান্ত অন্ধভাবে আপনাদিগের অজ্ঞাতসারে প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট জীবনপ্রণালীর অনুসরণ করিতেছে। কেন করিতেছে, কি উদ্দেশ্যে করিতেছে, না করিলে কি হইত, এই সকল তত্ত্বকথা তাহাদের মনে উদিত হয় না। প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট পথে তাহারা বিচরণ করে ও বিচরণ করিতে বাধ্য; রেখামাত্রমপি সেই পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার তাহাদের উপায় নাই। এই জন্য বলা হয়, তাহাদের সংস্কার অন্ধ অর্থাৎ বিচারবর্জ্জিত; তাহাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই; এবং তাহাদের জবাবদিহি নাই; তাহাদের চেষ্টা যন্ত্রের মত নিয়মবদ্ধ। কাজেই তাহাদের জীবন-সমালোচনায় পাপ-

পুণ্যের কথা উঠিতে পারে না। পশুজীবনে ধর্ম্মবিজ্ঞান-শাস্ত্রের প্রয়োগ নাই।

হতভাগ্য মনুষ্যের জীবন এইরূপ দায়িত্ববর্জ্জিত যন্ত্রের মত হইলে মনুষ্য-জীবনে ক্লেশের ভার অনেকটা লঘু হইত সন্দেহ নাই। প্রকৃতিদেবী তাঁহার পশু-সন্তানগুলির প্রতি যতটা মমত্ব দেখাইয়াছেন, মনুষ্য-সন্তানগুলির প্রতি ততটা দেখান নাই। আধিব্যাধি, জরামরণ, নৈসর্গিক বিপৎপাত হইতে ক্লেশ প্রভৃতি পশু ও মনুষ্য তুল্যরূপে ভোগ করে; হয়ত পশুজীবনে ঐ সকল অত্যাচারের মাত্রা মনুষ্য-জীবনের অপেক্ষা অনেক অধিক, কিন্তু স্বকৃত কার্য্যের জন্য মনুষ্যের যে জবাবদিহি আছে, পশুর জীবনে তাহার একবারে তুলনা নাই। মানব-জীবন আধ্যাত্মিক ক্লেশের ভারে প্রপীড়িত ও অবসন্ন হইয়া আছে, পশুজীবনে তাহার একবারে তুলনা নাই। প্রকৃতি পশুজীবনের বল্‌গা নিজের হাতে ধরিয়া রাখিয়া তাহাকে নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরাইতেছেন; কিন্তু মনুষ্যকে যথেষ্টপরিমাণে স্বাতন্ত্র্য ও যথেচ্ছভাবে বিচরণের ক্ষমতা দিয়া তাহাকে অত্যন্ত বিপন্ন করিয়াছেন।

মনুষ্য সংস্কারের বশ নহে, এরূপ নহে; জীবনরক্ষার্থ ও সন্তানোৎপাদনার্থ যে সকল প্রবৃত্তির প্রয়োজন, সেগুলি মনুষ্য অন্যান্য জীবের মতই প্রকৃতি হইতে লাভ করিয়াছে; এইগুলি তাহার সংস্কার। মানুষ সংস্কারবশে ক্ষুৎপিপাসার তাড়নায় প্রেরিত হয়; পথ্যাপথ্যবিচার অনেক স্থলে সংস্কারবলেই সম্পাদিত হয়; সংস্কারবলেই মানুষ শত্রুর আক্রমণে ভীত হয়, শত্রুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, বংশরক্ষায় ও অপত্যপালনে প্রবৃত্ত হয়। অপত্যের প্রতি জননীর স্নেহ, যাহা অনেক ইতর জীবের মধ্যেও পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান, তাহাও সংস্কার হইতে উৎপন্ন। জীবনরক্ষা ও বংশরক্ষা বিষয়ে এই সকল সংস্কারের এত প্রয়োজন যে, প্রকৃতি এ বিষয়ে মনুষ্যকে স্বাতন্ত্র্য দিতে সাহস করেন নাই। মৃত্যুর প্রতি যদি স্বাভাবিক ভয় না থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্যজাতি এত দিন সংসারমধ্যে দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা বহিতে সম্মত হইত কি না সন্দেহ; যৌনসঙ্গলিপ্সা যদি স্বাভাবিক সংস্কার হইতে উৎপন্ন ও তীব্রতাবিশিষ্ট না হইত, তাহা হইলে এই ঘোর জীবন-সংগ্রামে মনুষ্য বংশ-বৃদ্ধিতে সম্মত হইত কি না, সন্দেহের বিষয়। কাজেই এই সকল স্থলে মনুষ্যের সহজাত সংস্কারই প্রবল; মনুষ্য এই সকল স্থলে ইতর জীবের সহিত এক প্রকোষ্ঠে দণ্ডায়মান। মনুষ্যের এই সকল ধর্ম্মকে পাশব ধর্ম্ম ও এই

সকল বৃত্তিকে পাশব বৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করা প্রথা দাঁড়াইয়াছে। আহার-নিদ্রা-ভয়াদি কতিপয় জৈব ব্যাপারে পশুতে ও মনুষ্য-পশুতে বিভেদ নাই। এই সকল স্থলে মনুষ্য সংস্কারের অধীন ও প্রবৃত্তির অধীন; তাহার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নাই।

সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নাই, কিন্তু কতকটা আছে, ইহা স্বীকার না করিলে চলে না। ইতর জীবে কোনই স্বাতন্ত্র্য নাই; মনুষ্যে কতকটা আছে এবং তাহাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, এবং তাহাতেই পশুতে ও মনুষ্য-পশুতে বিশেষ। এবং অন্তঃকরণের যে বৃত্তি লইয়া এই বিভেদ, তাহার ইংরেজী নাম Reason; বাঙ্গালায় মাননীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত পরিভাষামত প্রজ্ঞা বলিব। প্রজ্ঞা ও সংস্কারের মধ্যে যথেষ্ট বিভেদ; এমন কি, বিরোধ বর্ত্তমান। প্রজ্ঞা, ভূয়োদর্শন বা অতীত কালের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রজ্ঞার দৃষ্টি ভবিষ্যৎ কালের ভরসার উপর স্থিরভাবে বর্ত্তমান। সংস্কারের সহিত এই অতীতের অভিজ্ঞতার ও ভবিষ্যতের ভরসার সম্পর্ক নাই। সংস্কার সম্পূর্ণভাবে অন্ধ, কিন্তু প্রজ্ঞা পূর্ণমাত্রায় চক্ষুষ্মতী। গরু মাংস পরিত্যাগ করিয়া ঘাসের আটির দিকে চলে ও বাঘ ঘাসের আটি ফেলিয়া গরুর প্রতি দৌড়ায়; উভয়েই প্রকৃতির প্রেরণায় এইরূপ করে; কেহই খাদ্যবিশেষের ইষ্টানিষ্ট বিচার করিতে বসে না। মানুষ প্রকৃতির প্রেরণায় মাংস ও মিষ্টান্ন উভয়ের প্রতি সস্পৃহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিন্তু সময়ক্রমে আবার প্রকৃতির প্রেরণার বিরুদ্ধচারী হইয়া মাংস মিষ্টান্ন উভয়ই পরিহার করিয়া কুইনীন গলাধঃকরণেও সম্মত হয়। কেন না, মানুষের অতীত কালের অভিজ্ঞতা তাহাকে শিখাইয়াছে, পীড়ার অবস্থায় কুইনীনই তাহার উপযোগী, এবং ভবিষ্যতের ভরসা যে, কুইনীনই তাহাকে স্বাস্থ্যলাভে সমর্থ করিবে। অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ের দিকে দৃষ্ট রাখিয়া এইরূপ বিচার করিতে সামর্থ্য দেয় যাহা, তাহাই প্রজ্ঞা। কুইনীন ভোজনের সমকালে মানুষ মনের মধ্যে তর্ক-শাস্ত্রের বিতণ্ডা বাঁধিয়া ফেলে; এবং তর্কশাস্ত্রের ইন্‌ডক্‌শন ও ডিডক্‌শন—আরোহ ও অবরোহ উভয় প্রক্রিয়াই যুগপৎ সমাধান করিয়া মুহূর্ত্তেকের জন্য দার্শনিক পণ্ডিত সাজিয়া উঠে। আরোহ প্রক্রিয়া তাহাকে বলে, কুইনীন বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী; অবরোহ প্রক্রিয়া বলে, তুমিও কুইনীনে ফল পাইবে। তখন প্রজ্ঞা সবলে তিক্ত দ্রব্যের বিরাগরূপ সংস্কারকে পরাভূত করিয়া সেই তিক্তান্নকেই উদরসাৎ করিতে পরামর্শ দেয়।

এরূপ বলিতেছি না যে, ইতর জীবেরা পীড়ার সময় পথ্য ও ঔষধ চিনিয়া লইতে পারে না, অথবা তাহারা সুস্থ ও অসুস্থ সকল অবস্থাতেই একই নিয়মে জীবনযাত্রা চালায়। অনেক পশুর গল্পে জানা যায়, তাহারা আপনাদের পীড়ার সময় ঔষধ চিনিয়া বাহির করে ও অসুস্থ অবস্থায় এমন সকল নিয়ম পালন করে, যাহা সকল ডাক্তারের মাথায় আসে না। কিন্তু পশুর পক্ষে এই সকল শক্তিও স্বাভাবিক ও সহজাত সংস্কার হইতে উৎপন্ন; কাহারও নিকটে এই বিদ্যা তাহাকে অর্জ্জন করিতে হয় নাই; কোন ডাক্তারকে ভিজিট দিতে হয় নাই। অথচ সংস্কারের নির্দ্দেশ একবারে অব্যর্থ ও অভ্রান্ত; সংস্কার ইতর জীবকে যে পথ্য ও ঔষধ দেখাইয়া দেয়, তাহা অমোঘ। মনুষ্য ডাক্তারের ব্যবস্থায় বা নিজের বিদ্যায় যে ঔষধ সেবন করে, অধিকাংশ স্থলে তাহা ব্যারাম বাড়াইয়া দেয়। পশুতে ও মনুষ্যে এইখানে বিভেদ; সংস্কার ও প্রজ্ঞা, উভয়ের মধ্যে এইখানে বিশেষ।

কথাটা শুনিতে যেমনই হউক, সংস্কারে ও প্রজ্ঞায় এই একটা সনাতন বিরোধ। সংস্কার একেবারে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে; তাহার এ-দিক্ ও-দিক্ থাকে না; তাহাতে ভ্রান্তি থাকে না; তাহাতে শিখিবার ও ঠেকিবার কিছুই থাকে না; তাহাতে উন্নতির অবনতির কোন আশা থাকে না। প্রজ্ঞা যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে, তাহা বহু যত্নে ও বহু কষ্টে শিখিতে হয়, শিখিয়াও আবার প্রয়োগকালে পুনঃ পুনঃ ঠেকিতে ও ঠকিতে হয়, এইরূপ ঠেকিয়া শিখিয়া ও পুনঃ পুনঃ ঠকিয়া অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি ও উন্নতি করিতে হয়। সংস্কার কেবল একটা রাস্তা দেখায়, অন্য পথে চলিতে স্বাধীনতা দেয় না; প্রজ্ঞা হাজার দরজা খুলিয়া রাখিয়াছে, সকলগুলিই অবারিত ও নিরর্গল; যে দিকে ইচ্ছা চলিয়া যাও; স্বর্গের বা নরকের মুখে চলিতেছ, তাহা ঠেকিয়া ও ঠকিয়া আবিষ্কার কর।

প্রকৃতি মনুষ্যেতর জীবকে জীবনযাত্রায় স্বাতন্ত্র্য দেন নাই; আহার নিদ্রাদি অত্যাবশ্যক বিষয়ে মনুষ্যেরও সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নাই; কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্যত্র মনুষ্য স্বতন্ত্র। মানুষকে গন্তব্য পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। সংস্কার কোন কথা বলে না। প্রজ্ঞার সাহায্যে পথ খুঁজিতে হয়; কিন্তু প্রজ্ঞাও একবারে নিঃসন্দেহে পথ দেখাইয়া দেয় না। পাঁচটা পথে চলিতেই মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্য থাকে; কিন্তু কোনটায় চলিলে ঠকিতে হয়, কোনটায় চলিলে জিতিতে হয়; এইরূপে অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হয়। প্রজ্ঞাও ক্রমশঃ

পরিস্ফুট হইয়া পুষ্টিলাভ করে। সংস্কার স্থিতিশীল, কনসার্‌বেটিব, চিরকাল তাঁহার এক দশা; প্রজ্ঞা উন্নতিশীল, লিবেরাল, তিনি ক্রমেই সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ ও বিকশিত হইতেছেন। সংস্কার বাদশাহের সংক্ষিপ্ত হুকুম, না মানিলে নিষ্কৃতি নাই; প্রজ্ঞা প্রজাতন্ত্র পার্লেমেণ্টের বিতণ্ডার কচকচি; ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল, সংশোধনসাপেক্ষ, বিরোধসাপেক্ষ, এবং সর্ব্বদা বিরোধে রত।

পশুজীবন মুখ্যতঃ সংস্কার কর্ত্তৃক চালিত; জীবনরক্ষায় নিতান্ত আবশ্যক কতিপয় জৈব ব্যাপার ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যে মনুষ্য-জীবন মুখ্যতঃ প্রজ্ঞা কর্ত্তৃক শাসিত। পশুজীবনে স্বাতন্ত্র্যের অত্যন্ত অভাব; মনুষ্য-জীবনে স্বাতন্ত্র্য যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। পশু যে কাজ করে, তাহার সে কাজ না করিলে উপায় নাই; মনুষ্য অনেক স্থলে যে কাজ করে, তাহার সে কাজ না করিলেও চলিত। পশুর কোন জবাবদিহি নাই; মনুষ্য স্বকৃত কার্য্যের জন্য দায়ী। পশুর সংস্কার সম্পূর্ণ অপ্রতিহত; মনুষ্যের প্রজ্ঞা সংস্কারকে সংযত করিয়া চলিতে পারে। পশু কোন কার্য্যের জন্য নিন্দিত বা প্রশংসিত হয় না; মনুষ্য বহু স্থলে নিন্দিত বা প্রশংসিত হয়। প্রজ্ঞার দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে। ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া প্রজ্ঞা যদি মনুষ্যকে কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করে, অথচ মনুষ্য প্রবৃত্তির প্রেরণায় সেই কাজ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহাকে নিন্দিত হইতে হয়। পশুর পক্ষে শিখিবার বিষয় অধিক কিছু নাই; সে জীবনধারণোপযোগী সমস্ত শিক্ষা জন্মকালেই প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যের জন্মলাভের পর শিক্ষার আরম্ভ হয়; পিতামাতার নিকট হইতে যে স্বাভাবিক সংস্কার পাওয়া যায়, তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে মানুষের চলে না। সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাকে নূতন নূতন জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হয়। সমস্ত বিশ্ব-জগৎই তাহার বিদ্যালয়; জাত মাত্রই সে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে।

পাপ-পুণ্যের কথা পশুজীবনের সমালোচনায় উঠে না; মানব-জীবনের সমালোচনায় উঠে। পশু পাপপুণ্যবর্জ্জিত; মনুষ্যের পক্ষে এ-কাজটা ভাল, ও-কাজটা মন্দ, এ-কাজটা পাপ, ও-কাজটা পুণ্য।

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, গোড়ায় দেখা যায়, প্রজ্ঞা ও সংস্কারের এই বিরোধী ভাব হইতে পাপ-পুণ্যের উৎপত্তি। প্রথম কথা, সংস্কার মানুষকে যে পথে চলিতে বলে, প্রজ্ঞা সময় সময় সে পথ দেখায় না, সে পথে চলিতে

নিষেধ করে। পশুদিগের জীবনে প্রজ্ঞার কার্য্যকারিতা আছে কি না, সহজে উত্তর দেওয়া যায় না। পণ্ডিতগণের মধ্যে এ একটা দুরূহ সমস্যা। অনেকে বলেন, পশুজীবনে প্রজ্ঞার প্রভুত্ব আদৌ নাই, মনুষ্যেতর জীব প্রজ্ঞা-বর্জ্জিত। প্রজ্ঞার শাসন থাকিলে পশুজীবনে কতকটা স্বাতন্ত্র্য থাকিত, এবং কালসহকারে পশুজীবনে উন্নতির সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু পশুজীবনে সে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায় নাই এবং পশুজীবনে উন্নতির পরিচয়ও এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তথাপি পশু মাত্রই একবারে প্রজ্ঞা-বর্জ্জিত, এরূপ স্বীকার নিতান্ত দুঃসাহসের কথা। উন্নত জীবশ্রেণীর মধ্যে অনেকেই এরূপ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেয়, এমন এক-একটা কাজ করিয়া ফেলে, এমন কি, সময়ে সময়ে নূতন বিষয়ে শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার এরূপ পরিচয় দেয় যে, সেখানে প্রজ্ঞার কর্তৃত্ব একবারে নাই, তাহা বলিতে সাহস হয় না। কুকুরের গল্প, বানরের গল্প, হাতীর গল্প ইহার প্রমাণ। যাহাই হউক, প্রজ্ঞার শাসন থাকিলেও সে শাসন এত ক্ষীণ যে, পশুজীবন মুখ্যতঃ সংস্কারাধীন ও স্বাতন্ত্র্যবর্জ্জিত বলিলে বিশেষ কোন দোষ হয় না। সংস্কারই তাহার জীবনের শাসক ও উপদেষ্টা ও শ্রেয়ঃসাধক। মনুষ্যের পক্ষে অন্যবিধ অবস্থা। মনুষ্য-জীবনে প্রজ্ঞা সংস্কারকে দমন করিয়া রাখে, সংস্কারকে পরাভব করিয়া নিজ প্রভুত্ব রাখিবার চেষ্টা করে। সংস্কারগুলিকে যদি পাশব ধর্ম্ম বলা যায়, তাহার বিরোধী ধর্ম্মগুলি, যাহা লইয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এবং পশুতে ও মনুষ্য-পশুতে বিশেষ, সেইগুলিকে মানবধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

এইখানে একটা সমস্যা আসিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই নিয়ম যে, জীবন-রক্ষার পক্ষে ও বংশরক্ষার পক্ষে, ব্যক্তিগত জীবন ও জাতিগত জীবন-রক্ষার পক্ষে যাহা অনুকূল, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে সেই সকল ধর্ম্মই অভিব্যক্ত হয় ও ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে। পশুগণের সংস্কারগুলি সর্ব্বত্রই তাহাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের অনুকূল; কাজেই তাহারা অভিব্যক্ত হইয়াছে। হিংসাবৃত্তি ব্যাঘ্র-জীবনের অনুকূল, তাই ব্যাঘ্র হিংস্রক; বঞ্চনাপরতা জম্বুক-জীবনের অনুকূল, তাই জম্বুক বঞ্চক; ভণ্ডামি মার্জ্জার-জীবনের অনুকূল, তাই বিড়াল সময়ে সময়ে তপস্বী হয়েন। হবিষ্যাশী ব্যাঘ্র বা ঋজুস্বভাব শৃগালের ধরাতলে স্থান নাই। অভিব্যক্তির নিয়ম মনুষ্যমধ্যে ও পশুমধ্যে বিভিন্ন নহে। তবে প্রজ্ঞায় ও সংস্কারে মানব-জীবনে বিরোধ কেন? প্রজ্ঞা

ও সংস্কার উভয়ই যদি জীবনরক্ষার অনুকূল হয়, তবে উভয়ের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা কোথায়? মনুষ্যের সংস্কারগুলি মনুষ্য-জীবনের প্রতিকূল হইলে এত দিন তাহারা লোপ পাইত; আবার প্রজ্ঞা অথবা সংস্কারবিরোধী ধর্ম্মগুলি জীবনের অন্তরায় হইলে তাহারাও অভিব্যক্ত হইতে পারিত না। উভয়ই যদি অনুকূল হয়, তবে উভয়ের মধ্যে বিরোধ কেন?

এই বিরোধের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে একবারে জীবসমূহের নিম্নতম স্তরে যাইতে হয়। জীবন পদার্থটাই একটা সনাতন বিরোধ; জীবনের সংজ্ঞাই একটা চিরন্তন বিরোধ। মানুষই বল, আর পিপীড়াই বল, আর একটা নগণ্য কীটাণুই বল, তাহার সমস্ত জীবনই একটা বিরোধের ও সংগ্রামের ইতিহাস। জীব যে-জগতের মধ্যে বাস করে, সে জগৎ দয়া-মায়াবর্জ্জিত, নিষ্ঠুর, নির্ম্মম। বহিঃস্থ জগৎ সর্ব্বদা জীব মাত্রকেই সংহার করিয়া, আত্মসাৎ করিয়া নির্জ্জীব পদার্থে পরিণত করিতে প্রস্তুত আছে। জল বায়ু, শীতাতপ, পাঁচটা ভূতই একত্র জোট বাঁধিয়া জীবকে নির্জ্জীব পঞ্চত্বে পরিণত করিবার চেষ্টায় আছে। বিশ্ব-জগতের সমস্ত বাহ্য শক্তি জীবের জীবনের অন্তরায়। জীবের আভ্যন্তরীণ শক্তি ক্রমাগত এই বহিঃস্থ শক্তির সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত। জড় চারি দিক্ হইতে জীবকে আক্রমণ করিয়া জড়ে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে; জীব জড়ের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সেই তুমুল সমরে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। পাঁচটা নির্জ্জীব মহাভূত যেমন একযোগে জীবকে পরাভূত করিয়া তাহার জীবত্বলোপে উদ্যত, জীবও তেমনই সেই পাঁচটা মহাভূতের উপর প্রভুত্ব চালাইয়া, তাহাদের নিকট হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আপনার জীবত্ব অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। জল-বায়ু, শীতাতপ, ক্ষিতি-ব্যোম এক দিকে জীবকে সংহার করিতে ব্যস্ত; জীব অন্য দিকে সেই জল-বায়ু, সেই শীতাতপ, সেই ক্ষিতি-ব্যোমকে আপন কাজে লাগাইয়া, তাহাদের নিকট হইতে হাতিয়ার সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের নিকট হইতে বলসঞ্চয় করিয়া, তাহাদিগকে পরাভব করিয়া, আপন অস্তিত্ব স্থির রাখিতেছে। উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম। এই সংগ্রামের বিরাম নাই। যত দিন উভয়ের মধ্যে এই সংগ্রাম, এই অবিশ্রাম বিরোধ, ঠিক তত দিন ধরিয়াই জীবের জীবন। যে দিন এই সংগ্রামের শেষ, এই বিরোধের বিরাম, সে দিন জীবনেরও শেষ দিন, সেই দিন মৃত্যু। অথবা এই অবিরত প্রবর্ত্তমান সংগ্রামের নামান্তরই

জীবন। জড় পদার্থে, ইটে পাথরে, জলে হাওয়ায় এই সংগ্রাম নাই; তাই তাহারা নির্জীব। মনুষ্য হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এই সংগ্রাম বর্ত্তমান, তাই তাহারা সজীব। সংগ্রামের অবসানের নাম মৃত্যু। মৃত্যুর পর জীবদেহে ও জড় দেহে কোন প্রভেদ থাকে না। এই বিরোধের ও সংগ্রামের তীব্রতা যেখানে যত অধিক, জীবনও সেইখানে ততটা অভিব্যক্ত ও পরিণতিপ্রাপ্ত।

জীবনের আরম্ভ এই সংগ্রাম ও বিরোধ লইয়া এবং জীবনের অভিব্যক্তি ও উন্নতি এই সংগ্রামে। জীবপর্য্যায়ে বিবিধ শ্রেণীর উৎপত্তি, বিবিধ বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি এই সংগ্রামের ফলে। জীবের সহিত সমগ্র জড় জগতের সংগ্রাম, এবং একটু উপরে উঠিলেই জীবের সহিত অবশিষ্ট জীব-সমূহের সংগ্রাম। প্রত্যেক জীব তাহার বহিঃস্থিত সমগ্র জীবজগৎ ও জড় জগতের সহিত সংগ্রামে নিরত। সমগ্র জগতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত। এই আত্মরক্ষার চেষ্টায় তাহার আভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশ; জীবপদবীতে তাহার উন্নতিলাভ। যে বিকাশ লাভ করিয়া আত্ম-রক্ষায় সমর্থ হয়, সে-ই টিকিয়া যায়; যে টিকিতে পারে না, সে লোপ পায়। কেহ থাকে, কেহ যায়। যাহারা থাকে, তাহারা যোগ্য, সমর্থ, প্রকৃতির স্বহস্তে বাছাই-করা জীব—জীবন-সংগ্রামে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে অভিব্যক্ত জীব।

জীবনের মূলে ও জীবনের আরম্ভে যে বিরোধ, যে বিরোধে জীবনের উন্নতি ও অভিব্যক্তি, সেই বিরোধের পরিচয় জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়ায়, জীবের প্রত্যেক চেষ্টায় প্রকাশ পায়। বিরোধ সনাতন, চিরস্থায়ী; ইহার নিবৃত্তি নাই বা পূর্ণতা নাই; তাই জীবন-প্রণালীটা একটা রফা বন্দোবস্ত। বিরোধী বিবাদী উভয় পক্ষের মধ্যে কেবলই সন্ধি স্থাপনের ও সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা। এই চেষ্টা কিন্তু ক্ষণস্থায়ী চেষ্টা মাত্র। উভয়ে পরস্পরকে হঠাইবার ও ঠকাইবার চেষ্টায় অবস্থিত; যখন আপাততঃ সংগ্রামের বিশ্রাম হয়, তখন বুঝিতে হইবে, বর্ত্তমানে শ্রান্ত হইয়া ভবিষ্যতের জন্য উভয়েই বলসংগ্রহে প্রস্তুত হইতেছে মাত্র।

এরূপ সন্ধিবন্ধনে, এরূপ রফাবন্দোবস্তে কখনই স্থায়ী লাভ হয় না; ভবিষ্যতের ভরসায় বর্ত্তমান কালে কতকটা ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত হইতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যত দিন বিরোধ চলে, তত দিনই জীবন; বিরোধের

অবসানের নামই মৃত্যু। কিন্তু বিরোধের অবসান কখনও ঘটে কি? জীবের মৃত্যু কখনও ঘটে কি? একপুরুষে কিছু দিন ধরিয়া যুদ্ধ চালাইয়া অবসর গ্রহণ করিলে পরপুরুষে যুদ্ধ চালাইতে থাকে। পিতা আপন জীবন ব্যাপিয়া সংগ্রাম চালাইয়া মৃত্যুর ক্রোড়ে শান্তিলাভ করেন; পুত্র নূতন করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করেন। পিতার রক্তমাংস পুত্রের শরীরে বর্ত্তমান; পুত্রের শরীর পিতার শরীরের অংশ মাত্র। পিতা নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া পুত্ররূপে আবির্ভূত হন মাত্র। জরাজীর্ণ ক্লান্ত ক্লিষ্ট কলেবরটা বা আবরণটা পরিত্যাগ করিয়া উদ্যমপূর্ণ নূতন আবরণ আশ্রয় করিয়া সংগ্রামে নিযুক্ত হন মাত্র। ওয়াইসমান দেখাইয়াছেন, জীবের নিম্নতম পর্য্যায়ে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নহে। সে জীব সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, সে জীব স্বভাবতঃ মরে না। কেবল মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড হইয়া রক্তবীজের মত সংখ্যায় বাড়ে মাত্র। সেখানে চিরদিন একই মূর্ত্তি ধরিয়া সংগ্রাম; মূর্ত্ত্যন্তরগ্রহণের অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনের নিয়ম নাই। উচ্চতর পর্য্যায়ে উঠিয়া ব্যক্তিগত মৃত্যু আছে, কিন্তু জাতিগত মৃত্যু নাই। এক ব্যক্তি কিছু দিন ধরিয়া লড়াই চালাইয়া পরাভূত হইয়া অবসন্ন হয় ও তাহার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তাহার নিজ শরীরের একটা অংশ রণস্থলে রাখিয়া যায়; সেই অংশটা নূতন বলে সংগ্রামে নিযুক্ত হয়। এই ব্যাপারের নাম, এই ঘটনার নাম বংশরক্ষা বা সন্তানোৎপাদন; অপত্যের হস্তে কার্য্যভার দিয়া পিতার অবসরগ্রহণ। কিন্তু সেই অপত্য পৃথক্ জীব নহে; পিতারই মূর্ত্ত্যন্তর মাত্র। এই অর্থে মৃত্যু জীবন-সংগ্রামে জীবের পরাভব নহে, নূতন করিয়া জীবন-সংগ্রামে প্রবর্ত্তন মাত্র। ব্যক্তির পক্ষে যেটা ক্ষতি, জাতির পক্ষে তাহা লাভ। উন্নত শ্রেণীর জীব এই মৃত্যুরূপ কৌশল বা উপায় উদ্ভাবন করিয়া বহির্জগতের সহিত বিরোধটা চিরস্থায়ী করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং যখন মৃত্যু উদ্ভাবিত হয় নাই, তখন যে সকল শক্তি সঞ্চিত হয় নাই, মৃত্যু আবিষ্কারের পর হইতে সেই সকল শক্তিসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছে। এককালে ধরাপৃষ্ঠে সামান্য কীটাণু বা তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট জীব অবস্থিত ছিল; আজ ধরাপৃষ্ঠ মনুষ্য পশু পক্ষী সরীসৃপাদি বিবিধ উন্নত শ্রেণীর বিবিধশক্তিশালী জীবজাতিতে পূর্ণ হইয়া শোভান্বিত হইয়াছে। জীবজগতে এই অদ্ভুত অভিব্যক্তির, এই আশ্চর্য্য পরিণতির, এই বিস্ময়কর বিকাশের মূলে মৃত্যু। জীব যদি মৃত্যু স্বীকার না করিত, তাহা হইলে জীবনে এত বৈচিত্র্যের উদ্ভবও ঘটিত না।

ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু একটা ত্যাগস্বীকার। বহির্জগতের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া আপন অস্তিত্বলোপের অঙ্গীকার। কিন্তু এই ত্যাগস্বীকার একটা অস্থায়ী সন্ধি-বন্ধন মাত্র। আমি পরাস্ত হইয়া সমরক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া সরিয়া পড়িলাম মাত্র; কিন্তু যাহাদিগকে রাখিয়া গেলাম, যাহাদের জন্ম দিয়া গেলাম, তাহারা আমা অপেক্ষাও যোগ্যতর; তাহারা বীরের মত লড়াই চালাইবে। জীবের ঝাড় রক্তবীজের ঝাড়; রক্তবীজ মরিয়াও মরে না; তাহার প্রত্যেক শোণিতবিন্দু মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া রণক্ষেত্র হইতে উত্থিত হয়। এক জন যায়, দশ জনকে রাখিয়া যায়; দশ জন যায়, শত জনকে রাখিয়া যায়; শত জনের স্থল সহস্র জনে পূর্ণ হয়। সংগ্রামের ভীষণতা বাড়ে মাত্র; জীবনযুদ্ধ যুগের পর যুগ ধরিয়া ভীষণতর হয়; জীব নূতন নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হয়। সমস্ত জড় জগৎ জীবনকে বিনাশের জন্য চেষ্টা করিতেছে, জীবন লুপ্ত হইতে চায় না; ব্যক্তিজীবন লুপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু জাতীয় জীবন লুপ্ত হইতে চাহে না। ব্যক্তিজীবন জাতীয় জীবনরক্ষার উদ্দেশ্যে চরম ত্যাগ স্বীকারে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ মৃত্যু অঙ্গীকার করে। ব্যক্তির মৃত্যু হয়, কিন্তু জাতি বর্ত্তমান থাকে। ব্যক্তিজীবনের সহিত জাতীয় জীবনের কাজেই বিরোধ; বংশরক্ষার জন্য ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু-অঙ্গীকার; পুত্রের অভ্যুদয়ের জন্য পিতার মৃত্যু-স্বীকার; সুতরাং পিতাপুত্রে বিরোধ।

প্রকৃতিতে জীবনের ব্যাপার বিরোধময়। জীবের সহিত জড়ের মূলগত বিরোধ; অন্নের জন্য জীবের সহিত জীবের বিরোধ। জীবের অন্ন জীব; এক জীবকে খাইয়া অন্য জীব বাঁচে। আত্মরক্ষাই যেখানে এক মাত্র উদ্দেশ্য, মুখ্যতম উদ্দেশ্য, তখন জীবে জীবে প্রীতির সম্ভাবনা কোথায়? ইহারই ফলে মৃত্যুর উৎপত্তি; মৃত্যুর তাৎপর্য্য জগতের সহিত সংগ্রামটা ভাল করিয়া চালাইবার জন্য ব্যক্তির পক্ষে ত্যাগ স্বীকার ও মৃত্যুর অঙ্গীকার এবং পুত্রের উপরে আপনার কার্য্যের ভারার্পণ; ইহার ফলে ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতিগত জীবনে বিরোধ অর্থাৎ পিতাপুত্রেও বিরোধ। বিরোধের ফলে জাতীয় উন্নতি, জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি ও পরিপুষ্টি; জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তির সহিত আবার ব্যক্তিগত জীবনে বৈচিত্র্যবিকাশ, ব্যক্তির শক্তিসঞ্চয় ও উন্নতিলাভ।

জীবনের দুঃখ কি? আধিব্যাধি, জরামরণ। জীবনের আনন্দ কি? জীবনের স্ফূর্ত্তিলাভ; ব্যক্তিগত জীবনের বিকাশ। আধিব্যাধি জরামরণ ব্যক্তিগত জীবনের স্ফূর্ত্তির অন্তরায়, এই জন্য উভয়ের মধ্যে বিরোধ। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, একে অন্যের সহায়, একের অস্তিত্ব অন্যের অস্তিত্বের অনুকূল। আধিব্যাধি, জরামরণ না থাকিলে ব্যক্তিজীবনে স্ফূর্ত্তিলাভ, বিকাশলাভ, আনন্দলাভ ঘটিত না। মৃত্যু না থাকিলে জৈবিক অভিব্যক্তি ঘটিত না। অভিব্যক্তির মুখ্যতম সাধন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। যে ভাল, যে সমর্থ, যে উন্নত, প্রকৃতি তাহাকেই বাছাই করিয়া বজায় রাখেন। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের এক মাত্র অবলম্বন মৃত্যু। যে মন্দ, যে অসমর্থ, যে অবনত, প্রকৃতি তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া সরাইয়া দেন। জীবজগৎ হইতে মৃত্যুকে সরাইয়া দাও; প্রকৃতি নির্ব্বাচন কার্য্যে বিমুখ ও উদাসীন হইবেন। ধরাধামে নূতন নূতন জীবের উদ্ভব ঘটিবে না।

জীবশ্রেণীমধ্যে অহি-নকুলের বিরোধ, মূষিক-মার্জ্জারের বিরোধ, ব্যাঘ্র ও মেষশাবকের বিরোধ নিষ্ঠুর সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অবশ্যম্ভাবী; কেন না, পুরাকালের এই বিরোধ হইতেই অহি ও নকুল, মূষিক ও মার্জ্জার, ব্যাঘ্র ও মেষশাবক, উভয়েরই বর্ত্তমান পরিণতি ও ভবিষ্যতে উন্নতি। বিরোধ লইয়াই জীবন; যেখানে বিরোধ অস্তিত্বহীন, সেখানে জীবন নাই। আশ্চর্য্য হইও না; জলের সহিত বায়ুর কোন বিরোধ নাই, উভয়েই নির্জীব, উভয়েই জড়। জড়ের অপেক্ষা জীবকে আমরা উন্নত বলিয়া থাকি। কিন্তু জীবের জীবত্ব এই বিরোধ লইয়া।

জীবশ্রেণীর উচ্চতম পর্য্যায় মনুষ্যজাতিতে পৌঁছিলে একটা নূতন ধরণের বিরোধের সহিত প্রথম পরিচয় ঘটে; এই বিরোধ সংস্কার ও প্রজ্ঞার মধ্যে বিরোধ। মনুষ্যের সংস্কার মনুষ্যকে এক পথে ঠেলিয়া দেয়; মনুষ্যের প্রজ্ঞা ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অন্য পথে চলিতে বলে। মনুষ্য উভয়ের শাসনে থাকিয়া একটা পন্থা নির্ব্বাচিত করিয়া লয়; হয় ঠকে, নয় জিতে; এবং চরমে প্রজ্ঞার শাসন আরও দৃঢ়ীভূত হইয়া পড়ে। মনুষ্যজীবনের এই অভিনব ব্যাপারটা বুঝিবার পূর্ব্বে মনুষ্যজীবনের সহিত পশুজীবনের একটা প্রধান পার্থক্য বুঝিয়া দেখা আবশ্যক।

সেই পার্থক্য এই যে, মনুষ্য জীব অপিচ সমাজবদ্ধ জীব। মনুষ্য দল বাঁধিয়া থাকে। এই দল বাঁধিয়া থাকার মূল কারণ মনুষ্যের দৌর্ব্বল্য।

জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্য যে সকল মোটা হাতিয়ারের দরকার, মানুষের সে সকল কিছুই নাই; না আছে ধারাল দাঁত, না আছে ধারাল নখ, না আছে গায়ে বল। প্রকৃতি মানুষকে দুইটা শিং পর্য্যন্ত দিতে কৃপণতা করিয়াছেন। গণ্ডারের মত মোটা চামড়াও নাই; হরিণ বা শশকের মত দ্রুতপলায়ন-সমর্থ চরণেরও অভাব; তাহা থাকিলেও পলায়ন দ্বারা আত্মরক্ষার উপায় থাকিত। মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিও তীক্ষ্ণতায় ও কার্য্যপটুতায় অনেক ইতর জীবের নিকট হারি মানে। বস্তুতঃ জীবসমাজে মনুষ্য বড়ই দুর্ব্বল। অপরকে আক্রমণ দূরের কথা, আপনাকে বাঁচানই মানুষের পক্ষে দুষ্কর। তবে মানুষের প্রকাণ্ড মাথার ভিতরে এক রাশি মস্তিষ্ক রহিয়াছে; সেই মস্তিষ্কের ভাঁজের পর্দ্দায় পর্দ্দায় বহু কালের বহু অতীত ঘটনার বিবরণ সাঙ্কেতিক চিহ্নে অঙ্কিত থাকে; এবং প্রয়োজনমত মানুষের অন্তরিন্দ্রিয় সেই ভাঁজগুলা ও পর্দ্দাগুলা উদ্ঘাটিত করিয়া সেই চিহ্নগুলির অর্থ আবিষ্কার করিয়া সেই বিবরণগুলি মানসপটে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়; এবং সেইগুলি বাছিয়া গুছিয়া তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া আপনার ভবিষ্যতের প্রয়োজন সাধনার্থ তাহাদিগকে কাজে লাগাইতে চায়। ইতর জীবের পক্ষে এই শক্তিটার অত্যন্ত অভাব; মনুষ্যের এই শক্তির অদ্যাপি ইয়ত্তা হয় নাই। ইহারই নাম প্রজ্ঞা। অতীত কালের অভিজ্ঞতায় ইহার প্রতিষ্ঠা; ভবিষ্যতের দিকে ইহার দৃষ্টি। কিন্তু দুর্ব্বল শরীর লইয়া কেবল আপন প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়াও চলে না, অপরের প্রজ্ঞার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়; এক জন মানুষের অভিজ্ঞতা অপরের জীবনযাত্রার আনুকূল্যে প্রদত্ত হয়। একের অভিজ্ঞতা অপরের জীবনযাত্রায় আনুকূল্যে প্রদত্ত হয়। একের অভিজ্ঞতা অপরকে জানাইবার জন্য মানুষ একটা বিস্ময়কর কৌশলের উদ্ভাবনে সমর্থ হইয়াছে; তাহার নাম ভাষা। সকলে মিলিয়া একযোগে কয়েকটা ধ্বনির সহিত কয়েকটা ভাবের সাঙ্কেতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লইয়াছে। মনুষ্য দল বাঁধিবার পর ভাষার উদ্ভাবন দ্বারা দল বাঁধিবার সুবিধা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। মানুষ একাএক দুর্ব্বল; কিন্তু এইরূপে দলবদ্ধ ও সমাজবদ্ধ মনুষ্য প্রচণ্ড বলে বলীয়ান। জীবমধ্যে কোন জীবই সমাজবদ্ধ মানুষের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না; মনুষ্য জীবজগতের সার্ব্বভৌম অধীশ্বর।

এইখানে একটা কথা আসিয়া পড়ে। মনুষ্য ভিন্ন অন্য জীবের মধ্যেও সমাজের উদাহরণ আছে। পিঁপীড়া ও মৌমাছির সমাজপ্রণালী তন্মধ্যে বিস্ময়করত্বে প্রধান। পিঁপীড়ার ও মৌমাছির সমাজ পিঁপীড়া-বংশকে ও মৌমাছি-বংশকে জীবনসংগ্রামে রক্ষা করিতেই সৃষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই; এ বিষয়ে মানব-সমাজের সহিত তাহাদের ঐক্য আছে। কিন্তু মৌমাছি-সমাজের ও পিঁপীড়া-সমাজের মেম্বারগণ প্রজ্ঞা কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়েন না। স্বাভাবিক সহজাত সংস্কারই তাঁহাদের সমাজ-বন্ধনের মূল। যে অন্ধ সংস্কার মৌমাছিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মধুপূর্ণ পুষ্পের সমীপে উপস্থিত করায় ও সেই পুষ্প হইতে মধু আহরণ করিয়া আপন চাকের মধ্যে সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্তি দেয়, সেই অন্ধ সংস্কারই তাহাকে দল বাঁধিতে বাধ্য করে, এবং দলবলে জুটিয়া মধুখের মশলায় বিচিত্র চক্র নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত করে। শুনা যায়, মৌমাছি-সমাজে অদ্ভুত রকমের শ্রমবিভাগের বা কর্ম্ম-বিভাগের নিয়ম আছে। তন্মধ্যে কেহ বা রাণী, কেহ বা মিস্ত্রী, কেহ বা মজুর, কেহ বা সৈনিক। বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট এমন শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হয় যে, মনুষ্য-সমাজ তাহার নিকট চিরদিন হারি মানিবে ও লজ্জা পাইবে। সমাজের প্রত্যেক সভ্যের নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে; কেহ মধু আনেন, কেহ চাক বানান, কেহ পাহারা দেন, কেহ শত্রুর গতায়াত পর্য্যবেক্ষণ করেন, কেহ বা কেবল মাত্র সন্তান-প্রসবস্বরূপ বিরাট্ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া মৌমাছি-বংশ রক্ষা করেন। সকলেই আপন আপন কাজ শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করেন; কেহ কাহাকে বাধা দেন না, কেহ কাহারও সঙ্গে বিবাদ করেন না। অথচ এত বড় সমাজ-মধ্যে একটা ইস্কুল নাই, একটা আদালত নাই, একটা উকীল নাই, একটা ধর্ম্মপ্রচারক নাই, একটা রিফর্মার নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত; অথচ কেহই জানে না, কেন সে ব্যস্ত; তাহাকে কাজ করিতে হয়, তাই সে করে; আমাদের যেমন খাইতে হয়, ঘুমাইতে হয়, জন্মিতে হয়, মরিতে হয়, তাহাদেরও সেইরূপ পাহারা দিতে হয়, চাক বানাইতে হয়, সন্তান প্রসব করিতে হয়। আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন সম্পর্ক না রাখিয়া যেমন আমাদের দাড়ি গজায়, দাঁত ভাঙ্গে ও চুল পাকে, তাহাদিগেরও সেইরূপ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কাজের সহিত ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন সম্পর্ক থাকে না। সমস্তই সংস্কারের প্ররোচনায়; কুত্রাপি প্রজ্ঞার শাসন নাই, কুত্রাপি স্বাতন্ত্র্য নাই। মৌমাছি জানে না যে, চাকনির্ম্মাণরূপ

বিস্ময়কর কারিগরির কাজে সে ব্যাপৃত রহিয়াছে, মানুষের মত প্রকাণ্ড জন্তু যাহা দেখিয়া কখন বিস্মিত, কখন লজ্জিত হয়। মৌচাকের এক-একটা কুঠরির কারু-কার্য্য দেখিয়া বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, বড় বড় গণিতবিৎ বিহ্বল হন। সে জানে না যে, তাহার কার্য্যপ্রণালী পাঠশালায়, নীতিকথায় ও পদ্যপাঠে বিশেষ আগ্রহ সহকারে প্রশংসিত হইতেছে। ইস্কুল-মাষ্টারের সাহায্য মাত্র না লইয়া তাহারা এতটা নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু সহস্র মাষ্টার মহোদয় অবিশ্রাম বেত্র চালাইয়া মনুষ্যশিশুকে তাহাদের উদাহরণের অনুবর্ত্তী করিতে আজ পর্য্যন্ত সমর্থ হইলেন না।

মানব-সমাজে ও মৌমাছি-সমাজে এই স্থানেই পার্থক্য। মৌমাছির সমাজে সংস্কারের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রভুত্ব, মনুষ্য-সমাজে প্রজ্ঞার শাসন। মৌমাছি-সমাজে ভুল-ভ্রান্তি নাই, সকলেই বিনা শিক্ষায় ওস্তাদ, সকলেই বিনা পুলিসে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ; মনুষ্য-সমাজে ভুল-ভ্রান্তি পদে পদে; নৈপুণ্য শিখাইবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন; কর্ত্তব্যে প্রবর্ত্তনার জন্য পাদরির দরকার। তথাপি মৌমাছি-সমাজে উন্নতি নাই; ঐ সমাজ চিরদিনই সমান ভাবে চলিতেছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে মৌমাছির যদি কখন উন্নতি ঘটে, তাহা হইলে তাহার চক্রনির্ম্মাণ-নৈপুণ্যেরও উন্নতি হইতে পারিবে, কিন্তু মৌমাছির জ্ঞাতসারে তাহাদের আপন চেষ্টায় বা ইচ্ছায় উন্নতি ঘটিবে না। মনুষ্যের সমাজ উন্নতিশীল; মনুষ্যের নৈপুণ্য ক্রমশই মনুষ্যের জ্ঞাতসারে, মনুষ্যের চেষ্টায় প্রকর্ষ লাভ করিতেছে ও ক্রমে করিবে। এক স্থানে অন্ধ সংস্কার; অন্যত্র চক্ষুষ্মতী প্রজ্ঞা। একে জানে না, সে কি করিতেছে, কেন করিতেছে, না করিলে দোষ কি, ক্ষতি কি। অন্যে জানে, সে কি করিতেছে, কেন করিতেছে, অকরণে ক্ষতি কি। একত্র পূর্ণ অধীনতা; অন্যত্র যথেচ্ছ স্বাতন্ত্র্য।

মনুষ্য তাহার জাতীয় জীবনের প্রত্যূষকাল হইতে, সম্ভবতঃ পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের পূর্ব্ব হইতেই সমাজ বাঁধিয়া বাস করিতেছে, এবং সে জানে যে, সমাজে অবস্থিতিই তাহার পক্ষে জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষার প্রধানতম উপায়। সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিবার তাহার ক্ষমতা আছে; মৌমাছির মত সে এ বিষয়ে অন্ধ সংস্কারের দাস নহে। কিন্তু এইরূপ বিচ্ছিন্নভাবে বাস তাহার জীবনরক্ষার অনুকূল নহে, তাহা সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে। সেই জন্য মনুষ্যের সামাজিকত্ব প্রায় মনুষ্যত্বের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন মনুষ্যকে পূর্ণ মনুষ্য আখ্যা দিতে

দ্বিধাবোধ হয়। মনুষ্যের শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও মানসিক সামর্থ্য হইতে এই সমাজবন্ধনের প্রবৃত্তি। সমাজবন্ধনের উদ্দেশ্য আত্মজীবনরক্ষা ও জাতীয়-জীবনরক্ষা; সমাজবদ্ধ না হইলে মানব-বংশ এত দিন ইতর জীবের আক্রমণে ধরাধাম হইতে বিলুপ্ত হইত। মানুষের পক্ষে এই আর একটা রফা বন্দোবস্ত। সমাজ বাঁধিয়া যেমন কতকটা সুবিধালাভ ঘটে, তেমনই কতকটা ত্যাগস্বীকার করিতেও হয়। প্রকৃতি-বিহিত স্বাতন্ত্র্যকে কতকটা সংযত ও নিয়মিত করিয়া চলিতে হয়।

জীবের জীবনে এই রফা-বন্দোবস্তের উদাহরণ পদে পদে; মনুষ্যের সামাজিক বন্ধন স্বীকার তাহার অন্যতম একটা উদাহরণ মাত্র। সমাজের অধীন হইয়া অবধি মনুষ্য আর আপন ইচ্ছামত স্বতন্ত্রভাবে বিহার ও বিচরণ করিতে পারেন না। যে স্বতন্ত্র বিহার আত্মজীবনের পক্ষে অনুকূল, তাহা অনেক স্থলে সামাজিক জীবনের পক্ষে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই ব্যক্তিগত জীবনের ও সামাজিক জীবনের মধ্যে বিরোধ। এই বিরোধের ফলে মানব-জীবনের একটা ভাগের সহিত আর একটা ভাগের তুমুল যুদ্ধ। মনুষ্যের আপনার মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ বিরোধ এবং এই বিরোধ হইতে পাপ-পুণ্যের উৎপত্তি। মানুষ যদি বাঘ-ভালুকের মত সমাজ না বাঁধিয়া বাস করিত, তাহা হইলে তাহার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে কেহ থাকিত না; তাহার জীবনে পাপ-পুণ্যের বিচার উপস্থিত হইত না। আপন সংস্কার ও প্রজ্ঞা উভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া সে কখনও সংস্কারের বশে, কখনও বা প্রজ্ঞার বশে চালিত হইত; কোন কাজ তাহার জীবনের পক্ষে অনুকূল হইত; কোন কাজ তাহার জীবনের পক্ষে প্রতিকূল হইত। নিজ কর্ম্মের ফল সে স্বয়ং ভোগ করিত; একের কর্ম্মফল অপরকে স্পর্শ করিত না। নিজ কর্ম্মের জন্য অপরের নিকট তাহাকে দায়ী হইতে হইত না। কোন কর্ম্মের জন্য সে নিন্দাভাগী বা প্রশংসাভাগী হইত না। আবার তাহার সমাজতন্ত্র যদি মৌমাছির সমাজতন্ত্রের মত সর্ব্বতোভাবে প্রাকৃতিক সংস্কারের অধীন হইত, নিজ কর্ম্মে যদি তাহার স্বাতন্ত্র্য একেবারে না থাকিত, অন্ধভাবে যদি সে প্রকৃতির নির্দ্দেশ ও প্রকৃতির প্রেরণা অনুসরণে সর্ব্বদা বাধ্য থাকিত, তাহা হইলেও তাহার জীবনে পাপ-পুণ্যের বিচার উঠিত না; এ কাজটা ভাল কাজ বলিয়া কেহ তাহার প্রশংসা করিত না; এ কাজটা মন্দ কাজ বলিয়াও কেহ তাহার নিন্দা করিত না। মনুষ্য-জীবন দুইয়ের বাহির; মনুষ্য

সমাজমধ্যে বাস করে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংযত করিতে বাধ্য হয় আবার মনুষ্যের জীবন সহজাত সংস্কারের সর্ব্বতোভাবে অধীন নহে। ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ-জীবনে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, সে প্রজ্ঞার উপদেশে শিখিতে পারে। তবে প্রজ্ঞা তাহাকে সরলভাবে একটা মাত্র পথ দেখাইয় দেন না। পাঁচটা পথ দেখাইয়া দিয়া কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌ট গ্রাহ্য, আর কোন্‌টা পরিহর্ত্তব্য, তাহার পরীক্ষা দ্বারা ঠেকিয়া শিখিতে বলেন। এই স্থানে মনুষ্য-জীবনে ও ইতর জীবের জীবনে বিভেদ; এই স্থানে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, এইখানেই মানব-জীবনের মাহাত্ম্য ও গৌরব।

উপরে যতগুলা কথা বলা হইল, তাহা সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে অনুবৃত্তি করিলে এইরূপ দাঁড়ায়।

১। ইতর জীবের জীবন মুখ্যতঃ সহজাত সংস্কারের অধীন। ইতর জীব যেখানে সমাজ বাঁধিয়া বাস করে, সেখানেও সংস্কারের সর্ব্বতোমুখ প্রভুত্ব। ইতর জীব প্রাকৃতিক অন্ধশক্তি কর্ত্তৃক শাসিত ও পরিচালিত হয় তাহাদের মধ্যে পাপ-পুণ্যের কথা উঠিতে পারে না।

২। মনুষ্য আহার-নিদ্রাদি কতিপয় বিষয়ে সংস্কারের বশবর্ত্তী; কিন্তু অন্যত্র প্রজ্ঞা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে। মানব-জীবন কোন কোন বিষয়ে প্রাকৃত শক্তির অধীন; কিন্তু অপরত্র মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্য বর্ত্তমান। প্রজ্ঞা যে পাঁচটা পথ দেখাইয়া দেয়, মানুষ ঠেকিয়া শিখিয়া পরীক্ষা করিয়া তাহার কোন একটা নির্ব্বাচন করিয়া লয়। প্রজ্ঞা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পথ অনেক সময়ে সংস্কারনির্দ্দিষ্ট পথের বিরোধী হয়। একটা পথ নির্ব্বাচন করিয়া সেই পথে চলিলে যে ফল লাভ হয়, মনুষ্য সেই ফল পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করে ও তদ্দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে সাবধান হইতে শিক্ষা পায়। প্রজ্ঞা এইরূপে জীবনকে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট ও বলবান্‌ করে।

৩। মনুষ্য আত্মরক্ষার্থ সমাজ বাঁধিয়া বাস করে; এই সমাজবন্ধন তাহার ব্যক্তিগত জীবন ও জাতীয় জীবন, উভয়েরই রক্ষণের জন্য আবশ্যক। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক জীবনে অনেক সময় বিরোধ ঘটে; যাহা একের অনুকূল, তাহা অন্যের প্রতিকূল হয়। সামাজিক জীবনে মনুষ্যকে আপনার স্বাতন্ত্র্য সংযত করিতে হয়। মুখ্যতঃ সামাজিক জীবনের অনুরোধে, গৌণতঃ ব্যক্তিগত জীবনের অনুরোধে এই ত্যাগস্বীকার। এই ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত না হইলে সমাজ তাহাকে আক্রমণ করে,

তাহাকে শাসন করে, তাহাকে নিগ্রহ করিয়া বাধ্য করিতে চেষ্টা পায়। মানুষের কার্য্যের ফলভোগী সে একা নহে, সমগ্র সমাজ তাহার ফলভোগী; সেই জন্য ব্যক্তির শাসনার্থ সমাজের প্রয়াস। আবার ব্যক্তিজীবন সমাজের মধ্যে রক্ষিত হয়; সেই জন্য ব্যক্তিজীবনের উপর সমাজের এতটা আবদার। মানুষের এমন কাজই হয়ত নাই, যাহার ফল কেবল তাহার আপনার উপর দিয়াই যায়, সমাজকে কিছু-না-কিছু তাহার ফলভোগ করিতে হয় না। কাজেই মানুষের প্রত্যেক কাজের উপরেই সমাজের শাসন-বিস্তারে যত্ন; ব্যক্তিজীবনের প্রত্যেক চেষ্টার উপর সমাজের প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা; নিন্দা ও প্রশংসা দ্বারা, দণ্ডবিধান ও পুরস্কার প্রদান দ্বারা, ভয়প্রদর্শন ও প্রলোভন দ্বারা সমাজ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক কার্য্যকেই শাসনে আনিতে চেষ্টা করে। যে সকল কর্ম্ম নিন্দিত ও গর্হিত হয়, সেইগুলা পাপ, যেগুলা প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়, সেইগুলি পুণ্য। সমাজের বাহিরে, সামাজিক জীবনের বাহিরে পাপ-পুণ্যের অস্তিত্ব নাই। সমাজ-জীবনের রক্ষার উদ্দেশ্যেই ব্যক্তিগত কার্য্যের এই শ্রেণীবিভাগ। স্থূলতঃ যাহা সামাজিক জীবনের অনুকূল, তাহার নাম পুণ্য; যাহা সামাজিক জীবনের প্রতিকূল, তাহার নাম পাপ; পাপ-পুণ্যের আবিষ্কর্ত্তা ও নিয়ামক মানব-সমাজরূপী বিরাট্ পুরুষ।

৪। ইতর জীবের ব্যক্তিগত জীবনে, জাতীয় জীবনে বা সামাজিক জীবনে কোন্ কার্য্য অনুকূল, সহজাত সংস্কার তাহা অভ্রান্তভাবে দেখাইয়া দেয়। প্রকৃতি স্বয়ং এই সংস্কারের উৎপত্তির ও বিকাশের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন; সমগ্র জীবনব্যাপার চালনার ভার আপনার হাতে রাখিয়াছেন; ইতর জীবের সমগ্র জীবন যন্ত্রের মত প্রাকৃতিক নিয়মের বশে চলে। মনুষ্য-জীবনে প্রকৃতি এতটা প্রভুত্ব আপন হস্তে রাখেন নাই। জীবনরক্ষার জন্য নিতান্ত আবশ্যক আহার, নিদ্রা, যৌন সম্বন্ধাদি কতিপয় ব্যাপারে প্রভুত্ব আপন হস্তে রাখিয়া মানুষকে প্রজ্ঞাবশে যথেচ্ছভাবে চলিবার ক্ষমতা ও অধিকার দিয়াছেন। ইহাতে মানুষের কতকটা লোকসান; কেন না, এই স্বাধীনতা লাভ করিয়া অনেক জায়গায় ঠকিতে হয় ও ঠেকিয়া শিখিতে হয়; কেন না, প্রজ্ঞা সংস্কারের মত কেবল একটা মাত্র পন্থা নির্দ্দেশ করে না। আবার অনেকটা লাভ; কেন না, এই শিক্ষার ফলে প্রজ্ঞার পুষ্টিলাভ ও তৎসহ মনুষ্য-জীবনে ক্রমিক উন্নতি। ইতর জীবের জীবন স্থিতিশীল, মনুষ্য-জীবন উন্নতিশীল; এবং সেই উন্নতিশীলতা অনেকাংশে আপনার ইচ্ছাধীন ও চেষ্টাসাধ্য।

৫। আত্মরক্ষার জন্য ও বংশরক্ষার জন্য সহজাত সংস্কার মনুষ্যকে এই এই পথে চলিতে বলে ; মনুষ্যের প্রজ্ঞা অতীতের অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া তন্মধ্যে গন্তব্যনির্দ্দেশে সাহায্য করে। অনেক সময় সংস্কার যে পথে চলিতে বলে, প্রজ্ঞা সে পথে চলিতে নিষেধ করে। মনুষ্যের প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বাতন্ত্র্য তাহাকে একটা-না-একটা পথনির্ব্বাচনে অধিকার দিয়া তাহাকে তাহার ফলাফলের ভাগী করে। প্রজ্ঞায় ও সংস্কারে এই একটা বিরোধ মানব-জীবনের অঙ্গীভূত। মানব-জীবনে আর একটা বিরোধ ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক-জীবন মধ্যে। যে কার্য্য একের অনুকূল, তাহা হয়ত অন্যের প্রতিকূল। সংস্কার বা প্রজ্ঞা, অথবা সংস্কার ও প্রজ্ঞা, উভয়ে ব্যক্তিগত জীবনের স্ফূর্ত্তির জন্য যে পথ দেখায়, তাহা কখনও কখনও সামা জীবনের অন্তরায় হয়। তাই সমাজ জোর করিয়া তাহাকে সামাজিক জীবনের অনুকূল পথে, ব্যক্তিজীবনের প্রতিকূল পথে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করে। এই আর একটা বিরোধ। এই বিরোধের ফলে মানব-জীবনে পাপ-পুণ্যের উৎপত্তি। দুইটা বিরোধ লইয়া মনুষ্য-জীবন। মনুষ্য-জীবন কেবল বিরোধময়। পাপে ও পুণ্যে যে সনাতন বিরোধ, এইখানে এইরূপে তাহার উৎপত্তি।

৬। মনুষ্য-জীবনে এই বিরোধের অস্তিত্ব দেখিয়া, পাপ-পুণ্যের চিরন্তন বিরোধ দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কেন না, শুধু মনুষ্য-জীবন কেন, জীবন মাত্রই কেবল বিরোধ। প্রতিকূল শক্তিসমূহের পরস্পর সংগ্রামই জীবনের সংজ্ঞা। এই বিরোধের, এই সংগ্রামের নামান্তরই জীবন। এই বিরোধেই জীবনের পরিপুষ্টি ও অভিব্যক্তি। এই বিরোধেই জীবে ও জড়ে প্রভেদ। মানব-জীবনে এই সনাতন বিরোধ যে নূতন আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাই মানব-জীবনের লক্ষণ, তাহার ফলেই মানব-জীবনের উন্নতি ও পরিণতি। তাহাতেই মানব-জীবনের মাহাত্ম্য ও গৌরব। এই বিরোধের তীব্রতাসহকারে মানব-জীবনের পরিপুষ্টি। পাপের অস্তিত্ব দেখিয়া ভীত হইও না. জগতের বিধাতার ও সৃষ্টিকর্ত্তার উপর. সেই বিধাতা ও সৃষ্টিকর্ত্তা যিনিই হউন, তাঁহার উপর, বৃথা নিন্দাভার অর্পণে প্রয়াস করিও না। আঁধার ও আলোকের সমবায়ে পরিদৃশ্যমান জগৎ ; সেইরূপ পাপ ও পুণ্যের সমবায়ে মানবের জীবন। জগৎ হইতে আঁধার সরাইয়া ফেল, আলোকের শেষ রশ্মি সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া যাইবে ; পরিদৃশ্যমান জগৎ সঙ্গে সঙ্গে বিলোপ পাইবে।

মানব-জীবন হইতে পাপের অস্তিত্ব সরাইয়া ফেল, পুণ্য বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু থাকিবে না। পাপ ও পুণ্যের বিলোপে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার জীবন নাম দেওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু তাহা মানব-জীবন, এই গৌরবময় আখ্যার অধিকারী হইবে না।

পাপ-পুণ্যের উৎপত্তি কিরূপে হইল, কতকটা বোঝা গেল; কিন্তু একটা সমস্যার আলোচনা এখনও আবশ্যক। কোন্ কাজটা পাপ? কোন্ কাজটা পুণ্য? ইহার মীমাংসা করিবে কে? যাঁহারা এই মীমাংসার নিমিত্ত এক কাল্পনিক বিধাতা পুরুষের সৃষ্টি করিতে চাহেন, তাঁহারা এক নিশ্বাসে প্রশ্নটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন মাত্র। তাঁহাদের কৌশল প্রশংসনীয়, কিন্তু ফলপ্রদ নহে। সেই বিধাতা পুরুষ এক দিন অকস্মাৎ বলিয়া দিলেন, এই এই কাজ ভাল, এই এই কাজ মন্দ। সেই দিন সেই শুভ ক্ষণে পাপ-পুণ্যের তপশীল বিধিবদ্ধ হইয়া গেল। কোন সৌভাগ্যশীল মানব কোনরূপে সেই তপশীলটা হস্তগত করিয়া একখানা খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছে। এখন সেই খাতাটা খুলিয়া দেখ; আর কোন চিন্তা থাকিবে না।

একখানা পাকা খাতায় পাপ-পুণ্যের তপশীলটা লিপিবদ্ধ থাকিলে মনুষ্যের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধা হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মানব-সমাজে এইরূপ অনেকগুলি তপশীল বিভিন্ন খাতায় লিপিবদ্ধ দেখা যায়; কোন্‌টা প্রকৃত ও কোন্‌টা জাল, তাহা নির্দ্দেশ করিবার কোন উপায় দেখা যায় না। আপন দলের খাতার অকৃত্রিমতা প্রমাণ করিবার জন্য বিভিন্ন দলমধ্যে ঘোর বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে; এবং বিতণ্ডা ক্রমে তীব্র হইয়া শোণিতপাতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি কোন্ খাতাখানা জাল ও কোন্‌খানা অকৃত্রিম, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অন্য উপায়ের আশ্রয় লইতে হইবে।

পাপ কি? না, যাহা সমাজ-জীবনের প্রতিকূল। পুণ্য কি? না, যাহা সমাজ-জীবনের অনুকূল। ইংরেজী ভাষায় যাহাকে ইউটিলিটি বলে, বাঙ্গালায় যাহাকে হিতবাদ বলা হয়, অনেকটা সেই ভাব আসে বটে, কিন্তু ঠিক সেই ভাবই আসে না। ইউটিলিটির তাৎপর্য্য যদি greatest good of the greatest number হয়, অধিকসংখ্যক লোকের শ্রেয়ঃসাধন মাত্র হয়, তাহা হইলে ইউটিলিটির দ্বারা পাপ-পুণ্যের বিচার সর্ব্বত্র চলিবে না। কেন না, প্রথমতঃ অধিকসংখ্যক লোকের শ্রেয়ঃ সাধনই যে সর্ব্বত্র সামাজিক জীবনের

শ্রেয়:সাধন, তাহা বলা যায় না ; দ্বিতীয়তঃ যাহা বর্ত্তমান কালে শ্রেয়:সাধন, তাহা ভবিষ্যতে হিতকর না হইতেও পারে, এবং সমাজ-জীবনে বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতের হিসাবই অধিক গ্রাহ্য। তৃতীয়তঃ শ্রেয়ঃ শব্দের অর্থ কি, তাহা লইয়াই অনেক বিতণ্ডা চলিতে পারে, উহার সংজ্ঞানির্দ্দেশ অনেক সময় অসম্ভব। সচরাচর পণ্ডিতেরা যাহাকে শ্রেয়ঃ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা শ্রেয়ঃ না হইতেও পারে ; শ্রেয়ঃ শব্দের ব্যবহারেই নানা আপত্তি আসে। যাহাই হউক, ইউটিলিটির কোনরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থ ত্যাগ করিয়া প্রশস্ত অর্থ গ্রহণ করিলে অনেকটা আপত্তি কাটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু মূলের কথা এখনও অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। সমাজ-জীবনের যাহা অনুকূল, তাহাই যেন পুণ্য হইল ; কিন্তু সমাজ-জীবনের অনুকূল কি, তাহা স্থির করিবে কে ? এই কাজটা অনুকূল কি প্রতিকূল, এইরূপ বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করিবে কে ? এই মীমাংসার জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করিতে পারা যায় কি ? মনুষ্যজাতির যুগব্যাপী অভিজ্ঞতা বলিতেছে যে, পারা যায় না। প্রকৃতি মনুষ্যকে এমন কোন সংস্কার দেন নাই, যাহার সাহায্যে এই মীমাংসা অভ্রান্তভাবে চলিতে পারে। ব্যক্তিবিশেষের প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতায় যাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহার ভিত্তি এত সঙ্কীর্ণ, তাহার দূরদৃষ্টি এত অল্পপ্রসার, তাহার নির্দ্দেশ এত অস্পষ্ট ও এত দ্বিধাভাবযুক্ত যে, তাহার উপরও নির্ভর করা চলে না। ফলেন পরিচীয়তে, এই ব্যবস্থার উপর অনেক সময়ে নিরাপদে নির্ভর করা চলে। কোন্ কার্য্যটা সমাজ-জীবনের অনুকূল ? না, যাহা এত কাল পর্য্যন্ত মানব-জীবনের অতীত ইতিহাস ব্যাপিয়া সুফল প্রদান করিয়া আসিয়াছে। মনুষ্য-সমাজ যুগযুগান্তরের শিক্ষালাভে যাহাকে ভাল বলিয়া, শ্রেয়স্কর বলিয়া জানিয়াছে ; যাহা ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার ফল নহে, যাহা সমগ্র মানব-জাতির, সমগ্র মানব-সমাজের কল্পব্যাপিনী শিক্ষায় ও অভিজ্ঞতায় উপার্জ্জিত, তাহার উপর নির্ভর করাই বোধ করি সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপৎ। এই অভিজ্ঞতার নাম শ্রুতি ও স্মৃতি। কোন্ দিন কোন্ ক্ষণে মানব-জাতির এই জ্ঞানলাভ আরব্ধ হইয়াছে, ইতিহাস তাহা জানে না। পুরুষপরম্পরাক্রমে এই পুরাতনী অভিজ্ঞতা সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে মাত্র। পুরুষের স্থান পুরুষান্তরে গ্রহণ করিতেছে। শত কোটি পিতার স্থান শত কোটি পুত্রে গ্রহণ করিতেছে। পূর্ব্বপুরুষের মুখ হইতে পরপুরুষ সেই পুরাতনী বাণী শুনিয়া আসিতেছে ; কিন্তু কবে

কোথায় সেই বাণীর আরম্ভ, তাহা কেহ জানে না। চিরকাল সকলেই শুনিয়া আসিতেছে; প্রথমে কে বলিয়াছিল, তাহা কে জানে? প্রথমে সেই বাণীর কে রচনা করিয়াছিল, তাহা কে জানে? মানবের জাতীয় জীবনের যে দিন আরম্ভ, সেই দিনই বুঝি তাহার আরম্ভ। অথবা তাহারও পূর্ব্ব হইতে সেই বাণী প্রচলিত আছে, সেই কথার সূত্র আরম্ভ হইয়া আছে। মানব-জীবন বিশ্বমধ্যে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয় নাই; সহসা এক দিন ধরাপৃষ্ঠে মনুষ্যত্বের আবির্ভাব হয় নাই। বহু যুগের তপস্যার ফলে, বহু যুগের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে ও যৌন নির্ব্বাচনে ও অপরবিধ নির্ব্বাচনে পুরাকালের অমানুষ অন্ধকার মানুষে পরিণত হইয়াছে। মনুষ্যত্বের আরম্ভ কবে, কেহ বলিতে পারে না; মানবের জাতীয় অভিজ্ঞতারও আরম্ভ কবে, তাহা কেহ জানে না। এই পুরাণ কথার আদি অনুসন্ধান করিতে গেলে অতীতের মহান্ধকারে প্রবেশ করিতে হয়; সেখানে মনুষ্যত্ব অবিকশিত অস্ফুট জীবত্বে বিলীন। জীবত্বেরই বা আদি কোথায়? আদি যদি কোথাও অনুমান করিতে পারা যায়, সেখানে জীবত্ব জড়ত্বে লীন হইয়া রহিয়াছে, উভয়ের মধ্যে বিভেদ দেখা যায় না। জগতের যিনি আদি পুরুষ, যিনি আদি মানব, যিনি আদি জীব, যিনি আদি জড়, তিনিই বুঝি সেই পুরাণ কথার আদি কথক; তদবধি সেই কথা জগতের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। ঐতিহাসিক কালে মানব-সমাজে যাঁহারা নেতা ছিলেন, তাঁহাদের প্রজ্ঞাচক্ষু অতীতের অন্ধকার ভেদ করিতে পারিত; অন্যে যাহা দেখিতে পায় না, তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইতেন; অন্যে যাহা শুনিতে পায় না, তাহা তাঁহারা শুনিতে পাইতেন; প্রজ্ঞাচক্ষুর সাহায্যে তাঁহারা অন্যে যাহা দেখিতে পায় না, তাহা দেখিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাদের নাম ঋষি; তাঁহারা যাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাহার নাম শ্রুতি। তাঁহাদের শিষ্যপরম্পরা, তাঁহাদের পরবর্ত্তী পুরুষপরম্পরা, তাঁহাদের নিকট শুনিয়া যাহা স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার নাম স্মৃতি।

বর্ত্তমান কালে সেই পুরাতনী বাণীর, মানব-জাতির সেই প্রাচীন অভিজ্ঞতার, শ্রুতি ও স্মৃতি যাহার ব্যবস্থাপন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য উদ্‌ঘাটন করিয়া কে দিবে? ব্যক্তিবিশেষের প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করা চলে না; মনুষ্য মাত্র একদেশদর্শী; মনুষ্য মাত্রেই পাশব ধর্ম্ম ও মানবধর্ম্ম, উভয়ের বিরোধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া উদ্‌ভ্রান্ত ও ব্যাকুল। প্রজ্ঞা

মনুষ্যকে এক পথ দেখাইতেছে, সহজাত প্রাকৃতিক সংস্কার তাহাকে অন্য পথে চালাইতেছে। মনুষ্যের জীবনতরী কর্ম্মসাগরে ভাসিতেছে; কোন্ পথে যাইতে হইবে, মানুষ ঠাহর পায় না। তবে মনুষ্যের মধ্যেও আবার ইতরবিশেষ আছে; মনুষ্য-সমাজ একবাক্যে যাঁহাদিগকে কাণ্ডারী বলিয়া নির্দ্দেশ করে, অগত্যা তাঁহাদিগের আশ্রয় লইতে হয়। সাধুসম্মত মার্গ আশ্রয় করিতে হয়। শ্রৌত ও স্মার্ত্ত বাক্যের তাৎপর্য্য যখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না, যখন তাহা হেঁয়ালির মত ঠেকে, তখন মহাজনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সংশয়সমাকুল মানবের নিকট শ্রুতি যখন নানারূপে কথা বলে, স্মৃতি যখন স্পষ্ট উপদেশ দেয় না, ধর্ম্মের তত্ত্ব যখন আঁধার গুহায় নিহিত বলিয়া বোধ হয়, তখন মহাজন-সেবিত মার্গ অবলম্বন করিতে হয়। মহাজনের পন্থাই তখন পন্থা, সাধুসম্মত সদাচার তখন ধর্ম্মের প্রমাণ।

তবে তোমাকে আমাকে কি চিরদিনই পরের হাত ধরিয়াই চলিতে হইবে? শ্রুতির অর্থ যখন বুঝিতে পারি না, স্মৃতি যখন হেঁয়ালিতে কথা কহে, তখন কি তোমার আমার মত প্রজ্ঞাবলহীন ব্যক্তিকে কেবলই সাধুর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হইবে? আমাদের অভ্যন্তরে শক্তি কি কিছুই নাই? আমরা কি কেবল অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিব? আমাদের মেরুদণ্ড কি এতই দুর্ব্বল যে, আমরা অপরের আশ্রয় না পাইলে সংসারের সমাজক্ষেত্রে আপনার চরণদ্বয়ের উপর দাঁড়াইয়া বিচরণ করিতে পারিব না? যখন অন্যের সাহায্যলাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে, তখন কি এই মহাহবে আমাদিগকে নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া দলিত, পীড়িত, পিষ্ট হইতে হইবে? জগতের এই কি বিধান? জীবজগতের উন্নততম পদবীতে অবস্থিত মনুষ্যের পক্ষে কি ব্যবস্থা? প্রকৃতি আমাদিগকে প্রবল সংস্কার ও দুর্ব্বল প্রজ্ঞা দিয়া এই সংসারক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন; আমরা কি তৃণের মত বন্যার স্রোতে ভাসিয়া যাইব? আমরা কি নিজ যত্নে গন্তব্যনির্ণয়ে সমর্থ হইব না? যে ধর্ম্ম-মীমাংসার সহিত আমাদের জীবন-যাত্রার এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই ধর্ম্মমীমাংসায় আমরা স্বয়ং কি একবারে অক্ষম? অন্যে না চিনাইয়া দিলে আমরা ধর্ম্মকে চিনিতে পারিব না; অন্যে না বলিয়া দিলে কি আমরা অধর্ম্মকে পরিহার করিতে পারিব না? মনুষ্যের অবস্থা কি এমনই শোচনীয়?

প্রত্যেক সুস্থ মনুষ্য এই প্রশ্নের উত্তরে বলিবে—না। আমাদের প্রত্যেকের অন্তস্তলে এক জন সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিয়া আমাদের কর্ত্তব্যমার্গের নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন ; শ্রুতি স্মৃতি সদাচার যেখানে উপদেশ দেয় না, অথবা তাহাদের উপদেশ যেখানে আমরা বুঝিতে পারি না, সেখানে তাঁহার সেই নীরব বাণী নিঃশব্দে আমাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিভেদ দেখাইয়া দেয়। সেই নীরব বাণী কাহার ? আমাদের হৃদি স্থলে কোন্ হৃষীকেশ অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন ? কোন্ কর্ণধার সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়া আমাদের জীবনতরীকে পথভ্রষ্ট হইতে দিতেছেন না ? ইংরেজী ভাষায় যাহাকে বলে conscience—বাঙ্গালায় যাহার নাম দিতে পারি সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, ইহাই সেই অন্ত[র্যা]মীর প্রেরণা।

মানবের হৃদি স্থিত সেই অন্তর্যামীর প্রেরণা। অনেকটা সহজাত সংস্কারের মত কাজ করে। মনুষ্য জন্ম মাত্রই এই অন্তর্যামীর অধীনতা আশ্রয় করে। সহজ সংস্কার যেমন কারণ দেখায় না, প্রেরণ করে মাত্র ; এই সহজাত ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিও সেইরূপ কারণ দেখায় না, একবারে বাদশাহের মত হুকুম চালায়। বলে—এই কাজটা ভাল, এই কাজটা মন্দ ; কেন ভাল, কেন মন্দ, তাহার কোন কৈফিয়ত দেয় না ; ইউটিলিটির হিসাব বা অন্য কোন হিসাব দিতে চায় না, কোনরূপ পুরস্কারের প্রলোভন, কোন তিরস্কারের ভয়, কিছুই দেখায় না। একবারে বলিয়া ফেলে, এই পথটা ভাল, এই পথে চল ; এই পথটা মন্দ, এই পথে চলিও না। মনুষ্য যদি মন্দ পথে চলিতে যায়, তখন তাহাকে পশ্চাৎ হইতে টানিয়া ধরে ; মনুষ্য যখন ভাল পথে চলে, তখন নীরব উৎসাহধ্বনি দ্বারা তাহার পুরোগতির বেগ বাড়াইয়া দেয়। এই অদ্ভুত মানবধর্ম্ম, যাহার সহিত পাশব সংস্কারনিচয়ের এই অংশে সাদৃশ্য আছে, অথচ তাহার সহিত পাশব ধর্ম্মের সামান্য মাত্র নাই, মানবেতর পশু যাহাতে পূর্ণ মাত্রায় বঞ্চিত, এই বিশিষ্ট মানবধর্ম্মের বর্ত্তমান বিকাশ কিরূপে হইল, তাহা লইয়া পণ্ডিতেরা চিরকাল কোলাহল করিয়া আসিতেছেন ; সেই কোলাহলে সম্প্রতি প্রবেশে আমার প্রবৃত্তি মাত্র নাই। আমি এই বলিয়াই নিরস্ত হইব যে, মানবের সামাজিক জীবনে ব্যক্তি-সমষ্টির সহিত ব্যক্তি-সমষ্টির, সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়ের, সঙ্ঘের সহিত সঙ্ঘের, বর্ণের সহিত বর্ণের, জাতির সহিত জাতির, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের যে ভীষণ দ্বন্দ্ব মনুষ্যের ইতিহাসের আরম্ভ হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেই ভীষণ

দ্বন্দ্বের পরিণাম-ফলে, সেই ভীষণ দ্বন্দ্বে যোগ্যের জয়ে ও অযোগ্যের পরাজয়ে, এই বিশিষ্ট মানবধর্ম্মের অভিব্যক্তির মূল অনুসন্ধান করিলে কিঞ্চিৎ উত্তর মিলিতে পারে। যে সনাতন বিরোধ জীবের জীবনের মূল স্থলে বর্ত্তমান, যে বিরোধে জীবের অভিব্যক্তি ও জীবনের উন্নতি, যে বিরোধে জীবনের মাহাত্ম্য ও গৌরব, মনুষ্য-সমাজে সেই সনাতন বিরোধের আকারভেদ হইতেই মনুষ্যের এই সহজাত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্ভব কতকটা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার পূর্ণ উত্তর পাইতে হইলে সম্ভবতঃ এই বিশ্ব-ব্যাপারের—এই বিশ্ব-সৃষ্টির মূলতত্ত্ব অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যে বিরোধ, যে ত্যাগ, যে যজ্ঞ, যে মায়া, যে লীলা এই বিশ্ব-ব্যাপারের হেতু, সেই হেতুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সময়ান্তরে এই অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা রহিল।

সে যাহাই হউক, শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মতুষ্টি বা হৃদি স্থিত অন্তর্যামীর পরিতোষ সকল ধর্ম্মের মূল ও প্রমাণ। আর পঞ্চম প্রমাণের কল্পনা বোধ করি অনাবশ্যক।

ধর্ম্মের অনুষ্ঠান

পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয় এবং সকলে মিলিয়া চোরকে পুলিসে দেয়। ইহার অর্থ কতকটা বুঝা যায়। কেন না, চুরি ব্যাপারে এক পক্ষের সম্পূর্ণ লাভ হইলেও অপর পক্ষের সম্পূর্ণ হানি। অতএব চোরের কৃত কর্ম্ম অপর পক্ষের আপত্তিজনক হইবেই, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

আমার আর এক শ্রেণীর কর্ম্ম আছে, তাহাতে কেন যে আমার প্রতিবেশিবর্গের চিত্তবিক্ষোভ উপস্থিত হয় এবং আমার শাসনের জন্য তাঁহাদের একটা বলবতী স্পৃহা জন্মে, তাহা সহজে বুঝা যায় না। মনে কর, আমার প্রতিবেশিবর্গ কতিপয় বিশিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানের পক্ষপাতী এবং এই সকল অনুষ্ঠানের সম্পাদন দ্বারা তাঁহাদের পরকালে এবং ইহকালে নানাবিধ শ্রেয়ঃ সংসাধিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। আমি তাঁহাদের বিশ্বাসের কোনরূপ সমালোচনা করিতে চাহি না এবং তাঁহাদের অনুষ্ঠানেও কোনরূপ বাধা প্রদান করি না। কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস যদি তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে যোগ দিতে আমাকে উৎসাহিত না করে, তাহা হইলে তাঁহারা সকলে মিলিয়া কেন আমাকে নিগৃহীত করিবেন, আমি তাহা বুঝিতে অসমর্থ। ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠানের জন্য যাহা কিছু প্রত্যবায়, তাহা আমারই ঘটিবে; আমার প্রতিবেশীদিগকে তাহার ফলভাগী হইতে হইবে না; এবং তাঁহারা যে সকল শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবেন, আমিই সে সকল শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইব। হানি হইবে আমার এবং আমি সেই হানিস্বীকারে প্রস্তুত আছি; অন্যের তাহাতে মাথাব্যথা ঘটে কেন?

পীনাল কোডে, ধর্ম্মশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে যে সকল মহাপাতকের উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে কোনটাই প্রচলিত ধর্ম্মপদ্ধতির বিরোধাচরণের মত সমাজের চক্ষে নিন্দনীয় নহে। চোর ও ব্যভিচারী রাজশাসনে দণ্ডিত হইলেও সমাজের নিকট তাহার ক্ষমা থাকিতে পারে; কিন্তু প্রচলিত রাজশাসনে ধর্ম্মবিরোধীর দণ্ডের ব্যবস্থা না থাকিলেও সমাজের নিকট তাহার ক্ষমা নাই। সে সমাজের নিকট উৎকট পাপে পাতকী; সমগ্র সমাজের শক্তি তাহাকে উরগক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় ছাঁটিয়া ফেলিবার জন্য ব্যাকুল।

ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বৈদিক সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন রায়ের সময় পর্য্যন্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানগত দ্বেষাদ্বেষির উদাহরণ বহু পরিমাণে পাওয়া যায়। শুনা যায় না-কি, এই ধর্ম্মানুষ্ঠানে মতভেদ লইয়াই প্রাচীন আর্য্য জাতির মধ্যে ঘোর গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সেই গৃহবিবাদের ফলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইরাণী আর্য্য-সমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে কুমারিল ভট্টের প্ররোচনায় বৌদ্ধগণের নির্যাতনও সম্পূর্ণ উপকথা না হইতে পারে।

আমাদের দেশে ধর্ম্মবিদ্বেষের ফল যতই কিছু হউক, খ্রীষ্টান ইউরোপ এ বিষয়ে সকলের উপর বাহবা লইয়াছে। ইউরোপের ইতিহাস শোণিতের এবং আগুনের অক্ষরে এই ধর্ম্মবিদ্বেষের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছে। অথবা এরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে মতভেদের জন্য কত নরহত্যা ঘটিয়াছে, সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া তাহার ধারাবাহিক বিবরণই খ্রীষ্টান ইউরোপের ইতিহাস।

অথচ ইহা সর্ব্বত্রই নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত যে, পাষণ্ডের ও নাস্তিকের জন্য চৌষট্টিটা নরককুণ্ডে গন্ধকের আগুন সর্ব্বদাই জ্বলিতেছে। যে পাষণ্ড ও নাস্তিক, সে জানিয়া শুনিয়াই পরকালের এই ভীষণ শাসনের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে ; তবে কেন তোমরা তাহার প্রতি ইহলোকেই যমদণ্ড প্রয়োগে ব্যস্ত হইতেছ ?

তাহার পক্ষে একটা কথা বলা যাইতে পারে যে, তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের জন্য সে স্বয়ং দায়ী ; সে নিজেরই অনিষ্ট সাধন করিতেছে। ইচ্ছাপূর্ব্বক পরের অনিষ্ট করে নাই ; তাহার অপরাধে অন্যে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে না। মাতাল যত ক্ষণ ঘরে বসিয়া মদ খায়, পথে দাঁড়াইয়া উৎপাত না করে ও পরের ছেলেকে প্রলোভিত না করে, তত ক্ষণ সে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইতে পারে বটে ; কিন্তু অপরে তাহার ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে প্রহার করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে না। এইটুকু স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা জনসমাজ তাহাকে নিঃসঙ্কোচে প্রদান করে। কিন্তু যে ব্যক্তি সমাজ-বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ না দিয়া আপনারই পরকাল বিপন্ন করে, অপরকে সেই পথে প্রলোভিত করে না, সেই নির্ব্বোধ ব্যক্তির প্রতি সমাজ কেন যে এত নিষ্করুণ, তাহার কারণ বুঝা কঠিন। তাহাকে নিন্দা কর, ঘৃণা কর, তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু তাহার পরকালের জন্য তোমার এত দুশ্চিন্তা কেন উপস্থিত হইল, তাহা

বুঝিতে পারি না। তাহাকে তাহার কর্ম্মের ফল পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতে দাও; তোমারই মতে পরকালে তাহার যথোচিত শাস্তি বিহিত রহিয়াছে; ইহকালে তাহার শাসনের জন্য তোমার এত মাথাব্যথার প্রয়োজন কি?

ইংরেজীতে যাহাকে রিলিজন বলে, এই প্রবন্ধে তাহাকেই ধর্ম্ম বা ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। দুঃখের বিষয়, আমাদের ভাষায় রিলিজনের ঠিক প্রতিশব্দ নাই। আমাদের ধর্ম্ম শব্দটিকে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করিতে এই জন্য বাধ্য হইলাম। সমাজের সহিত এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের সম্বন্ধ একটু সূক্ষ্মভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। কোন-না-কোন অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান মাত্রেরই সাধারণ অঙ্গ বুঝিতে হইবে। অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বা শক্তিসমূহে বিশ্বাস ও নিতান্ত অন্ধভাবে তাহার প্রীতিসম্পাদনই প্রচলিত সামাজিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য। কাহারও মতে এক জন সর্ব্বশক্তিমান্ সৃষ্টিকর্ত্তা জগদ্‌যন্ত্র চালাইতেছেন; কাহারও মতে হয়ত এক জন বিধাতা কোনরূপ সিণ্ডিকেটের বা কমিটির সাহায্যে জগৎ শাসন করিতেছেন; আবার কাহারও মতে বা বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র ব্যক্তি গোলেমালে একরূপে জগতের কলটা চালাইতেছেন। কাহারও মতে জগতের কল একরূপ আপনা হইতেই চলিতেছে, সেই দেবগণ বা অপদেবগণ মাঝে হইতে উপস্থিত হইয়া হস্তক্ষেপ করেন মাত্র; কেহ গোল বাধান, কেহ গোল সারেন; কেহ ভাঙ্গেন, অপরকে তাহা মেরামত করিয়া লইতে হয়। দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মত আছে; এবং এক-একটা দেবতত্ত্বের অনুবর্ত্তী এক-একটা নির্দ্দিষ্টরূপ উপাসনাপদ্ধতিও প্রচলিত আছে। দেবতত্ত্ব ও তাহার আনুষঙ্গিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির সমষ্টিকে ধর্ম্মের প্রাণ, এবং উপাসনা-পদ্ধতি ও তদানুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলিকে ধর্ম্মের শরীর বলা যাইতে পারে। সমাজের মধ্যে কতিপয় বাছাই লোকে ধর্ম্মের প্রাণ অর্থাৎ তাহার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাগ লইয়া আলোচনা করে; ইতর সাধারণে তাহা শুনে এবং বুঝিয়া বা না-বুঝিয়া বিশ্বাস করিয়া চলে। কিন্তু ধর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলি পালন করিতে ইতর-ভদ্র ও পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই সমান ভাবে বাধ্য। এই অনুষ্ঠান কে কতখানি পালন করিয়া চলে, তাহার দ্বারাই সাধারণতঃ প্রচলিত ধর্ম্মে আস্থার মাত্রা পরিমিত হয়। তেত্রিশ কোটিতে তোমার আন্তরিক শ্রদ্ধা থাক্ আর নাই থাক্, পথপার্শ্বে সিন্দুরচিহ্নিত শিলাখণ্ড দেখিলেই মাথা নোয়াইতে ভুলিও না;

তাহার উপর মাল্য-তিলক ও নামাবলির ব্যবহারে কার্পণ্যহীন হইতে পারিলেই সমাজমধ্যে তোমার যশের আর ইয়ত্তা থাকিবে না ; তোমার অন্তরের ভিতরে কোথায় কি আছে, অনুসন্ধান করিয়া কেহ তোমার শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইবে না। আর তোমার অন্তরে গভীর ভক্তি ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা থাকিলেও যদি প্রচলিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সাধনে কোন ত্রুটি ঘটে, তাহা হইলে পরকালে ধর্ম্মরাজ তোমাকে ছাড়িয়া দিতেও পারেন ; কিন্তু ইহকালে তোমার নিস্তারের কোন আশাই বর্ত্তমান নাই।

এমন কেন হয় ? খুঁজিলে কি ইহার উত্তর মিলে না ? ব্যক্তিবিশেষকে ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র স্বাধীনতা দিতে সমাজ এত কাতর কেন ? ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রচলিত পদ্ধতির লঙ্ঘন সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে সমাজদ্রোহেরই প্রকারভেদ বলিয়া গৃহীত হয়, ইহার কারণ কি ? চোরের ও হত্যাকারীর ক্ষমা আছে ; স্বধর্ম্মত্যাগীর ক্ষমা নাই কি জন্য ?

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইংরেজী রিলিজন অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিতে এই প্রবন্ধে পুনঃ পুনঃ বাধ্য হইতেছি। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্ম শব্দে মনুষ্যের কর্ত্তব্যসমষ্টিকে বুঝায়। ইংরেজী রিলিজন শব্দের অর্থ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। ইংরেজীতে 'মরালিটি' বলিয়া আর একটা শব্দ আছে, সে শব্দটাও আমাদের ধর্ম্মের ভিতরে আসিয়া পড়ে। স্থূলতঃ এই বলা যাইতে পারে যে, অতিপ্রাকৃতের সহিত মানুষের কারবার লইয়া রিলিজন এবং মানুষের সহিত কারবার লইয়া মরালিটি। মানুষের ইতিহাসে প্রাকৃতে ও অতিপ্রাকৃতে বহু স্থলে মেশামিশি হইয়া গিয়া রিলিজন ও মরালিটির একটা সম্পর্ক জন্মিয়া গিয়াছে। উহাদিগকে স্বতন্ত্র ভাবে স্বতন্ত্র অর্থে প্রয়োগ করিলে অনেক কূট বিতণ্ডার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় রিলিজন এবং মরালিটির জন্য পৃথক্ শব্দের ব্যবহার নাই। অগত্যা আমরা রিলিজন অর্থে ধর্ম্ম ও মরালিটি অর্থে নীতি শব্দ এই প্রবন্ধে প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলাম।

ধর্ম্মের অর্থাৎ রিলিজনের আবশ্যকতা লইয়া বহু কাল হইতে দুইটা দলে ঘোর বিসংবাদ চলিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। নীতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে এরূপ কোন বিসংবাদ নাই। নীতি না থাকিলে সমাজের স্থিতি ও গতি একেবারে অসম্ভব হইত, ইহা একরকম সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু ধর্ম্মের সম্বন্ধে এইরূপ একমত দেখা যায় না। এক দল ধর্ম্মকেই মনুষ্য-জাতির

প্রধানতম সম্পত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং ধর্ম্ম ব্যতীত মনুষ্যত্বের কোন গৌরব নাই, এইরূপ বলিয়া থাকেন। ধর্ম্ম হইতেই নীতির উৎপত্তি ; যেখানে ধর্ম্ম নাই, সেখানে নীতি ভিত্তিহীন, এইরূপ ইঁহাদের বিশ্বাস। অপর এক দল আছেন, তাঁহারা অতিপ্রাকৃতে শ্রদ্ধাহীন, সুতরাং ধর্ম্ম তাঁহাদের নিকট অর্থশূন্য। স্থানবিশেষে ধর্ম্ম নীতির সাহায্য করিয়া মানুষের উপকার করিয়া থাকিতে পারে ; কিন্তু সাধারণতঃ ধর্ম্ম হইতে মনুষ্যের কোন বিশেষ উপকার হয় নাই বা হইবার সম্ভাবনা নাই। এমন কি, মানুষের ইতিবৃত্তের আরম্ভ হইতে আজি পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস জ্ঞানের এবং সন্নীতির প্রবল অন্তরায় স্বরূপে, মনুষ্য-জাতির শত্রুস্বরূপে দণ্ডায়মান আছে। আর ধর্ম্মের যে সকল অনুষ্ঠান, দেবতাপ্রসাদনার্থ যে সকল কৌশল বিভিন্ন দেশে অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাদের মূলে যুক্তিও নাই, নীতিও নাই। বালকের চপলতা, বাতুলের নির্ব্বুদ্ধিতা ও কাপুরুষের ভীরুতা হইতে তাহাদের উদ্ভব। যত শীঘ্র তাহারা লোপ পায়, মনুষ্যের পক্ষে ততই কল্যাণ।

এক দিক্ হইতে দৃষ্টিপাত করিলে ধর্ম্ম অনেক স্থলে জ্ঞানের অন্তরায় ও নীতির অন্তরায় স্বরূপে দণ্ডায়মান হইয়া মনুষ্যের উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট বিঘ্ন সাধন করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না ; কিন্তু তথাপি কত সহস্র বৎসর ধরিয়া মানব-সভ্যতার প্রভাতাগম অবধি বিংশ শতাব্দীর উন্নতির কোলাহল মধ্যেও সহস্র দেবমন্দির ও গির্জাঘর ও মসজিদের উন্নত চূড়ার নিম্ন দেশে কোটি কোটি নরনারী হৃদয়ের আন্তরিক ব্যাকুলতার ও শ্রদ্ধার সহিত অতিপ্রাকৃতের উদ্দেশে যে সকল অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া আসিতেছে, তাহার উদ্দেশ্যের অপলাপ করিলে ঐতিহাসিক সত্যের নিকট অপরাধী হইতে হয়। মানবেতিহাসের বিস্তীর্ণ কাহিনী হইতে তাড়িত যন্ত্র ও বাষ্পীয় যান, আরিষ্টটল ও নিউটনকে বর্জ্জন করা যাইতে পারে ; কিন্তু এই মন্দির ও মসজিদগুলির বিবরণ বর্জ্জন করিলে ইতিহাস জীর্ণ-শীর্ণ ও বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে। ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূলে যুক্তি থাক্ আর নাই থাক্, ইহার মত সত্য ঘটনা মনুষ্যের ইতিহাসে অস্তিত্বহীন।

মনুষ্যের ইতিহাসে বোধ হয় এমন দিন ছিল, যখন নীতির শাসনের উদ্ভব হয় নাই, যখন রাজশাসনের স্ফূর্ত্তি ছিল না। ধর্ম্মানুষ্ঠানই তখন মনুষ্য-সমাজকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। এখনও পৃথিবীতে যে সকল অসভ্য সমাজ বর্ত্তমান আছে, তাহাদের পর্য্যালোচনা হইতে এইরূপ অনুমানই সঙ্গত বোধ হয়।

মনুষ্যেতর জীব সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ; তাহাদের মধ্যে নৈতিক শাসন ও ধর্ম্মশাসন ও রাজশাসন, লোকাচার ও দেশাচার, সকলই অস্তিত্বহীন। জীবন-সংগ্রামে তাহারা আপন আপন বুদ্ধি ও ক্ষমতা লইয়া স্বতন্ত্রভাবে উন্মুক্ত উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত নিরত আছে। প্রকৃতির নির্ব্বাচনে সেখানে সবলের ও সমর্থেরই জয়।

মনুষ্য-নামধেয় জীব ব্যাঘ্রের দংষ্ট্রা ও সর্পের হলাহল লইয়া সংসারে অবতীর্ণ হয় নাই। অথচ তাহার দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় ও ভঙ্গুর শরীর লইয়া বলবত্তর ইতর জীবগণের সহিত জীবন-সমরে সে প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিল।

অথচ সে জীবজগতে অবিসংবাদিত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; কতকটা তাহার বুদ্ধির বলে, কতকটা তাহার দল বাঁধিয়া আত্মরক্ষা করিবার সামর্থ্যবশে।

এইরূপে মনুষ্যের সমাজের উৎপত্তি হয়। ইতর বলবত্তর জীবের সহিত সংগ্রামে জয়লাভের জন্য মনুষ্যকে সমাজ বাঁধিতে হইয়াছিল।

মনুষ্যকে সমাজ বাঁধিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল; ইতর জীব তাহাতে তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু সমাজমধ্যেও মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের সমর তখনও চলিয়াছিল; অদ্যাপি ক্ষান্ত হয় নাই।

মনুষ্যের আদিম অবস্থায় সিংহ ভল্লুক ও বৃকের সহিত, ম্যামথ ও মাষ্টোডনের সহিত তাহাকে যেমন নিয়ত সংগ্রাম করিতে হইত, মনুষ্যের প্রাথমিক সমাজের অভ্যন্তরেও মানুষের সহিত মানুষের জীবন-সংগ্রাম কোন অংশে তীব্রতায় তদপেক্ষা হীন ছিল না।

এবং সেই প্রাথমিক সমাজের প্রাথমিক মনুষ্য যে মানসিক প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহা নৈতিক অংশে ইতর জীবের মানসিক প্রকৃতি অপেক্ষা বড় অধিক উন্নত ছিল না; কেন না, সেই মানসিক প্রকৃতি জীবন-সমরে তাহার অনুকূল ছিল; এবং বলা বাহুল্য যে, এ জগতে নিরীহ নীতিপরায়ণ জীবের সর্ব্বদা আহার লাভ ঘটে না। দুঃখের বিষয়, কিন্তু সত্য কথা।

অর্থাৎ অন্যান্য ইতর জীবের ন্যায় মুষ্টিমিত আহারের ভাগের জন্য মনুষ্য আপনাদের মধ্যে নখানখি, দন্তাদন্তি ও রক্তারক্তি করিত; এ বিষয়ে ভল্লুক ও ব্যাঘ্রের সহিত তাহার বিশেষ প্রভেদ ছিল না; এবং এই পাশবিক

জীবন-দ্বন্দ্বে নখানখি ও রক্তারক্তি আজিও যে থামে নাই, প্রাত্যহিক সংবাদপত্র তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

মনুষ্য-সমাজের উৎপত্তি হইতে দুইটা প্রতিকূল শক্তি সেই সমাজকে নিরন্তর বিক্ষুব্ধ রাখিয়াছে। প্রথমতঃ, মনুষ্য দল বাঁধিয়া থাকিতে বাধ্য; নতুবা জীবন-সংগ্রামে ইতর জীবের নিকট তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

মনুষ্যকে দল বাঁধিয়া, সমাজ বাঁধিয়া থাকিতে হইবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে আপনার উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতাকে সংযত করিতে হইবে। ইহাই মনুষ্যের পরাধীনতার মূল; এবং দল বাঁধিতে হইলেই অন্যের অধীনতা স্বীকার করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্যকে সংযত করিতে হইবে; স্বভাবদত্ত ছয়টা রিপুর মুখে বল্‌গা ধরিতে হইবে। ইহাই সর্ব্ববিধ সামাজিক শাসনের মূল। ইহা হইতেই মনুষ্য-সমাজের স্থিতি; ইহা হইতেই মনুষ্যত্বের মহিমা ও গৌরব।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষকে পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে হইবে; নতুবা আহার জুটিবে না, নতুবা মানুষের ব্যক্তিগত স্ফূর্ত্তি ও উন্নতি ও বিকাশ ঘটিবে না। পৃথিবীতে খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ অল্প; খাদকের সংখ্যা অধিক। কাড়াকাড়ি করিয়া না খাইলে চলিবে না। এই দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত উন্নতির মূল; কিন্তু পশুর সহিত মনুষ্যের এইখানে সমতা। ইহা সমাজবন্ধনের প্রতিকূল; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ইহা উন্নতিরও এক মাত্র উপায়।

এই দুইটা শক্তি পরস্পর প্রতিকূল, অথচ কোন-না-কোনরূপে কতকটা সমন্বয়ের ও সামঞ্জস্যের বিধান করিয়া মনুষ্যকে তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় নীত করিয়াছে।

মনুষ্য বাধ্য হইয়া আপনার পায়ে অধীনতার নিগড় পরাইয়াছে এবং সেই অধীনতার নিগড় পরিয়া কথঞ্চিৎ যথাসম্ভব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। যেখানে স্বাতন্ত্র্য উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত, সেখানে সমাজবন্ধন ছিন্ন হয়, মনুষ্যত্ব পশুত্বে পরিণত হয়। যেখানে স্বাতন্ত্র্য অন্তর্হিত, সেখানে সমাজ উত্থানশক্তি-রহিত হয়; উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হয়।

এই অধীনতার ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যগত সীমারেখা কোথায়? কে বলিয়া দিবে, কোথায় কোন্‌খানে রেখা টানিলে উভয়ের সামঞ্জস্য ঘটিবে, স্থিতি বজায় থাকিবে অথচ উন্নতি প্রতিহত হইবে না? অদ্যাপি ইহাই রাষ্ট্রনীতির ও ধর্ম্মনীতির প্রধানতম সমস্যা।

মনুষ্যের সহজ এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তি স্বাতন্ত্র্যমুখে ; সেই প্রবৃত্তিকে দমন ও নিরোধ করিতে হয়। নহিলে সমাজ টিকে না। নতুবা মানবিকতা পাশবিকতার নিকট জীবনযুদ্ধে পরাজিত ও অবসন্ন হয়। এই সমস্যা মনুষ্যের জীবন-মরণঘটিত।

স্বাভাবিক সংস্কারগুলি মানুষের আত্মরক্ষার অনুকূল ; পরকে অভিভূত করিয়া আপনাকে বাড়াইবার জন্য তাহাদের উৎপত্তি। কিন্তু তাহারা সমাজ-শক্তির প্রতিকূল ; সমাজশক্তি তাহাদিগকে রিপু আখ্যা দেয় এবং মানুষের ছয়টা রিপুকে শাসনে রাখিতে চায়।

দেশভেদে ও কালভেদে মনুষ্য নানা দলে বিভক্ত হইয়াছে ; নানা দেশে নানা সমাজ বাঁধিয়াছে। সমাজে সমাজে জীবনযুদ্ধ চলিয়াছে। যে সমাজে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য যত নিয়মিত, সে সমাজ তত সংহত, সমর্থ ও জীবনযুদ্ধে বলীয়ান্।

সমাজরক্ষার নিমিত্ত, অর্থাৎ সমাজের আশ্রয়ে গৌণভাবে আত্মরক্ষার নিমিত্ত, সামাজিক মনুষ্য প্রথমে যে শিকল গড়াইয়াছিল, সামাজিক মনুষ্য মাত্রই যে শিকলে আপনাকে বাঁধা রাখিতে অদ্যাপি বাধ্য, তাহার নাম করিতে হয়ত অনেকের লোমহর্ষ উপস্থিত হইবে। ইহার নাম পরতন্ত্রতা বা বশ্যতা। সামাজিক জীবের ইহাই প্রধান ধর্ম্ম। যেখানে এই ধর্ম্মের অস্তিত্ব নাই, সেখানে সমাজের অবস্থা ভয়াবহ।

শাদা কথায় ইহার অর্থ বড় ভয়ঙ্কর। তুমি যাহা চাহিতেছ, তাহা তুমি পাইবে না ; তোমার প্রবৃত্তি তোমাকে যে দিকে টানিতেছে, সে দিকে তোমার গতি রুদ্ধ ; তোমার বুদ্ধি, তোমার যুক্তি যে পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছে, সে পন্থা তোমার নিকট নিরুদ্ধ। সমাজের প্রবৃত্তি তোমার প্রবৃত্তিকে চালিত করিবে ; সমাজ যাহাকে নীতিমার্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিবে, তোমার নৈতিক প্রবৃত্তি তাহার বিপরীত মুখে তোমাকে লইতে পারিবে না। তোমার প্রবৃত্তি, তোমার নৈতিক বৃত্তি যদি তোমাকে অন্য পথে লইয়া যায়, তাহা হইলে তুমি সমাজদ্রোহী পাতকী ; অন্যত্র তোমার মার্জ্জনা থাকিতে পারে, সমাজের নিকট তোমার ক্ষমা নাই। নীতিবিৎ, তুমি চকিত হইও না, বশ্যতাই সামাজিক মনুষ্যের প্রথম ধর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্মের স্থান তাহার পরে। সামাজিক জীব সমাজের বেতনভোগী সৈনিক মাত্র ; সৈনিকের পক্ষে বশ্যতা ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম নাই।

সমাজের ধর্ম্মবুদ্ধির নিকট আপন ধর্ম্মবুদ্ধিকে বলিদান দিবে; সমাজের নীতির নিকট আপন নীতিকে বলিদান দিবে। হইতে পারে, তোমার মার্জ্জিত ধর্ম্মবুদ্ধি ও তোমার বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি প্রচলিত নিকৃষ্ট সামাজিক বুদ্ধির ও নিকৃষ্ট সামাজিক নীতির অনুমোদন করে না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, প্রথমে তোমার সামাজিকতা, পরে তোমার ব্যক্তিগত ভাব। সমাজ-ধর্ম্মের সমীপে ব্যক্তির ধর্ম্মের আসন নাই।

সামাজিক জীবের এই বশ্যতা স্থানভেদে ও পাত্রভেদে নানা নাম গ্রহণ করিয়াছে। কোথাও ইহা পিতৃভক্তি বা গুরুভক্তি, কোথাও রাজভক্তি, স্বদেশভক্তি বা স্বজাতিভক্তি নাম ধারণ করিয়াছে। এই ভক্তি সর্ব্বত্র মনুষ্য-হৃদয় হইতে স্বতঃ উচ্ছলিত না হইতে পারে; সেখানে ইহার স্বতঃ উচ্ছ্বাস ও স্বতঃ বিকাশ নাই, সমাজ যেখানে বলপ্রয়োগে ও দণ্ডপ্রয়োগে আপন দাওয়া ষোল আনা বুঝিয়া লয়।

জীবন-সমরে নিরত পশুধর্ম্মা মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহাকে চুরি করিতে ও মিছা কথা কহিতে প্রলোভিত করে। কিন্তু সমাজ যে দিন তাহাকে চুরি করিও না, মিছা কথা কহিও না ইত্যাদি নঞন্ত আদেশবাণী শুনাইতে আরম্ভ করে, সেই দিন নীতিশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। যেখানে ব্যক্তিগণ আপন স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া এই নীতিশাস্ত্রের আদেশ মানিতে চাহে, সেই-খানেই সমাজের বলবৃদ্ধি হয়; অথবা যে যে সমাজে সামাজিকগণের প্রকৃতি এই নীতিশাস্ত্রের বশীভূত হয়, সেই সেই সমাজই জীবনযুদ্ধে টিকিয়া যায়; যে সমাজে এই আদেশ পদে পদে লঙ্ঘিত হয়, সে সমাজ অন্য সমাজের নিকট জীবনযুদ্ধে ধ্বংস পায়।

কিন্তু মনুষ্যের পশুপ্রকৃতি সহজে মানুষকে এই নীতিশাস্ত্রের ব্যবস্থায় কর্ণপাত করিতে দেয় না। সামাজিক নির্ব্বাচনের প্রভাবে পশুর ভাব পরিহার করিয়া সামাজিক ভাব লাভ করিতে মানবপ্রকৃতি বহু দিন অপেক্ষা করে। নির্ব্বাচনের ফল বহু দিনে ক্রমে ক্রমে দেখা দেয়। এই জন্য অর্থাৎ সমাজরক্ষার্থ উদ্ধত সামাজিক জীবকে বশে রাখিবার জন্য অন্যবিধ বলের প্রয়োজন, অন্যবিধ প্রভুশক্তির আবশ্যকতা। যেখানে এই প্রভুশক্তি বর্ত্তমান, এই শক্তি কার্য্যকরী, সেইখানে সমাজের অবস্থা আশাপ্রদ।

এই শক্তির মধ্যে একটা রাজশাসন; আর একটা ধর্ম্মশাসন। মানুষ নীতিমার্গে থাকিতে চায় না; তাহাকে জোর করিয়া সেখানে রাখিতে হয়।

মানুষ আপনা হইতে ছয়টা রিপুকে বশ করিতে চাহে না বা পারে না। সমাজশক্তি রাষ্ট্রশাসনের বা ধর্ম্মশাসনের মূর্ত্তি ধরিয়া উদ্যত দণ্ডপ্রয়োগে রিপু কয়টার শাসনে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রবল শক্তির নিকট স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে অবনত থাকিতে হয়।

পরের দ্রব্য গ্রহণ করিবার জন্য স্বাভাবিক স্পৃহা দমনে রাখিতে হইবে ; সাধারণ মনুষ্যের চরিত্র আজিও এত উন্নত হয় নাই যে, শুধু নীতিশাস্ত্রের এই উপদেশ তাহাকে দুই চারি বার শুনাইলেই চলিবে। অন্যবিধ শাসনের প্রয়োজন। যে এই স্বাভাবিক স্পৃহা দমনে রাখিতে পারে না, তাহাকে জোর করিয়া শারীরিক দণ্ডে দণ্ডিত কর, অথবা তাহার কল্পনার সমক্ষে কুম্ভীপাকের বিভীষিকার সৃষ্টি কর। সৌভাগ্যক্রমে মনুষ্য দুর্ব্বল ও ভয়ালু জীব। নীতির অনুশাসন যাহার দমনে অক্ষম, রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন তাহাকে দমন করিবে। তাহার স্বভাবের শোধন করিবে, এরূপ ভরসা করিও না ; নীতিশিক্ষা মনুষ্যের স্বভাব সংশোধন করিতে পারে কি না, তাহা উৎকট সংশয়ের বিষয়। তাহার স্বভাবের উৎকর্ষ না ঘটিতে পারে ; তবে তাহাকে সমাজের ক্ষতিসাধন হইতে ক্ষান্ত রাখিতে পারিবে।

ফলে উদ্ধত মনুষ্যকে সংযত ও সমাজ-বদ্ধ রাখিবার জন্য, সমাজের স্থিতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত, রাজশাসনের ও ধর্ম্মশাসনের মত প্রকৃষ্ট উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। হয়ত মানুষের অদৃষ্টে এমন দিন আসিতে পারে, যখন সামাজিক নির্ব্বাচনের প্রভাবে মনুষ্যের নৈতিক স্বভাব এমন বিশুদ্ধ আকার ধারণ করিবে যে, উক্ত দ্বিবিধ শাসনের একটারও আবশ্যক হইবে না। সে দিন এখনও মানুষের ইতিহাসে আসে নাই। এখন বোধ করি, কারাগার ও গির্জ্জাঘর, পুলিস ও পুরোহিত, উভয়েরই সমান প্রয়োজন।

মনুষ্যের ইতিহাসও অন্য কথা বলে না। প্রথমে রাষ্ট্রশাসন লইয়া দেখ। অরাজকতা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্রয় দেয়, কিন্তু সমাজের পক্ষে উহা ভয়াবহ। রাজার ও রাজশক্তির বিবিধ মূর্ত্তি ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে রাজশক্তি বজ্রমুষ্টিতে শাসন-দণ্ড চালনা করে না, সেখানে সমাজের অবস্থা শোচনীয় ; সমাজ সেখানে দুর্ব্বল ও আত্মরক্ষণে একেবারে অসমর্থ। অগষ্টস্ সীজারের রোম হইতে বিসমার্কের জর্ম্মান পর্য্যন্ত সমস্বরে এই বাক্যের সার্থকতা প্রমাণ করিতেছে। ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপচেষ্টা বৃথা। প্রাচীন ভারতবর্ষে আসমুদ্র হিমাচল সমস্ত মহাদেশকে

কেহ চিরদিন এক ছত্রের অধীন করিয়া রাখিতে পারেন নাই ; সেই জন্য ভারতবর্ষের অদ্য এই দশা। সমাজবন্ধনের জন্য রাজপ্রযুক্ত পাশব শক্তির প্রয়োজন। পুনশ্চ প্রার্থনা—নীতিবিৎ ক্ষুব্ধ হইও না ; ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন, দুয়ের মধ্যে কোন্ শাসনটা সমাজবন্ধনে অধিক সহায়তা করে, তাহা নির্দ্দেশ করা দুষ্কর নহে। ধর্ম্ম অর্থে পুনরায় রিলিজন বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে যে, রাজশাসনের ভিত্তি যেমন ঐহিক প্রাকৃতিক বিভীষিকায় প্রতিষ্ঠিত, রিলিজনের মূলেও সেইরূপ অতিপ্রাকৃত বিভীষিকা বর্ত্তমান। মনুষ্য-প্রকৃতির স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ও ভয়ালুতা উভয় শাসনেরই ভিত্তিস্থল। রাজশক্তি যেখানে রাজনৈতিক একতা সাধনে অসমর্থ, ধর্ম্মশাসন সেখানে সমর্থ হয় ; একে যাহা পারে না, অন্যে তাহা অবলীলাক্রমে সম্পাদন করে। প্রত্যক্ষ প্রাকৃত যাহা পারে না, কাল্পনিক অতিপ্রাকৃত তাহা পারে।

কথাটা পরিস্ফুট করিবার জন্য ইতিহাস হইতে গোটাকতক চলিত উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্রগত একতা কোন কালে ছিল না ; তথাপি সর্ব্বত্র হেলেনিকগণের মধ্যে যে একটা জাতিগত বন্ধন ছিল, তাহাতেই সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন নগরগুলি পার্শ্ববর্ত্তী বর্ব্বর জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিয়া এক মহিমান্বিত জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয় একতায় সে বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; তাহার প্রতিষ্ঠার হেতু জীয়স্ দেব ও আপোলো, হোমর ও হীসিয়ড, ডেলফির অরাকল ও অলিম্পিক ক্রীড়াভূমি। অরিস্তফেনিস যখন আথেন্সের রঙ্গমঞ্চে দেবদেবীগণকে বিদ্রূপ করিয়া দর্শকের করতালি পাইলেন, তখন আথিনীয় নাগরিককে পারস্যের রাজসভায় উৎকোচগ্রাহী ও স্বদেশদ্রোহী মূর্ত্তিতে উপবিষ্ট দেখিতে পাই।

প্রাচীন রোম অত্যুগ্র রাষ্ট্রশক্তির বলে পুরাণ-প্রথিত মৎস্যাবতারের মত আপনার ক্ষুদ্র দেহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া সমগ্র ভূভাগ পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল ; চতুঃপার্শ্বের সমাজসমূহ তাহার বর্দ্ধমান কলেবরে ক্রমশঃ লীন হইয়া আপনাদের স্বাধীন অস্তিত্ব হারাইয়াছিল। গল ও বৃটন, ফিনিক ও গ্রীক, ইহুদি ও মিশরী, সকলেই এক উৎকট প্রবলপরাক্রম অপ্রতিহত রাষ্ট্রশক্তির অধীন হইয়াছিল বটে ; কিন্তু সেই প্রবল রাষ্ট্রশক্তি তাহার অধীন

প্রজাপুঞ্জকে এক অদ্বিতীয় ধর্ম্ম-শাসনের অধীন করিতে পারে নাই। লাটিন জুপিতারের সহিত গ্রীক জীয়সদেবের ঐক্যবন্ধন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহুদি জেহোবা রোমক জুপিতারের নিকট মাথা নোয়ান নাই ; মিশর হইতে আইসিস ও অসিরিস আসিয়া বেকসের ও দায়নীসসের পার্শ্বে নৃত্য করিতেছিলেন ; ইরাণীক মিত্রদেব ও নাজারীন খ্রীষ্টদেব আসিয়া রোমের বিশাল সাম্রাজ্যমধ্যে জনসাধারণের ভক্তি বিভিন্নমুখে আকর্ষণ করিয়া ক্রমে প্রবল হইতেছিলেন। রোমের সম্রাটেরা সাম্রাজ্যমধ্যে সীজার-পূজার প্রচলনের চেষ্টা করিয়া বিশাল সাম্রাজ্যকে দৃঢ়বদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াও সফলকাম হয়েন নাই। রোম সাম্রাজ্যের বিশাল কলেবর অবিচ্ছিন্ন রহিল না ; উগ্র রাজশাসন এই কার্য্যে পরাভূত হইল। জর্ম্মনির অরণ্য হইতে বর্ব্বর জাতি দলে দলে প্রবেশ করিয়া রোম সাম্রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিল। রোমসম্রাট্ খ্রীষ্টান ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া রোম সাম্রাজ্যকে এক রজ্জুতে বাঁধিতে কিছু দিনের জন্য কতকটা সমর্থ হইয়াছিলেন ; রাজশাসনে যাহা হয় নাই, ধর্ম্মের শাসনে তাহা ঘটিয়াছিল : জষ্টিনিয়ানের সমাজব্যবস্থা ও বেলিসারিয়াসের তরবারির পক্ষে যাহা অসাধ্য হইয়াছিল, কনষ্টাণ্টাইনের প্রবর্ত্তিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাসন তাহা কিয়ৎপরিমাণে সম্পাদিত করিয়াছিল। উত্তর কালে বর্ব্বর জাতির উপদ্রবে রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রগত একতা শতধা ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু ইহাও সত্য যে, সেই খ্রীষ্টানধর্ম্মই আবার বর্ব্বর জাতিগুলিকে সভ্যতা প্রদান করিয়া, খণ্ডিত সাম্রাজ্যকে একীভূত করিয়া রোমের সাম্রাজ্যকে অভিনব মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে। রোম সাম্রাজ্যের দণ্ডধর রাষ্ট্রপতি রোমীয় প্রজার সর্ব্বময় প্রভুতা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াও যে সাম্রাজ্যে একতা রক্ষায় অক্ষম হইয়াছিলেন, খ্রীষ্টীয় খোদার নিরূপিত ধর্ম্মপালস্বরূপে সেই দুষ্কর কার্য্যের সম্পাদন তাঁহার পক্ষে কথঞ্চিৎ সাধ্য হইয়াছিল।

রোমের পরবর্ত্তী ইতিহাসও এই কথারই সমর্থন করে। প্রাচ্য রোমের খ্রীষ্টানেরা আপনাদের মধ্যে বিবিধ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মের শাসন ও সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রশাসন শিথিল করিয়া ফেলিল ; এরিয়স ও আথানেসিয়স্ খ্রীষ্টের ঐশ্বরিকতা সম্বন্ধে বিবাদ-কোলাহলে যে অনৈক্যের বীজ রোপণ করেন, তাহারই অঙ্কুর হইতে শতশাখ প্ররোহ নির্গত হইয়া প্রাচ্য রোমের অট্টালিকার ভিত্তিগাত্র শতধা ভিন্ন করিয়া দেয়। নবোদিত ইসলামের

কুঠারাঘাত সেই জীর্ণ অট্টালিকাকে ক্রমশঃ চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাহা একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। কিন্তু প্রতীচ্য রোমের ইতিহাস অন্যরূপ। প্রতীচ্য রোমের ধর্ম্মযাজক পোপ সেণ্ট পীটারের ধর্ম্মাসনকে প্রাচ্য রোমের রাষ্ট্রীয় সিংহাসনের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া প্রতীচ্য রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রপালহীন ছিন্ন খণ্ডগুলিকে এক মাত্র ধর্ম্মপালের ধর্ম্মশাসনের অধীন করেন। সর্ব্বগ্রাসী ইসলামের অগ্রগামী বিজয়পতাকা পিরিনীস পার হইয়া যে দিন ফরাসী দলপতি চার্লস মার্টেলের পরাক্রমে রোমবিজয়ে প্রতিহত হয়, তার পর দিন সেই চার্লস মার্টেলের বংশধরের মস্তকে সীজার অগষ্টসের রাজমুকুট স্থাপন করিয়া রোমের পোপ প্রতীচ্য রোম সাম্রাজ্যকে ধর্ম্মরাজ্যরূপে পুনর্গঠিত করেন। সাত শত বৎসর পরে দেখিতে পাই, খ্রীষ্টীয় ইউরোপের পূর্ব্বপ্রান্তে প্রাচ্য রোমে সেণ্ট সোফায়ার খ্রীষ্টীয় মন্দিরের শিরোদেশে ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা উড্ডীয়মান; কিন্তু অন্য দিকে পশ্চিম প্রান্তে প্রতীচ্য পোপের অনুগত খ্রীষ্টানের আদেশে ইসলাম-বাহিনী জিব্রাল্টার পার হইয়া হিস্পানি দেশ হইতে পলায়মান।

আর এক উদাহরণ ইহুদি জাতি। এই ক্ষুদ্র জাতি কোন কালে রাষ্ট্রীয় বলে বলীয়ান্ ছিল না। বাবিলোনিক ও পারসিক, গ্রীক ও রোমক, যখন যে জাতি পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে, তখনই ইহারা তাহার পদানত হইয়াছে। বস্তুতঃ এমন সর্ব্বতোভাবে নির্যাতিত জাতির উদাহরণ ইতিহাসে দুর্লভ। কিন্তু এক অদ্বিতীয় জেহোবার উপাসনাকে অবলম্বন করিয়া যে দৃঢ়শাসন ধর্ম্মপ্রণালী ইহাদের সমাজকে গঠিত ও নিবদ্ধ করিয়াছিল, তাহারই বলে ইহারা সহস্রধা ক্লিষ্ট, পীড়িত ও নির্যাতিত হইয়াও অদ্যাপি আপনাদের জাতীয়তা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। স্বদেশ হইতে ইহারা বহু কাল নির্ব্বাসিত; ভিখারীর ন্যায় ইহারা সমগ্র ভূমণ্ডলে বৈদেশিকের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়াছে; আশ্রয়দাতা বৈদেশিকের নিষ্করুণ বিশ্বাসঘাতকতায় ইহারা দলিত ও বিমর্দ্দিত হইয়াছে। তথাপি মিসরে ফারাওর আশ্রয় পরিত্যাগের তারিখ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া ইহাদের সামাজিক জীবন একই স্রোতে বহিয়াছে। এখনও ইহাদের জাতীয় জীবনের অবসান হয় নাই। ইহুদি যে দেশে যে ভাবে বাস করুক, সে এখনও সেই গর্ব্বিত সনাতন আচারালম্বী জেহোবার নির্দ্দিষ্ট অনুগত মনুষ্য—ইহুদি।

অথবা উদাহরণের জন্য অধিক দূর যাওয়ারই বা প্রয়োজন কি? হিন্দুস্থানে রাষ্ট্রগত একতা বোধ হয় কোন কালে ছিল না। কিন্তু এক সনাতন ধর্ম্মানুশাসনই হিন্দুর জাতীয়তাকে সহস্র বিপত্তির মধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বাঙ্গালীর ভাষা কর্ণাটী বুঝে না; কর্ণাটীর ভাষা বাঙ্গালী বুঝে না। কিন্তু বাঙ্গালী ও কর্ণাটী মনু-প্রবর্ত্তিত পন্থায় অদ্যাপি বিচরণ করে। গঙ্গা ও যমুনা, গোদাবরী ও সরস্বতী, নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী, সর্ব্বত্রই স্নান-কালে বেদপন্থী মানব একই মন্ত্রে একই দেবতার উপাসনা করে, অযোধ্যা মথুরা মায়া হইতে কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা পর্য্যন্ত, পুরী হইতে দ্বারাবতী পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশে একই উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাষী বিভিন্নবেশী নরনারী সমবেত হয় এবং বিভিন্নভাষী বিভিন্নবেশী পরিব্রাজকগণ কামাখ্যা হইতে কন্যাকুমারীতে, কন্যাকুমারী হইতে হিঙ্গলাজে, একই মহাদেবীর ছিন্ন অঙ্গের অন্বেষণে পরিভ্রমণ করে। ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজে যে কিছু বন্ধন, যে কিছু একতা, যে কিছু জাতীয়তা বর্ত্তমান, তাহা এই ধর্ম্মানুষ্ঠানেরই একতাগত। সেই প্রবল জাতীয়ত্ব কোন বাহ্য শক্তির নিকট অদ্যাপি সঙ্কুচিত বা পরাভূত হয় নাই। দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান পুরাতন ইরাণিক সাম্রাজ্য ও পারসীক সভ্যতাকে,—আসীরিয়া ও বাবিলোনের সমাধির উপর প্রতিষ্ঠিত, ক্ষত্রিয়াণাং ক্ষত্রিয় দরিয়াবুসের ও ক্ষয়ার্ষের পরাক্রমে প্রসারিত, জরথুস্ত্রের ধর্ম্মশাসনে নিয়ন্ত্রিত, এবং উত্তর কালে নৌশেরোঁয়ার পরাক্রমবলে রোম সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী পদবীতে সংস্থাপিত,—পারসীক সাম্রাজ্যকে লীলাক্রমে পঞ্চবিংশতি বৎসর মধ্যে বিধ্বস্ত করিয়াছিল; রোম-সম্রাটের হস্ত হইতে সমগ্র এশিয়া ও সমগ্র আফ্রিকা ছিনিয়া লইয়া তত্তৎপ্রদেশে হেলেনিক সভ্যতা ও রোমক সমাজ-ব্যবস্থা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাসন শত বর্ষ মধ্যে একবারে লুপ্ত করিয়াছিল; বসপরস পারে দাঁড়াইয়া প্রাচ্য রোমের ও জিব্রাল্টার পার হইয়া প্রতীচ্য রোমের ভীতি উৎপাদন করিতেছিল। সেই দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান শতাব্দ মধ্যে তিন মহাদেশের মানচিত্র একবারে রূপান্তরিত করিয়াছিল; স্বাধিকার মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন সভ্যতা ও প্রাচীন সমাজ একবারে উচ্ছিন্ন ও বিলুপ্ত করিয়াছিল; আট শত বৎসর ধরিয়া সমস্ত খ্রীষ্টীয় সমাজের সমবেত শক্তির সহিত সংগ্রাম চালাইয়াছিল; এবং পরিশেষে কনষ্টাণ্টাইনের সিংহাসনে তুর্কি সুলতানকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া খ্রীষ্টীয় জগতের আদি রাজধানীকে ইসলাম-জগতের কেন্দ্র স্থানে পরিণত করিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে সেই লোকভয়ঙ্কর

ইসলামের আপতনের ইতিহাস অন্যরূপ। পয়গম্বরের অন্তর্দ্ধানের পর শত বৎসর মধ্যে মুসলমান হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিতে সাহসী হন নাই। ছয় শত বৎসর পরে হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব মুসলমানের করতলগত হয়, কিন্তু তজ্জন্য হিন্দুর সামাজিক স্বতন্ত্রতা অণুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই। হিন্দুসমাজে সামাজিক জীবনের যে স্রোত চারি হাজার বা ততোধিক কাল এক টানে বহিয়া আসিয়াছে, সেই স্রোতের গতিরোধে মুসলমান সমর্থ হয় নাই। জীবন-সংগ্রামে হিন্দুসমাজ মুসলমানের নিকট পরাস্ত হয় নাই। রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব কিছু দিনের জন্য গিয়াছিল বটে; কিন্তু সে-ই বা কয় দিনের জন্য?

প্রচলিত ইতিহাস-গ্রন্থে এইরূপ একটা ধারণা জন্মাইয়া দেয় যে, মুসলমান অতি সহজে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা বিচারসহ নহে। ইসলামের উদগ্র শক্তি ভারতবর্ষ-বিজয়ে যেমন বাধা পাইয়াছিল, পৃথিবীর অন্য কোথাও তেমন পায় নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমান শক্তির উদয় হয়; ঐ শতাব্দী সমাপ্ত না হইতেই মুসলমান সমস্ত পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা জয় করেন। পর-শতাব্দীতে মুসলমান হিস্পানি দেশ জয় করিয়া ফ্রান্সের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। সেখানে চার্লস মার্টেলের প্রদত্ত প্রচণ্ড আঘাতে পুরোগমনে পরাহত হইলেও পর-শতাব্দীতে ইসলামের বিজয়িনী শক্তি ক্রীট হইতে সিসিলি পর্য্যন্ত অধিকৃত করিয়া সমস্ত ভূমধ্য-সাগর করায়ত্ত করে। সেই সময়েই প্রতীচ্য খ্রীষ্টীয় জগতের রাজধানী রোম নগরে সেণ্ট পীটারের সমাধিমন্দির মুসলমান কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত দেখি। একাদশ শতাব্দীতে জেরুসালেমের খ্রীষ্টীয় মন্দির ভূমিসাৎ হয়। সমস্ত খ্রীষ্টীয় জগতের ক্রস্‌লাঞ্ছিত শক্তিসমষ্টি দুই শত বৎসর ক্রুসেডের পর ক্রুসেড অভিযানে জেরুসালেমের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হয় নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এক দিকে যেমন খ্রীষ্টীয় শক্তি মুসলমানকে হিস্পানি দেশ হইতে বিতাড়িত করে, অন্য দিকে তেমনই অটোমান তুর্কি প্রাচ্য রোমের ধ্বংস সাধন করিয়া প্রাচ্য খ্রীষ্টীয় সমাজের বৃহৎ অংশ করগত করে। তার পর সাড়ে চারি শত বৎসর অতীত হইল; এখনও জেরুসালেম ও আন্তিয়োক, আলেকজান্দ্রিয়া ও কাইরিণী প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের আদি অভ্যুদয়-ভূমি মুসলমানের করায়ত্ত এবং বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে বালকান-ভূমিতে সমবেত খ্রীষ্টীয় সেনা কনষ্টান্টিনোপল হইতে ইসলামকে সরাইবার জন্য দণ্ডায়মান।

নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত মুসলমানেরা ভারতবর্ষ প্রবেশে সাহসী হন নাই। কাশিমের সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ বিফল হইয়াছিল। গজনিপতি মামুদের সময় কিছু দিন ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে উৎপাত চলিয়াছিল মাত্র। যে সময়ে সেলজুক তুর্কের আদেশে খ্রীষ্টীয় যাজক কেশাকৃষ্ট হইয়া জেরুসালেম হইতে নির্ব্বাসিত হইতেছিলেন, সেই সময়ে সাহাবউদ্দীন ঘোরী তিরৌরীর ক্ষেত্রে ভগ্ন দন্ত রাখিয়া পলায়ন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আর্য্যাবর্ত্ত মুসলমানের অধিকৃত হয়। চতুর্দ্দশে আল্লাউদ্দীন চিতোরের ভস্মস্তূপে পদ্মিনী দেবীর লাবণ্যপ্রতিমা সমাহিত দেখিয়া ব্যর্থকাম হন। ষোড়শ শতাব্দীতে চিতোরপতি সংগ্রাম সিংহ পতিত পাঠানের সহায় হইয়া হিন্দুস্থানের আধিপত্য জন্য মোগলের সম্মুখীন হন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আকবর শাহ হিন্দু সেনানী হিমুর হস্ত হইতে আর্য্যাবর্ত্তের সাম্রাজ্য গ্রহণ করেন ও হিন্দু রাজা মানসিংহের সাহায্যে বঙ্গ, উৎকল ও কাবুল বিজয় করেন। সেই সময়েই দক্ষিণ দেশে মুসলমানগণ বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংস করেন। মহারাণা প্রতাপ সিংহ তখনও গুহাস্থিত সিংহের ন্যায় সিংহবিক্রমে আততায়ীর আক্রমণ পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ করিতেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে মেবারের রাণা মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করেন। সপ্তদশ শতাব্দী অতীত না হইতেই রাজপুত জয়সিংহের ও মরাঠা শিবাজীর হস্তে আওরঙ্গজীব বাদশাহকে ব্যতিব্যস্ত দেখিতে পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখা যায়, বর্গীর দল মুর্শিদাবাদের রাজকোষ লুঠ করিতেছে ও দিল্লীর দরজায় করাঘাত করিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শাহানশাহ বাদশাহ মরাঠা দলপতির প্রসাদভোগী বন্দী।

মূল প্রস্তাব হইতে আমরা কিছু দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। নীতিশাসন, রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন, তিনেরই উদ্দেশ্য এক। সমাজকে বাঁধিয়া রাখা, সমাজের গায়ে বল দেওয়া, সমাজকে জীবনযুদ্ধে সমর্থ করা, তিনেরই এক মাত্র উদ্দেশ্য। সমাজকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য সামাজিকগণ আপন আপন স্বাতন্ত্র্য কতক পরিমাণে পরিহার করিতে বাধ্য। প্রবৃত্তির দমন আবশ্যক। সাধারণের কল্যাণের জন্য নিজ স্বাধীনতার সংযমের প্রয়োজন। মানব-প্রকৃতির বর্ত্তমান অবস্থায় কেবল নীতির শাসনের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না। দুর্ব্বল মানব-প্রকৃতিকে বিভীষিকা দেখাইয়া শাসনে রাখিতে হয়। সেই বিভীষিকার কোন যুক্তিযুক্ত মূল না থাকিতে পারে; কিন্তু

সমাজ-জীবন রক্ষার জন্য সেই বিভীষিকার আবশ্যকতা। এই জন্য রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন আবশ্যক। সমাজের জীবন রক্ষার জন্য উভয়েরই উপযোগিতা। যেখানে রাজশাসন পরাভূত, সেখানেও ধর্ম্মশাসন বিমুখ হয় না। একে যাহা পারে না, অন্যে তাহা পারে। পৃথিবীর ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই হিসাবে ধর্ম্মশাসনের উপযোগিতা বুঝিতে গেলে পৃথিবীর ইতিহাসের অনেক অস্পষ্ট অধ্যায় স্পষ্ট হয়। অন্ততঃ ইউরোপের খ্রীষ্টানের ইতিহাস এই হিসাবে না বুঝিলে বুঝা যায় কি না সন্দেহ। ক্যাথলিক কর্ত্তৃক প্রোটেষ্টান্টের নির্যাতন, প্রোটেষ্টান্টগণের পরস্পর উৎকট বৈরসাধন, ইউরোপের রাজগণের প্রজাসঙ্ঘমধ্যে ধর্ম্মবিষয়ক একতা রক্ষার জন্য উৎকট প্রয়াস, ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লইয়া খ্রীষ্টীয় সমাজের সর্ব্বত্র তুমুল আন্দোলন, বিসংবাদ ও বিরোধ এই হিসাবে না দেখিলে বুঝা যায় কি না সন্দেহ। নীরো হইতে দায়োক্লিশিয়ান পর্য্যন্ত রোম-সম্রাট্গণের অভিনব খ্রীষ্টান সমাজের প্রতি উৎপীড়ন, কনস্তান্তাইনের পরবর্ত্তী সম্রাট্গণকর্ত্তৃক প্রাচীনপন্থীদের প্রতি ততোধিক অত্যাচার, সম্রাট্ থিয়োদোসিয়সের আদেশে রোমের পুরাতন দেবমন্দিরগুলির ও জষ্টিনিয়ানের আদেশে আথেন্সের ভুবনবিখ্যাত চতুষ্পাঠীসমূহের উচ্ছেদ সাধন ঠিক এই হিসাবেই বুঝা যায়। রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর খ্রীষ্টান ইউরোপ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র খ্রীষ্টীয় সমাজকে বহু দিন ধরিয়া প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানের সহিত ও পশুবলে বলীয়ান্ তাতার মোগল প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির সহিত জীবন-দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। কাজেই খ্রীষ্টীয় সমাজে সমাজরক্ষার্থ রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন উভয়েরই সম্মিলন ঘটিয়াছিল। প্রাচ্য রোমে সম্রাটের ও প্রতীচ্য রোমে পোপের অপ্রতিহত প্রভাব ঘটিয়াছিল। যে এই প্রভুত্বের বিরোধী হইত, সে সমাজের শত্রু বলিয়া গণ্য হইত। তাহার বিদ্রোহের মার্জ্জনা হইত না। কুঠারাঘাতে তাহার মুণ্ডপাত কর; তুষানলে তাহাকে দগ্ধ কর। আবার সেই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা; তাহারা পরস্পর উন্মত্তভাবে জীবন-সমরে নিরত। সমাজকে একই সূত্রে বাঁধিয়া রাখা দরকার; নতুবা জীবন-সমরে সে সমাজের জয়ের সম্ভাবনা নাই। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এখানে উন্মত্তের প্রলাপ। রাজার নিকট ও যাজকের নিকট সকলকে আজ্ঞাকারী থাকিতে হইবে। রাজাই যাজকমণ্ডলীর প্রধান সহায়; তিনি একাধারে

রাজশক্তির ও ধর্ম্মশক্তির অধিষ্ঠানস্থল। টিউডর রাজাদের রাজত্বকালে ইংরেজ জাতি পোপের অধীনতাপাশ ছিন্ন করে। বৈদেশিক ধর্ম্মপালের গঠিত নিগড় হইতে স্বাধীনতা লাভ ঘটিলেও স্বদেশের রাষ্ট্রপালের অধীনতাপাশ প্রজাগণকে আরও দৃঢ়রূপে বদ্ধ করে। টিউডর অষ্টম হেনরির সময় হইতে ইংলণ্ডপতি যুগপৎ রাষ্ট্রপাল ও ধর্ম্মপাল। এলিজাবেথের সময়ে প্রজাগণের রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মগত স্বতন্ত্রতা একেবারে লুপ্ত হয়। ষ্টুয়ার্টগণের সময়ে অধীনতার ভার আরও বৃদ্ধির চেষ্টায় প্রজাবিদ্রোহ ঘটে। ক্রমোয়েল রাজার মুণ্ডচ্ছেদ করেন; কিন্তু প্রজাকে কোনরূপ স্বতন্ত্রতা দেন নাই। তাঁহার সময়ে অধীনতার কেবল মূর্ত্তিভেদ ঘটিয়াছিল মাত্র। প্রকৃত পক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইংরেজের রাষ্ট্রগত স্বাতন্ত্র্য বা ধর্ম্মগত স্বাধীনতা অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। ইংলণ্ডের যে ইতিহাস, অন্যান্য রাজ্যেও সেই ইতিহাস। সর্ব্বত্র রাজা ও পুরোহিত উভয়ে মিলিয়া প্রজার স্বাধীনতা বিলোপের চেষ্টা করিয়াছে। ইউরোপের ইতিহাস এই কাহিনী সর্ব্বত্র গাহিয়াছে। এখনও সেই কাহিনীর উপসংহার হয় নাই।

রাজশাসনের সহিত ধর্ম্মশাসনের এইখানে সম্বন্ধ। রাজা স্বৈরাচার ও দুর্ব্বৃত্ত হইতে পারেন; কিন্তু যত ক্ষণ তিনি রাজা, তত ক্ষণ তাঁহার আদেশ পালনে তুমি বাধ্য। তাঁহার আদেশ ন্যায়বিগর্হিত ও নীতিবিরুদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার আদেশলঙ্ঘনে শাস্তি মাত্র তোমার প্রাপ্য। বর্ত্তমান কালে রাজাদেশের সমালোচনায় প্রজার অধিকার জন্মিয়াছে সত্য; কিন্তু প্রথমে রাজার আদেশ পালন কর; নতুবা তুমি রাষ্ট্রদ্রোহী। রাষ্ট্রের জীবনের কাছে তোমার জীবনের মূল্য নাই।

রাজা তোমাকে অব্যাহতি দিতে পারেন; সমাজ তোমাকে ছাড়িবে না। সমাজ তোমাকে নির্যাতন ও নিপীড়ন করিয়া সাধারণের চিরক্ষুণ্ণ মার্গে তোমাকে ব্যবস্থিত রাখিবে। তোমাকে উন্মার্গগামী হইতে দিবে না। তোমার যুক্তি, তোমার নীতি তুমি দূরে রাখ। আগে সমাজের আদেশ পালন কর। নতুবা তুমি সমাজদ্রোহী। রাজা দুশ্চরিত্র; তাঁহার চরিত্রের উপর তোমার শ্রদ্ধাভক্তি না থাকিতে পারে, তথাপি তিনি তোমার নমস্য। তাঁহার দর্শনলাভ তোমার সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র জানু পাতিবে ও শিরোবসন উন্মোচন করিবে। প্রচলিত ধর্ম্মে তোমার আস্থা না থাকিতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তুমি যোগ দাও না

দিলে তুমি সমাজচ্যুত হইবে; সমাজের হস্তে তোমাকে নির্যাতন ভোগ করিতে হইবে। সমাজ নিজের জীবন রাখিতে চাহে। তাহার স্বার্থ ও তোমার স্বার্থ সর্ব্বত্র এক নহে। নীতিবিৎ, তুমি ক্ষুব্ধ হইও না। দ্বন্দ্ব—নির্মম নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব—যেখানে জীবের অভিব্যক্তির ও উন্নতির এক মাত্র উপায়, সে জগতে নীতিবিদের প্রিয় সিদ্ধান্তের সর্ব্বত্র স্থান নাই।

প্রচলিত ধর্ম্মাচারসমূহের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদেরা যে মত প্রকাশ করেন, তাহা উল্লিখিত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করে। অসভ্য সমাজে বলবান্ ব্যক্তি রাজা। তাঁহার আদেশপালন ও তাঁহার প্রসাদন আবশ্যক। তাঁহার বিরাগের ফল প্রাণদণ্ড। অসভ্য সমাজে রাজপূজা প্রচলিত। রাজা মরিয়াও মরেন না। মানুষও মরিয়াও মরে না। তাহার প্রেত-শরীর আসিয়া মাঝে মাঝে দেখা দেয়। প্রেতেরও প্রসাদন আবশ্যক। নতুবা প্রেত আসিয়া উপদ্রব করিবে। এইরূপে প্রেতপূজার উৎপত্তি। প্রেতের শক্তির সীমা নাই। জড় প্রকৃতির উপর প্রেতের ক্ষমতা অনির্দ্দেশ্য। প্রেতকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। জীবন্ত রাজা সামাজিক প্রেতপূজার প্রধান যাজক। রাজাই প্রধান পুরোহিত। রাজার সহিত প্রেতের কথাবার্ত্তা চলে। রাজা প্রেতের প্রতিনিধি। প্রেতপূজা হইতে দেবপূজার উদ্ভব। দেবতার ও উপদেবতার প্রভেদ মর্য্যাদাগত। মূলতঃ উভয়ে একজাতীয়। বিজিত জাতি জেতৃজাতির দেবতা গ্রহণ করে। জেতার দেবতা বিজিতের দেবতার উপর আধিপত্য স্থাপন করে। জেতার যিনি উপাস্য, তিনি দেবতা; বিজিতের যিনি উপাস্য, তিনি অপদেবতা। দেবতাগণের মধ্যে ক্ষমতানুসারে পদবী নির্দ্দিষ্ট হয়। দেবতাদের মধ্যে সমাজের সৃষ্টি হয়। দেবে অপদেবে এবং দেবে দেবে বাদ-বিসংবাদ, যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে। অসুরগণ দেবগণের চিরশত্রু। শয়তান জেহোবার প্রতিদ্বন্দ্বী। এঞ্জেল ও আর্কেঞ্জেল প্রভৃতি জেহোবার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। জেহোবা দেবগণের রাজা; তিনি নরগণেরও রাজা; তিনি জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। তিনি একাকী পূজা চাহেন; অন্যে পূজা পাইবে, ইহা তাঁহার অসহ্য। তিনি অদ্বিতীয় ঈশ্বর। তাঁহার আদেশে জগৎ চলিতেছে। মর্ত্ত্যে ভূমিপাল তাঁহার প্রতিনিধি। যাজক ও পুরোহিত তাঁহার আদেশপ্রচারে ও সন্তোষসাধনে নিযুক্ত। রাজার আদেশ খোদার আদেশ। এই আদেশের পালন প্রজার প্রথম কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যপালনে দ্বিধা

করিও না। পরকালে কুম্ভীপাক আছে; তাই বলিয়া কি ইহলোকে তুষানল আবশ্যক হইবে না? রাজার রাজত্ব তবে কিসের জন্য?

প্রেতপূজা হইতে পিতৃপূজা, দেবপূজা, জেহোবাপূজার উদ্ভব এইরূপ কতকটা বুঝা যায়। প্রেতের প্রসাদন হইতে ধর্ম্মানুষ্ঠানের উৎপত্তি কতকটা বুঝা যায়। অনেক দেবতা প্রাকৃত শক্তির অধিষ্ঠাতৃরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়েন। মনুষ্য পরলোকগত প্রেতের পূজা করে; আবার চন্দ্র সূর্য্য, জল বায়ু, নদী-পর্ব্বতেরও উপাসনা করে। প্রেতপূজা হইতে প্রকৃতি-পূজার উৎপত্তি কিরূপে হইল, ভাল বুঝা যায় না। হার্বার্ট স্পেন্সর বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; তাহা সন্তোষজনক নহে। নানা পণ্ডিতে নানা মত উপস্থিত করিয়াছেন। সে প্রসঙ্গের আলোচনা এখানে অনাবশ্যক।

মনুষ্যকে সমাজের অধীন থাকিতেই হইবে। সমাজের আদেশ যুক্তি-বিরুদ্ধ হইলেও মানিতে হইবে। সামাজিক জীব সমাজের অধীন। এই অধীনতার সীমা কোথায়, তাহার সদুত্তর নাই। বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহার মীমাংসারও প্রয়োজন নাই। মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এক দলকে সেই সীমারেখার এক পার্শ্বে রাখে; মনুষ্যের সমাজ-বশ্যতা অন্য দলকে অন্য পার্শ্বে রাখে। স্থিতিশীল ও উন্নতিশীল, উভয় দলের চিরন্তন বিরোধ। এই বিরোধের মীমাংসা কখনও হয় নাই; কখনও হইবে কি না জানি না। কিন্তু এই সনাতন বিরোধের ফলে সেই সীমারেখা ক্রমশই সরিয়া গিয়াছে। বিরোধের ফলে মনুষ্যের ব্যক্তিগত চরিত্রের ও সমাজগত চরিত্রের ক্রমেই বহুধাভাব ঘটিয়াছে। ইতিহাস সাক্ষী। অথবা প্রকৃতির বুঝি, ইহাই নিয়ম। বিরোধই বোধ করি, উন্নতির ও অভিব্যক্তির এক মাত্র বিধাতৃ-বিহিত উপায়।

প্রকৃতি-পূজা

মানুষ মানুষের সহিত যুঝিয়া আসিতেছে ও মানুষ প্রকৃতির সহিত যুঝিয়া আসিতেছে। অতি পুরাকাল হইতে এই সংগ্রামের আরম্ভ হইয়াছে; অদ্যাপি এই সংগ্রামের অবসান হয় নাই। কবে এই সংগ্রামের অবসান হইবে, তাহা বলা যায় না।

এই জীবনব্যাপী মহাসমরের সহিত মনুষ্য-জীবনের যত নিকট সম্পর্ক আছে, অন্য কোন ব্যাপারের সহিত তত দূর আছে কি না জানি না। মানুষ সেই সমরে চিরকাল দলিত, পীড়িত ও বিক্ষত হইয়া ত্রাহি-স্বরে ক্রন্দন করিতেছে।

প্রকৃতির পীড়নে মনুষ্য মাত্রই চিরদিন পীড়িত। প্রকৃতি সবল ও মনুষ্য দুর্ব্বল। সবলের পীড়নে মনুষ্য চিরদিন ধরিয়া নিগৃহীত হয়। ইহাই জগতের নিয়ম। দুর্ব্বলের এরূপ ক্ষেত্রে যাহা এক মাত্র গতি, সে তাহারই অবলম্বন করিয়া থাকে। এবং সেই এক মাত্র গতি সবলের উপাসনা। দুর্ব্বল মানুষ বোধ হয়, সমাজ-সংস্থিতির প্রারম্ভ হইতে সবলা প্রকৃতিকে নানা উপায়ে পূজা দ্বারা প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। পূজা দ্বারা প্রসাদলাভ যে একেবারেই ঘটে না, এমন নহে। কেবল মাত্র ভ্রূকুটী ও চপেটাঘাত পাইলে এত দিন মনুষ্যজাতির ধরাতলে অবস্থান ঘটিয়া উঠিত না। মনুষ্য যে এখনও ধরাতলে বর্ত্তমান আছে এবং ধরাতল পরিত্যাগ করিবার স্পৃহাও সকলের নাই, তখন প্রকৃতির মন যোগাইয়া পূজা করিতে পারিলে যে কিছুরই প্রত্যাশা চলিবে না, এরূপ বলা সঙ্গত নহে। প্রকৃতির যখন মেজাজ ভাল থাকে, যখন আমরা প্রাকৃতিক বিধানে ব্যবস্থা দেখি, তখন মন যোগান সুসাধ্য হয় এবং প্রসাদলাভও ঘটে। একালে যাঁহাদের নাম বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা প্রাকৃতিক বিধানের ব্যবস্থা লইয়া আলোচনা করেন এবং তদনুসারে প্রকৃতির মন যোগাইয়া প্রসাদ লাভ করেন। দুঃখের বিষয় যে, প্রকৃতিতে সর্ব্বত্র ব্যবস্থা দেখা যায় না। চিত্তচাপল্যে প্রকৃতির সহিত অন্য কোন প্রভু তুলনীয় নহে। তাঁহার কখন কিরূপ খেয়াল থাকিবে, হিসাব করিয়া গণনা চলে না। তাই সর্ব্বত্র পূজার ব্যবস্থা করাই সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষে শ্রেয়ঃ কল্প।

অতএব প্রকৃতিতে যাহা কিছু প্রবল ও শক্তিমান্ বলিয়া বোধ কর, তাহারই পূজা কর। সূর্য্যের পূজা কর, চন্দ্রের পূজা কর, মেঘের পূজা কর, বায়ুর, জলের, আগুনের, সকলেরই পূজা কর। বৃক্ষ-পর্ব্বত, নদী-সমুদ্র, কেহই যেন বাদ না যায়। কাহার মনে কি আছে, কে বলিতে পারে? কাহার শক্তি কিরূপ, তাহা কে জানে? যাহাকে সম্মুখে দেখ, তাহারই পূজা কর। সাপ বাঘ, বিড়াল কুকুর, ইট পাথর, কেহ যেন বাদ না পড়ে। সাবধান ব্যক্তি কড়াক্রান্তি হিসাব করিয়া চলেন; কেহ যেন বাদ না পড়ে। বিশ্বজগৎ জুড়িয়া দেবতা প্রতিষ্ঠা কর। শস্যশালিনী পৃথিবী নিখিল ভূতের জননী-স্বরূপা, তিনি মহাদেবী, তাঁহার পূজা কর। সীমাহীন আকাশ পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন, তিনি মহাদেব, পরম পিতা, তাহার পূজা কর। দেবতার সংখ্যা কত, তাহা কে জানে? দেবতা তেত্রিশ, কি তেত্রিশ কোটি, কে বলিতে পারে? প্রত্যক্ষে না পোষায়, কল্পনার আশ্রয় লও। অলিম্পস বা কৈলাস, স্বর্গ বা পাতাল, কোথায় কে আছেন, কে বলিতে পারে?

জগতের কারখানা সবই বিচিত্র। কোথা হইতে কি হয়, মানুষের গণনার অতীত। সূর্য্যদেব কোথা হইতে একচক্র রথে হরিদশ্ব যোজনা করিয়া, অরুণ সারথিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া জগতের তিমিররাশি ভেদ করিয়া উপস্থিত হয়েন, অগ্রে চারুহাসিনী উষা বনের ফুল ফুটাইয়া, মন্দ মারুতে বনস্থলী প্রকম্পিত করিয়া সুপ্ত জীবকুলকে প্রবোধিত করেন। এই বা কি আশ্চর্য্য! নৃত্যপরা উষাসুন্দরী বর্ণকান্তিতে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া চঞ্চলচরণে উপস্থিত হইতেছেন; উঠ উঠ সুপ্ত মানব, অর্ঘ্যপাত্র হাতে লইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা কর; তাহার চরণতলে শতদল ফুটিয়া উঠিতেছে, তাঁহার নিশ্বাসসৌরভে দশ দিক্ আমোদিত হইতেছে, তাহার অনাবৃত বক্ষোদেশ হইতে ক্ষীরধারা নিঃসৃত হইতেছে। উঠ, আর সময় নাই; ঐ দেখ, উষাদেবীর রূপবাণে আকৃষ্ট হইয়া রথারূঢ় দিবাকর তাহার অনুসরণ করিতেছেন। রূপমুগ্ধ দিবাকর তাঁহার পশ্চাৎ অনুধাবন করিলেন, সমুদয় আকাশমার্গ অতিক্রম করিয়া, জ্যোতিঃপ্রভায় দিগন্তর আলোকিত করিয়া চলিলেন। দেখ, পশ্চিমাকাশে যখন সন্ধ্যার রক্তিম রাগে জগৎ নূতন বেশ ধারণ করিয়াছে, তখন দিবাকর উষার সহিত সঙ্গত হইলেন। সন্ধ্যা ত উষারই অন্য মূর্ত্তি! কিন্তু হায়, এ কি হইল! দিবাকর প্রজাপতি; উষাদেবী যে তাঁহার দুহিতা। প্রজাপতি ঋশ্যরূপ ধারণ করিয়া রোহিতরূপিণী রক্তবর্ণা

ঊষাদেবীর সহিত সঙ্গত হইলেন। দেবগণ লজ্জায় মুখ লুকাইলেন। ভূতপতি রুদ্রদেব ক্রোধভরে প্রজাপতির হত্যাসাধনার্থ শরক্ষেপ করিলেন। দিবাকর পশ্চিমাকাশে দেবীর সহিত মিলিত হইলেন। ফুলশয্যা নির্ম্মিত হইল। কিন্তু হায়, সেই ফুলশয্যাই অন্তিমের মৃত্যুশয্যায় পরিণত হইবে কে জানিত! উহা সন্ধ্যার রক্তরাগ নহে; দিবাকরের চিতানল জ্বলিয়া উঠিয়া দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়াছে মাত্র; পরক্ষণেই বসুন্ধরা গভীর শ্বাস ফেলিয়া বিষাদের কালিমা ধারণ করিবে। সবিতা ঊষাদেবীর অন্বেষণে চলিয়াছেন। রঘুবীর সীতাদেবীর অন্বেষণে চলিয়াছিলেন; রাক্ষসী সেনা ধ্বংস করিয়া তিনি সীতাদেবীর সন্ধান পাইলেন; কিন্তু রাবণের চিতা না নিবাইতেই সীতাদেবীর জন্য চিতা সজ্জিত হইল। বানরী সেনা চিতানলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। গ্রীক বীরগণ হেলেনা সুন্দরীর অন্বেষণে সাগরপারে চলিয়াছিলেন; হেলেনার উদ্ধার হইল, ট্রয় নগরী গভীর নিশীথে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইল। দীপ্ত অগ্নি সাগরকূল আলোকিত করিল। মহাবীর হীরাক্লীস বিজয়ান্তে প্রণয়িনীর নিকট আসিলেন। প্রণয়িনী তাঁহাকে অঙ্গরাখা কবচ পরিতে দিলেন। কে জানে, সে কবচ প্রাণঘাতক হইবে। হীরাক্লীস কবচ পরিধান করিয়া চিতারোহণ করিলেন। ঈজীয় সাগরের পশ্চিম কূলে তাঁহার চিতা জ্বলিল। সমুদ্রের জলরাশির উপরে গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই চিতাবহ্নির রক্তরাগ ঈজীয় সাগরের পূর্ব্বকূল পর্য্যন্ত দীপ্ত করিল। বালডারের মৃতদেহ বহন করিয়া সমুদ্র বাহিয়া পশ্চিমমুখে তাঁহার নৌকাখানি চলিতেছে। নৌকার উপরে সজ্জিত চিতানলে বালডারের দেহখানি ধীরে ধীরে পুড়িতেছে। বালটিক সাগরের আঁধার পৃষ্ঠ সেই চিতালোকে দীপ্ত হইতেছে। রাবণের চিতা আজও নিবায় নাই। বালডারের চিতা কি নিবাইয়াছে? দুরন্ত শীতের মধ্যভাগে যখন ভূমণ্ডলের উত্তরভাগ দিবালোক-বর্জ্জিত হয়, ক্ষীণপ্রভ দিবাকর যখন দক্ষিণাকাশে দেখা দেন বা দেখা দেন না, সেই সময় নোর্স জর্ম্মানেরা সে দিন পর্য্যন্ত বালডারের চিতা জ্বালিত। সে দিনও ঠিক সেই সময়ে খ্রীষ্টানেরা জোহনের স্মরণার্থ সেই আগুন জ্বালাইত। অদ্যাপি যখন মার্ত্তণ্ড গ্রীষ্ম ঋতুর মাঝখানে দক্ষিণায়ন-গামী হয়েন, তখন ইউরোপের লোকে সেই চিতার অনল জ্বালাইয়া থাকে।

দিবাকর অস্ত গেলেন, আর কি তিনি ফিরিবেন না? বালডারের দেহ ভস্মীভূত হইল, আর কি তিনি পুনর্জ্জীবন পাইবেন না? অমরের কি মৃত্যু

আছে? দেব গিয়াছেন অধোভুবনে পাতালপুরে,—পতিতের উদ্ধারের জন্য, মৃতের পুনর্জীবনদানের জন্য। আপোলো পাতালপুরে নামিয়াছিলেন, আলকেস্তির উদ্ধারার্থ। দায়োনীসস্ পাতালপুরে নামিয়াছিলেন, জননীর উদ্ধারার্থ। থর অধোভুবন গিয়াছিলেন, ফিরিয়াছেন। ওধিন অধোভুবনে গিয়াছিলেন, ফিরিয়াছেন; স্বয়ং খ্রীষ্টদেব নরক প্রবেশ করিয়াছিলেন, আশ্রিতগণকে তুলিয়া আনিবার জন্য। ভয় নাই, আপোলো অধোভুবন হইতে ফিরিয়াছিলেন; বালডারও ফিরিবেন।

মেশায়া আবার আসিবেন। নব জেরুসালেমে তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। কল্কিদেব আবার আসিয়া খড়্গহস্তে ভূভার হরণ করিবেন। শাক্য বুদ্ধ গিয়াছেন; মৈত্রেয় বুদ্ধ আবার আসিবেন। আর্থর কি মরিয়াছেন? পৃথিবীর প্রান্তদেশে আবালন দ্বীপে তিনি অবস্থান করিতেছেন; সেখানে মর্ত্ত্যভূমির ঝঞ্ঝাবায়ু বহে না, সেখানে সারা বৎসর সমীরণ সুরভি বহন করে, সারা বৎসর সেখানে বসন্তের ফুল ফুটে। সময় হইলে আর্থর আবার ফিরিবেন।

দিবাকর চিরতরে অস্ত যান নাই। কাল আবার তিনি ফিরিবেন। আবার তাঁহার মস্তকোপরি কনক-মুকুট জ্বলিবে; আবার স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলে তাঁহার শিরোদেশ শোভিত হইবে। আঁধার ও মেঘ ও কুজ্ঝটিকা তাঁহার উদয়ে বাধা দিবে; কিন্তু তীব্র করজালে সকল বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আকাশপথে দিগ্বিজয়ী বীরের ন্যায় তিনি চলিতে থাকিবেন। মহাবীর অদূসীয়স ট্রয় নগরে পরস্ত্রীধর্ষকের দমনের জন্য গিয়াছেন। সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, মহাসাগর পার হইয়া স্বদেশে তিনি ফিরিয়া আসিবেন। পেনিলপী, তোমার চিন্তা নাই; তোমার পাণিস্পর্শলোভী দুরাত্মাদিগের যথাকালে দমন হইবে। আকাশপটে কি দেখিতেছ? বৃষ রাশি যখন পশ্চিম দিকে অধঃপতিত ও অস্তগামী, মধ্যাকাশে সিংহ রাশি তখন উজ্জ্বল প্রভায় জ্যোতিষ্মান্। তৎপশ্চাৎ কন্যারাশি; সিংহপৃষ্ঠে কন্যাকুমারী; তিনি মহিষমর্দ্দিনীরূপে মহিষবৃষকে মর্দ্দন করিতেছেন। নীলাকাশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যোমগঙ্গা প্রবহমাণ; উত্তরাকাশে সপ্তর্ষিগণ যজ্ঞনিযুক্ত; যজ্ঞভূমিতে অগ্নিদেব স্বাহাদেবীর রূপমুগ্ধ; তাঁহার সিক্ত তেজ আকাশগঙ্গায় স্খলিত হইয়াছিল। বিজনে গঙ্গাতীরে শ্বেত পর্ব্বতগুহায় শরবনে কুমারদেবের উৎপত্তি হইল; ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁহার জাতক্রিয়া সম্পাদন করিলেন;

কৃত্তিকাগণ তাঁহাকে বর্দ্ধিত করিলেন; কন্যাকুমারী তাঁহাকে পুত্রত্বে গ্রহণ করিলেন; দেবগণ তাঁহাকে সৈনাপত্যে অভিষেক করিলেন; দেবসেনাপতি তারকাসুরকে জয় করিবেন; দেবগণ স্বপদে স্থির হইবেন। মহাভারতে বনপর্ব্ব খুলিয়া দেখ, তারকাসুরই মহিষাসুর; আকাশপটে চাহিয়া দেখ, ব্যোমগঙ্গার অপর পারে তারকারূপী মহিষবৃষ যখন অধঃকৃত ও মর্দ্দিত হইতেছে, কৃত্তিকাগণ গঙ্গাতটে দাঁড়াইয়া আছেন, সপ্ত ঋষি দূর হইতে চাহিয়া রহিয়াছেন, সিংহপৃষ্ঠে কন্যা তখন মধ্যগগনে জ্যোতির্ম্ময়ী।

বিজন গুহামধ্যে কুমারীগর্ভে নরনারায়ণের জন্ম হইয়াছে। বেথলহীমে তারকার উদয় হইয়াছে। প্রাচী হইতে ঋষিগণ অর্ঘ্যহস্তে পূজা করিতে যাইতেছেন। দুরাত্মা হেরডের আজ্ঞাকারী অনুচরগণ তাঁহার অন্বেষণে শিশুহত্যায় নিযুক্ত। মিশর দেশে তিনি গুপ্ত রহিবেন। শয়তান তাঁহাকে একাকী পাইয়া প্রলোভিত করিবে; শয়তান তাঁহাকে ভুলাইতে পারিবে না। সরীসৃপরূপে শয়তান এত দিন মানবের পদে দংশন করিতেছিল; মানবরূপী নারায়ণ এখন তাহার মস্তকে পদাঘাত করিবেন। তিনি মেষপাল; মানবজাতি তাঁহার মেষ। মায়াদেবীর কুক্ষিভেদ করিয়া তথাগত গর্ভস্থ হইয়াছিলেন; লুম্বিনীর বিজন উদ্যানে শালতরুতলে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। ঋষি অসিতদেবল তাহা জানিতে পারিয়াছেন; অসিতদেবল শাক্যশিশুর পূজা করিতে যাইতেছেন। শিশু শাক্য বুদ্ধ হইবেন, জগৎকে প্রবোধিত করিবেন। তিনি গোপাপতি; গোপার প্রেমশৃঙ্খল তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। মার-সেনা তাঁহার নিকট পরাভূত হইবে; মার-বধূগণ তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পারিবে না। কাশ্যপ-গৃহে তিনি কালিক নাগকে বশীভূত করিবেন। দেবকীগর্ভে নারায়ণের জন্ম হইয়াছে। কারাগৃহের অন্ধকারে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন; গোপগৃহে গুপ্ত হইয়া তিনি রক্ষিত হইয়াছিলেন; শিশুঘাতক কংসপ্রেরিত আততায়িগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনে তিনি ধেনু চরাইতেন; তিনি গোপসখা গোপীকান্ত গোপাল; গো-গোপকে রক্ষার জন্য তিনি কালিয় সর্পের দমন করিয়াছিলেন; কালিয়ের শিরোদেশে পদাঘাত করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। গোপীর প্রেমরজ্জু তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই; অরাতিনিধনের জন্য তিনি মথুরায় গিয়া আত্মপ্রকাশ করেন; কেন না, তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে হইবে; ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে সম্ভূত হন। মিত্রদেব

গিরিগুহায় জন্মিয়াছিলেন; গুহামধ্যে তাঁহার পূজা হয়; তিনি মহিষবৃষকে হত্যা করেন। তিনি মানবের ত্রাণকর্ত্তা; অছুর মজ্‌দের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি মানবজাতির পাপমোচন ভিক্ষা করেন। বিজন দ্বীপমধ্যে তালতরুতলে লীতোদেবীর গর্ভ হইতে আপোলো দেব ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন; তিনি মানবজাতির প্রতি করুণাময়; তিনি পাইথন নাগকে বিনষ্ট করেন; ডেলফি নগরে সমবেত হইয়া গ্রীকগণ তজ্জন্য মহোৎসবে যোগ দিত। দেবরাজ ইন্দ্র অহিরূপী বৃত্রের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; মরুদ্গণ তাঁহার সহায় ছিলেন। দারুণ শ্বাস ত্যাগ করিয়া অহি পতিত হইয়াছিল।

মানবজাতি, উত্থান কর; দিবাকর উদিত হইয়াছেন; দিবাকরের রথচক্র মহাকালের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছে। উত্তর হইতে দক্ষিণে, দক্ষিণ হইতে উত্তরে তাঁহার রথচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়া মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর মহাকালদেহে অঙ্কিত করিয়া চলিতেছে। উত্তরায়ণের পর দক্ষিণায়ন; দক্ষিণায়নের পর উত্তরায়ণ; যাত্রার পর পুনর্যাত্রা। অদ্য আষাঢ়ী শুক্ল-দ্বিতীয়া; গ্রীষ্ম ঋতুর অবসান হইয়াছে; বর্ষার বারিধারায় বসুধার তপ্ত দেহ সিক্ত ও স্নিগ্ধ হইতেছে। জগন্নাথের রথযাত্রা আজি আরম্ভ হইয়াছে; যে যেখানে আছ, রথাস্থিত বামনমূর্ত্তির পুরোবর্ত্তী হইয়া জয়ধ্বনি সহ রথ-রজ্জুতে করার্পণ কর। অদ্য শরতের মহাষ্টমী; বর্ষাপগমে বসুধা নির্ম্মল মুখশ্রী ধরিয়া হাসিতেছে; মহাশক্তির বোধন হইয়াছে; প্রবুদ্ধ শক্তির আরাধনা কর। অদ্য কোজাগরী পূর্ণিমা; মহালক্ষ্মীর চরণক্ষেপে জগৎ-শতদল বিকশিত হইয়াছে; এমন রাতে কি ঘুমায়? নারিকেলোদক পান করিয়া অক্ষক্রীড়ায় আজি রাত্রি যাপন কর। অদ্য শারদোৎফুল্লমল্লিকা কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী; বসুন্ধরা জ্যোৎস্নাবিধৌত শুভ্র বসন পরিধান করিয়া, যৌবনরাগ বিকাশ করিয়া প্রিয়তমের প্রতি অভিসারে চলিয়াছে এবং প্রিয়সঙ্গমে রাসরসে হাসিতেছে ও তরল তরঙ্গে নাচিতেছে। অদ্য উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি; হিম ঋতু অবসানোন্মুখ; দেবগণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। তনয়েশ্বর মানবরূপে অবতীর্ণ হইবেন; দেবগণ তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। অর্দ্ধ পৃথিবী আনন্দে উৎফুল্ল; ঘরে ঘরে আলো জ্বাল, সুরাপাত্রে মদিরা ঢাল। আজি বাসন্তী পঞ্চমী; মলয় বহিয়াছে, কুহু স্বর শোনা গিয়াছে, বাগ্বাদিনী বীণায় ঝঙ্কার দিয়াছেন। আজ আবার বাসন্তী পূর্ণিমা, মদনের মহোৎসবদিন। গোপীসখা সেই মহোৎসবে যোগ দিয়াছেন। আজি

বহ্ন্যুৎসবের দিন; আকাশে ধধূপ উৎক্ষেপ কর। ফাগ কই, রঙ কই, নরনারী যে হোলিরঙ্গে মাতিয়াছে। অদ্য মহাবিষুবসংক্রান্তি; বর্ষচক্র এক পাক ঘুরিয়া আসিল; বৎসরের পর বৎসর এইরূপ পাকের পর পাক দিয়া মহাদেবের কালচক্র ঘুরিয়া আসিতেছে; আজি চড়ক-গাছে ঘুরিবার দিন। ঢাক বাজাও, আর করতালি দাও, আর আনন্দে নৃত্য কর।

দিনের পর রাত্রি; রাত্রির পর দিন। জন্ম হয় মৃত্যুর জন্য; কিন্তু মৃত্যু হয় আবার জন্মের জন্য। সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ান্তে সৃষ্টি। মনুষ্য, চিন্তা করিও না; প্রকৃতির এই বিধান; প্রকৃতির পূজা কর। প্রকৃতি তোমাদের জননী; প্রকৃতিজননী তোমাদের জন্য আত্মোৎসর্গপরায়ণা। বিশ্বসৃষ্টি এক মহাযজ্ঞ। এই যজ্ঞে সহস্রশীর্ষা পুরুষ আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেবগণ তাঁহাকে পশুরূপে কল্পনা করিয়া সেই যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন। তাঁহার শীর্ষ হইতে দ্যুলোক, নাভি হইতে অন্তরিক্ষ, পদদ্বয় হইতে ভূমি, শ্রোত্র হইতে দিক্‌সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রজাপতিকন্যা সতী যজ্ঞে প্রাণ দিয়াছিলেন; মহাদেব সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছেন; নারায়ণ চক্র দ্বারা সতীদেহ ছিন্ন করেন; সতীর ছিন্নাঙ্গ ভারতভূমি ব্যাপিয়া আছে। সতী হৈমবতী উমারূপে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। মহাদেব অসীরিস মানবের হিতার্থ ভ্রাতা টাইফনের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছিলেন; দুরাত্মা টাইফন তাঁহার দেহ খণ্ডে খণ্ডে ছিন্ন করিয়াছিল; মহাদেবী আইসিস সেই ছিন্ন অঙ্গের অনুসন্ধানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন; মিশরদেশে নীল নদীর উভয় তটে সেই ছিন্ন অঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; যেখানে যেখানে ছিন্ন খণ্ড পতিত হইয়াছিল, তাহা মহাপীঠে পরিণত হইয়াছিল। অসীরিস পুনর্জন্ম লাভ করেন; আজিও তিনি দণ্ডধর দেবরাজ; পুণ্যের পুরস্কার, পাপের তিরস্কার তিনি বিধান করেন। আত্মোৎসর্গ বিনা যজ্ঞ হয় না; যজমান যজ্ঞে আপনাকে পশুরূপে উৎসর্গ করেন; যজ্ঞে তিনি আত্মনিষ্ক্রয়স্বরূপে পশু বধ করেন। যজ্ঞের বধ বধ নহে। মানবের পাপপ্রক্ষালনের জন্য বলির প্রয়োজন। বিধাতা নিজ পুত্রকে বলিস্বরূপ ধরায় পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার রক্তে ধরাতল পবিত্র হইয়াছে; মানবের পাপরাশি ধুইয়া গিয়াছে। মৃত্যুর পর তিনি নব জীবন লাভ করেন। শেষের সেই দিনে তিনি পিতার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিবেন। অতএব বলিদানের আবশ্যকতা।

শোভাময়ী শরৎসুন্দরী উদ্ভিন্নযৌবনা কুমারীর মত বনস্থলী আলো করিয়া বিচরণ করে। কোথা হইতে দুরন্ত শীত আসিয়া সুন্দরীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। জননী বসুন্ধরা কাঁদিতে থাকেন ; জননী তাঁহার নন্দিনীর শোকে বিষাদের কুজ্‌ঝটিকায় মুখ ঢাকিয়া, সর্ব্বত্র তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ান। সুন্দরী পার্সিফনী সহচরীপরিবৃতা হইয়া বনে বনে ফুল তুলিয়া বেড়াইতেছিলেন। অকস্মাৎ ধরাতল বিদীর্ণ হইল। ভূগর্ভ হইতে কোন অদৃশ্য পুরুষের হস্ত উঠিয়া কুমারীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। সখীগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। শ্রীরূপিণী মাতা দীমিতীর হাহাকার করিতে লাগিলেন। সাক্ষী ছিলেন চন্দ্রমা, —তাঁহার তমসাবৃত গুহার মধ্য হইতে ; সাক্ষী ছিলেন সূর্য্য,—তাঁহার সুদূর নির্জ্জন শিবিরাবাসে। জননী দীমিতীর কন্যাশোকে আলো হাতে কাঁদিতে কাঁদিতে জল-স্থল অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে সন্ধান দিলেন। অধোভুবনে প্রচণ্ড দেবরাজ প্লুটো তাঁহার কন্যাকে লইয়া গিয়াছেন। জননী দীমিতীর ক্রোধ করিলেন। সংসার হইতে লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান করিলেন। গাছে আর ফুল হয় না ; ভূমি আর শস্য দেয় না ; জীবকুল নিরানন্দ হইল। দেবরাজ ভীত হইলেন। মাতার হস্তে কন্যাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। সেই অবধি বৎসরের মধ্যে আট মাস কন্যা মায়ের নিকট থাকে ; চারি মাস অধোভুবনে দেবরাজের নিকট বাস করে। চারি মাস পৃথিবী শ্রীহারা হইয়া কাঁদে ; আট মাস পৃথিবী শ্রীযুক্তা হইয়া হাসে। ঋষিশাপে লক্ষ্মী স্বর্গ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন ; ত্রিভুবন লক্ষ্মী হারাইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইল। ত্রিভুবনে হাহাকার উঠিল। দেবগণ সমুদ্র মন্থন করিয়া লক্ষ্মীকে পাইলেন। লক্ষ্মী সুধাভাণ্ড-হস্তে উঠিলেন ; সুধার সহিত হলাহলও উঠিল।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া দীমিতীর কন্যা পাইয়াছিলেন। এমনই করিয়া দেবী আইসিস পতি অসীরিসকে পুনর্জীবন দান করিয়াছিলেন। সহজে কি তিনি পতি পাইয়াছিলেন? আইসিসকেও তাঁহার অনুসন্ধানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। সাবিত্রী সতীও সত্যবান্‌কে যমের হাত হইতে ফিরাইয়া আনেন ; সেও কি সহজে? তিনি ভর্ত্তৃবিনা সুখ প্রার্থনা করেন নাই, ভর্ত্তৃবিনা তিনি দ্যুলোক প্রার্থনা করেন নাই। দেবী আস্ফুজিৎ আদনিসকে নিহত দেখিয়া শোকবিহ্বল হইয়াছিলেন ; কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি আদনিসকে ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। বালডার মৃত্যুর পর কোথায় অবস্থান করিতেছেন? সহজে কি তিনি সেখান হইতে ফিরিবেন? যে

যেখানে আছ, রোদন কর ; বনের পশু, গাছের পাখী, তরু লতা, যে যেখানে আছ, রোদন কর। মাটি ফাটিয়া শোকাশ্রুর উৎস উঠিতেছে ; বালডারের জন্য নির্জীব শিলা দ্রবীভূত হইতেছে।

মরণের রহস্য সকলের উপর। মানুষ মরিয়া কোথায় যায় ? জীয়ন্তে কি সেখানে যাওয়া যায় না ? সে পুরী কোথায় ? বৈতরণীর অপর পারে, বাল্‌টিক সাগরের অপর পারে। বৈতরণীর অপর পারে যমদ্বার ; মহাঘোরে যমদ্বারে শ্যাম-শবল সারমেয়দ্বয় দাঁড়াইয়া আছে। চিন্বট সেতুর পার্শ্বে ঘোরদংষ্ট্র সারমেয় দাঁড়াইয়া আছে। অধোভুবনে যমদ্বারে কার্ব্বেরস কুক্কুর প্রহরী আছে। জাহ্নবীনীরে প্রিয়তমের ভস্মরাশি ভাসাইয়া দাও ; বালডারের দেহখানি ভেলায় চাপাইয়া, আগুন ধরাইয়া বাল্‌টিকের জলে ভাসাইয়া দাও ; হয়ত সেই পুরীতে পৌঁছিতে পারে।

যাহাদিগকে ভাল বাসিতাম, তাহারা কে কোথায় আছে, কে জানে ? কোন্ আঁধার পুরে তাহারা বসতি করিতেছে ? আঁধারে কি তাহারা পথ চিনিতে পারিবে ? হাতে হাতে মশাল ধর ; ঘরে ঘরে আলো জ্বাল। আজি কার্ত্তিকী অমাবস্যা ; প্রিয়গণ গন্তব্য পথ চিনিতে পারিবে না ; দীপমালায় অন্ধকার বিনষ্ট কর। গঙ্গাস্রোতে দীপগুলি ছাড়িয়া দাও। স্রোতে তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাক। প্রেতপুরুষগণ দীপগুলি ধরিয়া লইবেন। ব্যোমবহ্নি ঊর্দ্ধমুখে ছাড়িয়া দাও। পিতৃপক্ষ ব্যাপিয়া বারিধারায় পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছি ; আজি অমাবস্যার অন্ধকারে মহালয়া ; যমলোক ত্যাগ করিয়া যাঁহারা মহালয়ে আসিয়াছেন, তাঁহারা উজ্জ্বল-জ্যোতি ব্যোম-বহ্নির সাহায্যে পথ চিনিয়া লউন।

শুধু শোক করিলে যে যায়, সে কি ফিরিয়া আসে ? মৃত্যুর উপরে যে রহস্যের আবরণ আছে, তাহা উন্মোচন করিতে হইবে। সে বড় দুর্ভেদ্য রহস্য। বুদ্ধিকে প্রদীপ্ত করিতে হইবে ; তবে মরণতত্ত্ব জানিবে। যদি মরণতত্ত্ব জানিতে চাও, নিজে অমৃত পান কর। ঋষিগণ সোম পান করিয়া অমৃত লাভ করিয়াছিলেন। সোমলতা হইতে অমৃত নিষ্কাশন কর ; দ্রাক্ষালতা হইতে অমৃতরস বাহির কর। গৌড়ী-পৈষ্টীও অভাবে চলিতে পারিবে। অমৃতপানে অমরত্ব লাভ করিবে, বুদ্ধি প্রদীপ্ত হইবে, আবরণ অপসৃত হইবে, রহস্যের উচ্ছেদ হইবে। ইহার নাম গুপ্ত বিদ্যা ; এই বিদ্যালাভে যথাবিধি দীক্ষা চাই। যে-সে ইহাতে অধিকারী নহে। দীক্ষিতের

মধ্যে জাতিভেদ নাই ; ভৈরবীচক্রে সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম। সাবধান, অনধিকারী যেন এখানে প্রবেশলাভ না করে। পশ্বাচারী যেন বীরত্বের স্পর্দ্ধা না করে। খ্রীষ্টের শোণিতধারা যে খর্পরমধ্যে গৃহীত হইয়াছিল, যে কেহ তাহা দেখিতে পায় না। শুদ্ধসত্ত্ব সার গালাহাড তাহার দর্শন পাইয়াছিলেন। খ্রীষ্টের শোণিত বেদির উপর মদিরারূপে বিদ্যমান। দীক্ষিত তাহা পান করেন ; অপরের তাহাতে অধিকার নাই।

শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া, ঢাকঢোল বাজাইয়া, নৃত্য-গীত-উৎসব, হাসি-কান্না দ্বারা দেবীর পূজা কর। ধূপ ধূনা জ্বালাও ; পশুরক্তে নররক্তে মহীতল সিক্ত কর ; তাহাতে দেবীর তৃপ্তি হইতে পারে। প্রাচীন ফিনিশিয়ায় দেবতার তর্পণ কিরূপে হইত ? স্বয়ং এল দেব জগতের হিতের জন্য আপন পুত্রের কণ্ঠশোণিতে মহীতল সিক্ত করিয়াছিলেন। ফিনিকেরা তাহা জানিত : যখনই কোন দৈবী অথবা মানুষী আপৎ আপতিত হইয়া স্বদেশের জন্য আশঙ্কা জন্মাইত, তখনই পিতা আপন পুত্র আনিয়া দিত, মাতা আপন কন্যা আনিয়া দিত। নরকণ্ঠনিঃসৃত তপ্ত শোণিতে দেবীর তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা হইত। কিন্তু তাহাতেও বুঝি মহাদেবীর তৃপ্তিলাভ ঘটিত না। তিনি অন্যবিধ বলি উপহার চাহিতেন, সে উপহার বীভৎস।

গুপ্তবিদ্যায় যাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা মন্দিরের দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া অনধিকারীর চক্ষু হইতে সাধনাকে গুপ্ত রাখেন। সেই দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিবার প্রয়োজন নাই। গুপ্ত সাধনা গুপ্ত থাকুক। বাবিলনে মাইলিটা দেবীর মন্দিরে, ফিনিকেরা আস্তার্তি দেবীর মন্দিরে যে সকল অনুষ্ঠান করিত, সাইপ্রস দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী সাগরফেনোদ্ভবা আফ্রজিৎ দেবীর উপাসনায় যাহা অনুষ্ঠিত হইত, দায়নীসস দেবের পূজোপলক্ষে প্রাচীন থ্রেসে ইতর ভদ্র নর-নারী একত্র উপস্থিত হইয়া যে সকল আচরণ করিত, পূর্ব্বকালে খ্রীষ্টান নর-নারী আগাপীর প্রীতিভোজে সমবেত হইয়া যে অনুষ্ঠান সম্পাদন করিত, বৌদ্ধ-বিহারমধ্যে আর্য্যতারা ও অনবদ্যাঙ্গী প্রজ্ঞাপারমিতার পূজার্থ সমবেত ভিক্ষুগণ ও ভিক্ষুণীগণ যে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিত, তাহা মানবের ইতিহাসে অতীত ঘটনা নহে। এখনও অন্তঃস্রোতস্বিনী ফল্গুধারার মত নরসমাজে সেই স্রোত বহিয়া আসিতেছে ; কবে তাহার গতি রুদ্ধ হইবে জানি না। তবে শুষ্ক বালুকা উৎখাত করিয়া সেই প্রবাহের আবিষ্কারের কোন প্রয়োজন নাই। প্রকৃতি-পূজার মন্দিরদ্বার অর্গলরুদ্ধ রহুক।

ধর্ম্মের জয়

উৎকট প্রত্নতাত্ত্বিকেরাও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না যে, অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর ভূমণ্ডলে পাঠশালার সৃষ্টি হইয়াছে; এবং এই তিন হাজার বৎসর ধরিয়া গুরুমহাশয়পরম্পরা বিনীত শিষ্যগণকে যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই নীতি অভ্যাস করিতে উপদেশ দিয়া আসিতেছেন। আমাদের পুরাণশাস্ত্রে যমরাজ ধর্ম্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; এবং দণ্ডপাণি গুরুমহাশয়ে সেই দক্ষিণ-দিক্‌পালের মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া আতঙ্ক-বিহ্বল ছাত্রবর্গ ধর্ম্মের তাৎকালিক জয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয় বটে; কিন্তু সংসারক্ষেত্রে সর্ব্বত্র ধর্ম্মের জয় হওয়া উচিত কি না, তদ্বিষয়ে তাহাদের মনের মধ্যে একটা সংশয় বাধিয়া যায়। নতুবা মনুষ্যগণ এত কাল ধরিয়া শৈশব কালে যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই নীতি কণ্ঠস্থ করিয়া আসিলেও আজিকার দিনে ধর্ম্মকে তাঁহার চারিখানি পায়ের মধ্যে তিনখানি হারাইয়া নিতান্ত খঞ্জের ন্যায় বিচরণ করিতে হইত না। নতুবা এই তিন হাজার বৎসরে মনুষ্যজাতির অন্য বিষয়ে এত অদ্ভুত উন্নতি সত্ত্বেও ধর্ম্মবিষয়ে তাহার উন্নতি আদৌ ঘটিয়াছে কি না, সে বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিত সংশয় করিতেন না।

তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন, এখনও ঠিক তেমনই আর্ত্তের ও ব্যথিতের করুণ স্বর দয়াময় জগৎকর্ত্তার অভিমুখে উত্থিত হইতেছে; কিন্তু জগৎকর্ত্তার হৃদয় তাহাতে বিচলিত হইতেছে না। ঠিক তেমনই ভাবে সবল দুর্ব্বলের হৃদয়শোণিত পান করিয়া আপনার তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কোন ন্যায়পরায়ণ বিধাতা সেই অত্যাচারের প্রতীকার করিতেছেন না। ঠিক তেমনই ভাবেই অধর্ম্ম অভ্যুত্থিত হইয়া অহরহঃ ধর্ম্মের গ্লানি সম্পাদনে নিযুক্ত রহিয়াছে; কিন্তু কোন দণ্ডদাতা সাধুর, পরিত্রাণের ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য অবতীর্ণ হইতেছেন না। দুই সহস্র বৎসর হইতে চলিল, ইহুদি জাতির মধ্যে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের রাজ্য অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই আশ্বাসবাণী ও অভয়বাণী প্রচার করিয়া অশান্তিপূর্ণ নরসমাজে শান্তির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎপ্রতিষ্ঠাপিত ধর্ম্মসমাজেই অধর্ম্ম ধর্ম্মের ধ্বজা আন্দোলন করিয়া, ধর্ম্মের অভিনয় করিয়া ভূমণ্ডলের বিশাল রঙ্গমঞ্চের উপর আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে; ধর্ম্ম তাহা অকাতরে সহিয়া যাইতেছেন।

শ্রোতৃবর্গ কৃপা করিয়া মার্জ্জনা করিবেন, আমরা এক বার যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই চিরপ্রচলিত নীতিবাক্যের যাথার্থ্য বিচারে অথবা তাৎপর্য্য বিচারে প্রবৃত্ত হইব। ঐ নীতিবাক্যের যাথার্থ্যে আমি কোনরূপ সংশয় প্রকাশ করিতেছি, এই মনে করিয়া শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যদি কেহ ইতিমধ্যেই হতভাগ্য প্রবন্ধপাঠকের প্রতি রক্তকটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট আমি সহিষ্ণুতার ভিখারী হইতেছি।

আমি পূরা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, এই সভামধ্যে উপস্থিত এমন কেহই নাই, যিনি—ধর্ম্মের জয় হউক, ইহা অকপটে মনের সহিত বাঞ্ছা করেন না। ধর্ম্মের জয়ে আনন্দলাভ সুস্থ মানবচিত্তের পক্ষে স্বাভাবিক। অতিবড় অধার্ম্মিক, শাস্ত্রে যাহাকে মহাপাতকী বা অতিপাতকী বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সে ব্যক্তিও ধর্ম্মের পরাভবে মন ভরিয়া উল্লসিত হয় না, এরূপ সন্দেহ করিবার প্রচুর কারণ আছে। কিন্তু জগৎপ্রণালীর কি বিচিত্র বিধান, আমরা যাহা বাঞ্ছা করি, তাহা সর্ব্বত্র ঘটে না। ধর্ম্মের জয় আমরা বাঞ্ছা করি বটে, কিন্তু ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র ঘটে না, ইহা সত্য কথা। ধর্ম্মের জয় যদি প্রত্যক্ষ নিত্য ঘটনা হইত, তাহা হইলে ক্ষেত্রবিশেষে কোন অধম পাতকীকে অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে পাইতে দেখিলে, আমরা এত উৎসাহের সহিত, এত আনন্দের সহিত তাহা ধর্ম্মের জয়ের দৃষ্টান্ত-স্বরূপে গল্প করিয়া বেড়াইতাম না। অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে ফলিলে আমাদিগকে মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য এত চিন্তিত হইতে হইত না। যদি মনুষ্য মাত্রই চক্ষুর উপর দেখিতে পাইত, অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে ভোগ করিতে হয়, যদি নিজ জীবনে ও প্রতিবেশীর জীবনে ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ হইত, তাহা হইলে অধর্ম্ম এরূপ দর্পের সহিত বুক ফুলাইয়া ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে সাহসী হইত না। তাহা হইলে অধার্ম্মিককে দমনে রাখিবার জন্য রাজার সর্ব্বদা উদ্যতদণ্ড হইয়া থাকিবার প্রয়োজন হইত না। শান্তিরক্ষার জন্য অশান্তির অবতার পুলিস প্রহরীকে রাজার পক্ষ হইতে বেতন ও প্রজার পক্ষ হইতে উৎকোচ দিয়া নিযুক্ত রাখিবার প্রয়োজন হইত না। ধর্ম্মাধিকরণের প্রাচীরমধ্যে বিচার-কর্ত্তাকে ফরিয়াদির অভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে হইত। রাজব্যয়ে নির্ম্মিত কারাগারগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানমতে কালেজের ছাত্রাবাসে পরিণত করা এবং জেল-দারোগাদিগকে কালেজ-ইন্‌স্পেক্টারিতে নিযুক্ত করা সহজ হইত। সমাজ-শাসনের প্রয়োগের অবকাশ না পাইয়া সমাজ-

পতিগণ কর্ম্মাভাবে তাস-পাশাকে দুর্ম্মূল্য করিয়া তুলিতেন। নীতিকথার পুস্তকগুলি ক্রেতার অভাবে দোকানের মধ্যে কীট-দষ্ট হইতে থাকিত; যাজকেরা যজমানের অভাবে হলকর্ষণ আরম্ভ করিতেন; ধর্ম্মপ্রচারকেরা শ্রোতার অভাবে থিয়েটারের দল বাঁধিতেন; সন্ন্যাসীরা শিকারের অভাবে রোমন্থন করিতে আরম্ভ করিতেন; তাঁহাদের গেরুয়া বসন যাদুঘরের গ্লাস-কেসের মধ্যে শোভা পাইত।

কিন্তু মানবজাতির দুর্ভাগ্যক্রমে এ সকল কিছুই ঘটে নাই। রাজশাসন, সমাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন অধর্ম্মকে দমনে রাখিবার জন্য নিয়ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। পীনাল কোডে পুরাতন ধারার সংশোধনের জন্য ও নূতন ধারা বসাইবার জন্য রাজমন্ত্রিগণ মন্ত্রণা আঁটিতেছেন; কারাগারের পরিধি সম্প্রসারিত করিবার জন্য এঞ্জিনীয়ারগণ নক্সা টানিতেছেন; এণ্ট্রান্স কোর্সের মধ্যে কয় পাতা ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ও নীতিশিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত, তজ্জন্য সেনেট সভায় বিতণ্ডা চলিতেছে; গুরুমহাশয়েরা ছাত্রের পৃষ্ঠে বেত্রপ্রয়োগে ধর্ম্মের জয়ের নমুনা দেখাইয়া গাঁজার পয়সা সংগ্রহ করিতেছেন। কাজেই বলা চলে না, ধর্ম্মের জয় সংসারে নিত্য ঘটনা। অধর্ম্মের শাস্তি হাতে হাতে ঘটিলে এ সকল কিছুই ঘটিত না; রাজশাসন ও সমাজশাসন ও ধর্ম্মের শাসনের কিছুই প্রয়োজন হইত না।

তথাপি আমরা প্রতি নিশ্বাসেই বলিয়া থাকি ও বলিতে চাহি,—যথা ধর্ম্ম তথা জয়। জগৎপ্রণালীর অন্তর্নিহিত নিগূঢ় বিধানই যেন এইরূপ। ঐ বিধান মানব-কল্পিত বিধান নহে। জগদ্‌যন্ত্রের নিয়ামক যদি কেহ থাকেন, তিনি স্বয়ং ঐ বিধান বিহিত করিয়াছেন। উহা রাজার ও সমাজপতির ও ধর্ম্মপ্রচারকের কোন অপেক্ষা রাখে না। যে অধার্ম্মিক, সে রাজার চোখে ধূলা দিয়া রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে; সে সমাজপতির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারে; সে ধর্ম্মপ্রচারকের সম্মুখে ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া সার্টিফিকেট পাইতে পারে; কিন্তু তাহার পশ্চাতে, তাহার দৃষ্টির অন্তরালে, তাহার নিকট সম্পূর্ণ অদৃশ্য ভাবে ধর্ম্মের ফাঁদ পাতা রহিয়াছে; তাহা এড়াইবার কোন উপায় নাই। সেই ফাঁদে তাহাকে পা দিতেই হইবে। আজি দিতে না হউক, কালি দিতে হইবে; কালি দিতে না হউক, পরশু দিতে হইবে। সেই ফাঁদ সে কিছুতেই এড়াইতে পারিবে না। সেখানে এক দিন ধরা পড়িতেই হইবে। সেই দর্শনের অগোচর

নিয়ন্তার ও শাস্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম কারবার কোন উপায় নাই ; তাঁহাকে ফাঁকি দিবার কোন উপায় নাই ; তাঁহা হইতে গোপনে রহিবার কোন উপায় নাই ; মানুষকে ফাঁকি দেওয়া চলে, রাজাকে ফাঁকি দেওয়া চলে, সমাজকে ফাঁকি দেওয়া চলে, মনুষ্য-জাতিকে ফাঁকি দেওয়া চলে ; কিন্তু এই জগদ্বিধানকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। এই জগদ্বিধানের নির্ম্মম হস্ত সকল সময়ে ক্ষিপ্রতা না দেখাইতে পারে, কিন্তু উহার সন্ধান অব্যর্থ। উহা অজ্ঞের নিকট অন্ধ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু উহা নিবিড় অন্ধকারেও দেখিতে পায়। উহা কখন্ কোথা হইতে কিরূপে অজ্ঞাতসারে অজ্ঞাত প্রণালীতে কাজ করে, তাহা নির্ব্বোধ মানবের বুদ্ধির অতীত ; কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে উহা কাজ করিতে ভুলে না। উহা অভ্রান্ত, উহা সদা-জাগ্রত, উহা সর্ব্বদা চেতন।

যখন আমরা যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই নীতিবাক্যের উল্লেখ করি, তখন আমরা সেই অদৃশ্য দুর্বোধ্য জগদ্বিধানকেই লক্ষ্য করিয়া উহার উল্লেখ করি। অপরাধ করিলে রাজা দণ্ড দিতে পারেন বা নাও পারেন ; সমাজ শাস্তি দিতে পারে বা নাও পারে ; রাজাকে উৎকোচ দেওয়া সহজ, সমাজকে প্রতারিত করা সহজ ; কিন্তু যদি রাজার ভয় না থাকিত, সমাজের শাসনের ভয় যদি একেবারেই না থাকিত, তাহা হইলেও ঐ জাগতিক বিধান হইতে কোন পাপী অব্যাহতি লাভ করিতে পারিত না। যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই নীতিবাক্যের অর্থই ইহাই। উহার অন্যবিধ অর্থ করিলে উহাকে খাটো করা হয় ; উহার অন্যরূপ তাৎপর্য্য বুঝিলে উহার গৌরব থাকে না।

উহার অর্থ উহাই বটে ; এবং অন্য অর্থ করিলে উহার গৌরব থাকে না, তাহাও ঠিক কথা ; কিন্তু বস্তুতই কি জগতের বিধান এইরূপ ? বস্তুতই কি পাপী জগদ্বিধানকে ফাঁকি দিয়া পার পাইতে পারে না ? অমুক ফাঁকি দিতে পারে নাই, অমুক পারে নাই ; দেবদত্ত পারে নাই, যজ্ঞদত্ত পারে নাই, বেণ নহুষ হইতে জয়চন্দ্র মীরজাফর পর্য্যন্ত পারে নাই ; অথবা অনেকে পারে না, বহু লোকে পারে না, অধিকাংশ লোকে পারে না ; এইরূপ বলিলে ঐ নীতিবাক্যের সার্থকতা থাকিবে না, উহার গৌরব রক্ষিত হইবে না। দেখাইতে হইবে, কোন ব্যক্তিই পারে না : এই বর্ত্তমান ক্ষণে ধরাপৃষ্ঠে যে দেড় শত কোটি মনুষ্য বাস করে, তাহাদের মধ্যে এক জনও ফাঁকি দিয়া এড়াইতে পারিবে না ; ও তাহাদের যে সহস্র-কোটি পূর্ব্বপুরুষ অতীত কালের

কুক্ষিতে লীন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক জনও পারে নাই। যদি এই অতীত অনাগত বর্ত্তমান মনুষ্য-সঙ্ঘের মধ্যে এক জনও এই জগদ্বিধানকে ফাঁকি দিয়া অতিক্রম করিয়া থাকে বা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে ধর্ম্মের পরাভব হইল; সেই ক্ষেত্রে অধর্ম্মের বিজয় হইল; তাহা হইলে ঐ নীতিবাক্য আপনার উচ্চ মহিমা হইতে ভ্রষ্ট হইল। কেন না, ঐ জগদ্বিধান এরূপ বিধান, উহার কোন এক স্থানে অন্যথাভাব কল্পনা করিলে উহার সার্থকতা থাকে না; উহা এক সংক্ষিপ্ত সূত্র, উহার বিকল্প কল্পিত হইতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাহাই? বস্তুতই কি ঐ সূত্রের বিকল্প নাই? বস্তুতই কি অধর্ম্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী? বস্তুতই কি অধর্ম্মের ফল সর্ব্বত্র হাতে হাতে ফলে?

অধর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী হউক না হউক, অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে ফলে না, ইহা অস্বীকার করিয়া ফল নাই। ইহা অস্বীকার করিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে; এবং ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া একটা মিথ্যা কথা বলা নিতান্তই সাজে না। অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে ফলিলে জগতে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে ধর্ম্মের এত দুর্ভিক্ষ হইত না। হাতে হাতে শাস্তি পাইলে এমন সাহসী কেহই নাই, এমন দুর্দ্ধর্ষ কেহই নাই যে, সেই অঙ্কুশতাড়না অহরহঃ সহ্য করিয়াও উন্মার্গগমনে প্রবৃত্ত হইতে পারিত। অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে ফলে না, ইহা সত্য কথা; ইহার অপলাপ চলিবে না।

কাজেই ঘুরাইয়া বলিতে হয়, অধর্ম্মের ফল হাতে হাতে না ফলিতে পারে, কিন্তু অধর্ম্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এই অবশ্যম্ভাবী শব্দ ব্যবহার করিয়া উহাকে অনাগত ভবিষ্যতের গহ্বরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। আজ হউক, কাল হউক বা অন্য দিন হউক, এক দিন না এক দিন অধর্ম্মের ফল ফলিবে; উহা হাতে হাতে সর্ব্বত্র ফলে না—কিন্তু এক দিন না এক দিন ফলে।

ক্লাইবের, না ওয়ারেন হেষ্টিংসের, কাহার ঠিক মনে হইতেছে না, কুকর্ম্ম-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া লর্ড মেকলে এই ধর্ম্মতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, এবং অতিশয় গম্ভীরভাবে বলিয়াছেন, অধর্ম্মটা কিছু নহে, উহার ফল হাতে হাতে ফলে না বটে, কিন্তু ফলে—in the long run অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত। লর্ড মেকলের সজাতীয়েরা দয়াধর্ম্মের নিতান্ত বশীভূত হইয়া উচ্চতর নীতির শিক্ষা দ্বারা এই পতিত জাতির উদ্ধার সাধনের জন্য এ দেশে অবতীর্ণ

হইয়াছেন, এবং লর্ড মেকলে স্বয়ং নিতান্ত করুণাপরবশ হইয়া আমাদের পুরাতন অসভ্য শিক্ষা-প্রণালীর বদলে সভ্যতর শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; অতএব অত্যন্ত বিনয়ের সহিত ও কৃতজ্ঞতার সহিত আমরা তদুপদিষ্ট ধর্ম্মনীতি শিরোধার্য্য করিয়া লইতে বাধ্য আছি, এবং ক্লাইবের ও হেষ্টিংসের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল বিলম্বিত হউক, ইহাই অকপটে আমরা প্রার্থনা করি। কিন্তু এই long run—এই লম্বা দৌড়—কত কালের দৌড়, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন এই ধর্ম্মবিচারে আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। আমরা যে উচ্চতর খ্রীষ্টীয় সভ্যতা গ্রহণের জন্য কখন সাদরে, কখন কর্ণমর্দ্দন সহকারে আহূত হই, সেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের গোড়ায় না কি একটা কথা আছে, মানবজাতির আদিম মাতাপিতার কর্ম্মের ফল সন্ততিকে ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহাতেই যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই নীতিবাক্যের সার্থকতা ঘটিয়াছে। মানবজাতির অতিবৃদ্ধ পূর্ব্বপিতামহ ও অতিবৃদ্ধা পূর্ব্বপিতামহী যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হতভাগ্য সন্তানপরম্পরা এত যুগ ধরিয়া তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আসিতেছে, এবং এই যুগব্যাপী ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত সত্ত্বেও তাহাদিগকে সেই অন্তিম দিনের বিচারের পর নরকের অগ্নিকুণ্ডের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইতেছে। এইরূপে in the long run—অতি লম্বা দৌড়ে মানুষকে তাহার কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। পিতার কর্ম্মের ফল পুত্রকে ভোগ করিতে হয়, পৌত্রকে ভোগ করিতে হয়, এবং যে পর-পুরুষকে সেই মূল দুষ্কৃতকারার সপিণ্ডীকরণও করিতে হয় না, তাহাকেও ভোগ করিতে হয়। এইরূপে যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই নীতিবাক্যের সার্থকতা ঘটে; এইরূপেই জাগতিক বিধানের নৈতিক সামঞ্জস্য ঘটে।

কথাটা মিথ্যা নহে। দুষ্কৃতকারী পিতার কর্ম্মের ফল পুত্রে ভোগ না করে, এমন নহে। কেবল পুত্র কেন, পিতার কর্ম্মফল সাত পুরুষ ধরিয়া ও চৌদ্দ পুরুষ ধরিয়া অধস্তন পুরুষগণের হাড়ে হাড়ে সংক্রমণ করে, তাহার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ডাক্তারের ও প্যাথলজি-বিদ্যার সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হইবে না। নবীন বঙ্গীয় ঐতিহাসিকগণের মুখ চাহিয়া ভয়ে ভয়ে বলিতেছি, বৃদ্ধ নরপতি লক্ষ্মণসেন কি করিয়াছিলেন বা না করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানি না। কিন্তু যদি তিনি তদারোপিত দুষ্কর্ম্মটুকু করিয়া থাকেন, আমরা সপ্ত কোটি বঙ্গবাসী, যাহারা সেন-বংশে জন্মায় নাই, যাহাদের ধমনীতে লক্ষ্মণসেনের শোণিতের এক কণিকা মাত্রও বিদ্যমান নাই, তাহারাও

তাঁহার কর্ম্মের ফল অত্যাপি ভোগ করিতেছে। পিতার কর্ম্মফল পুত্রে ভোগ করে, ইহা সত্য কথা। কিন্তু তাহাতে যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই ধর্ম্মনীতির সার্থকতা হয় কি না, তাহা বিচার্য্য। খ্রীষ্টানেরা প্রত্যেক স্বতন্ত্র জীবের যতটা স্বাধীনতা, যতটা পরের প্রতি অনপেক্ষিতা স্বীকার করেন, আমরা ততটা স্বীকার করিতে চাহি না। আপনাকে সর্ব্বভূতে নিরীক্ষণ করিতে আমরা ভগবদুপদেশ লাভ করিয়াছি; সুতরাং একের কর্ম্মফলে অন্যের শাস্তিলাভ আমাদের নিকট নিতান্ত দুরূহ সমস্যা না হইতে পারে। কিন্তু খ্রীষ্টানের ন্যায় জীবের স্বাতন্ত্র্যবাদী কিরূপে এক অতিপ্রাচীন অতিবৃদ্ধ-পিতামহের স্কন্ধের উপর—যাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য, যাঁহার অপরাধ ক্ষালনের জন্য কোন আধুনিক উকীল ব্রীফ গ্রহণে সম্মত হইবেন না, যাঁহার জন্মকাল নিরূপণে ও মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে গবেষণায় কোন ঐতিহাসিক সাহসী হইবেন না, যাঁহার অস্থি কয়খানি কোন টার্শিয়ারি প্রস্তর হইতে আবিষ্কার করিয়া মিউজিয়মে পাঠাইতে সমর্থ হইতে কোন ভূতত্ত্ববিৎ আশা করেন না—সেই অতি পুরাতন পিতামহের স্কন্ধে এই বিশাল মানবসমষ্টির আধি-ব্যাধি, শোক-তাপ, জরামরণের দুর্ভর দায়িত্ব কিরূপে অর্পণ করেন, তাহা একটা মহা সমস্যা। এই সমস্যার মীমাংসার ভার আমাদের উচ্চতর ধর্ম্মনীতির শিক্ষকদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া আপাততঃ আমরা স্বীকার করিয়া লইব, একের কর্ম্মফল অন্যকে ভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই ধর্ম্মনীতির ঠিক সার্থকতা হয় না—তাহাতে ঐ জগদ্বিধানের নৈতিক সামঞ্জস্য ঠিক ঘটে না। যে ব্যক্তি অধর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকেই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে; অন্যে তাহার ভাগ পাইল কি না, ভাগ পাইবে কি না, তাহা দেখার দরকার নাই; ইহাই ঐ বাক্যের প্রকৃত অভিপ্রায়। অপরে ফল ভোগ করুক আর নাই করুক, আমি অধর্ম্ম করিয়া নিষ্কৃতি পাইব না, উহাই ঐ বাক্যের প্রকৃত অভিপ্রায়। আমাকে একাকী আমার কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে; আমি একাকী সমস্ত দণ্ড বহন করিব; রত্নাকরের আত্মীয়েরা তাহার পাপের ভাগ গ্রহণ করিতে চাহে নাই, আমার আত্মীয় লোকেও সেইরূপ আমার পাপের ফলের ভাগ লইতে চাহিবে না;—এইরূপ বিধানে পাপীর মনে যতটা ভয় সঞ্চার হইতে পারে, অন্যকেও সে তাহার ফাঁদে জড়াইতে পারিবে—কুম্ভীপাকের অগ্নিকুণ্ডেও সে সহচর পাইবে, এই আশ্বাস পাইলে নরকাগ্নিও তাহার নিকট ততটা আতঙ্কজনক না

হইতে পারে। বস্তুতই মানুষের মনের এমনই গতি যে, একাকী কোন নূতন পথে চলিতে তাহার সাহস হয় না; একাকী তাহার স্বর্গে যাইতেও ভয় হয়; আর দল বাঁধিয়া যাইতে পারিবে, এই আশা থাকিলে শয়তানের পুরীতে প্রবেশ করিতেও সে তেমন ভয় পায় না। একের কর্ম্ম অন্যকে স্পর্শ করে, ইহা সত্য কথা। একের কর্ম্ম অন্যের স্পর্শ করা উচিত কি না, সে উৎকট তত্ত্বের মীমাংসায় এ স্থলে প্রবৃত্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহাও সত্য যে, আমরা যখন যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই প্রবচন উচ্চারণ করি, তখন অপরের দিকে চাহি না; যে ধার্ম্মিক, তাহারই জয়, অন্যের নহে; যে অধার্ম্মিক, তাহারই পরাজয়, তাহার পুত্রপৌত্রাদির বা স্বজন প্রতিবেশীর নহে;—এই সরল স্পষ্ট কথাই আমাদের অভিপ্রেত হয়।

কাজেই পরের উপর নিজের কর্ম্মফল চাপাইয়া in the long run বা লম্বা দৌড়ে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের জয় হইবে, এরূপ বলিলে চলিবে না। আপন কর্ম্মের ফল আপনাকেই ভোগ করিতে হইবে, ইহারই প্রতিপাদনের দরকার। অথচ মোটের উপর যখন দেখা যায়, অধর্ম্ম জয়ডঙ্কা বাজাইয়া, ধর্ম্মকে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া জীবনের নৌকায় সুখের পবনে পাল তুলিয়া ভাসিয়া চলিতেছে, তখন বলা যায়, নৌকা এক দিন না এক দিন ভরাডুবি হইবে। আজি না হউক, কালি না হউক, এক দিন ভরাডুবি হইবেই। কিন্তু আবার যখন দেখা যায়, পাপের বোঝা লইয়া তরীখানি অবহেলে ভবসমুদ্র পার হইয়া চলিয়া গেল, তখন বলা হয়, ভবসমুদ্র একটা ক্ষুদ্র উপসাগর বৈ ত নহে, বৈতরণীর প্রণালীর অপর পারে যে প্রকাণ্ড মহাসাগর বর্ত্তমান আছে, সেইখানে গেলেই নৌকাখানি উল্টাইয়া যাইবে, এবং তখন অধর্ম্মের পরাভব ঘটিবে, তাহার আর সংশয় মাত্র নাই।

পর-জন্মের অস্তিত্বে আপনারা বিশ্বাস করেন কি না, আমি জানি না,—অনেকে হয়ত করেন, অনেকে হয়ত উহা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেন,—সেই অস্তিত্ব সপ্রমাণ বা অপ্রমাণ করিতে গিয়া এই সম্মুখস্থ বিপুল শ্রোতৃ-সঙ্ঘের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে এই ক্ষীণদেহ প্রবন্ধ-পাঠকের ক্ষমতা নাই। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, বৈতরণীর ও-পার হইতে কেহ কখনও ফিরিয়া আসিয়া যখন আমাদিগকে দেখা দেন নাই এবং ও-পারে কি আছে-না-আছে, তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই,—অন্ততঃ আমাদের দুই এক জন থিয়সফিষ্ট বন্ধু ব্যতীত অন্যকে সেরূপ অনুগ্রহ করেন নাই—তখন

অন্য কোন উপায়ে আমরা পর-জন্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছি। ইহ জন্মে যদি সর্ব্বত্র পাপের পরাজয় ও ধর্ম্মের জয় দেখা যাইত, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার ও তাহার ফলভোগ যদি সর্ব্বত্রই ইহজন্মে হাতে হাতে ঘটিতে দেখা যাইত, তাহা হইলে পর-জন্মে যাঁহাদের এখন ধ্রুব বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের অনেকের বিশ্বাসের ভিত্তি হয়ত শিথিল হইত। যিনি পুণ্যবান্, তিনি তাঁহার প্রাপ্য পুরস্কার ইহলোকে সর্ব্বত্র পান না, এবং যে পাপী, সে তাহার প্রাপ্য তিরস্কার ইহলোকে সর্ব্বত্র পায় না; ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াই আমরা আশা করিয়া বসিয়া আছি, অন্যত্র এই পুরস্কারের ও তিরস্কারের বিতরণটা ঘটিবেই ঘটিবে। নতুবা যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই বাক্যের সার্থকতা থাকিবে না; নতুবা অধর্ম্মেরই জয় হইবে; কেন না, ইহজন্মে অধর্ম্মের জয় প্রত্যক্ষ চোখের উপর ঘটিতে সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে, ইহা অপলাপের উপায় নাই। অধর্ম্ম জিতিয়া যাইবে, ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবে, কোথাও তাহার অবশ্য-প্রাপ্য দণ্ড লাভ করিবে না, ইহা মনে করিতে গেলে আমাদের জীবনের গ্রন্থি একেবারে শিথিল হইয়া পড়ে। কেন না, ধর্ম্মই মনুষ্যের জীবনের ভিত্তি, অন্ততঃ মনুষ্যের সামাজিক জীবনের ভিত্তি; সেই ভিত্তি যদি এরূপ আল্‌গা মাটিতে নির্ম্মিত দেখা যায়, তাহা হইলে কাহারও পক্ষে জীবনের উপর ভর দিয়া দাঁড়ান চলে না; জীবনের পথে সাহস করিয়া এক পা অগ্রসর হওয়া যায় না; কোথা হইতে কে আসিয়া একটা ধাক্কা দিয়া আমাদিগকে দলিত পিষ্ট করিয়া দিবে, সেই ভয়েই আমাদিগকে সর্ব্বদা ত্রস্ত হইয়া চলিতে হয়। কাজেই আমাদের স্বার্থের জন্য, আমাদের সর্ব্বস্বের জন্য, আমাদের জীবনের অনুরোধে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, জীবনের ভিত্তি তেমন শিথিল নহে; ধর্ম্মের দেহ জমাট মশলাতে গঠিত; উহা কোনরূপে ভাঙ্গিবার উপায় নাই; সেই জন্য আমরা মানিয়া লই যে, যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই সূত্রের কোন বিকল্প সম্ভবপর নহে। আজি হউক, কালি হউক, ইহজন্মে না হউক, পরজন্মে কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী, অধর্ম্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আমরা ইহা স্বীকার করি। স্বীকার করি, না বলিয়া আশা করি বলিলে বোধ হয় ঠিক হয়; কেন ঐরূপ আশার উপর নির্ভর করিয়া আমরা জীবনের নৌকায় দাঁড় ফেলিয়া ভবসমুদ্রের ঝড় তুফান অতিক্রম করিয়া চলিতেছি। ঐরূপ আশা না থাকিলে আমরা কিরূপে অধর্ম্মকে তাহার আস্ফালন হইতে নিরস্ত করিতাম। যদি কোটি মনুষ্যের

মধ্যে এক জনও ধর্ম্মকে ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি পাইবে, এরূপ সম্ভব হইত, এজন্মে বা পর-জন্মে কোথাও সমুচিত শাস্তি লাভ করিবে না, এরূপ সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমার প্রতিবেশী যখন মুদ্গর তুলিয়া আমার মাথা ভাঙ্গিতে উদ্যত হয়, তখন তাহাকে কি বলিয়া বুঝাইতাম যে, সে সেই এক জন হইবে না; তাহাকে কি বিভীষিকা দেখাইয়া আমি নিরস্ত করিতে পারিতাম। এখন আমি তাহাকে এই বিভীষিকা দেখাই—ভ্রাতঃ, অত আস্ফালন করিও না; তুমি আপাততঃ আমার মাথায় মুদ্গরাঘাত করিতে পার, তোমার হাতে বল আছে, তোমার মুদ্গরে প্রচুর শক্তি আছে, আমার মাথার খুলিও ভঙ্গপ্রবণ; কিন্তু একদিন-না-একদিন কোন অদৃশ্য হস্ত, কোন মহৎ ভয় বজ্র উদ্যত করিয়া তোমার কপালে আপতিত হইবে, তোমার মস্তিষ্ক ছড়াইয়া দিবে, তোমার আজিকার কৃত অপকর্ম্মের প্রতিফল দিবে, কেহ তাহা নিবারণ করিতে শক্ত হইবে না। এইরূপ আশা করিয়া, এই আশ্বাসে, এই সান্ত্বনায় আমরা জীবনের পথে চলিয়া থাকি; নতুবা জীবনের পথে চলা অসাধ্য হইত, নতুবা একেই ত জীবনে আতঙ্কের সীমা নাই, আতঙ্কের মাত্রা আরও বাড়িলে অভাগা পথিকদিগকে আত্মহত্যা করিয়া জীবনলীলা অকালে সমাপ্ত করিতে হইত।

সকলের পক্ষে না হউক, অনেকের পক্ষেই পরকাল এইরূপ আশার সামগ্রী ও আশ্বাসের বিষয় ও সান্ত্বনার আশ্রয়। ইহকালে আমরা সর্ব্বত্র ধর্ম্মের জয় দেখি না বলিয়াই পরকালের আশায় বসিয়া থাকি; এবং আমরা হিন্দুজাতি, আমরা পরকালেও মানুষে নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিবে, এরূপ কল্পনায় আনিতে পারি না; আমরা সেই পরজন্মকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য জন্মজন্মান্তর বা জন্মান্তরপরম্পরা কল্পনা করিয়া থাকি। এই কোটি জন্মের পরম্পরায় পরিভ্রমণের নাম সংসার—আমরা এই সংসারের চক্রে ভ্রমণ করিতেছি; এ-লোক হইতে ও-লোক, ও-লোক হইতে সে-লোক আমরা কর্ম্মপাশবদ্ধ হইয়া কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; যেখানেই থাকি, কর্ম্ম করিতেই হইবে; স্বর্গে গিয়াও ধান ভানিতে হইবে; ভাল হউক, মন্দ হউক, কর্ম্ম করিতেই হইবে; নিষ্কর্ম্মা হইয়া দিন কাটাইবার উপায় নাই; এবং সেই ভাল কাজের বা মন্দ কাজের ফলভোগও করিতে হইবে। না করিলে যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই নীতিবাক্যের সার্থকতা থাকে না; নতুবা জগদ্‌যন্ত্র মরিচা পড়িয়া বিকল হইয়া কোন দিন বন্ধ হইয়া

যাইবে, এইরূপ আশঙ্কা থাকে; নতুবা জগৎপ্রণালীর নৈতিক সামঞ্জস্য ঘটে না। কবে এই কর্ম্মপাশের বন্ধন হইতে শ্রান্ত জীব মুক্তি লাভ করিবে, এই উপায়ের আবিষ্কারে আমাদের পিতামহগণের ধীশক্তি বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া নিযুক্ত ছিল; "অস্তিত্বের চক্রতলে একবার বাঁধা প'লে, পায় কি নিস্তার," এই উৎকট প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আমরা এত কাল ধরিয়া ব্যাকুল রহিয়াছি।

আমি আজ সেই উৎকট প্রশ্নের মীমাংসারূপ উৎকট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব না। সে সাহস আমার নাই, সে ক্ষমতা আমার নাই; আমার উদ্দেশ্য সঙ্কীর্ণ; আমি যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই বাক্যটির সার্থকতা কতটুকু, উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহাই কেবল বুঝিতে চাহি। তাহাই বুঝিতে চাহি, কেন না, অনেক সময়ে আমরা অনেক কথা বলিয়া থাকি, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমরা বুঝি না; কি অর্থে বলিতেছি, তাহা অনেক সময়ে নিজেই জানি না; অপরকে কি অর্থ বুঝাইতে চাহি, সে সম্বন্ধেও কোন দৃঢ় ধারণা আমাদের থাকে না। একটু চাপিয়া ধরিলেই বুঝা যাইবে, এই বর্ত্তমান ক্ষেত্রেই আমাদের ধারণা কত অস্পষ্ট। বস্তুতঃ ইহলোকে ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র ঘটে না—ঘটে না দেখিয়াই আমরা জন্মান্তরের কল্পনা করি বা অস্তিত্ব স্বীকার করি—জন্মান্তরের আশা করি ও অপেক্ষা করি; অথচ ইহ জীবনেই যে ধর্ম্মের জয় ঘটে না, এরূপও পুরা সাহসের সহিত বলিতে পারি না। অধার্ম্মিক ব্যক্তি ইহলোকটা ফাঁকি দিয়া উত্তীর্ণ হইল, চোখের উপর দেখিতে পাইলাম, —পরকালে তাহার যথোপযুক্ত সে দণ্ড পাইবে, এইরূপ প্রত্যাশাও থাকিল, —অথচ ভিতরে একটা খট্‌কা রহিয়া গেল। যদি কোনরূপে আবিষ্কার করিতে পারি যে, না, লোকটা ইহলোকেই নরকযাতনা ভোগ করিয়াছে, আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি নাই; ইহলোকেই সে কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছে; বাহিরে সে আস্ফালন করিয়াছে বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে পুড়িয়া মরিয়াছে;—এইরূপ যদি আমরা প্রতিপন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মন যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। আমরা মনকে বুঝাইতে চাহি যে, যদিও পাপী পাপের জন্য ইহকালে কোন শারীরিক বা ভৌতিক দণ্ড লাভ না করে, কিন্তু একটা আধ্যাত্মিক শাস্তি লাভ তাহার ঘটিবেই ঘটিবে। তাহার পার্থিব বা সাংসারিক উন্নতির কোন ব্যাঘাত না ঘটিতে পারে, সমাজের নিকটে সে ধনে মানে পদে যশে গৌরবে বাহবা লইয়া

জয়ঢাক বাজাইয়া জীবনযাত্রা সমাপন করিতে পারে, কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক জীবনে সে পাপের ফল হাতে হাতে সমুচিত ভাবে অনুক্ষণ ভোগ করিয়া থাকে, লোকে তাহা দেখিতে পায় না বা জানিতে পারে না। পাপীর মনের ভিতর, তাহার অভ্যন্তরে, সর্ব্বদা চৌষট্টি নরকের আগুন জ্বলে, সেই নরকাগ্নি হইতে অব্যাহতি পাওয়ার কোন উপায় নাই; পাপী স্বীকার করুক আর নাই করুক, তাহার পাপের ফল সে দিবানিশি জাগ্রতে ও স্বপ্নে ভোগ করিতে বাধ্য হয়। স্বপ্নসঞ্চারিণী লেডি মাকবেথের রক্তলিপ্ত হস্ত সপ্ত সাগরের জলে ধৌত হয় নাই, পৃথিবীর যাবতীয় সুরভি দ্রব্যের ধূপ সেই শোণিতের গন্ধ নাশ করিতে পারে নাই। পাপের শাস্তির জন্য পরলোকে নরক-কল্পনা অনাবশ্যক; ইহলোকেই পাপীর হৃদয় যে নরককুণ্ডে পরিণত হয়, কোন কাল্পনিক রৌরবের সহিত তাহার ভীষণতার তুলনা হয় না।

কথাটা সত্য বটে, আবার সম্পূর্ণ সত্য বটে কি না, ইহা লইয়াও তর্ক চলিতে পারে। এমন পাষণ্ড কি বস্তুতই অস্তিত্বহীন, যে পাপকর্ম্মজন্য অনুতাপভোগেও বঞ্চিত আছে? যে পাপী অনুতাপ করিতে পারে, তাহার পাপের হয়ত কোথাও ক্ষমা আছে; কিন্তু যে অনুতাপ করিতে পারে না বা জানে না, এমন মহাপাপীও কি সংসারে একবারে অস্তিত্বহীন? এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য; তবে আমরা যখন যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই বাক্য ঘোষণা করিয়া ধর্ম্মের জয়গানে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা এই আধ্যাত্মিক নরকভোগের কথা মনে করি না, ইহা সত্য কথা। আমরা বুঝি যে, এই যে জয়, ইহা সংসারে জয়, বৈষয়িক জয়, ভৌতিক জয়। অধর্ম্মের যে পরাজয় প্রতিপন্ন করিতে চাহি, সে পরাজয় সাংসারিক পরাজয়; তাহা রোগ শোক পরীতাপ বন্ধন ও ব্যসনরূপেই সকলের নিকট উপস্থিত হয়। ইহা ভৌতিক পরাজয়; ইহা বৈষয়িক পরাজয়; ইহা নিতান্তই পার্থিব সমুন্নতি বিষয়ে ও পার্থিব সুখলাভ বিষয়ে পরাজয়। ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। নতুবা আমাদের কাব্যে উপন্যাসে, কথায় কাহিনীতে, আমাদের ইতিহাসে, আমাদের বক্তৃতায়, ধর্ম্মপ্রচারে নীতিপ্রচারে সর্ব্বত্র অধর্ম্মের পরাজয় ও ধর্ম্মের জয় ঠিক ভৌতিক বিষয় সম্পর্কেই দেখিবার জন্য আমরা এত ব্যস্ত কেন? আমাদের যাত্রায়, গানে থিয়েটারে, আমাদের ঘরকন্নায়, কথাবার্ত্তায়, ঝগড়ায়, দলাদলিতে, আমাদের নাটকে প্রহসনে, বিদ্রূপে ব্যঙ্গে, সর্ব্বত্র আমরা ইহকালেই এবং পার্থিব ভৌতিক বিষয়েই অধর্ম্মকে তিরস্কৃত

ও ধর্ম্মকে পুরস্কৃত দেখিবার জন্য এত লালায়িত কেন ? কোন কাব্যলেখক একখানা কাব্য লিখিলেই তাহাতে এইরূপেই ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় বর্ণিত হইয়াছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য সমালোচককুল এত ব্যগ্র কেন ? যে কোন কুকাব্যলেখক আপনার কুকাব্যমধ্যে এই হিসাবেই অধর্ম্মের নিগ্রহ ও ধর্ম্মের জয় প্রতিপন্ন করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করেন কেন ? এই সকল প্রশ্নের উত্তর আবশ্যক। এবং ইহার উত্তর দিতে হইলেই আমরা যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই বাক্যে কি অর্থে বিশ্বাস করি ও কতটুকু বিশ্বাস করি, ইহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক হয়। একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাক; এবং যে উদাহরণটি লইব, তাহা ছোট উদাহরণ নহে। কোন অকাব্যের বা কুকাব্যের উদাহরণ না লইয়া, আধুনিক ক্ষুদ্র ভারতের কোন ক্ষুদ্র কাব্যের উদাহরণ না লইয়া, আমাদের মহা-ভারতের মহাকাব্য মহাভারতকেই দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণ করিব। এই মহাভারতের মহাকাব্য হইতে আমাদের বালকবালিকা টেক্‌স্‌ট্‌ বুক কমিটির অনুমোদিত নীতিকথার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত এণ্ট্রান্স কোর্সের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই ধর্ম্মনীতি শিখিয়া আসিতেছে। এখন আমরা দেখিতে চাহি, এই মহাভারতে ধর্ম্মের জয় কিরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

মহাভারতের প্রধান ঘটনা কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ—উহা ধর্ম্মযুদ্ধ, উহার উদ্দেশ্য হালের ভাষায় ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন। মহাভারতের নায়ক যুধিষ্ঠির—তিনি ধর্ম্মপুত্র এবং ধর্ম্মরাজ। ঐ নায়কের যিনি আবার নেতা ও পরিচালক, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ; এবং যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানে ধর্ম্ম; যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানে জয়। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের ঘটনা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের জয় এই মহাকাব্যের প্রতিপাদ্য। যে দিন হইতে পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে অধর্ম্মের অবতার ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তাঁহাদের নিগ্রহ আরম্ভ করেন। পরম সহিষ্ণুতার সহিত পাণ্ডবেরা সেই নিগ্রহ সহ্য করিলেন। বিষ দানে ভীমের হত্যাচেষ্টা, জতুগৃহদাহ, বহু কাল অনাথের ন্যায় অরণ্যবাস, কপট দ্যূতক্রীড়া, সভাস্থলে পত্নীর দারুণ অবমাননা,—সহিষ্ণুতা ইহার বহু পূর্ব্বেই সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। তৎপরেও বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস; তাহার পরও প্রতিশ্রুতিরক্ষায় অসম্মতি—"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।" তখন কৃষ্ণপ্রেরিত ধর্ম্মরাজ আর ক্ষমা অবলম্বন কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন না। কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী

সমবেত হইল। ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা সবংশে বিনষ্ট হইল। পার্থিব সমৃদ্ধি হইতে তাহারা ভ্রষ্ট হইল। ধর্ম্মরাজ সিংহাসনে বসিলেন। ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল। যথা ধর্ম্ম তথা জয়, ইহা এইরূপে প্রতিপন্ন হইল।

দেখান হইল, ধর্ম্মের জয় হাতে হাতে ঘটে না। ধর্ম্মের পথ কণ্টকে আকীর্ণ। যিনি ধার্ম্মিক, তাঁহাকে জীবনে নানা বিপদ্, নানা অপমান, নানা কষ্ট সহিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। অধর্ম্ম জয়ঢক্কা বাজাইয়া কিছু দিনের জন্য—বহু দিনের জন্য ধর্ম্মকে পীড়ন করে। কিন্তু ধর্ম্মের জয় শেষ পর্য্যন্ত অবশ্যম্ভাবী। শেষ পর্য্যন্ত in the long run—ধর্ম্মের জয় ঘটে। অধর্ম্ম পরাভূত হয় এবং ইহলোকেই পরাভূত হয়।

বাল্যাবধি শুনিয়া আসিতেছি, মহাভারতের এই শিক্ষা; ধর্ম্মের জয় ঘটে, তবে শীঘ্র না ঘটিতে পারে। কিন্তু যিনি মহাভারতের পাঠক, তিনি পদে পদে ধর্ম্মের নিগ্রহ দেখিয়া মর্ম্মাহত হন; তাঁহার সমস্ত সমবেদনা ধর্ম্মের পক্ষে ও অধর্ম্মের বিপক্ষে প্রেরিত হয়; এবং যখন তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্মসহায়, দ্রোণসহায়, কর্ণসহায় অধর্ম্মকে পরাভূত হইতে দেখেন, তখন বুঝিতে পারেন, অধর্ম্মকে কেহ রক্ষা করিতে পারে না—জগদ্বিধাতার অদৃশ্য হস্ত আসিয়া শেষ পর্য্যন্ত অধর্ম্মকে দণ্ডিত করে। তখন তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। কৌরবেরা এত কাল ধরিয়া অধর্ম্মাচরণ করিয়া আসিয়াছে; শেষে যখন তাহারা তাহাদের কর্ম্মফল ভোগ করিল দেখা যায়, তখনই পাঠকের তৃপ্তিলাভ হয়। তাহার পূর্ব্বে হয় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবসানের পরই মহাভারতের মহানাটকের প্রকৃত অবসান। অন্ততঃ বোধ হয়, এইখানেই অবসান হওয়া উচিত ছিল। ভারতবর্ষীয় কবি না হইয়া পাশ্চাত্য দেশের কবি হইলে এইখানেই যবনিকাপাত ঘটিত। কেন না, যে অন্তিম অঙ্কের ভীষণ অভিনয় দেখিবার জন্য দর্শকের চিত্ত আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছিল, ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের প্রেরিত গদাঘাতের সহকারে সেই অঙ্কের অভিনয় সমাপ্ত হইয়া গেল। তার পর যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিয়া কি করিলেন, কত বৎসর রাজ্যভোগ করিলেন, কতগুলি অশ্বমেধ করিলেন, কত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন, কতগুলি হাতী পুষিলেন, কত টাকা খরচে প্যালেস তৈয়ার করিলেন, কত টাকার ফর্ণিচার কিনিলেন, এ সকল অবান্তর কথা, এ সকল অপ্রাসঙ্গিক কথা; এ সকল না বলিলেও চলিত—মূল মহানাটকের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই—এ সকল কথা

শুনিবার জন্য শ্রোতা বসিয়া থাকিতে চাহেন না—সভাভঙ্গে সভাপতিকে ধন্যবাদের মত এ সকল কথা যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই ভাল।

বস্তুতঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেই মহাভারতের সমাপ্তি—উহাতেই ধর্ম্মের জয় প্রতিপন্ন হইল। এবং যত দিন পরেই হউক, ইহলোকে বর্ত্তমান থাকিতেই অধর্ম্ম তাহার সমুচিত ফল পাইল, তাহাই এখানে প্রতিপন্ন হইল। মহাভারতের পাঠক যে পর্ব্বের পর পর্ব্ব, পর্ব্বাধ্যায়ের পর পর্ব্বাধ্যায়, অধ্যায়ের পর অধ্যায়, শ্লোকের পর শ্লোক অতিক্রম করিয়া ক্লান্ত, শ্রান্ত, গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া এই অধর্ম্মের পরাজয়ের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইলেন, ইহাই তাঁহার পরম লাভ। তৎপরে পরকালে কৌরবগণের কোথায় গতি হইল, দুর্য্যোধন কোথায় গেলেন, দুঃশাসন কোথায় গেলেন, মাতুলের জন্য যমরাজ্যে কোন্ বাড়ীখানা নির্দ্দিষ্ট হইল, আর পাণ্ডুপুত্রেরা শচীপতির উদ্যানের কোন্ কুঞ্জে স্থান পাইলেন, তাহা জানিবার জন্য পাঠকের আগ্রহ থাকে না। পাঠক শুনিতে চাহেন না বটে, কিন্তু নাছোড়বান্দা মহাভারত-কার পাঠককে নিতান্ত জবরদস্তি করিয়া তাহার খুঁটিনাটি শুনাইতে ছাড়েন নাই। কোন্ রাস্তায় পাণ্ডুপুত্রগণ মহাপ্রস্থান করিলেন, হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৈল-শিখরের মধ্যে কোন্‌খানে—সাগরপৃষ্ঠ হইতে কত ফুট উচ্চে—কে কোথায় পড়িতে লাগিলেন, সেখানে টেম্পারেচার কত ডিগ্রি, সেখানে ব্যারমিটার কত ইঞ্চিতে, কে কত ঘণ্টা আগে পড়িলেন, কে কয় ঘণ্টা পরে পড়িলেন, আর কেন আগে পড়িলেন, কেন পরে পড়িলেন, ইহজন্মকৃত পাপের মাত্রা কার কতটুকু ছিল, নিক্তি ধরিয়া—রতি, মাষা, যবে পরিমাণ করিয়া পাঠককে তাহার হিসাব না শুনাইয়া মহাভারত-কার কিছুতেই ছাড়িবেন না। পাঠকের শ্বাস রুদ্ধ হউক, পাঠক পরিত্রাহি চীৎকার করুন, মহাভারত-কার তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না।

নিতান্তই যখন পরিত্রাণ পান, তখন পাঠক বুঝিতে পারেন, মহাভারতের কাহিনী সমাপ্ত হইয়াছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সহিত; ধর্ম্মের জয় প্রতিপন্ন হইয়াছে, ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে। তার পর যুধিষ্ঠির যে সশরীরে স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন বা নরক-দর্শন মাত্র করিয়াই খোলসা পাইয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্মের জয় প্রতিপাদনের জন্য নিতান্ত আবশ্যক ছিল না। যিনি মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন,—অথবা আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের খাতিরে বলিতেছি, যাঁহারা মহাভারত সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি অন্যরূপ বর্ণনা

করিতেন—যদি কুরুক্ষেত্রের লড়াইয়ে পাণ্ডবগণেরই পরাজয় হইত ও কৌরবগণ বিজয়দুন্দুভি বাজাইয়া শকুনিকে অগ্রে করিয়া ফিরিয়া আসিতেন, দুঃশাসন যদি ভীমসেনের রক্ত পান করিত, আর অলম্বুষ যদি শ্রীকৃষ্ণকে অকালে বৈকুণ্ঠে পাঠাইত, এবং উপসংহারে পাঠকগণকে আশ্বাস দেওয়া হইত, ইহকালে ধর্ম্মের জয় হয় না বটে, কিন্তু পরকালে জয় অবশ্যম্ভাবী ;—কেন না, ইহলোকে ঐরূপ বিঘটন সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে পঁহুছিয়াই বিরাট রাজার অনুকরণে নকুল-সহদেবকে আপনার আস্তাবল রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, বৃকোদরকে সূপকারের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পার্শ্বে বাসা দিয়াছিলেন, অর্জ্জুনকে কমলার নাট্যশালার ম্যানেজারি দিয়াছিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরের সহিত অন্তঃপুরে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া পাশাখেলায় সময় কাটাইতেন—অপিচ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ মায় মাতুল কৃতান্তের চার্জে প্রেরিত হইয়া রৌরবের অগ্নিকুণ্ডে জ্বালানি কাঠে পরিণত হইয়াছিল,—যদি মহাভারত-কার এই রূপেই ধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী জয় বর্ণনা করিতেন, তাহা হইলে আপনারা সন্দেহ করিবেন না যে, তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইত, গণেশের লেখনী-চালনা নিতান্তই পণ্ডশ্রম হইত, এবং লক্ষশ্লোকী বৈয়াসিকী সংহিতার কথা দূরে থাকুক, বটতলার মহাভারতও কেহ চারি পয়সা মূল্যে খরিদ করিয়া অর্থ নষ্ট করিতে প্রস্তুত হইত না।

কাজেই বলিতে হইবে, মহাভারতে যদি যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই নীতি সমর্থিত হইয়া থাকে, সেখানে জয়ের তাৎপর্য্য এই লোকেই জয়—পরকালে জয় নহে, পরজন্মে জয় নহে—অনেক দুর্গতির পর শেষ পর্য্যন্ত—এই মর্ত্ত্যধামেই সাংসারিক, বৈষয়িক ও ভৌতিক হিসাবেই ধর্ম্মের জয় ঘটে। তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত কৌরব ও পাণ্ডব—অধর্ম্মাচারী কৌরব সবংশে বিনষ্ট হইল—ধর্ম্মাচারী পাণ্ডব ধর্ম্মরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিলেন। অতএব অহে মানব, অহে বালক, অহে বৃদ্ধ, অয়ি বনিতা, তোমরা অধর্ম্মের তাৎকালিক সমৃদ্ধি দেখিয়া মোহগ্রস্ত হইও না। অধর্ম্মের ভৌতিক জয় অবশ্যম্ভাবী, এই মর্ত্ত্যধামেই অবশ্যম্ভাবী।

বাল্যকাল হইতেই শিখিয়া আসিতেছি, মহাভারত এইরূপেই ধর্ম্মের জয় শিখাইয়াছেন এবং সকলের বটে কি না জানি না, অধিকাংশেরই এই বিশ্বাস যে, মহাভারতে ধর্ম্মের জয় এইরূপেই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রোতৃবর্গ আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, আমি এরূপ বিশ্বাস করিতে

পারি না। আমার বিবেচনায় মহাভারতে এই নীতি উপদিষ্ট হইয়াছে মনে করিলে মহাভারতকে খাটো করা হয়, ক্ষুদ্র করা হয়, মহাভারতের অপমান করা হয়, উহাকে উহার অতুল্য গৌরব হইতে ভ্রষ্ট করা হয়। মহাভারতের মহাকাব্যকে আজিকালিকার ক্ষুদ্র ভারতের কুকাব্য-সকলের শ্রেণীতে নামাইয়া আনা হয়। কেন না, আমার বিশ্বাস, মহাভারত স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়াছেন, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ধর্ম্মপুত্রের জয় হয় নাই। আমরা যুদ্ধে বিজয়কে জয় বলি, শত্রুনিপাতকে জয় বলি, সিংহাসনলাভকে ও রাজ্যপ্রাপ্তিকে জয় বলি, কিন্তু তাহা জয় নহে। সেরূপ জয়ে ধর্ম্মের জয় হয় না। পাণ্ডুপুত্রেরাও সেরূপ জয় লাভ করিয়া থাকিবেন; সে জয়ে আমরা মহাভারতের ক্ষুদ্র পাঠকেরা উল্লসিত হইতে পারি, কিন্তু পাণ্ডুপুত্রেরা তাহাতে উল্লসিত হন নাই। পাণ্ডবেরা সেই জয় লাভ করিয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন মনে করিলে সেই মহাসত্ত্ব পুরুষসিংহগণের গৌরবের হানি হইবে। বস্তুতই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বীরশূন্যা বসুন্ধরার অধিপতি হইয়া আপনাকে জয়যুক্ত বোধ করেন নাই। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণে সহস্র আত্মীয় বান্ধবের চিতাগ্নি তাঁহার মনের মধ্যে যে আগুন জ্বালাইয়াছিল, মৃত্যুর ক্রোড়ে শরশয্যোপরি সুখাসীন বীরোত্তমের শান্তির উপদেশ সেই আগুনের জ্বালা উপশম করিতে পারে নাই। পতিহীনা পুত্রহীনা লক্ষ নারীর করুণ রোদন, যাহা নারীপর্ব্বের প্রতি শ্লোকের মধ্য হইতে অশ্রুর উৎস ঢালিয়া দিয়া ভারত-সমাজকে আজি পর্য্যন্ত প্লাবিত রাখিয়াছে, সেই অশ্রুস্রোতে ধর্ম্মরাজের হৃদয় মরুভূমির উপরিস্থিত মৃৎস্তরকে ক্ষালিত করিয়া তাহাকে উষর ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল, অশ্বমেধের মহোৎসব তাহাতে হরিৎ তৃণের অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ হয় নাই। যদি ইহাতেও আপনাদের মনে সংশয় থাকে, তাহা হইলে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। যখন দর্পের অবতার কুরুকুলপতি দুর্য্যোধন পুত্রহীন, ভ্রাতৃহীন, বান্ধবহীন, অনুচরহীন হইয়া বিকলাঙ্গ অবস্থায় দ্বৈপায়ন হ্রদের তটভূমির এক প্রান্তে ধূলিলুণ্ঠিত হইতেছিলেন, যখন মাংসাশী শৃগাল কুক্কুর মাংসলোভে হর্ষের সহিত তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইতেছিল ও তখনও তাঁহাকে জীবিত দেখিয়া নিরাশ হইয়া পরাবৃত্ত হইতেছিল, যখন নরমাংসভোজনে পূর্ণোদর গৃধ্রকুল উচ্চ বৃক্ষের উচ্চতম শাখায় উপবিষ্ট হইয়া একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিনেতার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, সেই দিন মহানিশায়, যখন বাত্যাসংক্ষুব্ধ মহাসাগর

প্রশান্ত হইয়াছে, যখন সেই মহাসাগরের পৃষ্ঠের উপর নিবিড় অন্ধকার ঘনায়মান হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, যখন অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর অষ্টাদশদিন-ব্যাপী উন্মত্ত রণকোলাহল মৃত্যুর নিস্তব্ধ নীরবতায় শ্রান্তিলাভ করিয়াছে, সেই সময়ে, পাণ্ডবশিবিরে করালা মহাকালীর ভীমমূর্ত্তি অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া মহানিশার অন্ধকারকে ঘনীভূত করিয়া দিল, সুপ্ত মানবের মরণকোলাহল নিশীথিনীর নীরবতা বিদীর্ণ করিল, আর সেই নিবিড় অন্ধকারকে দীপ্ত করিয়া অশ্বত্থামার মুক্ত কৃপাণ পরিশ্রান্ত সুখসুপ্ত অসহায় পাণ্ডব-সৈনিকগণের ও পাণ্ডব-বান্ধবগণের ও পাণ্ডব-পুত্রগণের কণ্ঠ হইতে রক্তস্রোত ঢালিতে লাগিল। সেই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের ভীষণ বর্ণনা যাঁহারা মহাভারতমধ্যে পাঠ করিয়াছেন, যে হত্যাকাণ্ডে দ্রোণবিজেতা ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র পর্য্যন্ত পদদলিত কৃমির ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল, মহাবীর কৃতবর্ম্মা ও মহাসত্ত্ব কৃপাচার্য্য মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃতের ন্যায় যে হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইয়া মানব-চরিত্রের দুর্ব্বোধ্য রহস্যকে আরও দুর্জ্জেয় করিয়া দিয়াছিলেন, সেই হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও যদি বলিতে চাহেন, কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণে পাণ্ডুপুত্রেরা জয়লাভ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মের জয় হইয়াছিল, অধর্ম্মের পরাজয় হইয়াছিল, তাহা হইলে এই দীন প্রবন্ধপাঠক এইখানেই বিদায় লইতে বাধ্য হইবে।

কিন্তু আমার বিদায় গ্রহণের প্রয়োজন নাই। মহাভারতের মহাকবি যিনিই হউন, তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রে শত্রুবিনাশ করিয়া পাণ্ডুপুত্র জয়লাভ করেন নাই। ধনঞ্জয় যখন কপিধ্বজে আরূঢ় হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার লোমহর্ষ উপস্থিত হইল, তাঁহার গাত্র অবসন্ন হইল, তাঁহার মুখ পরিশুষ্ক হইল, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিত হইল। তিনি তাঁহার সারথিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ; মহাবাহো, আমি এ জয় চাহি না; যাহার জন্য পুত্রকে হত্যা করিতে হইবে, ভ্রাতাকে হত্যা করিতে হইবে, শ্যালক শ্বশুরকে হত্যা করিতে হইবে, আচার্য্য ও পিতামহকে হত্যা করিতে হইবে, সে সিংহাসন পাণ্ডুপুত্রের প্রার্থনীয় নহে। বস্তুতই তাহাই। সে সিংহাসন, সে জয় ইতরের প্রার্থনীয়, ক্ষুদ্রের প্রার্থনীয়, তাহা পাণ্ডুপুত্রের প্রার্থনীয় হইতে পারে না। পাণ্ডুপুত্র বনবাস আশ্রয় করিতে পারেন, পাণ্ডুপুত্র জতুগৃহে দগ্ধ হইতে পারেন, পাণ্ডুপুত্র পরগৃহে বাস করিয়া পরান্নে শরীর পোষণ করিতে

পারেন ; যিনি ইন্দ্রসখ্য লাভ করিয়াছিলেন, যিনি উর্ব্বশীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, যিনি কিরাতরূপী পুরুষের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে সাহসী হইয়াছিলেন, তিনি ভ্রাতার অপেক্ষায় চক্ষুর উপরে পত্নীর নগ্নীকরণও সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু তিনি এরূপ জয় বাঞ্ছা করিতে পারেন না। এ জয় তাঁহার জয় নহে। ইহা পরাজয়। ইহাতে ইতরের জয় প্রতিপন্ন হইতে পারে। ইহাতে ধর্ম্মের জয় প্রতিপন্ন হয় না।

বস্তুতই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অভিনয়ের সহিত মহাভারতের মহানাটকের যবনিকাপাত হয় নাই। উহার পরবর্ত্তী অঙ্কগুলি পরিত্যাজ্য নহে। অন্য দেশের অন্য কবির রচিত কাব্য হইলে ঐখানে যবনিকাপাত সম্ভবপর হইত। কিন্তু ভারতবর্ষের মহাকবি-রচিত মহাভারতের যবনিকাপাত ঐখানে সম্ভবপর হয় নাই। সৌপ্তিকপর্ব্ব ও নারীপর্ব্ব, শান্তিপর্ব্ব ও আশ্রমবাসিকপর্ব্ব, মৌষলপর্ব্ব ও মহাপ্রাস্থানিকপর্ব্ব এই মহাকাব্যের সমাপ্তির জন্য অত্যাবশ্যক। নতুবা আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির ভ্রম জন্মিতে পারিত, শত্রুনিপাতে ও রাজ্যলাভে ধর্ম্মের জয়ঘোষণাই বুঝি মহাভারত-কারের অভিপ্রেত। কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে দেখাইতে চাহেন, ধর্ম্মের জয় সেই অর্থে অবশ্যম্ভাবী নহে। মানব-জীবনের সমস্যা অত সহজ নহে।

আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা বিয়োগান্ত কাব্যের প্রতি—ইংরেজীতে যাহাকে ট্রাজেডি বলে, তাহার প্রতি অনুকূল ছিলেন না। কোন আধুনিক কাব্যলেখক সংস্কৃত ভাষায় বিয়োগান্ত কাব্যরচনায় সাহসী হয়েন নাই। কিন্তু মহাভারত এক প্রকাণ্ড ট্রাজেডি। আমাদের ভারতবর্ষের হিন্দু জাতির জাতীয় জীবনের ইতিহাসও এক প্রকাণ্ড ট্রাজেডি ; তাহাতেই ভারতবর্ষে মহাভারতের উৎপত্তির বুঝি সার্থকতা। অথবা মহাভারতে ঐরূপ প্রাদেশিকত্ব অর্পণ করিলে বুঝি উহাকে সঙ্কীর্ণ করা হয়। মানবের মর্ত্ত্য জীবনই বোধ করি এক মহা ট্রাজেডি। মহর্ষি কপিল জীবনকে দুঃখময় বলিয়া জানিয়াছিলেন। মানবজাতির প্রামাণিক ইতিহাসে যে মহাপুরুষের স্থান সকলের উচ্চে, যাঁহাকে পঞ্চাশৎ কোটি এশিয়াবাসী অদ্যাপি উপাসনা করিতেছে, যাঁহাকে পঞ্চবিংশতি কোটি ভারতবাসী ভগবদবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, ত্রিংশৎ কোটি ইউরোপবাসী অজ্ঞাতসারে যাঁহার পন্থার অনুবর্ত্তন করিয়া চলিতেছে, তিনিও মানব-জীবনের দুঃখাত্মকতা আর্য্য-সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এই দেশে ও এই দেশের মহাকাব্যে শত্রুসংহারে

ও সিংহাসনলাভে ধর্ম্মের জয় দেখিতে গেলে ধর্ম্মের অবমাননা হয়। কোথায় কাহারও সংশয় থাকিতে পারে বলিয়া মহাভারতের মধ্যে মৌষলপর্ব্বটি যেন নিতান্তই জোর করিয়া গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেখানে কৃষ্ণ, সেখানে ধর্ম্ম, এবং যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে জয় ; অথচ আমরা মুষলপর্ব্বে দেখিতে পাই, কৃষ্ণ যাঁহাদের নায়ক, সেই দুর্দ্ধর্ষ যদুবংশ সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া পরস্পরকে হত্যা করিয়া নির্ম্মূল হইয়া গেল ; কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া তাহা দেখিলেন, তাহার প্রতিবিধান তিনি করিতে পারিলেন না বা করিলেন না ; তৎপরে সেই পুরুষোত্তম, কুরুক্ষেত্রের মহাহবে যিনি অস্ত্রধারণে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি ব্যাধের অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন ; তাঁহার গৃহস্থিত নারীগণকে দস্যুতে ভোগার্থ অপহরণ করিয়া লইয়া গেল, আর সংশপ্তকবিজেতা মহারথ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া গাণ্ডীব তুলিতে সমর্থ হইলেন না। ইহাকে জয় বলে না ; ইহার নাম পরাজয়। কুরুক্ষেত্রের সমরে যদি বা জয় হইয়া থাকে, ভগ্নহৃদয় দীনচিত্ত মহাপ্রস্থানোদ্যত পাণ্ডবগণ জীবন-সমরে জয় লাভ করিতে পারেন নাই। ইহজীবনে ধর্ম্মের জয় হয় নাই। মহাভারতই প্রতিপন্ন করিয়াছে, যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই নীতিবাক্য ইহজীবনে প্রযোজ্য নহে।

বাস্তবিকই জীবনসমস্যার অত সহজে মীমাংসা হয় না। ধর্ম্মের বিচার এত সহজ নহে। "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।" সেই গুহা এত অন্ধকার, সেখানে কি যে ধর্ম্ম, কি যে অধর্ম্ম, তাহা বিচার দ্বারা, বিতর্ক দ্বারা নিরূপণ করা কঠিন ; কিসেই বা জয়, কিসেই বা পরাজয়, তাহা বলা কঠিন। আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকে লৌকিক জয়কে জয় বলে, রাজ্যপ্রাপ্তিকে ও সিংহাসনপ্রাপ্তিকে জয় বলে ও তদ্দ্বারা ধর্ম্মের জয় প্রতিপাদন করিয়া উল্লসিত হয়। কিন্তু যাঁহারা মানবত্বের উচ্চতর প্রকোষ্ঠে অবস্থিত, তাঁহাদিগের নিকট রাজসিংহাসন খেলার সামগ্রী, উহার লাভালাভে জয়-পরাজয় নির্ণীত হইবার নহে। কি যে ধর্ম্ম, তাহা চেনাই কঠিন ; তাহার লক্ষণনির্ণয়ে কোন তত্ত্বজ্ঞ এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না জানি না।

যাঁহারা ডারুইনের আবিষ্কৃত তত্ত্বে অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ঐ তত্ত্ব কিরূপে ধর্ম্মের গুহাস্থিত মূল অনুসন্ধানে কতটা পথ দেখায়। আমাদের শাস্ত্রে বলে, যাহাতে লোক ধারণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। লোক শব্দ মনুষ্য-সমাজকে বুঝায়। মনুষ্য সমাজবদ্ধ বলিয়াই ধর্ম্মের অস্তিত্ব। ভূমণ্ডলে

মানুষ একজন মাত্র থাকিলে তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকিত কি না সংশয়ের স্থল। ডারুইনের মতে মানুষের অতিপূর্ব্বপিতামহ এককালে সর্ব্বতোভাবে পশুধর্ম্মা ছিল। তখন মানুষের, অর্থাৎ বর্ত্তমান মানুষের সেই পশুধর্ম্মা পূর্ব্বপুরুষের কোন ধর্ম্ম ছিল না; কেন না, পশুর কোন ধর্ম্ম নাই। বাঘ নিরীহ মেষ-শাবককে অকুণ্ঠিতভাবে উদরসাৎ করে; তাহাতে তাহার অধর্ম্ম হয় না। জম্বুক প্রতারণায় চিরাভ্যস্ত; তাহাতে তাহার অধর্ম্ম হয় না। পশুর মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধির উৎপত্তি হয় নাই, কাজেই উহারা কোন কর্ম্মের জন্য দায়ী নহে। পশুকে অধর্ম্মের জন্য দায়ী করিতে গেলে চৌষট্টি নরকেও স্থান কুলাইত না। যে পশু সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র, কেবল নিজের স্বার্থটুকুই বুঝে, তাহার ত ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই; যে পশু বা যে ইতর জীব দল বাঁধিয়া বাস করে, তাহাদেরও ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই। পিপীলিকা ও মৌমাছি সমাজমধ্যে বাস করে। তাহাদের সমাজের শৃঙ্খলা শ্রেণিবিভাগ কর্ম্মবিভাগ দেখিলে চমকিত হইতে হয়। তাহাদের প্রত্যেকের নিরূপিত কাজ আছে। কর্ত্তব্যসাধনে ত্রুটি হইলে কোন ব্যক্তি সমাজপতির নিকট দণ্ড লাভ করে কি না জানি না—করা অসম্ভব নয় —তবে প্রকৃতির কাছে দণ্ডিত হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন নীতিশাস্ত্রকার বা ধর্ম্মশাস্ত্রকার পিপীড়াকে বা মৌমাছিকে কর্ত্তব্য অনাচরণে প্রত্যবায়ভাগী করিতে সাহসী হইবেন না। পিঁপীড়াকে নানা দণ্ড ভোগ করিতে হয়, কেবল যমদণ্ড ভোগ করিতে হয় না। কেন না, পিঁপীড়ার ধর্ম্মবুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহা স্বীকারে কেহ সাহসী হইবেন না। সে যাহা কিছু করে, কর্ত্তব্যবুদ্ধির বা ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া করে না, সে নৈসর্গিক সহজ সংস্কারবশে, যাহাকে ইংরেজীতে instinct বলে, তাহার বশেই করিয়া থাকে। এই সহজ সংস্কারের হাতে সে কলের পুতুল; ঘটিকাযন্ত্রের মত যথানিয়মে চলিতে সে বাধ্য। মনুষ্য যখন সর্ব্বতোভাবে পশুধর্ম্মা ছিল, তখনও সেও ধর্ম্মের দুয়ারে দায়ী ছিল না। সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিলেও যদি তখন তাহার ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্গম না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তখন ধর্ম্মাধর্ম্মের জন্য সে দায়ী ছিল না। অভিব্যক্তির সোপানপরম্পরায় আরোহণ করিয়া যখন সমাজবদ্ধ মনুষ্য ক্রমশঃ উচ্চতর পদবীতে উঠিতে থাকে, তখন ক্রমশঃ তাহাতে ধর্ম্মবুদ্ধির বিকাশ হয়। কেন হয়, কিরূপে হয়, ডারুইন-শিষ্য তাহা বলিতে চাহেন না। সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ডারুইন-শিষ্যের অভ্যাস নাই, তাহার উত্তর দিতেও তিনি বাধ্য নহেন। তবে তিনি দেখান যে, ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্গমে তাহার

লাভ আছে। এবং যাহাতে জীবের লাভ আছে, তাহাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে, কেমনে বলিতে পারি না, ক্রমশঃ উৎপন্ন ও অভিব্যক্ত হয়। ধর্ম্মবুদ্ধির বিকাশে সামাজিক মনুষ্যের লাভ আছে কি না, এইটুকু দেখাইতে পারিলেই ডারুইন-শিষ্যের কাজ শেষ হইল। লাভ আছে দেখাইতে পারিলেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন তাহার অভিব্যক্তিতে সাহায্য করিয়াছে, ইহা মনে করা যাইতে পারিবে। মানুষ যখন সর্ব্বতোভাবে পশুধর্ম্মা ছিল, তখন সে সম্পূর্ণরূপে আপন প্রকৃতির অধীন ছিল। ঐ সকল ষোল আনা পাশবিক প্রকৃতির মধ্যে দুইটা প্রধান—ক্ষুৎপ্রবৃত্তি ও কামপ্রবৃত্তি। প্রথমটা আত্মরক্ষার অনুকূল, দ্বিতীয়টি বংশরক্ষার অনুকূল। অনুকূল বলিয়াই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে ঐ পাশবিক প্রবৃত্তিগুলিও উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়; এবং পশুর মধ্যে ঐ প্রকৃতি দুইটা অত্যন্ত তীব্র, তাহাও বুঝা যায়। তীব্র না হইলে পশুর জীবনরক্ষা ও পশুর বংশরক্ষা ঘটিত না। 'বোধোদয়ে' পড়িয়াছিলাম, ঈশ্বর সকল জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা, কিন্তু সেই ঈশ্বরই আবার জীবকেই জীবের এক মাত্র আহার-সামগ্রী করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। মাটি খাইয়া ও জল খাইয়া ও বায়ু খাইয়া কোন জীবের বাঁচিবার উপায় তিনি করেন নাই। এক জীবকে মারিয়া ভক্ষণ না করিলে অন্য জীবের বাঁচিবার উপায় থাকে না। এই স্থলে আহারদাতৃত্ব ও রক্ষাকর্ত্তৃত্ব উভয়ের সামঞ্জস্য কিরূপে ঘটিবে, তাহার মীমাংসার ভার শ্রোতৃবর্গের উপর নিক্ষেপ করিলাম। জীবের আহার জীব, অথচ সেই আহার-সামগ্রীও অত্যন্ত পরিমিত। বিধাতা গুটিকতক প্রাণীকে ধরাধামে পাঠাইয়া বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ কর। এরূপ ক্ষেত্রে পশুজীবনে ক্ষুৎপ্রবৃত্তির তীব্রতার কারণ বোঝা যায়। যাহার ক্ষুধার তেজ নাই, এই কাড়াকাড়ি ব্যাপারে সে খাইতে পাইবে কি? এই কাড়াকাড়ি ব্যাপারের নাম জীবন-সংগ্রাম। এই জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত জীবসকল পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে সবলের জয় হয়। প্রকৃতির রাজ্যে সবলের জয়ের মূল এইখানে। কিন্তু মানব-সমাজে অধর্ম্মের মূলও প্রধানতঃ এইখানে; মুষ্টিমেয় খাবার লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়া বাঁচিতে হয়, কাজেই মানুষ গোড়ায় অধার্ম্মিক। ডারুইন-শিষ্য ইহা স্পষ্টরূপে দেখিয়াছেন। ঠিক কোন্‌খানে, এখন বলিতে পারিতেছি না, মহাভারতের এক স্থানে, অধর্ম্মের মূল অনুসন্ধানের প্রসঙ্গে

ঠিক এই কথাই দেখিয়াছি। জলাশয়ের মধ্যে মৎস্যেরা যেমন পরস্পরকে খাইয়া বাঁচে, সমাজমধ্যে মানুষেরা সেইরূপ পরস্পরকে খাইবার চেষ্টা করে। ইহার নাম দেওয়া হয় মাৎস্য ন্যায়। অধর্ম্মের মূল মানুষের এই সনাতন ক্ষুৎপ্রবৃত্তি। ক্ষুৎপ্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্রবৃত্তিটাও বর্ত্তমান। পাঁচটি সন্তান জন্মিয়া যেখানে পিতামাতার সেই মুষ্টিমিত আহারসামগ্রীর নূতন ভাগী হইতে বসিবে, সেখানে বংশবৃদ্ধি আত্মরক্ষার প্রতিকূল। জীব ইচ্ছা করিয়া জানিয়া শুনিয়া বংশবৃদ্ধি করিয়া জীবন-সংগ্রামের উৎকটতা বাড়াইবে না। অথচ বংশবৃদ্ধির উপায় না থাকিলে মর্ত্ত্যধামে জীবের ধারা রক্ষা হয় না। কাজেই কামপ্রবৃত্তি সময়ে সময়ে তীব্রতায় ক্ষুৎপ্রবৃত্তিকেও পরাস্ত করে। নিতান্ত অন্ধের মত নিজের ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া জীবগণ যৌন সঙ্গে প্রবৃত্ত হয়। নতুবা বংশরক্ষা ঘটে না। সেই হেতু এই উভয় প্রবৃত্তি পশুতে অতীব তীব্র। মনুষ্যও গোড়ায় পশু; কাজেই মনুষ্যেও ঐ দুই প্রবৃত্তি তীব্র মাত্রায় বর্ত্তমান। ঐ দুই পাশবিক প্রবৃত্তির তীব্রতা না থাকিলে মানুষ টিকিত না। অথচ এই দুই প্রবৃত্তি মানুষের সকল অধর্ম্মের মূল। মানুষকে সমাজ বাঁধিয়া বাস করিতে হয়; নচেৎ মানুষ এত দুর্ব্বল, সে একাকী ইতর পশুর সহিত লড়াই করিয়া উঠিতে পারে না। মানুষের দাঁতে পান চিবান চলে, হাড় চিবান চলে না; ইতর পশুর সঙ্গে লড়াই করিতে সে দাঁত কোন কাজে লাগে না। দাঁত নাই, নখ নাই বলিয়া মানুষের পক্ষে দল বাঁধিয়া থাকিলে সুবিধা হয়। কাজেই মানুষের সামাজিকতা। কিন্তু দল বাঁধিতে হইলে আবার বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়, প্রবৃত্তিকে সংযত রাখিতে হয়; পূরা স্বাতন্ত্র্যে দল ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। এক দিকে গোড়ায় প্রবৃত্তি অতীব তীব্র; অন্য দিকে প্রবৃত্তির দমন আবশ্যক। একটা জৈব ধর্ম্ম, অন্যটা সামাজিক ধর্ম্ম। অথচ উভয়ের মধ্যে সনাতন বিরোধ। সকল মানুষ যদি অকস্মাৎ ব্রহ্মচারী ও বাতাহারী হইয়া বসে, তাহা হইলে সত্বর মনুষ্যজাতি অস্তিত্বহীন হইবে। আবার প্রবৃত্তিকে নিরঙ্কুশ করিয়া পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলে সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে; মানবজাতি বন্য পশুর দংষ্ট্রাঘাতে ও নখরপ্রহারে লোপ পাইবে। সামাজিক মনুষ্যকে কাজেই দুই নৌকায় পা দিয়া চলিতে হয়। এইখানেই ধর্ম্মাধর্ম্মের মূল। প্রবৃত্তির সংযমে ধর্ম্ম, উহা সমাজরক্ষার অনুকূল; উহাই সমাজকে ধরিয়া রাখে; প্রবৃত্তির নিরঙ্কুশ চালনায় অধর্ম্ম; উহা সমাজের বন্ধন শিথিল করে। কখন

কোন্ পথে চলিতে হইবে, মনুষ্যকে তাহা বিচার করিয়া চলিতে হয়। আপন ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা বিচার করিতে হয়। পিঁপীড়ার মত ও মৌমাছির মত সে প্রকৃতির নিকট হইতে এ বিষয়ে সহজ সংস্কার লাভ করে নাই। প্রকৃতি ঠাকুরাণী সে বিষয়ে কৃপা করিলে ধর্ম্মবিচার দুরূহ হইত না, ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহানিহিত হইত না। সহজ সংস্কার যে পথ দেখাইয়া দিত, মানুষকে সেই পথে চলিলেই হইত। তাহাকে ধর্ম্মের দুয়ারে দায়ী হইতে হইত না। কেন জানি না, প্রকৃতি দেবী মানুষের প্রতি সে কৃপা করেন নাই। অধিকন্তু মনুষ্যে ধর্ম্মবুদ্ধি উদ্গত করিয়া তাহাকে অত্যন্ত ফাঁফরে ফেলিয়াছেন। সংসারের মধ্যে জীবনসমরে কোন্ পথে চলিতে হইবে, সে তাহা সর্ব্বত্র ঠিক করিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, আপনার দিকে চাহিও না; স্বার্থের দিকে চাহিও না; যাহাতে লোকহিত হয়, সেই দিকেই চল; লোকহিতেই ধর্ম্ম,—ইহার নাম হিতবাদ। লোকহিত আবার কি, বলিলে ইতস্ততঃ করিয়া বলিতে হয়, যাহাতে greatest good of the greatest number—সমাজের মধ্যে যাহাতে অধিকাংশের অধিক পরিমাণ হিত হয়। কিন্তু সে হিসাবটা বড় শক্ত হিসাব। কোনও শুভঙ্কর তাহার জন্য আর্য্যা বাঁধিয়া দেন নাই। আবার সমাজের সঙ্গে সমাজের বিরোধ আছে। যাহা আমার সমাজের অনুকূল, তাহা অন্য সমাজের প্রতিকূল। এবারে কেহ বলিয়া উঠিবেন, যাহা মানবজাতির পক্ষে মোটের উপর অনুকূল, তাহাই ধর্ম্ম; আত্মসমাজের প্রতিকূল হইলেও যাহা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের অনুকূল, তাহাই ধর্ম্ম। ইহা Religion of Humanity—মানবহিতরূপ মহাধর্ম্ম। কিন্তু এ আরও কঠিন সমস্যা; এখানে patriotism বা স্বদেশহিতৈষায় আঘাত লাগে। মানব-সমাজের অনুরোধে নিজের সমাজের অনিষ্ট করিতে গেলে নিজের সমাজ বাদী হয়, ফাঁসিকাঠে ঝুলাইতে যায়। ও-পক্ষ বলিবেন, ভয় কি, মানব-হিতের অনুরোধে এখন ফাঁসিকাঠে চড়; আপীলে বুঝা যাইবে। আবার মানবের হিত কিরূপে হইবে, বলা কঠিন। দৃষ্টান্ত চোখের উপর। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জাতির এই মানবের প্রতি প্রেম এত অধিক যে, তাঁহারা মানবজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য যত অসভ্য জাতিকে, যত দুর্ব্বল জাতিকে নির্ম্মূল করিতে বসিয়াছেন। কেন না, তাহাতে মানবজাতির মোটের উপর লাভ—in the long run অর্থাৎ লম্বা দৌড়ে লাভ।

কাজেই কি যে ধর্ম্ম, তাহার নিরূপণই দুরূহ ; মানুষের কর্ত্তব্য কি, তাহার দ্বিধাস্থলে নিরূপণের জন্য কোন যন্ত্র এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ধর্ম্মের তত্ত্ব পূর্ব্বের মত গুহাতেই নিহিত আছে। যে মনীষী দার্শনিকের মৃত্যুতে পাশ্চাত্য পৃথিবীতে সম্প্রতি এক সমুজ্জ্বল দীপের নির্ব্বাণ হইয়াছে, যে দীপের আলোকে কেবল পাশ্চাত্য সমাজ নহে, পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানিসমাজ আলোক পাইতেছিল, যাঁহার মৃত্যুর জন্য সভাস্থলে এই অবকাশে শোক-প্রকাশ আমি কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি, সেই মনীষী হার্ব্বার্ট স্পেন্সার relative ethics ও absolute ethics—সাপেক্ষ ধর্ম্ম ও নিরপেক্ষ ধর্ম্ম—এই দুই সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে বিচারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থমধ্যে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন। সকল অবস্থায় সকল সমাজে মনুষ্যের ধর্ম্মবুদ্ধি সমান জাগ্রত নহে। ফিজিদ্বীপের অধিবাসীরা বুড়া বাপকে রাঁধিয়া খাইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইত। মিশরের টলেমিগণ ভগিনী-বিবাহে সঙ্কুচিত হইতেন না। আমাদের নিকট উহা লোমহর্ষকর। কিন্তু ঐ সকল অনুষ্ঠান সেই সেই সমাজে তদানীন্তন ধর্ম্মবুদ্ধির বিরুদ্ধ ছিল না। ঐ সকলের অনুষ্ঠানকারীদের জন্য নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিতে গেলে ন্যায়বিচার হইবে না। যাহা এক সমাজে ধর্ম্ম, তাহা অন্য সমাজে অধর্ম্ম। যাহা এক ক্ষেত্রে ধর্ম্ম, তাহা অন্য ক্ষেত্রে অধর্ম্ম। যাহা এক সময়ে ধর্ম্ম, তাহা অন্য সময়ে অধর্ম্ম। মানব-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় যুগধর্ম্ম সর্ব্বত্র সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ সময়ে কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, তাহা কিরূপে নির্দ্ধারণ করিব? এই ধর্ম্মের তত্ত্ব কে আবিষ্কার করিবে? ধর্ম্মের তত্ত্ব অদ্যাপি গুহায় নিহিত রহিয়াছে।

অর্জ্জুন যখন জ্ঞাতিহত্যা দ্বারা রাজ্যলাভকে অধর্ম্ম নিশ্চয় করিয়া ও সেই জয়কে পরাজয় মনে করিয়া ধর্ম্মসংমূঢ়চিত্ত হইয়া স্তব্ধ হইয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়। ক্ষমা পরম ধর্ম্ম সন্দেহ নাই ; কিন্তু সময়ক্রমে ক্ষমাও অধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায় ; ধর্ম্মনিরূপণ অতি কঠিন ব্যাপার—ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্। খ্রীষ্টানদিগের প্রতি উপদেশ আছে, এক গালে চড় মারিলে অন্য গাল পাতিয়া দিবে। খ্রীষ্টানেরা সে উক্তি কত দূর পালন করেন জানি না—কিন্তু পাণ্ডবেরা যেমন পরপ্রযুক্ত চপেটাঘাত সহ্য করিয়াছিলেন, সকলে তাহা পারে না। ক্ষমাধর্ম্ম অবলম্বনে যুধিষ্ঠির কখনই পরাঙ্মুখ হন নাই। কিন্তু তাঁহাদের

জীবনে এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন ক্ষমা আর ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারিত না। সহিষ্ণুতার যে সীমা থাকা উচিত, অন্য লোকের বিবেচনায় বহু পূর্ব্বেই সে সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছিল; এখন শত্রুকে ক্ষমা করিলে উহা ধর্ম্ম না হইয়া অধর্ম্ম হইত। উহার নাম হইত ক্লৈব্য। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সেই ক্লৈব্য পরিহার করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। বস্তুতই মনুষ্য-সমাজে বর্ত্তমান অবস্থায় এমন এক সময় আইসে, তখন ক্ষমা ক্লৈব্য হইতে অভিন্ন হয়। ইহার নাম relative ethics; পরের প্রাণরক্ষায় বীরের গৌরব আছে, নিজের প্রাণপরিত্যাগে বীরের গৌরব আছে; কিন্তু অকারণে যখন আততায়ী আসিয়া আক্রমণ করে, তখন তাহার হস্তে প্রাণটাকে ছাড়িয়া দেওয়ায় গৌরব নাই। শত্রু যখন আসিয়া চোখের উপর পত্নীর বা দুহিতার অপমান করে, তখন তাহার শাস্তিবিধানে অধর্ম্ম হয় না; তাহাতে পরাঙ্মুখ হইলেই অধর্ম্ম হয়। পরে আসিয়া যখন অকারণে স্বদেশ আক্রমণ করে, তখন স্বদেশের রক্ষার্থ যুদ্ধে সঙ্কুচিত হইলে ক্লৈব্য হয়। পাণ্ডবদিগের জীবনে সেই সময় আসিয়াছিল, যখন আর ক্ষমা-প্রদর্শন ক্লৈব্য হইত। তাঁহারা পত্নীর নগ্নীকরণ পর্য্যন্ত সহিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও যদি সেই অপমানকর্ত্তার দণ্ডবিধানে দ্বিধাবোধ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ক্লৈব্য হইত। এখন ধর্ম্মরক্ষার জন্য, ভ্রাতার সহিত, পুত্রের সহিত, শ্বশুর শ্যালকের সহিত, আচার্য্যের সহিত ও পিতামহের সহিত যুদ্ধ তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইয়াছিল। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন; রাজ্যপ্রাপ্তি তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। সিংহাসনপ্রাপ্তি তাহার উদ্দেশ্য ছিল না, ধর্ম্মরক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। যুদ্ধের ফল কাহারও অধীন ছিল না, সম্ভবতঃ কৃষ্ণেরও অধীন ছিল না। কৃষ্ণ বালক ভাগিনেয় অভিমন্যুর হত্যা-নিবারণেও সমর্থ হন নাই বা নিবারণ করেন নাই। পাণ্ডবগণের হস্তে জয়লক্ষ্মীর সমর্পণও তাঁহার হয়ত অসাধ্য ছিল। জয় হউক আর পরাজয়ই হউক, যুদ্ধ এখন কর্ত্তব্য হইয়াছিল। সেই জন্য ফলাকাঙ্ক্ষা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া যুদ্ধ করিতে কৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছিলেন। যুদ্ধে কৌরবকুলের ধ্বংস হইয়াছিল; কিন্তু যদি পাণ্ডবকুলেরই ধ্বংস হইত, তাহাতেও কৃষ্ণের পক্ষে ফল সমান হইত। জয়-পরাজয় তাঁহার লক্ষ্যই ছিল না। বস্তুতই পাণ্ডবকুলের জয় হয় নাই। ভ্রাতার ও পুত্রের রুধিরপ্রদিগ্ধ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যুধিষ্ঠির জয়লাভ করিয়াছিলেন, মনে করিতে

গেলে যুধিষ্ঠিরের অবমাননা হয়। বস্তুতই তাঁহাদের জয় হয় নাই। তাঁহারা ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন; সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যপালনে তাঁহারা উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। মনুষ্যের সুস্থ স্বাভাবিক ধর্ম্মবুদ্ধি অনেক সময়ে এই ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দেয়। মানবের অভ্যন্তরে সেই পথ দেখাইবার জন্য এক জন বসিয়া আছেন, তিনিই সেই পথ দেখান; ইউটিলিটির বিচারে ক্ষতি-লাভ গণনায় ও শুভঙ্করী আর্য্যায় এই ধর্ম্মের হিসাব পাওয়া যায় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অধিক লোকের অধিক হিত ঘটিয়াছিল কি না, কে তাহার হিসাব করিবে? আঠার অক্ষৌহিণী মনুষ্যের পত্নী যেখানে অকালে বিধবা হইয়াছিল, পুত্র কন্যা যেখানে অনাথ হইয়াছিল, সেখানে এই ক্ষতি-লাভ গণনার হিসাব করিয়া ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে কে সাহস করিবে? কাহারও যদি সেরূপ হিসাবে সাহস থাকে, তিনিই হিসাব করুন, আমরা সে দুঃসাহস করিব না। গাণ্ডীবধন্বা কপিধ্বজ হইতে নামিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে আপাততঃ বসুন্ধরা রক্তক্লিন্ন হইত না। ইতরের বিবেচনায় হয়ত তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। অর্জ্জুনও ক্ষণেকের জন্য বিহ্বল হইয়া উহাই ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলিলেন, মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়। যুদ্ধ ক্রূর কর্ম্ম, অতএব অধর্ম্ম, কিন্তু সময়ক্রমে উহাও ধর্ম্ম হয়। তিনি অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া পরবর্ত্তী মানবজাতিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন—কর্ম্মেই তোমার অধিকার—ফলে তোমার অধিকার নাই। যথা ধর্ম্ম তথা জয়—এই নীতি হয়ত সত্য—কিন্তু সত্য হউক আর নাই হউক, ইহলোকে উহা প্রযোজ্য হউক আর নাই হউক, তুমি ধর্ম্মসাধনে বাধ্য, জয়ে তোমার অধিকার নাই। তুমি যাহাকে জয় বিবেচনা কর, তাহা জয় না হইতে পারে; তুমি যাহাকে পরাজয় মনে করিতেছ, দুর্জ্ঞেয় জাগতিক বিধানে তাহাই হয়ত জয়। কিন্তু জয়-পরাজয়-বিচারে তোমার ক্ষমতা নাই; ক্ষতি-লাভ গণনা করিয়া তুমি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিও না।

আচার্য্য হক্সলি এক জায়গায় বলিয়াছেন যে, যে-বিধানক্রমে জগদ্‌যন্ত্র চলিতেছে, উহা moralও নহে, immoralও নহে, উহা unmoral. জীবেরা পরস্পরকে হত্যা করিয়া ও ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে ও তাহার ফলে জীবন-সংগ্রামে অযোগ্য জীবের ধ্বংস ঘটিতেছে; ইহা জাগতিক বিধান —ইহা immoral নহে অর্থাৎ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ নহে, ইহা unmoral অর্থাৎ

ধর্ম্মাধর্ম্মবহির্ভূত। ভূমিকম্পের ও ঘূর্ণিবায়ুর উৎপাতে পাপ নাই; সেইরূপ বাঘেরও মেষ-ভক্ষণে পাপ নাই। মানুষ যখন ধর্ম্মবুদ্ধি সত্ত্বেও জ্ঞানপূর্ব্বক অপকর্ম্ম করে, তখনই ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা আসে। তখনই সেই অপকর্ম্মটা immoral অর্থাৎ অধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। মানুষ যখন নিতান্ত অসভ্য বন্য দশায় পশুর মত পরস্পর মারামারি করিয়া আত্মরক্ষা করিত, তখনও তাহাদের কাজ unmoral অর্থাৎ ধর্ম্ম-সম্পর্কশূন্য ছিল; কিন্তু উন্নত অবস্থায় কাজটা অনুচিত হইতেছে বুঝিয়াও, স্বার্থরক্ষার জন্য বা প্রবৃত্তির তাড়নায় যখন সে সেই অপকর্ম্ম করে, তখনই তাহা immoral বা অধর্ম্ম হয়। উচ্চতম মনুষ্য-সমাজেও এখনও সেই জীবন-সংগ্রাম থামে নাই; তবে মনুষ্য যাহা unmoral ছিল, তাহাকে immoral বলিয়া ক্রমশঃ গ্রহণ করিতেছে; যাহা ধর্ম্মাধর্ম্মের বাহিরে ছিল, তাহা অধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছে; ইহারই নাম তাহার ধর্ম্মবুদ্ধির অভিব্যক্তি।

হক্সলি বিশ্লেষণ দ্বারা জগৎপ্রণালীকে এইরূপে দুইটা প্রকোষ্ঠে ভাগ করিয়াছেন। জগতে যে বিধান, তাহার নাম দিয়াছেন cosmic process; উহা unmoral, উহার সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্পর্ক নাই; উন্নত মানব-সমাজে যে বিধান, তাহার নাম দিয়াছেন ethical process—উহার সহিতই ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্পর্ক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এইরূপ বিশ্লেষণ-কার্য্যে মজবুত। বিবেকের অণুবীক্ষণ লাগাইয়া ঐক্যের মধ্যে কোথায় অনৈক্য আছে, তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া বাহির করিতে দক্ষ। আমাদের প্রাচ্য দেশে অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য আবিষ্কারেই প্রতিভা নিয়োজিত আছে। পাশ্চাত্যেরা যে ঐক্য দেখেন না, তাহা বলিতে চাহি না; প্রকৃতপক্ষে ঐক্যের মধ্যে অনৈক্য আবিষ্কার ও অনৈক্যমধ্যে ঐক্যের আবিষ্কার, উভয় লইয়া বিজ্ঞানশাস্ত্র। তবে বিজ্ঞানশাস্ত্রকে কখনও বা এদিকে, কখনও বা ওদিকে ঝোঁক দিতে হয়। অনৈক্যমধ্যে ঐক্যের আবিষ্কারেই প্রাচ্যগণের ঝোঁক। মানব-সমাজেই হউক আর পশু-সমাজেই হউক, আর অচেতন জড় জগতেই হউক, একটা নিয়তি, কোন একটা অনির্দ্দেশ্য উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বত্রই কাজ করিতেছে; প্রাচ্যগণ জগদ্বিধানকে সেই চোখে দেখেন। যে নিয়তি সৌর জগতে গ্রহ-উপগ্রহগুলিকে আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ঘুরাইতেছে, যে নিয়তির বশে দিন-রাত্রি হয়, ঋতু-পরিবর্ত্তন হয়, জল-ঝড় হয়, ভূমিকম্প ঘটে ও ঝঞ্ঝাবায়ু বহে, অথবা যে নিয়তির বশে ম্যামথ ও মাষ্টোডনের বাসভূমিতে মানুষে

রেলপথ চালাইতেছে ও টেলিগ্রাফের তার খাটাইয়াছে, সেই নিয়তি, এবং যে নিয়তি মানুষকে সৎকর্ম্মে ও অসৎকর্ম্মে প্রেরিত করে, যাহাতে সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগ করাইয়াছিল ও যীশুকে ক্রুসে ঝুলাইয়াছিল, এই নিয়তি, এই উভয় প্রকোষ্ঠের উভয় নিয়তির মধ্যে এক পরম ঐক্য বর্ত্তমান আছে। আর্য্য ঋষি জড় জগতে, জীবজগতে ও মানব-সমাজে অনৈক্যের মাঝে সেই ঐক্য দেখিয়াছিলেন। যাহাতে মানব-সমাজকে ধরিয়া আছে, তাহাকে ধর্ম্ম নাম দাও, আর যাহাতে সৌর জগৎকে ধরিয়া আছে বা জীবসমাজকে ধরিয়া আছে, তাহাকে ধর্ম্ম নাম না দাও, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু উভয়ই একটা বৃহত্তর ব্যাপারের অঙ্গ ; সেই বৃহত্তর ব্যাপারের নাম ঋত। সমস্ত বিশ্ব-জগৎ তাহার অধীন ; জগতের কোন অঙ্গ, কোন প্রত্যঙ্গ তাহার বন্ধন ছাড়িয়া চলিতে পারে না।

এই যে ঋত, যাহা জগতের নিয়ামক, যাহার নাম নিয়তি, যাহা তোমার আমার অধীন নহে, তাহা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান—তাহা ব্যাবহারিক বিশ্ব-জগতে সত্যের সহিত অভিন্ন—বিজ্ঞান-বিদ্যায় তাহার নামান্তর সত্য। আর্য্য ঋষি পুরাকালে দেখিয়াছিলেন, এই যে ঋত, এই যে সত্য, তাহা অভীদ্ধ তপস্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল—কাহার তপস্যা হইতে জন্মিয়াছিল, কে বলিবে ; কবে জন্মিয়াছিল, তাহার উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই ;—আর্য্য ঋষি দেখিয়াছিলেন, ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ তপসোঽভীদ্ধাদজায়ত—তাহার পর রাত্রি হইয়াছে, দিন হইয়াছে, সূর্য্য চন্দ্র হইয়াছে, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকের সৃষ্টি হইয়াছে, বিশ্ব-জগতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমুদয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ঋতের জয় সর্ব্বত্র। তাহার পরাজয় সম্ভবপর নহে ;—সেই ঋতেই বিশ্ব অবস্থিত, কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। হিরণ্যগর্ভ হইতে ধূলিকণা পর্য্যন্ত সকলই তাহার অধীন। ঋতের জয় সর্ব্বত্র ; সেই ঋত বিশ্বকে ধরিয়া আছে, অতএব তাহারই নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্ম শব্দে এই ব্যাপকতর অর্থ আরোপ করিলে ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী, উহার পরাজয় কল্পনায় আসে না। এই অর্থে ধর্ম্মের জয় সত্য ; ইহা অস্বীকারের উপায় নাই। সেই ঋত হইতেই এ সকলের উৎপত্তি হইয়াছে, তৎকর্ত্তৃকই এ সকল চালিত হইতেছে, তৎকর্ত্তৃকই এ সকল আবার সংহৃত হইবে। দিন-রাত্রি থাকিবে না, চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে না, স্বর্গ-পৃথিবী থাকিবে না। কোথায় বা জয় আর কোথায় বা পরাজয় ; উভয়ই ইহার কাছে তুল্যমূল্য ; পুণ্য ইহার দক্ষিণ

হস্ত, পাপ ইহার বাম হস্ত। মনুষ্যজাতির সমস্ত ইতিহাস ইহার নিকট এক নিমেষ; পলকের পূর্ব্বে সেই ইতিহাস ছিল না, পলক ফেলিবার পরে আর তাহা থাকিবে না। ঋষি যাহা দেখিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাহা কর্ত্তব্যমূঢ় অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু দিয়া দেখাইয়াছিলেন—জগন্নিয়ন্তার সেই বিশ্বরূপের আদি অন্ত কোথায় জানা যায় না, মধ্য কোথায় তাহা বলা যায় না—দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরাল ব্যাপিয়া তাহা অবস্থিত; তাহার অভ্যন্তরে লোকসকল সমৃদ্ধবেগ হইয়া নাশের জন্য প্রবিষ্ট হইতেছে, ভীষ্ম-দ্রোণ প্রবেশ করিতেছেন, সূতপুত্র-জয়দ্রথ প্রবেশ করিতেছেন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ প্রবেশ করিতেছেন, পাণ্ডুপুত্রগণ প্রবেশ করিতেছেন, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, বিশ্বদেবগণ, সকলেই তাহাতে লীন হইয়া যাইতেছেন। সেখানে জয়ই বা কাহার, আর পরাজয়ই বা কাহার?

এই বিশ্বরূপ দেখাইয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, জয় হইবে কি পরাজয় হইবে, দেখিবার প্রয়োজন নাই; হিসাবের খাতায় অঙ্ক কষিয়া কোন্ কার্য্যের কি ফল হইবে, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই; ফলে তোমার অধিকার নাই, কর্ম্মেই তোমার অধিকার; অতএব অপ্রমত্ত হইয়া স্বাভাবিক সুস্থ ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায়, শত্রুর বিনাশই যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে শত্রুনাশ দ্বারা ধর্ম্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হও। ইহলোকে তোমার জয় হইবে কি না, পরলোকে তোমার কোথায় গতি হইবে, তাহার হিসাব করিতে বসিও না—কামনাশূন্য হইয়া তুমি কর্ম্ম কর। ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত আছে; হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ অপিহিত রহিয়াছে। ক্ষমা সকল সময়ে ধর্ম্ম হয় না; প্রাণত্যাগও সকল সময়ে ধর্ম্ম হয় না; আততায়ীর বিনাশেও সকল সময়ে অধর্ম্ম হয় না।

এত ক্ষণে দেখা গেল, যথা ধর্ম্ম তথা জয়—এই নীতিবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? যাহার ধর্ম্মবুদ্ধি এখনও সম্পূর্ণ জাগ্রত হয় নাই, তাহাকে জোর করিয়া ধর্ম্মপথে রাখিবার জন্য প্রলোভনের প্রয়োজন হয়ত থাকিতে পারে—লোকস্থিতির জন্য, লোকরক্ষার জন্য পুলিসের প্রয়োজন আছে, ফাঁসিকাঠের প্রয়োজন আছে; নীতিকথাপূর্ণ এণ্ট্রান্স-কোর্সেরও প্রয়োজন আছে; যথা ধর্ম্ম তথা জয় বা তাদৃশ অন্যান্য নীতিবাক্যেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু একটু উচ্চ সোপানে উঠিলে ঐ বাক্যের সার্থকতা লইয়া বিতর্ক উঠিতে পারে। অন্ততঃ আমরা যে সঙ্কীর্ণ অর্থে উহা গ্রহণ করিয়া

থাকি, সেই অর্থে উহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সংশয় উঠিতে পারে, বস্তুতঃ জাগতিক বিধানে কিসে জয়, কিসে পরাজয়, তাহাই বলা যখন অসাধ্য, যাহাকে আমরা পরাজয় মনে করি, তাহাই হয়ত যখন জয়, তখন এইরূপে ধর্ম্মের জয় হইল, তাহা প্রতিপন্ন করিব কিরূপে ?

এইখানে তার্কিক আসিয়া যদি প্রশ্ন করে, যদি ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও আমার জয়ের আশা থাকিল না, তবে কেন আমি সুগম অধর্ম্মের পথ ছাড়িয়া ধর্ম্মের গহন পথে যাইব, তাহা হইলে তাহাকে নিরস্ত করা কঠিন হয়। নিরস্ত করিবার লৌকিক উপায় আছে বটে ;—তুমি ঐ পথে চলিলে, তোমার কান মলিয়া দিব, তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইব, তোমাকে ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াইব। ও-পক্ষ তাহার উত্তর দিবে—তোমার গায়ে জোর আছে, যত ক্ষণ তুমি সেই জোর আমার উপর প্রয়োগ করিতে পারিবে, তত ক্ষণ আমাকে বাধ্য হইয়া নিরস্ত থাকিতে হইবে বটে, কিন্তু যদি তোমাকে ও তোমার ডালকুত্তাকে ফাঁকি দিতে পারি, তাহা হইলে কি করিবে ?

ধর্ম্মপ্রচারক এখানে আসিয়া বলেন, তুমি লোকহিতে প্রস্তুত হও, নিজের হিতে তাকাইও না—কেন না, লোকহিতই ধর্ম্ম। কিন্তু লোকহিতে আমার কি লাভ ? লোকে যত ক্ষণ জোর করিয়া আমাকে এ-পথে রাখিবে, তত ক্ষণ থাকিতে পারি, কিন্তু অন্য সময়ে কেন থাকিব ? কেহ আসিয়া বলিবেন, যাহাতে অধিক লোকের অধিক হিত ঘটে, সেই পথে চল ; কেহ বলিবেন, তুমি মানবজাতির জন্য স্বার্থ উৎসর্গ কর। কিন্তু কি আকর্ষণে আমি তাহা করিব ? এইখানে পণ্ডিতেরা একটা শেষ উত্তর দিবেন—ধর্ম্মেই সুখ এবং সুখই লাভ ; অতএব ধর্ম্মপথে চল। অধর্ম্মে যে সুখ হয়, সে সুখই নহে, ধর্ম্মের সুখের নিকট তাহা দাঁড়াইতে পারে না—সেই সুখই তোমার লভ্য—সেই লাভের কামনায় তুমি ধর্ম্মপথে চল। কিন্তু এ সেই পুরাণ কথা—সুখের নামান্তর জয় ; ধর্ম্মে সুখ, তাহার অর্থ—যথা ধর্ম্ম তথা জয়। ইতর লোকে যাহাকে সুখ মনে করে, সে সুখ সুখই নহে ; ইতর লোকে যাহাকে জয় মনে করে, সে জয় জয়ই নহে। কিন্তু ধর্ম্মের তত্ত্বও যেমন, সুখের তত্ত্বও তেমনই গুহায় নিহিত ; ঐ সুখের মরীচিকার উদ্দেশে চলিতে গেলে পথভ্রান্ত হইবারই সম্ভাবনা। মিছা প্রলোভনে লোককে ভ্রান্ত করা উচিত নহে।

বস্তুতই ধর্ম্মশাস্ত্রের পক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট সমস্যা। ধর্ম্মের sanction কি, ধর্ম্মের প্রমাণ কি, ধর্ম্মের চরম ও পরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি, ইহা নির্ণয়ের জন্য সর্ব্বদেশের তত্ত্বান্বেষিগণ ব্যাকুল। কেহ বলেন, ইহা বিধাতার আদেশ—অতএব ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লও—তর্ক করিয়া ফল নাই। এই আদেশের মূল খুঁজিবার জন্য কেহ অলৌকিকের ও অতিপ্রাকৃতের আশ্রয় লন। কেহ বা প্রাকৃত জগতের বিধানকেই বিধাতার আদেশের সহিত সমানার্থক বলিয়া গ্রহণ করেন। আমাদের শাস্ত্রে এই মূল অনুসন্ধান করিয়া একটি কথা বলা হইয়াছে, অন্য শাস্ত্রে সে কথা আছে কি না, জানি না। পরের হিত করিব কেন, ভূতের হিত করিব কেন? ইহার উত্তর—সেই ভূতই তুমি—সর্ব্বভূত তোমা হইতে অভিন্ন। সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি নিরীক্ষণ করিবে। তুমি সর্ব্বভূত ব্যাপিয়া আছ ও সর্ব্বভূত তোমাতেই অবস্থিত আছে; কাজেই ভূতের উপকার, লোকহিত, তোমারই হিত। পরকে পীড়া দিলে তুমি নিজেকেই পীড়া দিবে; পরকে কাঁটা বিঁধিলে তোমার নিজের গায়ে বিঁধিবে। পরকে আনন্দ দিলে তোমার নিজেরই আনন্দ হইবে। যখন তুমি জানিবে, তোমাকে ছাড়িয়া আর পর নাই; যেখানে যা-কিছু আছে, সে তুমি স্বয়ং; যাহা কিছু তুমি দেখিতেছ, তাহা দ্রষ্টা তোমা হইতে অভিন্ন; যাহা তোমার বিষয়, তাহা বিষয়ী তোমা হইতে অভিন্ন; তখন আর তুমি এই প্রশ্ন করিবে না যে, কেন আমি স্বার্থ ছাড়িয়া পরার্থ করিব।

বস্তুতই যে তাহা জানিয়াছে, সে আর সে প্রশ্ন তুলিবে না। যাহারা এখনও জানে নাই, তাহাদিগকে সে উত্তর দেওয়া মিছা। তাহাদিগের জন্য ফাঁসিকাঠ ও ডালকুত্তার ব্যবস্থা করিয়া, স্বর্গের প্রলোভন ও নরকের বিভীষিকা ব্যবস্থা করিয়া, সমাজের নায়কগণ লোকরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন।

আমার পরমসহিষ্ণু ক্ষমাধর্ম্মের অবতার শ্রোতৃবর্গের সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিতে আর আমার সাহস হইতেছে না; কি জানি, তাঁহারা যদি অকস্মাৎ ক্লৈব্য পরিহার করিয়া আমার উপর আপতিত হন, তাহা হইলে আমার পক্ষে ধর্ম্মবিচার অসম্ভব হইবে। এক বার ইচ্ছা ছিল, আমাদের ভারতবর্ষের অন্যতর মহাকাব্য রামায়ণে এই ধর্ম্মতত্ত্ব কিরূপে বুঝান হইয়াছে, তাহার আলোচনা করি। আমাদের অনেকের বিশ্বাস, এই মহাকাব্যও ধর্ম্মের জয়

ও অধর্ম্মের পরাজয় দেখাইবার জন্য আদিকবি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। অধর্ম্মমূর্ত্তি রাবণের সবংশে নিধন ও রামচন্দ্রের সিংহাসনপ্রাপ্তি ধর্ম্মের জয়ের দৃষ্টান্ত। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, এই ভ্রমটা যেন ঘুচাইবার জন্যই মহাকবি তাঁহার কাব্যের শেষ ভাগে—ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পুনশ্চ ক্ষমা করিবেন—মহাকবি তাঁহার মহাকাব্যের শেষ ভাগে উত্তরকাণ্ডটি জুড়িয়া দিয়াছেন। রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বিসর্জন করিয়া কাজটা ভাল করিয়াছিলেন, কি মন্দ করিয়াছিলেন, তাহার সমালোচনায় আমার সাহস নাই। আমাদের মত ইংরেজীনবিশদের এ বিষয়ের সমালোচনায় কণ্ডূয়নপ্রবৃত্তি আমি দেখিয়াছি; কিন্তু আমার সে প্রবৃত্তি নাই। সেই বজ্রের অপেক্ষাও কঠোর ও কুসুমের অপেক্ষাও কোমল লোকোত্তর চরিত্র চিত্তপটে আঁকিবার চেষ্টা করিলে আমার বেপথু হয়, আমার হৃৎপিণ্ড কম্পিত হয়। সেই অলৌকিক মাহাত্ম্যের সম্মুখীন হইলে, আমার ক্ষুদ্রতা তাহার জ্যোতির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তিনি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণী যাহাতে সংশয় প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়া নিজের ক্ষুদ্রত্বেরই পরিচয় দেয়—সেই ধর্ম্মের রক্ষার জন্য তিনি সীতাদেবীকে বিসর্জন করিয়াছিলেন। তিনি পত্নীত্যাগ করেন নাই; তিনি আপনার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়াছিলেন; তিনি আপনার অর্দ্ধেক অঙ্গ ছিন্ন করিয়া হোমানলে আহুতি দিয়া আপনাকে হীন, আপনাকে ভগ্ন, আপনাকে শীর্ণ, আপনাকে অসম্পূর্ণ করিয়া, সেই অসম্পূর্ণ আত্মটুকু ধর্ম্মের পরিচর্য্যার জন্য অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন। ইহা লোকোত্তর কর্ম্ম—ইহা ধর্ম্ম—ইহার তত্ত্ব গুহাতে নিহিত আছে; সেই গুহার অন্ধকার ভিন্ন করা তোমার আমার মত মূষিকের ও ছুচ্ছুন্দরের কার্য্য নহে। তোমার আমার সৌভাগ্য যে, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই লোকোত্তর ধর্ম্মের আদর্শ দেখিতে পাইয়াছি। ধর্ম্মবুদ্ধি তাঁহাকে প্রেরিত করিয়া এই ধর্ম্মপালনে প্রবৃত্ত করিয়াছিল—তিনি সুখের আশা করেন নাই, তিনি জয়ের আশা করেন নাই। সীতার সহিত তিনি যখন বনে ছিলেন, তখন তিনি জয়ী ছিলেন; রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়া তিনি জয়ী হয়েন নাই। জয়ের আশা তিনি করেন নাই; শুনিয়াছি, তিনি আত্মবিস্মৃত ছিলেন, তিনি আপনার মাহাত্ম্য আপনি জানিতেন না; বৈকুণ্ঠ তাঁহার আপন ধাম হইলেও তিনি বৈকুণ্ঠের দিকে চাহেন নাই। যমের ভয় তাঁহার ছিল না; যমভয়

নিবারণের জন্য তিনি ধরায় আসিয়াছিলেন। নিজের হাতে তাঁহার হৃদয়কুণ্ডে তিনি যে তীব্র আগুন জ্বালিয়াছিলেন, যমালয়ের অগ্নিকুণ্ডে তাহার তীব্র যাতনার তুলনা হয় না। যাবচ্চরন্তি ভূতানি যাবদ্গঙ্গা মহীতলে, মানব-ধর্ম্মের সেই মহাদর্শ মানবজাতির নিকট অব্যাহত রহুক।

মানব-জাতির ভাবনা ভাবিয়া এখন আমাদের কাজ নাই—আমরা ভারতবাসী যেন চিরকাল ধরিয়া সেই আদর্শের নিকট প্রণত থাকি। ভারতের মহাকবি যে করুণ গীতি গাহিয়া গিয়াছেন, উহা বিজয়গীতি নহে, উহা পরাজয়-সঙ্গীত; উহা সুখের গীত নহে, উহা দুঃখের গীত। উহা মানব-জীবনের দুঃখগীতি—মহাজ্ঞানী কপিল ঋষি মানব-জীবনকে যে দুঃখের সহিত অভিন্ন করিয়া গিয়াছেন, ভগবান্ তথাগত বোধিদ্রুমতলে মানব-জীবনকে যে দুঃখের সহিত অভিন্ন করিয়া গিয়াছেন—উহা মানবের সেই চিরন্তন দুঃখের গীতি। উহা বিশেষতঃ ভারত-সন্তানের দুঃখগীতি। প্রাণি-সমাজ ব্যাপ্ত করিয়া নিয়তির বশে যে ঘোর নির্দ্দয় নিষ্ঠুর জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে, সেই জীবন-সংগ্রামে এখন আমাদের পরাজয়। যাঁহারা আমাদের এই পরাজয়ে নিয়তির মঙ্গলহস্ত দেখিতে পান, তাঁহারা সুখী। তাঁহাদের সেই সুখে আমার অধিকার নাই। আমি এই পরাজয় মাত্রই দেখিতে পাই; ভবিতব্য আমার নিকট অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; ভারতবাসীর জাতীয় জীবন কিরূপে সমাপ্ত হইবে, তাহা আমি জানি না। ভারতের আদিকবি যেন দিব্য চক্ষে আমাদের এই ভবিতব্য পরাজয় দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং আমাদের সান্ত্বনার জন্য পরাজয়-সঙ্গীত ও দুঃখের সঙ্গীত গাহিয়া গিয়াছেন। আমরা জয়ের আশা করিব না—ভারতবাসীর ভবিতব্য কি—সেই দুর্নিরীক্ষ্য লক্ষ্যের দিকে চাহিয়া আমাদের কাজ নাই। আমাদের আদিকবির সেই দুঃখগীতি আমাদিগকে সান্ত্বনা দিবে—জয় পরাজয় লক্ষ্য না করিয়া আমরা ধর্ম্মের পথে চলিব। ধর্ম্ম আমাদের লক্ষ্য হউক। সত্য আমাদের লক্ষ্য হউক। জয়-পরাজয় নিয়তির বিধান। নিয়তির জয় হউক।

যজ্ঞ

আমাদের পুরাতন সমাজতন্ত্র বেদ নামক শব্দরাশির উপর প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা এই সমাজতন্ত্রের অধীন, তাঁহারা এই শব্দরাশিকে অনাদি ও অপৌরুষেয় বলিয়া মানিয়া থাকেন। যাঁহারা মানেন না,—কার্য্যতঃ মানেন না,—তাঁহারা বড়লোক ও ভাল লোক হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা আমাদের সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নহেন।

অথচ ইহা না মানিবারও সম্যক্ কারণ দেখি না। এই ব্যাবহারিক জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা চিরকালই আছে ও চিরকালই থাকিবে; ইহা না মানিলে কোন বিজ্ঞানেরই ভিত্তি থাকে না। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, বস্তু মাত্রই বিকারী ও পরিণামশীল; এবং এই বিকার ও পরিণামই আমরা অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করি। এই অনিত্য বিকারের অন্তরালে ইহার আশ্রয়রূপে যে নিত্য বস্তু আছে, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নহে; উহা হয়ত একটা কাল্পনিক বস্তু। কিন্তু এই ব্যাবহারিক জগৎ সমস্তটাই যখন কল্পিত বস্তু, তখন এই যুক্তিতে ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। ব্যাবহারিক হিসাবে অস্তিত্বযুক্ত যাবতীয় বস্তুকে এই সঙ্কীর্ণ অর্থে নিত্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। "সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ"—সত্য দ্বারাই ভূমি ধৃত হইয়া আছে; "ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তি"—ঋত দ্বারাই আদিত্যগণ স্থির আছেন; ইহা না মানিলে বিজ্ঞানশাস্ত্র টিকে না। এই 'ঋত' ও এই 'সত্য' অভীদ্ধ তপস্যা হইতে জাত, এবং তাহা হইতেই আর সমস্ত জন্মিতেছে, এটুকু মানিয়া লইয়াই আমরা সংসারক্ষেত্রে চরিতেছি।

বেদকে শব্দসমষ্টি বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রথা আছে। কিন্তু এই শব্দ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়লব্ধ এবং বায়ুরাশিতে প্রতিঘাত-জাত শব্দ মনে না করিলেও চলিতে পারে। প্রাচীন কালের মীমাংসক ও শাব্দিক আচার্য্যগণ ইহা লইয়া বহু বিতণ্ডা করিয়াছেন। সেই বিতণ্ডার ফলে এইটুকু বুঝা যায় যে, প্রাচীন আচার্য্যেরা যে শব্দকে অনাদি ও অপৌরুষেয় বলিতেন, তাহা সাধারণের পক্ষে কোনরূপ অতীন্দ্রিয় বস্তু;—তাহা নিত্য-বস্তুরূপে জগৎ জুড়িয়া বিদ্যমান আছে;—তাহার আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অতএব তাহা অনাদি; তাহা কোন পুরুষের "কৃত" নহে, অতএব

অপৌরুষেয়। এমন কি, এই শব্দ হইতেই ব্যাবহারিক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এরূপ কথাও যখন দেখা যায়, তখন সেই শব্দকেই ঋত বা সত্যের বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তাহা অতীন্দ্রিয় হইলেও কোন কোন মহাপুরুষ সাধনাবলে কোন-না-কোনরূপে তাহার কোন-না-কোন দিকের, কোন-না-কোন অংশের সন্ধান পান—তাহা যেন তাঁহাদের 'দৃষ্টি'-পথে আইসে। যাঁহারা ইহা দেখিতে পান, তাঁহাদের নাম 'ঋষি'।

বস্তুতঃ এরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব সকল দেশে সকল কালেই হইয়া থাকে; অন্যে যাহা দেখিতে পায় না, তাঁহারা তাহা দেখেন, এবং জনসমাজে প্রচলিত ভাষায় শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দদ্বারা প্রকাশ করেন। তাঁহারাই ঋষি। নিউটন এবং ডারুইন এবং মাক্সওয়েলকে যদি কেহ আধুনিক যুগের ঋষি বলিয়া অভিহিত করিতে চাহেন, তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবার কারণ দেখিব না। তাঁহারাও সেই ঋতের—যে ঋত বিশ্ব-জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, সেই ঋতের এক দেশ না এক দেশ দেখিয়াছেন। তাঁহারা যাহা দেখেন ও প্রচার করেন, তাহা ব্যাবহারিক জগতের নিত্য সত্য—তাহা চিরদিনই বিদ্যমান আছে;—ছিল এত দিন প্রচ্ছন্নভাবে; তাঁহারা তাহা ব্যক্ত করিয়া দেন।

বেদপন্থীরা বলেন, বেদ নামক অতীন্দ্রিয় শব্দরাশিও সময়ে সময়ে ঋষিগণের বিজ্ঞানদৃষ্টির গোচর হইয়াছে; তাঁহারা সেই প্রচ্ছন্ন সত্যকে প্রচলিত মানবী ভাষায় প্রকাশ করিয়া মানবের হিতার্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। নিউটন যেমন মাধ্যাকর্ষণঘটিত মন্ত্রে অথবা ডারুইন যেমন অভিব্যক্তিঘটিত মন্ত্রে ব্যাবহারিক নিত্য সত্যের এক-একটা দেশ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, বেদপন্থী সমাজের প্রাচীন ঋষিরাও সেইরূপ ব্যাবহারিক জগতের কোন-না-কোন দেশের আবরণ খুলিয়া দিয়াছেন। এমন কি, যে আবরণে গূঢ়তর পরমার্থতত্ত্ব আবৃত হইয়া ব্যাবহারিক জগৎরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, সেই আবরণও উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন।

আর একটু নীচে নামিয়া দেখা যায়,—বেদ ও বিদ্যা, এই দুই শব্দ সমানার্থক। প্রাচীন বেদপন্থী সমাজে ঋষিগণের আবিষ্কৃত সমুদয় বিদ্যার সমষ্টিকে বেদ বলিত। এ-কালের বেদপন্থী সমাজেও যে কিছু বিদ্যা বর্ত্তমান আছে, তাহা সেই পুরাতনী বিদ্যারই বিকৃতি ও পরিণতি মাত্র। ভাগীরথীর

সহস্র শাখার উৎস-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে সেই গোমুখীতেই উপস্থিত হইতে হইবে। স্থূলতঃ এই বিদ্যাকে জ্ঞানকাণ্ডে ও কর্ম্মকাণ্ডে ভাগ করা হয়। জ্ঞানকাণ্ডে ব্যাবহারিক জগতের পারমার্থিক তত্ত্বনির্ণয়ের চেষ্টা আছে। ঋগ্বেদসংহিতার অন্তর্গত নাসদাসীয় সূক্তে সম্ভবতঃ সেই তত্ত্বের প্রথম স্পষ্ট প্রচার দেখা যায়; উক্ত সংহিতার অন্তর্গত অম্ভৃণকন্যা বাগ্‌দেবীদৃষ্ট দেবীসূক্তে সেই তত্ত্বের প্রায় পূর্ণ পরিণতি দেখা যায়। বেদের সমুদয় জ্ঞানকাণ্ডে এই তত্ত্বই আরও ফুটাইবার চেষ্টা হইয়াছে, আর নূতন কথা বড়-একটা বলা হয় নাই। তার পর কত যুগ অতীত হইয়া গেল; আর কেহ আর কোন নূতন কথা প্রচার করিতে পারেন নাই; পারিবেন, এরূপ আশাও নাই। উহাই জ্ঞানকাণ্ডের প্রথম কথা ও শেষ কথা—উহাতে যে সত্যের উল্লেখ আছে, তাহা অনাদি ও অপৌরুষেয় সত্য। ঋষিগণের আবিষ্কৃত এই সত্য মানব-জাতির সাধারণ সম্পত্তি। শুক্লযজুর্বেদান্তর্গত ঈশাবাস্যমিত্যাদি ঋক্‌সমূহাত্মক উপনিষদে মানবসাধারণের ধর্ম্মসম্পর্কে মূল কথা আবিষ্কৃত হইয়াছে;—মানবের কর্ম্মকাণ্ডের ইহাই প্রথম কথা ও শেষ কথা। তৎপরে যিনি যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে ঐ মূল কথাকেই পল্লবিত করা হইয়াছে। ব্যাবহারিক জগতের প্রতি মানবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে অনাদি ও অপৌরুষেয় সত্যের এতদ্দ্বারা প্রচার হইয়াছে, তাহাও মানব-জাতির সাধারণ সম্পত্তি।

কিন্তু বেদপন্থীর বেদমধ্যে অনেক কথা আছে, যাহা মানবের সাধারণ সম্পত্তি নহে। মানব-সমাজের যে সঙ্কীর্ণ অংশ বেদপন্থী, সেই সঙ্কীর্ণ অংশেই তাহার প্রযোজ্যতা। এই অংশকেই সাধারণতঃ বেদের কর্ম্মকাণ্ড বলিয়া থাকে। এই কর্ম্মকাণ্ডের ভিত্তিভূমিও উক্ত উপনিষদেই নিহিত আছে।

বেদপন্থী সমাজের মূল কোথায় ও এই সমাজের বিশিষ্ট ভাব কি, তাহা জানিতে হইলে ঋষি-প্রচারিত বেদের এই কর্ম্মকাণ্ডের আশ্রয় লইতে হয়। বেদপন্থী সমাজের যাহা বিশিষ্ট ধর্ম্ম, যদ্দ্বারা ঐ সমাজকে পৃথিবীর অন্যান্য সমাজ হইতে ভিন্ন করিয়া চিনিয়া লইতে পারা যায়, সেই ধর্ম্মের পরিচয় বেদের এই কর্ম্মকাণ্ড ভিন্ন অন্য কোথাও জানিবার উপায় নাই।

এই বিশিষ্ট সামাজিক ধর্ম্মেরও আদি কোথায়, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সহসা এক দিন পাঁচ জনে জটলা করিয়া এই ধর্ম্মের স্থাপনা করে নাই—কোন পুরুষকর্ত্তৃক ইহা "কৃত" নহে; বেদপন্থীর চক্ষুতে এই ধর্ম্মেও যে ব্যাবহারিক সামাজিক সত্যের একদেশের পরিচয় দেয়, তাহাও অনাদি ও

অপৌরুষেয়। যে দিন হইতে আর্য্য জাতির বেদপন্থী শাখা সমাজবদ্ধ হইয়াছে,—সে কোন্ দিন, তাহা আজিও কেহ জানে না—সেই দিন হইতে এই বিশিষ্ট ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সেই সমাজ ধৃত রহিয়াছে। এই ধর্ম্মের পারিভাষিক নাম যজ্ঞ এবং যজ্ঞের নামান্তর ত্যাগ। ত্যাগ নহিলে মনুষ্য সমাজবদ্ধ হইতে পারে না। মানবজাতির ধর্ম্ম মাত্রই ত্যাগাত্মক; তবে বেদপন্থী সমাজে ত্যাগের একটু বিশিষ্ট ভাব ছিল, তাহা বেদপন্থীর বেদ ভিন্ন অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাহ্য জগতের সহিত আমার সম্পর্ক, এই জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড উভয়েরই আলোচ্য বিষয়; আর তৃতীয় কাণ্ডের কোন প্রয়োজন নাই। কেন না, আমি ইহা জানি এবং আমি ইহা করি—এই দুইটা বলিলেই আমার সম্বন্ধে সমস্ত কথাই বলা হয়; আর তৃতীয় কথা বলিবার প্রয়োজন থাকে না। এই বাহ্য জগৎ কতিপয় শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধে নির্ম্মিত; শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ছাড়িয়া দিলে বাহ্য জগতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ আমারই জ্ঞানের বিষয়; আমার যখন জ্ঞান থাকে না—যেমন সুষুপ্তির সময়—তখন শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের লেশ মাত্র কোথাও কিছু থাকে না—তখন বাহ্য জগৎও থাকে না। বাহ্য জগৎ যে তখন বর্ত্তমান থাকে, কোন তার্কিকই তাহার প্রমাণ দিতে পারিবেন না। আমিই শব্দ-স্পর্শাদিকে জানি; এবং যত ক্ষণ জানি, তত ক্ষণই উহারা বর্ত্তমান থাকে; আমি জানি বলিয়াই বর্ত্তমান থাকে। আমিই ঐ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ 'সৃষ্টি' করিয়া উহাদিগকে বিবিক্তভাবে, স্বতন্ত্রভাবে জানিয়া থাকি; এবং উহাদিগকে দুই ভিন্ন রীতিতে সাজাইয়া বিন্যস্ত করিয়া বা সন্নিবেশিত করিয়া জানিবার চেষ্টা করি। এক রকম বিন্যাসের নাম দেশে বিন্যাস; অন্যরূপ বিন্যাসের নাম কালে বিন্যাস। এই দেশ ও কাল, উভয়ই সেই রূপ-রসাদিবিষয়ক জ্ঞানগুলিকে সাজাইবার রীতি মাত্র; উভয় রীতিই আমারই কল্পিত। আমার যখন জ্ঞান থাকে না, তখন দেশও থাকে না, কালও থাকে না; তখন দেশ-কালের অস্তিত্বের কেহ প্রমাণ দিতে পারিবে না। ফলে এই দেশে বিস্তৃত ও কালে প্রসারিত রূপ-রসাদিময় বাহ্য জগৎকে আমি কল্পনা করিয়া বা সৃষ্টি করিয়া আমার কল্পিত সম্মুখে ও পশ্চাতে, আশে ও পাশে ছুঁড়িয়া ফেলি এবং আমার কল্পিত অতীতে ও ভবিষ্যতে টানিয়া লইয়া যাই। ইহাই আমার সুষুপ্তি হইতে জাগরণ;

ইহারই নামান্তর জগৎ-সৃষ্টি। আবার যখন আমার জাগরণ সুষুপ্তিতে লীন হইয়া যায়, তখন এই বাহ্য জগৎকে গুটাইয়া লইয়া দেশ ও কালকে লোপ করিয়া আমার ভিতরে টানিয়া লই—ইহারই নামান্তর প্রলয়। কিন্তু যখন এই জগৎব্যাপারটা আমারই কল্পনা—যখন কাল নামক পদার্থ টা আমারই কল্পিত,—তখন এই 'যখন' 'তখন' প্রভৃতি নির্দ্দেশেরও কোনরূপ পারমার্থিক তাৎপর্য্য নাই; জগৎই যদি কল্পনা হয়, তবে তাহার সৃষ্টি ও প্রলয় ঘটনাও কল্পিত না হইয়া যায় না।

কিন্তু এই কল্পনা করে কে?

এই কল্পনা করি আমি। এই আমার অস্তিত্বে আমার কোনরূপ সংশয় নাই; সংশয় করিলে আমার কোন কথা কহিবারই অবসর বা অধিকার থাকে না। জগতের অস্তিত্ব আমার অপেক্ষা করে—আমি না থাকিলে এই জগৎ কোথায় থাকিত? কিন্তু আমার অস্তিত্ব কাহারও অপেক্ষা রাখে না। আমি আছি,—ইহা আমার পক্ষে অবিসংবাদিত ধ্রুব সত্য। এই সত্যটুকুই পরমার্থতত্ত্ব।

আর এই যে আমার কল্পিত জগৎ, উহার অস্তিত্ব ব্যাবহারিক মাত্র। আমি উহাকে সৃষ্টি করিয়া আমা হইতে স্বতন্ত্রভাবে দেখিতেছি ও উহার সহিত আমার একটা কাল্পনিক সম্পর্ক পাতিয়াছি। এই কাল্পনিক সম্পর্ক পাতানর নাম ব্যবহার—এই ব্যবহারের আলোচনা যাবতীয় বিজ্ঞান-বিদ্যার বিষয়।

বেদের যাহা জ্ঞানকাণ্ড, তাহাতে ঋষিগণ এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন ও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে, আমা ছাড়া আর কোন বস্তুর পারমার্থিক সত্তা নাই। আমিই আছি—আর যাহা আছে বলিয়া মনে করি, তাহা মনে করি মাত্র, তাহা আমারই কল্পনা মাত্র, আমারই সৃষ্টি মাত্র—তাহার নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই। আমিই এই কল্পিত বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা—আমি ভিন্ন আর কোন সৃষ্টিকর্ত্তা নাই। এই যে আমি, সেই আমার নামান্তর ব্রহ্ম। আমিই ব্রহ্ম। তদতিরিক্ত কোন সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনা একেবারে অনাবশ্যক। বেদের জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাদ্য ইহাই—অহং ব্রহ্মাস্মি নাপরঃ।

প্রশ্ন উঠে, আমিই না হয় এক মাত্র সৎপদার্থ হইলাম এবং জগৎ না হয় কল্পিত পদার্থ হইল; কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মৎকর্ত্তৃক কেন ও কিরূপে সৃষ্ট বা কল্পিত হইল? নাসদাসীয় সূক্তের ঋষি এই প্রশ্ন

তুলিয়াছিলেন। "কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ, কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ,"—কে জানে, কে বলিবে, এই জগৎ কোথা হইতে আসিল? কোথা হইতে সৃষ্ট হইল? কে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে? "যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ"—যিনি পরম ব্যোমে অর্থাৎ ব্যাবহারিক দেশের পরপারে থাকিয়া এই জগতের অধ্যক্ষ, সাক্ষী বা দ্রষ্টা—তিনিই জানেন; অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও দ্রষ্টা আমিই ইহা জানি—আমিই উত্তর দিতে পারি। অথবা আমিও হয়ত জানি না; অর্থাৎ আমি মূঢ় সাজিয়া, এই জগতের সৃষ্টি কিরূপে হইল, তাহা না জানিবার ভান করি।

বস্তুতঃ এই জগতের উৎপত্তি একটা "বিসৃষ্টি" বা বিসর্জ্জন মাত্র,—ছুঁড়িয়া ফেলা মাত্র; আমিই এই জগৎকে আমার বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছি। কিরূপে ছুঁড়িয়া ফেলিলাম?—"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি, মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ"—আমার মনে কাম উপস্থিত হইল, ইহাই জগতের উৎপত্তিহেতু। অর্থাৎ আমি ইহা কামনা করিলাম—সেই কামনা হইতে ইহার উৎপত্তি। এই জগদ্ব্যাপার আমার কামনা মাত্র, আমার ইচ্ছা মাত্র, আমার লীলা মাত্র। আমার এই কামনারূপ জগন্নির্ম্মাণ-শক্তির পরবর্ত্তী কালে নাম দেওয়া হইয়াছে মায়া।

অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ দেবী স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করিয়াছেন,—"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি, অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ, অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্মি, অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা"—আমিই রুদ্রগণের ও বসুগণের সহিত বিচরণ করি; আমিই আদিত্যগণের ও বিশ্বদেবগণের সহিত বিচরণ করি; আমিই মিত্র ও বরুণ উভয়কে ভরণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিদ্বয়কে ভরণ করি। "অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্, মম যোনিরপ্সু অন্তঃ সমুদ্রে, ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বা, উতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি"—আমিই সকলের শিরঃস্বরূপ দ্যৌঃ পিতাকে প্রসব করিয়াছি; সমুদ্রের অভ্যন্তরে জলমধ্যে আমার যোনি আছে; সেই স্থান হইতে আমি সকল ভুবনে প্রতিষ্ঠিত হই; আমার দেহ দ্বারা আমি দ্যুলোক স্পর্শ করি। "অহমেব বাত ইব প্রবামি, আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা"—আমি বিশ্বভুবন নির্ম্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র প্রবহমান হই। "পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা এতাবতী মহিমা সম্বভূব"—আমার মহিমা পৃথিবী ও দ্যুলোককেও

অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে। কোন ভাষা ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট হইতে পারে না।

আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলা যাউক। আমি এই জগতের কল্পনা বা সৃষ্টি করিয়াছি—কেন করিয়াছি, কি উদ্দেশে করিয়াছি ? এ সমস্যার উত্তর দিতে আমিই সমর্থ, অথচ আমিও সম্যক্‌রূপে সমর্থ নহি। মনুষ্যের ভাষা আশ্রয় করিয়া আমি অসম্পূর্ণভাবে উত্তর দিই—আমি এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছি—ইহাই আমার কামনা—ইহাই আমার লীলা—ইহাই আমার আনন্দ। এই আনন্দ হইতেই ভূতসকল জন্মিয়াছে। অথবা ইহাই আমার মায়া ;—মায়াবী আমি এই ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া আপনাকে প্রতারিত করিয়া আনন্দ পাইতেছি। নিতান্তই যদি মানবীয় ভাষায় ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, আমি জগতের সৃষ্টি করিয়াছি—উহাই আমার আনন্দ—আমি এই ব্যাবহারিক কল্পিত জগতের সম্পর্কে আনন্দ-স্বরূপ,—আমি রসস্বরূপ,—আমি কামস্বরূপ। এই জগন্নির্ম্মাণ-কামনাই আমার হ্লাদিনী শক্তি, উহা লীলাময়ী, অতএব আনন্দরূপিণী। ভারতবর্ষে সমুদায় সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব পন্থার ভিত্তি এইখানে। অথবা বলিতে হয়,—আমার মায়াকল্পিত এই জগৎব্যাপার ;—জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ব্যাপারের জননী আমার মায়া। এই মায়া আমার ইচ্ছা ও আমার আনন্দ—ইহা ইচ্ছাময়ী, অপিচ আনন্দময়ী। সমুদায় সাম্প্রদায়িক শাক্ত পন্থার ভিত্তি এইখানে। আর এই যে আমি—আমি আছি, অতএব আমি সৎস্বভাব ; আমি মায়াজগতের চেতন সাক্ষী, অতএব আমি চিৎস্বরূপ ; আমার অস্তিত্বেই আমার আনন্দ—আমিই আমার পরম প্রেমাস্পদ—অয়মাত্মা পরানন্দঃ—অতএব আমি আনন্দস্বরূপ। একযোগে আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ—আমি সত্য শিব সুন্দর—শান্ত শিব অদ্বয়—মায়াজগতের কর্ত্তা সংহর্ত্তা হইলেও স্বয়ং উদাসীন—শিবোঽহং—শিবোঽহং—শিবোঽহম্‌। সমুদয় সাম্প্রদায়িক শৈব ধর্ম্মের ভিত্তি এইখানে। এই গেল বেদের জ্ঞানকাণ্ড। নাসদাসীয় সূক্ত ও দেবীসূক্ত যিনি অবহিত হইয়া পাঠ করিবেন, তিনি দেখিবেন, ইহাই জ্ঞানকাণ্ডের প্রথম ও শেষ কথা—অন্যান্য বেদান্তবাক্য ইহারই পল্লবিত ভাষ্য মাত্র।

যাহা হউক, আমি এই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাত্মক বিষয়রূপী জগতের সৃষ্টি করিয়াছি—তাহাকে দেশে ও কালে ছড়াইয়া দিয়াছি—এবং এই

স্বকল্পিত জগতের সহিত নিজের একটা সম্পর্ক পাতাইয়াছি। এই সম্পর্ক প্রথমতঃ জ্ঞানরূপী—আমি এই জগৎকে আমার জ্ঞানের বিষয় করিয়া লইয়াছি। এই জগৎকে আমি এইরূপ জানি—ইহাই আমার চেতনা। আমি চিৎস্বরূপ—আমি চেতন। এই জগৎ যে আমার জ্ঞানগম্য হইতেছে—এই জগতের সহিত আমার যে এই সম্পর্ক পাতান হইয়াছে—ইহাই আমার চেতনা, ইহাই আমার জাগরণের অবস্থা। আমি চেতন থাকিয়া এই জগৎকে সম্মুখে ও পশ্চাতে, অতীতে ও ভবিষ্যতে বিস্তৃত দেখিতেছি; আমি এই জগদ্ব্যাপারের এক মাত্র সাক্ষী। কেন না, শব্দ-স্পর্শাদি, পরস্পরকে জানিতে পারে না। শব্দ স্পর্শকে জানে না, স্পর্শ রূপকে জানে না, আমি শব্দ স্পর্শ সকলকেই জানি। আমিই চেতন—আর শব্দ-স্পর্শাদি সমস্তই অচেতন বা জড়। দ্বিতীয়তঃ এই সম্পর্ক কর্ম্মরূপী। বস্তুতঃ আমি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও কেমন একটা খেয়ালের বশে আপনাকে সেই জগতের সর্ব্বতোভাবে অধীন ধরিয়া লইয়াছি। মনে করিতেছি যে, এই জগৎ অতি বৃহৎ, আর আমি অতি ক্ষুদ্র; মনে করিতেছি, এই বৃহৎ জগৎ সর্ব্বতোভাবে আমাকে অধীন রাখিয়াছে। এই বৃহৎ জগতের সহিত সর্ব্বদা আমার আদান-প্রদান চালাইতেছি; ইহার কিয়দংশ আমার উপাদেয়—আমি তাহা গ্রহণ করিতেছি; অপরাংশ আমার হেয়—তাহা আমি বর্জ্জন করিবার চেষ্টায় আছি। এইরূপে মৎকল্পিত জগতের সহিত আমার একটা কারবার, লেনা-দেনা চলিতেছে। এই কারবার, লেনা-দেনা, সমস্তই কল্পিত ব্যাপার—ইহারই নাম ব্যবহার—ইহারই নামান্তর কর্ম্ম। এবং এই কর্ম্মের ফল সুখদুঃখের ভোগ। আমি মনে করিতেছি যে, আমি জগতের সহিত নিয়ত আদান-প্রদানরূপ কর্ম্ম করিতেছি ও সেই কর্ম্মের ফলরূপে সুখদুঃখ ভোগ করিতেছি। যখন আমি এইরূপে আপনাকে জগতের অধীন মনে করিয়া জগতের সহিত আদান-প্রদান—উপাদেয় গ্রহণ ও হেয় বর্জ্জন-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকি, তখন আমার নাম হয় জীব। এই জীবরূপে আমি কর্ম্মকর্ত্তা ও কৃত কর্ম্মের ফল-ভোক্তা।

কে বলিল? কে জানে? আমি যে কর্ম্ম করিতেছি ও ফল ভোগ করিতেছি, তাহা কে জানে? আমিই জানি। আমিই ইহার দ্রষ্টা বা সাক্ষী। আমি দেখিতেছি যে, আমি জগতের সহিত আদান-প্রদান কর্ম্মে নিযুক্ত আছি ও কর্ম্মফলের ভোক্তা রহিয়াছি। আমিই আমাকে ঐ ভাবে দেখিতেছি।

আমিই দেখি ও আমাকেই দেখি। যে আমি দেখি ও যে আমাকে দেখা যায়, উভয় আমিই এক আমি। আর দ্বিতীয় আমি কুত্রাপি নাই। বাঙ্গালা আমি পদ সংস্কৃত ভাষায় আত্মা; যে আমি দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা, তাহার নাম দিই পরমাত্মা; যে আমি কর্ত্তা, ভোক্তারূপে দৃশ্য ও জ্ঞেয়, তাহার নাম দিই জীবাত্মা। অথচ উভয় আমিই এক আমি। কর্ম্ম ও তাহার ফল, উভয়ই ব্যবহার মাত্র—জগৎ যখন কল্পনা, উহাও তখন কল্পনা। যত ক্ষণ আমি এই কল্পনায় ভ্রান্ত থাকি, তত ক্ষণ আমি বদ্ধ জীব। আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া এই কল্পিত জগতের অধীনতায় স্থাপনের নামই বন্ধন। যখন বুঝি, এটা আমারই খেয়াল বা আমোদ মাত্র, আমারই কল্পনা বা স্বপ্ন বা কামনা, তখন আমি মুক্ত। ইন্দ্রজালটাকে ইন্দ্রজাল বলিয়া বুঝাই মুক্তি।

আমিই ব্রহ্ম ও আমিই জীব। জীব এক বই দুই নহে—একমেব অদ্বিতীয়ম্। তবে ব্যাবহারিক জগতে আমি খেয়ালের বশে মৎসদৃশ বহু জীবের কল্পনা করিয়া লই এবং সেই সকল কাল্পনিক জীবের সহিতও আদান-প্রদান করিয়া খেয়াল পূরণ করি। ভাস্নুরকসিংহ কূপমধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া দ্বিতীয় সিংহের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিল। বহু কূপে প্রতিবিম্ব দেখিবার সুযোগ পাইলে সে বহু সিংহের কল্পনা করিতে পারিত। কিন্তু ভাস্নুরক এক বই দুই হইত না। আমিও বহু দেহে মৎসদৃশ বহু জীবের কল্পনা করিলেও এক বই দুই হইতে পারি না। এই সকল কল্পিত মৎসদৃশ জীবের সমষ্টি মানব-সমাজ। এই মানব-সমাজের সহিত আদান-প্রদানরূপ কর্ম্মও আমি করিয়া থাকি এবং তাহার ফলভোগও আমাকেই করিতে হয়।

জীবের পক্ষে জগতের কিয়দংশ উপাদেয়, কিয়দংশ হেয়। উপাদেয় গ্রহণ ও হেয় বর্জ্জন দ্বারা জীবের জীবত্ব রক্ষিত হয়। ইহাতেই জীবের সুখ; উহা না করিতে পারিলেই জীবের দুঃখ। ঐ গ্রহণ ও ঐ বর্জ্জনই জীবের কর্ম্ম—তাহার করণে ফল সুখ ও অকরণে ফল দুঃখ। জীব সেই সুখভোগের ও দুঃখভোগের কর্ত্তা। এই সুখ-দুঃখ ভোগই ভোগ। কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল এই ভোগ।

কোন্ কর্ম্মের ফল সুখ, কোন্ কর্ম্মের ফল দুঃখ—তাহা আমি জীব সর্ব্বদা বুঝিতে পারি না। যে ভ্রান্তি হইতে আমি ক্ষুদ্র জীব, সেই ভ্রান্তির বশে বুঝিতে পারি না। সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ উপার্জ্জন করিতে হয়। জগতের সহিত বহু দিন কারবার করিয়া তবে সুখপ্রাপ্তির ও দুঃখ-

পরিহারের উপায়—কোন্ কর্ম্ম করণীয় এবং কোন্ কর্ম্ম অকরণীয়—তাহা আমাকে বুঝিতে হয়। এই অভিজ্ঞতালাভ বহুকালসাধ্য ও বহুক্লেশসাধ্য। অনেক ঠেকিয়া তবে এই কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে ক্ষমতা জন্মে। আধি-ব্যাধি, দৌর্ম্মনস্য প্রভৃতি দুঃখ সহিয়া সহিয়া ক্রমশঃ ঠেকিয়া শিখিতে হয়। জগতের সহিত ক্রমশঃ পরিচয় লাভ করিতে হয় এবং সেই পরিচয়ের সহিত কার্য্য ও অকার্য্য নিরূপণ করিয়া লইতে হয়। জগতের সহিত পরিচয়বৃদ্ধিসহকারে যে অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহা একালের ভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। আর তদ্দ্বারা যে কার্য্য ও অকার্য্য নিরূপণ হয়, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। এই জন্য দাঁতন-কাঠির ব্যবহার হইতে কুরুক্ষেত্রের লড়াই পর্য্যন্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে দাঁতন-কাঠির ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ দিলে তাহাতে বিদ্রূপ করিও না।

জীবের জীবত্ব অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্ব যখন গোড়াতেই একটা কল্পিত ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন, তখন জীবের বিজ্ঞানান্ধতাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। বিজ্ঞানান্ধ জীব সর্ব্বদা কার্য্য অকার্য্য বিবেচনায় অক্ষম। যাহা উপাদেয় মনে করে, তাহা সর্ব্বদা উপাদেয় নহে ; যাহা হেয় মনে করে, তাহা সর্ব্বদা হেয় নহে। ঐ অজ্ঞানান্ধতার ফলে জীব আপনাকে জগৎ হইতে স্বতন্ত্র মনে করে, এবং জগৎকে আপনা হইতে স্বতন্ত্র মনে করে এবং জগতের সহিত একটা অহেতুক বিরোধের সম্পর্ক খাড়া করিয়া সর্ব্বদা প্রতারিত হয়। পরমার্থতঃ ঐরূপ বিরোধ নাই। ঈশাবাস্য উপনিষৎ বলিয়াছেন—"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি, সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে"—যে দেখে, সর্ব্বভূতই আমাতে বর্ত্তমান এবং আমি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান—সে সেই জগৎ হইতে ভয় পায় না, জগৎকে ঘৃণা করে না। বৃহৎ জগৎ ক্ষুদ্র জীবকে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিতে আসিতেছে—তাহারই ফলে আধি-ব্যাধি—যে এইরূপ মনে করে, সে-ই প্রতারিত হয়। আর যে জানে, আমিই জগৎকে আমার বাহিরে, দূরে ও নিকটে, অতীতে ও ভবিষ্যতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, বিসর্জ্জন করিয়া জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছি—জগৎ আমাকে আত্মসাৎ করিবে কি, আমিই আপনাকে প্রসারণ করিয়া জগতে পরিণত করিয়াছি,—আধি-ব্যাধি আমার ক্রীড়া মাত্র—তাহার সেই ভয় নাই। "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ, তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ" —যে জানে আমিই সব, তাহার মোহই বা কি, আর শোকই বা কি ?

কিন্তু জীব যত ক্ষণ আপনাকে জগতের অধীন ক্ষুদ্র জীব বলিয়া মনে করে, তত ক্ষণ ইহা জানিতে পারে না। তাহাকে জগতের সহিত সাবধানে কর্ম্ম করিতে হয়। এই কর্ম্ম যতই উৎকৃষ্ট কর্ম্ম হউক না, এতদ্দ্বারা কখনই নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তি অর্থাৎ মুক্তিলাভ ঘটিতে পারে না। কেন না, যত ক্ষণ জীবত্বভ্রম, তত ক্ষণ বদ্ধত্ব, তত ক্ষণই কর্ম্মের বন্ধন; তবে কোন্‌টা কার্য্য, কোন্‌টা অকার্য্য, তাহার নিরূপণ দ্বারা জগতের সহিত জীবের জীবনের সামঞ্জস্য স্থাপনে আনুকূল্য ঘটে মাত্র। সুখের মাত্রা বাড়ে, দুঃখের মাত্রা কমে মাত্র, কিন্তু সুখদুঃখের অধীনতা রহিয়াই যায়।

বিজ্ঞানান্ধ জীব মনে করে, বৃহৎ জগৎ তাহাকে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিতে উন্মুখ; তাহার পাল্‌টা দিতে গিয়া আপনার জীবত্ব রক্ষার জন্য সে জগতের যাহা কিছু উপাদেয় মনে করে, তাহাই নিজে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিতে চায়; ইহাই তাহার প্রবৃত্তি। ছয়টা "রিপু" তাহাকে এই প্রবৃত্তির পথে চালায়। কিন্তু এই প্রবৃত্তি দ্বারা জীবের ও জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হয় না। কেন না, জগতের সহিত জীবের প্রকৃত সম্পর্ক অন্যরূপ। আমিই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছি—আপনাকে প্রসারিত করিয়া জগতে পরিণত করিয়াছি—আপনাকে জগৎমধ্যে বিলাইয়া দিয়া এই বৃহৎ ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছি। এই যে জগৎ-নির্ম্মাণ ব্যাপার, ইহা আমার ত্যাগ। কেন না, এতদ্দ্বারা আমি আমার মহত্ত্ব ত্যাগ করিয়া, আপনাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ক্ষুদ্র জীবে পরিণত করিয়াছি; আপনার একত্বকে নষ্ট করিয়া, বহুত্বে পর্য্যবসিত করিয়া জগদ্বিধানের সৃষ্টি করিয়াছি। আমি আমার বৃহত্ত্বকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ক্ষুদ্রত্বে পরিণত করিয়া জীব সাজিয়াছি, এবং সেই ক্ষুদ্র আমা হইতে স্বতন্ত্র বৃহৎ জগৎ কল্পনা করিয়া সেই জগতের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি;—স্বয়ং জগৎকর্ত্তা হইয়াও আপনাকে স্বকৃত জগতের নিকট বলি দিয়াছি।

অতএব এই জগন্নির্ম্মাণ একটা ত্যাগ এবং ত্যাগের নামান্তর যজ্ঞ। প্রকৃত পক্ষে আমিই সর্ব্বময়—"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্"—যাহা কিছু আছে, ছিল বা হইবে, তাহার সমষ্টিই পুরুষ। পুরুষ অতি বৃহৎ, তাঁহার কিয়দংশ মাত্র বিশ্বভুবনরূপে বিজ্ঞানান্ধ জীবের জ্ঞানগোচর; অবশিষ্ট অংশ এখনও অজ্ঞানাবৃত। "স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্"—সমস্ত বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া তিনি আছেন—তাহা অতিক্রম করিয়া আরও দশ

অঙ্গুলি পর্য্যন্ত আছেন। অথবা এই বিশ্বভুবন তাঁহার এক পাদ মাত্র—বিশ্বভুবনের ওপারে যে অদৃশ্য দীপ্তিময় অমৃতলোক আছে—সেখানে তাঁহার ত্রিপাদ বর্ত্তমান। কিন্তু হইলে কি হয়—"তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ"—সেই সকলের অগ্রজন্মা পুরুষকেই যজ্ঞরূপে—যজ্ঞীয় পশুরূপে কল্পনা করিয়া প্রোক্ষিত করা হইয়াছিল। "যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ"—সেই পুরুষকেই যজ্ঞীয় পশুরূপে আলম্ভন করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন হইয়াছিল; সেই যজ্ঞ হইতেই চন্দ্র-সূর্য্য-ইন্দ্র, অগ্নি-ভূমি-আকাশ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রভৃতি সকলেই জন্মিয়াছে।

অতএব এই বিশ্বব্যাপার এক মহাযজ্ঞ—বিশ্বকর্ম্মার সম্পাদিত যজ্ঞ। যজ্ঞ ত্যাগাত্মক—যাজ্ঞিকের পরিভাষায় দেবোদ্দেশে দ্রব্য-ত্যাগের নাম যজ্ঞ। কাজেই জীব যে জীবত্ব গ্রহণ করিয়া জগতে উপস্থিত আছেন—"সংসার" করিতেছেন, তাহা যখন মূলেই ত্যাগ, তখন যে যে কর্ম্ম ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাই বিশ্বযজ্ঞের অনুকূল। প্রবৃত্তির বশে জীব সবই গ্রহণ করিতে চায়—প্রবৃত্তিকে নিরোধ করিতে উপদেশ দিয়া তাহাকে ত্যাগ শিখাইতে হইবে। ত্যাগাত্মক কর্ম্ম দ্বারাই জীবের সহিত জগতের প্রকৃত সামঞ্জস্য সাধিত হইবে—ত্যাগাত্মক কর্ম্মই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই সম্পাদ্য—জীবের অন্যথা গতি নাই। এই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, কেন না, জীব যত ক্ষণ জীব, তত ক্ষণ তাহাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে—এবং ত্যাগাত্মক কর্ম্মেই জীবের জীবত্বের সার্থকতা।

ঈশোপনিষৎ এই কথাই বলিয়াছেন—"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—এই জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের ঈশিত্ব দ্বারা আচ্ছাদিত আছে; ঈশ্বররূপী আমিই আপনাকে প্রসারণ করিয়া—বিলাইয়া দিয়া সেই সমস্ত পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। আমি আত্মত্যাগ দ্বারা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমি যাহা সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাই আমার ভোগের বিষয় হইয়াছে। মূলে ত্যাগ না থাকিলে ভোগ ঘটিত না। অতএব "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করিবে। আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়াই ইহা ভোগ্যরূপে কল্পিত হইয়াছে—ত্যাগই এখানে ভোগ—অন্যরূপ ভোগ জগৎব্যাপারের প্রতিকূল। অন্যরূপে ভোগ করিতে গেলে জগৎব্যাপার বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে। "মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্"—এ সমস্তই যখন আমার—অন্যের ইহাতে কোন অধিকারই নাই—কেন না, অন্য কেহ

যখন বিদ্যমান নাই—তখন ইহাতে গৃধ্নুতার—লোভের প্রয়োজন কি? নিজের ধনে কে নিজে লোভ করে? অতএব লোভ করিও না—ত্যাগ কর। এই ত্যাগই কর্ম্ম—এতদ্ভিন্ন অন্য কর্ত্তব্য থাকিতে পারে না। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"—কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াই পৃথিবীতে শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে—ভাক্ত বৈরাগ্য দ্বারা সমস্ত জগৎকে হেয় জ্ঞান করিয়া আত্মহত্যার প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম কর ও শতায়ুঃ হইতেই ইচ্ছা কর—"এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে,"—এতদ্ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই, যাহাতে জীবকে কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। যেহেতু তুমি জীব—তোমাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে। ত্যাগরূপ কর্ম্ম কর—তাহাতে তোমার উপরে আর নূতন কর্ম্মের প্রলেপ পড়িবে না। এই কর্ম্মেরই নামান্তর ধর্ম্ম।

মানবজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিত্তিপত্তন এইখানে। সর্ব্বদেশের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র এই ধর্ম্মমূল স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ত্যাগই ধর্ম্ম—অন্যথা ধর্ম্মই না। কিন্তু কেন আমি ত্যাগ করিব—তাহাতে আমার লাভ কি—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া অন্য দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র হাবুডুবু খাইয়াছেন। বেদপন্থীর বেদ এইখানে মূল সত্য আবিষ্কার করিয়া উত্তর দিয়াছেন। মানবজাতির জ্ঞানকাণ্ডের প্রথম কথা ও শেষ কথা যেমন নাসদাসীয় সূক্তে পাওয়া যায়—সমস্ত বেদান্ত-বিদ্যা তাহাকেই পল্লবিত ও বিস্তারিত করিয়াছেন; মানবজাতির কর্ম্মকাণ্ডের প্রথম কথা ও শেষ কথা এই ঈশোপনিষদে পাওয়া যায়—সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাই মূল ধরিয়া পল্লবিত ও বিস্তারিত হইয়াছে।

বেদ-বিদ্যা এইরূপে ধর্ম্মমীমাংসা করিয়াছেন। জীব কর্ম্মে বাধ্য—কিন্তু সেই কর্ম্ম ত্যাগরূপী কর্ম্ম হইলেই জীবের সহিত জগতের আপাততঃ দৃশ্য বিরোধের মীমাংসা হয়; জগৎ হইতে জীবের ভয় দূরে যায়—উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হয়। নিঃশ্রেয়স লাভ ঘটে না, কিন্তু পরম শ্রেয়োলাভ ঘটে। ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এই ত্যাগাত্মক কর্ম্মের নাম যজ্ঞ।

এই যজ্ঞের অনুষ্ঠানই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান। বঙ্কিম বাবু এক স্থানে বলিয়াছেন, যজ্ঞে ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম লোকহিতে। আগুনে ঘি ঢালিয়া দেবতার নিকট কিছু আদায়ের চেষ্টাকেই তিনি সম্ভবতঃ যজ্ঞ বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে যজ্ঞ শব্দের গ্রহণ আবশ্যক ছিল না। ত্যাগাত্মক কর্ম্ম

যজ্ঞ, এবং ত্যাগাত্মক কর্ম্মে যদি ধর্ম্ম হয়, তবে যজ্ঞেই ধর্ম্ম। ত্যাগাত্মক না হইলে লোকহিতেও ধর্ম্ম হয় না। ইহ বা পরত্র লাভের প্রত্যাশায় যে লোকহিত, তাহা যজ্ঞ নহে; যে লোকহিতের মূলে কেবল ত্যাগ, তাহা মহাযজ্ঞ, অতএব পরম ধর্ম্ম।

আবার দেবোদ্দেশে আগুনে ঘি ঢালিয়াও যে ধর্ম্ম হয় না, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারিব না। কেন পারিব না, তাহা বুঝাইবার এ সময় নহে। মানবজাতির যে অংশ বেদপন্থী বলিয়া পরিচিত, সেই অংশ আবহমান কাল হইতে কতিপয় বিশিষ্ট আচার অনুষ্ঠান আশ্রয় করিয়া অন্যান্য জাতি হইতে আপনার বিশিষ্ট ভাব রক্ষা করিতেন্। আপনার সমাজতন্ত্রকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রাখিবার জন্য কতিপয় আচার অনুষ্ঠানকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক কারণপরম্পরায় ঐ সকল অনুষ্ঠান উদ্ভূত ও অভিব্যক্ত হইয়াছিল। বেদপন্থীর বেদশাস্ত্র সেই আচার অনুষ্ঠানকে পরিবর্জ্জন করিতে উপদেশ দেন নাই, বরং সেই সকল আচার অনুষ্ঠানকে অব্যাহত রাখিয়া বেদপন্থী সমাজের বিশিষ্ট ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসী ছিলেন। অধিকন্তু সেই সকল আচার অনুষ্ঠানকে সংস্কৃত, মার্জ্জিত, বিশুদ্ধ করিয়া ত্যাগধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া যজ্ঞে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহাই বেদপন্থীর সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। পশুযাগ, সোমযাগ, ইষ্টিযাগ প্রভৃতি যে সমস্ত শ্রৌত যজ্ঞের বিবরণ বেদের কর্ম্মকাণ্ডে বিহিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে, অবহিত ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, মনুষ্যের স্বাভাবিক সহজ প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া তাহাকে ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠা দিবার চেষ্টাতেই এই সকল অনুষ্ঠানের উদ্ভব। জীবধর্ম্ম বা সমাজধর্ম্ম স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত না হইলেই যজ্ঞে পরিণত হয়। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের ফল নিজের ভোগ্য মনে না করিয়া যজ্ঞেশ্বর নারায়ণে অর্পিত করিলেই তাহা যজ্ঞ হয়। কেন না, দেবোদ্দেশে কৃত কর্ম্মই যজ্ঞ।

মনুষ্য আপনাকে বৃহৎ জগদ্ব্যাপারের অধীন ক্ষুদ্র জীব ধরিয়া লইয়া জগদ্ব্যাপারের আপ্যায়ন জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগে বাধ্য মনে করে; যজ্ঞকর্ম্মের গোড়ার কথা এই। কিন্তু স্বার্থান্ধ ও বিজ্ঞানান্ধ মানুষ এই সর্ব্বস্ব ত্যাগের অর্থ করিয়া লয় আত্মহত্যা—নরহত্যা। ফলে যজ্ঞে নরাহুতি বহু স্থলে প্রচলিত আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, বহু প্রাচীন সমাজে যজ্ঞার্থ নরপশুর প্রদান কোন-না-কোন আকারে প্রচলিত ছিল। বেদপন্থী সমাজেও

হয়ত এক কালে নরযজ্ঞ চলিত ছিল। যজমান আপনার জীবন অর্পণ করিতে না পারিয়া পরের ছেলে ধরিয়া আনিয়া যজ্ঞ করিত। নিজের পরিবর্ত্তে প্রতিভূস্বরূপে বা নিষ্ক্রয়স্বরূপে অন্যকে অর্পণ করিত। যীশুখ্রীষ্ট সমস্ত মানবজাতির নিষ্ক্রয়স্বরূপে আপনাকে যজ্ঞীয় পশুরূপে অর্পণ করিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা অনুসারে নরের বদলে পশু—পশুর বদলে ধান, যব—পশুযাগের পরিবর্ত্তে পুরোডাশযাগের সৃষ্টি ;—উক্ত উপাখ্যানেই তাহার ইতিহাস পাওয়া যায়। মাতলামি করিয়া দেবতার তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা বহু জাতির ধর্ম্মেতিহাসে দেখা যায়। মাতাল জাগতিক বা সামাজিক বন্ধন মানিতে চায় না। মনে করে যে, জগতের বন্ধন, বিশেষতঃ মৃত্যুর বন্ধন হইতে হয়ত সে এইরূপে মুক্ত হইতে পারিবে। সোমপানে মত্ততা জন্মে—মাদকসেবনে স্ফূর্ত্তি হয়—দেবগণ সোম পান করিয়া স্ফূর্ত্তি করিতেন। তাঁহারা সোমপানেই ব্যাবহারিক অমরতা পাইয়াছিলেন। এই ব্যাবহারিক অমরতা লাভের জন্য, দেবত্ব প্রাপ্তির জন্য, পার্থিব জগতের মলিনতা হইতে সংস্কৃত হইয়া দ্যুতিমান্ দেবত্ব প্রাপ্তির জন্য মনুষ্য সর্ব্বত্র লালায়িত। সোমপান করিয়া যজমান দেবত্বের জন্য স্পর্দ্ধী হইত। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করিবার ব্যবস্থা হইল—সোমপানের অনুষ্ঠান বজায় থাক্—উহা বেদপন্থী সমাজের পুরাতন অনুষ্ঠান ও বিশিষ্ট অনুষ্ঠান—কিন্তু মাতাল হইও না। সোমযজ্ঞে ব্যবস্থা হইল, চুমুক মাত্রেই পান, অথবা ঘ্রাণ মাত্রেই পান। উদর পূরিয়া সোমরস পানের প্রয়োজন নাই—কেন না, দেবগণ যে সোম পান করেন, তাহা সোমলতার রস নহে—"সোমং মন্যতে পপিবান, যৎ সম্পিষন্ত্যোষধিম্, সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুঃ, ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন"—ওষধি সোমকে পিষিয়া তাহার রস পান করিয়া লোকে মনে করে যে, সোমরস পান করিলাম ; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা যাহাকে সোম বলিয়া জানেন, তাহা কেহ পান করিতে পায় না। "সোমেনাদিত্যা বলিনঃ, সোমেন পৃথিবী মহী, অথো নক্ষত্রাণামেষাম্, উপস্থে সোম আহিতঃ"—আদিত্যগণ সেই সোমের প্রভাবে বলবান্, পৃথিবী সেই সোমের প্রভাবেই মহীয়সী, সোম এই নক্ষত্রগণের সম্মুখে স্থাপিত আছেন। "অপাম সোমমমৃতা অভূম, অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্"—এই সোম পান করিয়া আমরা অমর হইয়াছি, জ্যোতিঃ পাইয়াছি, দেবগণকে জানিয়াছি। ঋষিগণ এই সোম পান করিয়া অমরতা লাভ করিতেন। উহা মাতলামি ছিল না।

কিন্তু যজ্ঞ শব্দটি কেবল বেদপন্থী সমাজের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপেই আবদ্ধ ছিল না। উহা ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইত। যজ্ঞের মৌলিক তাৎপর্য্য ত্যাগ, এই কথাটি স্মরণ রাখিলেই বেদপন্থীর শাস্ত্রে যজ্ঞের মহিমা বুঝিতে পারা যাইবে। জগতের সহিত জীবের সামঞ্জস্য সাধন যজ্ঞ দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ত্যাগের সহিত ভোগের বিরোধকল্পনা জ্ঞানান্ধ প্রবৃত্তিপ্রবণ মনুষ্যের সহজ ধর্ম্ম। মানুষ সহজে ত্যাগ করিতে চায় না, ভোগ করিতে চায়। ঈশোপনিষৎ দেখাইয়াছেন, এই ধারণা ভ্রান্ত। ত্যাগের সহিত ভোগের বিরোধ থাকিতে পারে না। ভোগের বিষয় এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহা জীবের আত্মত্যাগের বা আত্মপ্রসারণেরই ফল। জীব ত্যাগ স্বীকার করিয়া জীব হইয়াছে বলিয়াই এই ভোগের বিষয় সম্মুখে পাইয়াছে। অতএব ভোগ ত্যাগমূলক ; ত্যাগই ভোগ। জীব জগতের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছে বলিয়াই জগৎ ভোগের জন্য সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। এই অধীনতা একরূপ ঋণস্বীকার। জীব জগতের নিকট নানা ঋণে আবদ্ধ। বেদপন্থীর ধর্ম্মশাস্ত্র এই ঋণের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন—মনুষ্যের নিকট ঋণ, ভূতগণের নিকট ঋণ, পিতৃগণের নিকট ঋণ, দেবগণের নিকট ঋণ, এবং সর্ব্বশেষে ঋষিগণের নিকট ঋণ ; এই পঞ্চবিধ ঋণ লইয়া মনুষ্যকে জীবরূপে সংসারযাত্রা আরম্ভ করিতে হয়। এই পঞ্চ ঋণ মোচনের জন্য গৃহস্থের পক্ষে নিত্য অনুষ্ঠেয় পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। গৃহস্থের দৈনন্দিন অনুষ্ঠানে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ তাহাকে জগতের নিকট আপনার ঋণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

যজ্ঞের মাহাত্ম্যবর্ণনায় বেদপন্থীর শাস্ত্র ওতপ্রোত রহিয়াছে। বিশ্বসৃষ্টি-ব্যাপারই একটা যজ্ঞ—পুরুষ আপনাকে যজ্ঞরূপে কল্পিত করিয়া সৃষ্টি সংঘটন করিয়াছেন। প্রজাপতি স্বয়ং এই যজ্ঞের যজমান ; দেবগণ এই যজ্ঞের ঋত্বিক্। আবার যিনি যজমান, যাঁহার হিতার্থ এই যজ্ঞ, সেই বিরাট্-পুরুষ-রূপী প্রজাপতিই এই যজ্ঞের পশু। যজ্ঞই এই যজ্ঞের দেবতা। ত্যাগের উদ্দেশেই ত্যাগ—এই ত্যাগের অন্য কোন কামনা হইতে পারে না। "যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ"—দেবগণ যজ্ঞ দ্বারাই—ত্যাগস্বীকার দ্বারাই যজ্ঞরূপী দেবতার যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এখনও যজ্ঞরূপ বস্ত্রের বয়নকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন—সেই বস্ত্রে বিশ্বভুবন আচ্ছাদিত রহিয়াছে—বিশ্বভুবনের ঘটনাবলী এই বস্ত্রের তন্তুসূত্র। "যো যজ্ঞো বিশ্বতস্তন্তুভিস্ততঃ,

একশতং দেবকর্ম্মেভিরায়তঃ, ইমে বয়ন্তি পিতরো য আ যযুঃ, প্র বয় অপ বয় ইত্যাসতে ততে"—এই যজ্ঞরূপী বস্ত্রের তন্তুসকল সমস্ত বিশ্বে আস্তীর্ণ হইয়াছে; দেবগণের কর্ম্মে ইহার শত তন্তু বিস্তৃত হইয়াছে; পিতৃগণ আগমন করিয়া তন্তুসকল দ্বারা বয়ন করিতেছেন; দৈর্ঘ্যের দিকে বয়ন কর, বিস্তারের দিকে বয়ন কর, এই বলিতে বলিতে তাঁহারা রহিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপিতামহগণ—ঋষিগণ ও মনুষ্যগণ—মানবসমাজগঠনকালে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; "পশ্যন্ মন্যে মনসা চক্ষুষা তান্, য ইমং যজ্ঞমযজন্ত পূর্ব্বে"—পূর্ব্ববর্ত্তী যাঁহারা এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আজি যেন আমি তাঁহাদিগকে মানস চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি। এমন কি, বিশ্বকর্ম্মা এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন,—বিশ্বকর্ম্মা—"যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা, ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা"—যিনি আমাদের পিতা ও জনক ও বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবন ও বিশ্বধাম জানেন, তিনিই প্রথমে এই বিশ্বনির্ম্মাণরূপ যজ্ঞ করেন—"য ইমা বিশ্বাভুবনানি জুহ্বদ্, ঋষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ"—সেই পিতা—সেই পুরাণ ঋষি—তিনিই হোতা হইয়া এই বিশ্বভুবনকে আহুতি দিতে বসিয়াছিলেন। "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখঃ বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ, সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈঃ, দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ"—বিশ্ব জুড়িয়া যাঁহার চক্ষু ও মুখ, বিশ্ব জুড়িয়া যাঁহার হস্ত-পদ, সেই এক মাত্র দেব, তিনি বাহু সঞ্চালন করিয়া ও পক্ষ সঞ্চালন করিয়া গমন করেন—তাহাতেই দ্যাবাপৃথিবী উৎপন্ন হয়। ঋষি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"বিশ্বকর্ম্মন্ হবিষা বিবৃধানঃ, স্বয়ং যজস্ব পৃথিবীমুত দ্যাম্"—অহে বিশ্বকর্ম্মা, তুমি ভূলোকে ও দ্যুলোকে বিশ্বসৃষ্টিরূপ যে যজ্ঞ করিয়াছ, ঐ যজ্ঞে অর্পিত হব্য দ্বারা, হবিঃশেষভোজন দ্বারা তুমি স্বয়ং বর্দ্ধিত হও। তুমি যাহা ত্যাগ করিয়াছ, তাহাই তোমার ভোগ্য হউক।

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" এই মহাবাক্যের পূর্ণ সার্থকতা এখন বুঝা যাইবে। ত্যাগই ভোগ—অতএব ত্যাগ দ্বারাই জীবের জীবত্বের সার্থকতা এবং ত্যাগাত্মক ধর্ম্মই ধর্ম্ম। এই ভিত্তির উপর বেদপন্থীর ধর্ম্মশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। জীবের পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগ করিবার উপায় নাই। অতএব "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"—কর্ম্ম করিতে করিতেই শতায়ুঃ হইবার ইচ্ছা করিবে। গীতায় ভগবান্ এই মহাবাক্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"—কোন ব্যক্তি

কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ, অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্"—প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—এই যজ্ঞ দ্বারাই তোমরা বৃদ্ধি পাইবে—এই যজ্ঞই তোমাদের অভীষ্ট কামনা দান করিবে—এই ত্যাগই তোমাদের ভোগ হইবে। "নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ"—নিয়ত কর্ম্ম কর; কেন না, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেয়ঃ। "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ"—যাঁহারা যজ্ঞের হুতাবশেষ ভোজন করেন—ত্যাগের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ভোগ করেন—তাঁহারা সর্ব্বপাপপ্রমুক্ত হন। "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং, তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্"—কর্ম্ম অক্ষর ব্রহ্ম হইতেই উদ্ভূত, নিত্য সর্ব্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। উপনিষৎও বলিয়াছেন—ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বম্। "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর"—সেই জন্য সতত কর্ত্তব্য কর্ম্ম আচরণ কর; কিন্তু আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে—"মা গৃধঃ"। কোন্ বিষয়ে আসক্ত হইবে? সবই ত তোমার। "কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ"—কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য, কোন্ কর্ম্ম অকার্য্য, ইহা পণ্ডিতেরাও ঠিক করিতে পারেন না। "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ"—ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। "যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ"—যাঁহার সমস্ত কর্ম্ম কামসঙ্কল্প-বর্জ্জিত, তিনিই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্মকে দগ্ধ করেন। "গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ, যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে"—যাঁহার আসক্তি নাই, যাঁহার চিত্ত জ্ঞানে অবস্থিত, তিনি কর্ম্মবন্ধনমুক্ত; যজ্ঞার্থ আচরিত সমস্ত কর্ম্ম লয় পায়। এই কর্ম্মাকর্ম্মবিচারের জন্য বেদপন্থীর ধর্ম্মশাস্ত্র। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে কর্ম্মের প্রমাণ চতুর্ব্বিধ—"শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচার আত্মনস্তুষ্টিরেব চ"। শ্রুতির অর্থে বেদোক্ত সনাতনী বাণী; স্মৃতি অর্থে মহাজনকৃত শ্রুতির তাৎপর্য্যব্যাখ্যা; সদাচার অর্থে মহাজনগণের অবলম্বিত পন্থা; এবং সকলের উপর আত্মতুষ্টি;—আত্মার পরিতোষ;—যিনি সকল তত্ত্বের হেতুভূত, সকল চরাচরের নিদান, যিনি আপনাকে জীবরূপে পরিণত করিয়া স্বকল্পিত জগতের সমীপে আপনাকে যজ্ঞীয় পশুরূপে আহুতি দিয়াছেন, তিনিই সেই বৃহৎ জগতের সহিত ক্ষুদ্র জীবের আদান-প্রদান বিষয়ে, জগতের সহিত জীবের সামঞ্জস্যসাধনে, অন্তর্যামিস্বরূপে কর্ত্তব্যনির্ণয়ে পরম সহায়; দুর্গম সংসার-

যাত্রায় যেখানে কোন আলোক পাওয়া যায় না, যেখানে শ্রুতি স্মৃতি সদাচারও গন্তব্য নির্দ্দেশ করে না, সেইখানে সেই অন্তর্যামী সহায়;—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" বলিয়া আহ্বান করিলে অন্তর্যামী সেখানে সাড়া না দিয়া স্থির থাকিতে পারেন না।

যে শাশ্বতী বাণী, যে সনাতন শব্দ বিশ্ববিধাতার চতুর্ম্মুখ হইতে সমীরিত এবং যুগে যুগে ঋষিমুখে প্রচারিত ও মহাজনকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়া এই প্রাচীন সমাজে লোকস্থিতির সহায় হইয়াছে, যে সনাতন ধর্ম্ম সহস্র বিপ্লবে এই পুরাতন সমাজকে ধারণ করিয়া আসিতেছে এবং বহু অনার্য্য আক্রমণ সত্ত্বেও এই আর্য্য সমাজের বিশুদ্ধি ও বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াছে, সেই বাণী, সেই শব্দ, সেই ধর্ম্ম আমাদের এই বিপত্তির দিনে পথপ্রদর্শক হউন। স্বধর্ম্মে রক্ষিত হইলেই আমরা রক্ষিত হইব—ইহাই এই ক্ষুদ্র লেখকের ধ্রুব বিশ্বাস। আর যদিই বা নিয়তির প্রেরণায় আমরা রক্ষিত না হই, যদিই বা মহাকালেব চক্রতলে পিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনেব ধ্বংস হইবে, ইহাই আমাদেব নিয়তি হয়, তাহা হইলে আমাদের আর্য্য বিশিষ্ট ভাব বক্ষা কবিয়াই যেন আমরা বিনষ্ট হই, ইহাই প্রার্থনা—কেন না, ভগবান্ অঙ্গুলিসঙ্কেতে উপদেশ দিতেছেন—স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।

রত-কথা

[১৯১৩ সনের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ হইতে]

নিবেদন

এই পুস্তকের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রকাশ্য সভায় পঠিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিতকথা ১৩০৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ এমেরাল্ড থিয়েটারে বিদ্যাসাগর ইনষ্টিটুট কর্তৃক আহূত স্মৃতিসভায় পঠিত হয়। মাননীয় শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ সভায় সভাপতি ছিলেন। ১৩১২ সালের ২৬শে চৈত্র তারিখে ক্লাসিক থিয়েটারে আহূত সভায় বঙ্কিমবাবুর চরিতকথা পাঠ করি। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোভাবের কিছু দিন পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ জেনেরাল এ্যাসেম্ব্লিস কলেজের হলে যে শোক-সভা আহ্বান করেন, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি পঠিত হয়। অধ্যাপক মক্ষমূলর ও রজনীকান্ত গুপ্ত সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ, এই দুইটিও তাঁহাদের মৃত্যুর পর সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পড়িয়াছিলাম। অবশিষ্ট প্রবন্ধ কয়টি কোন সভায় পঠিত হয় নাই।

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তদীয় গ্রন্থাবলীর ভূমিকা আমাকে লিখিতে হইয়াছিল; ঐ ভূমিকাটিও এই সংগ্রহগুলির মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ দুইটির কিয়দংশ বর্জ্জন করিয়াছি। অন্য প্রবন্ধগুলিতে বিশেষ পরিবর্ত্তন করি নাই।

কোন্ প্রবন্ধ কোন্ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, সূচীপত্রে তাহার উল্লেখ থাকিল।

কলিকাতা　　　　　　　　　　শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

৫ই ভাদ্র ১৩২০

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রত্নাকরের রাম নাম উচ্চারণে অধিকার ছিল না। অগত্যা মরা মরা বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল।

এই পুরাতন পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্দ্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাঙ্গালী জাতির প্রাচীন ইতিহাস কেমন ছিল, ঠিক স্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। লক্ষ্মণসেনঘটিত প্রাচীন কিংবদন্তীটা অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পলাশির লড়াইয়ের কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষায় এত উচ্চে অবস্থিত যে, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময়ে কুণ্ঠিত হইতে হয়। বাগ্যত কর্ম্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মত বাক্‌সর্ব্বস্ব সাধারণ বাঙ্গালী, উভয়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে, স্বজাতীয় পরিচয়ে তাঁহার গুণকীর্ত্তন দ্বারা প্রকারান্তরে আত্মগৌরব খ্যাপন করিতে গেলে, বোধ হয়, আমাদের পাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে। আমাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে সহৃদয়তার এত অভাব ও মৌখিকতার এত প্রভাব যে, অদ্য যে আমরা তাঁহার স্মৃতির উপাসনার জন্য একত্র হইয়াছি, এই উপাসনা ব্যাপারটাই একটা ভণ্ডামি নহে, তাহা প্রমাণ করা দুষ্কর। আমরা তাঁহার তর্পণোদ্দেশে যে বক্তৃতাময় বারির অঞ্জলি প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার প্রেতপুরুষ যদি অবজ্ঞার সহিত তাহা গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাহা হইলে আমাদের পক্ষসমর্থনে বলিবার কথা কি আছে, সহজে খুঁজিয়া পাই না।

বিদ্যাসাগরের উপাসনায় এই অধিকার অনধিকারের কথা আসে বলিয়া প্রথমেই আমাকে রত্নাকরের নজীর আশ্রয় করিতে হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের উপাসনায় আমাদের অধিকার না থাকিতে পারে; এবং বিদ্যাসাগরের

জীবনের ও বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হওয়াও হয়ত অসম্ভব। তথাপি এই সাংবৎসরিক উপাসনা বর্ষে বর্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক ক্রমশঃ ধৌত করিবে, এই আমাদের এক মাত্র ভরসা। পূজিতের প্রীতি-উৎপাদন, বোধ হয়, আমাদের শাস্ত্রবিহিত শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ব্যাপারের উদ্দেশ্য নহে; পূজক আত্মোন্নতি বিধানের জন্য ঐ সকল অনুষ্ঠান সাধনে বাধ্য। বিদ্যাসাগরের প্রেতপুরুষের প্রীতিজনন আমাদের অসাধ্য হইলেও, আমরা স্বার্থের অনুরোধে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

কিন্তু প্রথমেই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিব কি না, সেই ঘোর সমস্যা আসিয়া দাঁড়ায়। সেই প্রকাণ্ড মানবতাকে সঙ্কীর্ণ বাঙ্গালীত্বের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে যাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতে তাঁহার স্বজাতি তাঁহার নিকট আপনার যে মূর্ত্তি দেখাইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনকাহিনীপাঠে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুগণের সম্পর্কে আসিয়া তাঁহাকে পদে পদে লজ্জিত ও প্রতারিত হইতে হইয়াছে, ইহার ভূরি উদাহরণ তাঁহার জীবনের আখ্যায়িকামধ্যে সঙ্কলিত আছে। যদি কোন বৈদেশিক আমাদের জাতীয় চরিত্রের ছবি আঁকিতে প্রয়াসী হয়েন, তাঁহাকে মসীবর্ণ সংগ্রহ করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত-লেখকগণ প্রচুর পরিমাণে ঐ সকল সামগ্রী একাধারে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।

অণুবীক্ষণ নামে এক রকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখায়; বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থ-বিদ্যাশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, ঐ উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্ম্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবা মাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙ্গালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তি ধবল পর্ব্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনর্থক আত্মগ্লানির অবতারণা আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে আপনার বলিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইতে তুলনায় আত্মগ্লানি আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে তাহার একান্তই অসদ্ভাব। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা মেরুদণ্ড দেখিয়া সমগ্র প্রাণিসমষ্টিকে উন্নত ও অনুন্নত দুই প্রধান পর্য্যায়ে ভাগ করেন। মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব প্রাণীর পক্ষে সামর্থ্যের ও আত্মনির্ভরশক্তির প্রধান পরিচয়। বিদ্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ বাঙ্গালী-চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না।

একটা কথা আজকাল অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান রাজকীয় শাসনে চারি দিকে আমাদিগের জাতীয় অভ্যুদয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। অতি প্রাচীন কালে যখন হিন্দু রাজা হিন্দুরাজ্যে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন, তখন আমাদের জাতীয় অবস্থা সমধিক উন্নত ছিল, অনেকে এ কথা অস্বীকার করেন না; অন্ততঃ হিন্দু জাতির পুরাবৃত্তের অভাবে এ কথা লইয়া তর্ক বিতর্ক যত ক্ষণ ইচ্ছা চালান যাইতে পারে। কিন্তু গত কয় শত বৎসরে আমাদের দুর্দ্দশার যে একশেষ ঘটিয়াছিল, এবং বর্ত্তমান কালে আমাদের সামাজিক জীবন সঙ্কটাপন্ন মুমূর্ষু অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহা এক রকম সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। এই নবজীবনসঞ্চারের কয়েকটা বড় বড় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটা প্রধান লক্ষণ, আমাদের জাতীয় রুচির পরিবর্ত্তন ও জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ। বেহুলার নাচ দেখিয়া স্বর্গের দেবগণ যত দূর তৃপ্তি লাভ করিতেন, আমরা মর্ত্ত্যদেহ ধরিয়াও কোনরূপেই ততটা পারি না। এখন বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথের হাতে মানবজীবনের উৎকট সমস্যাগুলার আলোচনা কবিতাকারে দেখিতে চাই। দ্বিতীয় একটা লক্ষণ, আমাদের মধ্যে রাষ্ট্রিক আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপন এবং তৎসহকারে স্বায়ত্তশাসন লাভের প্রয়াস।

কিন্তু এই সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিতেও আমরা উন্নতির সোপানে উঠিতেছি, এই বাক্য নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে আমি প্রস্তুত নহি। এক শত বা দেড় শত বৎসরের মধ্যে কলির প্রকোপ সহসা এত দূর বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে যে, বাঙ্গালীর পরমায়ুঃ একবারে পঁচানব্বই হইতে পঁয়ত্রিশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ধর্ম্মের চারি পায়ের মধ্যে তিনটি একবারে চিরদিনের

মত খঞ্জ হইয়া গিয়াছে, অবশ্য এরূপ বিশ্বাস করিতে আমি বাধ্য নহি। কিন্তু আবার আমাদের সামাজিক গগনের পূর্ব্বাকাশে তরুণ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে, এবং অরুণ সারথি হস্তধৃত হরিদশ্বগণের রশ্মিগুচ্ছ আর যে ঘুরাইয়া দিবেন না, ইহার স্বীকারেও আমার সাহস হয় না। বঙ্গ-সাহিত্যের অভ্যুদয় সম্বন্ধে কোন কথা এখানে বলিতে চাহি না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা বঙ্কিমের প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়াছি; কিন্তু আশা করি, নবীনচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের তুলিকা অক্ষয় হইয়া আমাদের চিত্ত-বিনোদনে ও সন্তাপহরণে নিযুক্ত থাকিবে।* কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রিক অবস্থা সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। শ্রোতৃবর্গ অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

বস্তুতই শতাধিক বর্ষব্যাপী সুশাসনে আমরা নিতান্ত আদুরে ছেলে হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের পরিণামও বোধ করি, আদুরে ছেলের পরিণামের অপেক্ষা অধিকতর আশাপ্রদ নহে। পালঙ্কের উপর সুখশয্যাশায়ী শিশুকে যখন আরামের সহিত তুলিযোগে চুমুকে চুমুকে দুগ্ধ পান করিতে দেখা যায়, তখন বয়স্ক লোকের মুখ হইতে "আহা মরি শিশুকাল" ইতি কবিতাবাণী সনিঃশ্বাসে নির্গত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে এই শিশুকেই আবার কিছু দিন মধ্যে সেই বয়স্কের স্থান গ্রহণ করিয়া জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত হইতে হয়। আমাদের স্নেহময়ী গভর্মেণ্ট-জননীর অনুগ্রহের মাত্রা ও আমাদেরও আবদারের মাত্রা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আর আমরা সেই আরামের পালঙ্ক ও তুলির দুধ সহজে ছাড়িতে চাহিতেছি না এবং আমাদের স্বচ্ছন্দতার অণুমাত্র ত্রুটি ঘটিলেই, শৈশবসুলভ সানুনাসিক কণ্ঠধ্বনি বাহির করিয়া জননীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হইতেছি। বাস্তবিকই আমাদের মত সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী কোন জাতির উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা ইতিহাসে লেখে না।

আমাদের মেরুদণ্ডের সনাতন কোমলতা হইতেই এই অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে; আবার সেই অবস্থা হইতেই মেরুদণ্ডের কোমলতা বাড়িয়া যাইতেছে। আমরা কথায় কথায় আমাদের চরিত্রসংশোধনের প্রস্তাব করি; এবং এই চরিত্রসংশোধন না হইলে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই, এই মর্ম্মে

* যখন এই প্রবন্ধ প্রথম পঠিত হয়, তখন নবীনচন্দ্র জীবিত ছিলেন

মহতী ঘটা করিয়া বক্তৃতা করি। চরিত্রসংশোধন না হইলে যে উন্নতি ঘটিবে না, ইহা সত্য কথা; কিন্তু চরিত্র-সংশোধন ব্যাপারটাই কি এত সহজ জিনিষ? যেন ইচ্ছা করিলেই চরিত্রটা আপনা-আপনি শোধিত হইয়া যাইবে। কিঞ্চিলিকা যেন ইচ্ছা মাত্রেই আপনাকে কুম্ভীরে পরিণত করিবে! ডারুইন-বাদীরা বলেন, কুম্ভীরেরও পূর্ব্বপুরুষ এক কালে কেঁচোর মত ছিল। কিন্তু সেই কুম্ভীরত্বে পরিণতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাকে কত যুগব্যাপী জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে! ইচ্ছা মাত্রেই চরিত্রশোধন ঘটে না; এবং প্রস্তাব দ্বারাও জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

বিদ্যাসাগরের মহত্বের সম্মুখীন হইলে, আমাদের ক্ষুদ্রত্বের উপলব্ধি জন্মিয়া যে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, এইরূপে সেই আত্মগ্লানির কতকটা ওজর মিলিতে পারে।

আমরা যে বিদ্যাসাগরের সম্মুখে দাঁড়াইতে সঙ্কুচিত হই, এইরূপে তাহার কতকটা সান্ত্বনা মিলিতে পারে বটে, কিন্তু এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দ্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ব্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দ্দমতা ও অনম্যতা, এই দুর্দ্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ, যাহারা কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে, তাহাদের মধ্যেই পাওয়া যায়; আমাদের মত যাহারা তুলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে ও সেই দুধে মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া লয়, তাহাদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

সেই জন্যই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিতে দ্বিধা হয়। অনেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্য জাতিসুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ; আমাদের মনুষ্যত্ব তাঁহাদের নিকট নিষ্প্রভ ও মলিন।

যে পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত্রে যাহা বর্ত্তমান, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে যাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্র জীবনকেই নিজের জন্য না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্রগঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু পিতৃপিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে ও মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ভিন্ন করিয়া তিনি বীরের মত সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে; জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টকসমাবেশে আরও দুর্গম। কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলাকে ছাঁটিয়া দলিয়া চলিয়া যাইতে অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙ্গালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ আশ্চর্য্য এই, এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। তিনি যে স্থানে যাহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সে স্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাব তখন পর্য্যন্ত একবারেই প্রবেশলাভ করে নাই। পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্যের স্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য চরিত্রে অনুকরণের যোগ্য অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার চরিত্রকে কোনরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র তাহার পুর্ব্বেই সম্যগ্‌ভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল; আর নূতন মশলা-সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। যে বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সহিত আমরা এত পরিচিত, যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পরের ক্ষেতে যবের শীষ খাইতে গিয়া গলায় কাঁটা ফুটাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, অথবা আহারকালে পার্শ্ববর্ত্তীদের ঘৃণার উদ্রেকভয়ে নিজের পাকস্থলীতে আরশুলার ন্যায় বিকট জন্তু প্রেরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই বালক বিদ্যাসাগরেই সেই চরিত্রের প্রায় সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। বিদ্যাসাগর যদি ইংরেজী একবারে না শিখিতেন বা ইংরেজের স্পর্শে না আসিতেন; চিরকালই যদি তিনি সেই

নিভৃত বীরসিংহ গ্রামের টোলখানিতে ব্যাকরণের তাৎপর্য্য আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে ১৩০৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা শহরের অবস্থাটা ঠিক এমনই না হইতে পারিত; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আপন প্রকাণ্ড পুরুষসিংহত্ব লইয়া আপনার পল্লীগ্রামখানিকে বিক্ষোভিত রাখিতেন, সন্দেহ নাই। তিনি ঠিক যেমন বাঙ্গালীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্য্যন্ত তেমনই বাঙ্গালীটিই ছিলেন। তাঁহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণ দ্বারা পরত্ব গ্রহণের তাঁহার কখন প্রয়োজন হয় নাই; এমন কি, তাঁহার এই নিজত্ব সময়ে সময়ে এমন উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিত যে, তিনি বলপূর্ব্বক এই পরত্বকে সম্মুখ হইতে দূরে ফেলিতেন। পাশ্চাত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি। ইহার জন্য তাঁহাকে কখন ঋণস্বীকার করিতে হয় নাই।

সম্প্রতি আমাদের পরমশ্রদ্ধাভাজন মাননীয় কোন মহাশয় এইরূপ একটা কথা তুলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্যগণের সহিত আমাদের সামাজিক কুটুম্বিতা-স্থাপন না ঘটিলে, আমাদের জাতীয় চরিত্রের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কথাটা লইয়া আমাদের সমাজমধ্যে অনেকটা আন্দোলন চলিয়াছিল। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পাশ্চাত্য বেশভূষার ও পাশ্চাত্য আচারের পক্ষপাতী, তাঁহারা এই আন্দোলনে কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বৈদেশিকের সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন ও বিদেশের আচার-গ্রহণ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত গ্রহণ করিতে গেলে কি ফল ঘটিত, বোধ হয়, উল্লেখ অনাবশ্যক। তাঁহার খাঁটি দেশীয় পরিচ্ছদ হইতেই তাহার উত্তর মিলিতে পারে। চটিজুতার প্রতি তাঁহার একটা আত্যন্তিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন চটি ত্যাগ করিয়া বুট ধরিয়াছি, ঠিক তাহা দেখিয়াই যেন বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই এই চটিজুতাকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্প তাঁহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত। যে অভিমান ও দর্পের অনুরোধে নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও মুটের মাথা হইতে বোঝা কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া পথ চলিতেন, এই দর্প ঠিক সেই দর্প।

আচারবিষয়ে অন্যের অনুকরণ দূরের কথা, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এমন দুই একটা পদার্থ ছিল, যাহাতে পাশ্চাত্য মানব হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল। এই প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখিয়াই আমরা বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব অনুভব করি।

পাশ্চাত্য দেশে ফিলান্‌থ্রপি নামে একটা পদার্থ আছে, তাহার বাঙ্গালা নাম মানবপ্রীতি। এই মানবপ্রীতি কোন সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে আবদ্ধ নহে; সমস্ত মানবসমাজ এই হিতৈষণার বিষয়ীভূত এবং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই হিতৈষণা পলিটিকাল ইকনমি শাস্ত্রেরও সম্পূর্ণ বিরোধী নহে। এই লোকহিতৈষণা ইউরোপ হইতে বাহির হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং ইহার প্রভাবে যে কত অলৌকিক ঘটনার, কত অসাধারণ স্বার্থত্যাগের উদাহরণ মিলিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই লোক-হিতৈষণার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, প্রাচ্য দেশে তাহার তুলনা মিলে না। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিতর এমন একটা স্ফূর্ত্তি রহিয়াছে, যেন তাহা আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া আপনা হইতে উছলিয়া বাহির হয়, এবং অন্য কোন মূর্ত্তি ধারণের সুবিধা না পাইলে এই মানবপ্রীতির ও বিশ্বহিতৈষণার আকৃতি পরিগ্রহ করে। যে স্ফূর্ত্তির বশে ইংরাজের ছেলে সাঁতার দিয়া নায়াগারা পার হইতে গিয়া জীবনকে অবলীলা-ক্রমে বিসর্জ্জন দেয়, এই হিতৈষণাও যেন সেই অমানুষিক স্ফূর্ত্তি হইতেই উদ্ভূত। এই পরার্থপরতার মূলে যেন ব্যক্তিগত স্ফূর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আপনার ব্যক্তিত্ব যেন নিজের ভিতর স্থান না পাইয়া অপরের উপর সবেগে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। প্রাণের প্রবাহ যেন আপনার বেগ আপনি সহিতে না পারিয়া পরের দিকে ধাবিত হইতেছে। পরের উপকার যেন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; আপনার নিজত্বের অভিব্যক্তিই যেন তাহার প্রণোদক।

বিদ্যাসাগরকে এইরূপ ফিলান্‌থ্রপিষ্ট বলা চলে না। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্ম্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমন কি, তিনি হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অনেকই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোন স্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক তাহার প্রতীকার করিতে হইবে, একালের সমাজতত্ত্ব সর্ব্বদা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু

দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবা মাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাবমোচন না করিয়া পারিতেন না। লোকটার কুল-শীলের পরিচয় লওয়ার অবসর ঘটিত না। তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায়, তাহার অভাব পূরণ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহার উপকার হইবে, কি অপকার হইবে ও গৌণ সম্বন্ধে সমাজের ইষ্ট হইবে, কি অনিষ্ট হইবে, নীতিতত্ত্ব-ঘটিত ও সমাজতত্ত্ব-ঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করিতেন না। অপিচ, দুঃখের সম্মুখে আসিবা মাত্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব একবারে অভিভূত হইয়া যাইত। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন; পরের মধ্যে তাঁহার নিজত্ব একবারে মগ্ন ও লীন হইয়া যাইত। এই লক্ষণের দ্বারা তাঁহার মানবপ্রীতি অন্য দেশের মানবপ্রীতি হইতে স্বতন্ত্র ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন্ ব্যক্তির কি উপকার করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা তৈয়ার করা একরকম অসম্ভব। তাঁহার জীবনচরিত-লেখকেরা যেগুলা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই পড়িতে পড়িতে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। শ্রোতৃবর্গ ভয় পাইবেন না; আমি সেই ফর্দ্দ এক্ষণে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সুদীর্ঘ ফর্দ্দের মধ্যে প্রায় শতকরা নব্বইটা কার্য্য অর্থনীতির অনুমোদিত নহে। কিন্তু প্রচলিত অর্থনীতির উপরে আর একটা নীতি আছে, তাহা উচ্চতর মানবনীতির অঙ্গীভূত।

ইউটিলিটির হিসাবে ভাল-মন্দ নির্ণয় করিতে হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই ইউটিলিটির হিসাবটা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। সমাজের স্থিতির ও গতির নিয়মগুলা এতই জটিল যে, সেই নিয়মগুলাকে যতই আয়ত্ত করিতে যাওয়া যায়, তাহারা ততই যেন হাত হইতে পিছলিয়া পড়ে। সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আজকাল আলোচনা যতই অধিক হইতেছে, সমাজের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের অনভিজ্ঞতা ততই যেন বৃদ্ধি পাইতেছে! একটা অকর্ম্মণ্য, অলস, কুচরিত্র ব্যক্তির আহার দিয়া প্রাণ বাঁচাইলে আমাদের পরিমিত খাদ্যসমষ্টির পরিমাণ অকারণে হ্রাস করা হয়, এবং মনুষ্যজাতির জীবন-সংগ্রামকে কিয়ৎপরিমাণে আরও তীব্র করিয়া তোলা হয়, এই হিসাবে এইরূপ দয়াপ্রকাশ গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া আজিকালকার অনেক সমাজতাত্ত্বিক নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র দয়াপ্রকাশ ব্যাপার কত

দিকে কত উপায়ে গৌণভাবে ও পরোক্ষভাবে শুভ ফলের আনয়ন ও উৎপাদন করে, তাহা আমাদের স্থুল হিসাবে ধরা পড়ে না; কাজেই ইউটিলিটির জমাখরচের খাতায় জমার অঙ্কে শূন্য পড়িয়া যায়। রাজশাসন ও সমাজ-শাসন ও ধর্ম্মের শাসন, লোকাচার ও দেশাচার, নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র, বিদ্যার বিস্তার ও জ্ঞানের বিস্তার, সহস্র উপায় অবলম্বন করিয়া সহস্র গির্জ্জাঘর ও সহস্র কারাগার ও সহস্র বিদ্যালয় ও সহস্র ধর্ম্মাধিকরণ মনুষ্যের জীবন-সমরের উৎকটতার লাঘব সাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে। বর্ত্তমান সমাজতত্ত্ব দুঃখের সহিত বলিতেছে, এই যুগযুগান্তরব্যাপী মনুষ্যের সমবেত চেষ্টার এক মাত্র ফল নিষ্ফলতা। মনুষ্য-চরিত্রে স্বার্থপরতার মাত্রা কোনরূপে কমাইতে না পারিলে, বোধ করি, এই দ্বন্দ্বের ভীষণতার কোনরূপ লাঘব হইবে না। সন্তানকে দেখিলে জননীর স্নেহের উৎস আপনা হইতে উথলিয়া উঠে; কোনরূপ ক্ষতি-লাভ গণনার বা কর্ত্তব্য নির্ণয়ে সংশয়ের অবকাশমাত্র উপস্থিত হয় না। মনুষ্যের চরিত্র যদি কখনও এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, সেই স্নেহাকৃষ্ট জননীর মত দুঃখক্লেশাতুর মনুষ্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য সে আপনা হইতেই বাধ্য হইবে, তাহা হইলেই মনুষ্যজাতির ভবিষ্যতের জন্য আশা করিতে পারা যায়। অনেক হিসাব-নিকাশ জমাখরচ বিচারের পর কর্ত্তব্য-নির্ণয় একরূপ ব্যাপার; আর আপনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কর্ত্তৃক প্রণোদিত ও তাড়িত হইয়া কর্ত্তব্যের দিকে ধাবিত হওয়া আর এক রকম ব্যাপার। এই শেষোক্ত স্থলে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্তিটা স্বভাবের সহিত এমন ভাবে মিশিয়া যায় যে, উহাকে স্বভাব হইতে আর পৃথক্ করিয়া লওয়া চলে না; পৃথক্ করিতে গেলে সমগ্র স্বভাবটাই ভাঙ্গিয়া যায়। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণতঃ মানুষে পরের কাজ করে; কেন না, পরের কাজটা ভাল কাজ ও প্রশংসনীয় কাজ; উহাতে নিজেরও লাভ আছে, সমাজেরও লাভ আছে। ইহলোকে, এবং হয়ত ইহলোকের পর আর একটা যে লোক আছে শুনা যায়, সেইখানে এই কাজের জন্য বিশেষ প্রতিপত্তি লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু মানুষ যেমন ক্ষুধার উত্তেজনায় খাইতে চায়, পিপাসার উত্তেজনায় জলার্থী হয়; শারীরবিজ্ঞানঘটিত কোন তত্ত্ব তখন তাহার মনে স্থান পায় না; এমন কি, ক্ষুধার ও পিপাসার তাড়নায় এমন খাদ্য ও এমন পানীয় সে উদরস্থ করিয়া ফেলে, শারীরবিজ্ঞান তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া হইয়া পড়ে। সেইরূপ পরার্থপরতা তখনই স্বাভাবিক প্রকৃতির মধ্যে স্থান

পাইবে, যখন মনুষ্য সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় স্বার্থ ছাড়িয়া পরার্থের মুখে আপনা হইতে ধাবিত হইবে। তাহার এই কার্য্যের দ্বারা সমাজের মঙ্গল হইবে, কি অমঙ্গল হইবে, তাহা চিন্তা করিতে সে সময় পাইবে না। মনুষ্যের ইতিহাসে যদি কখন এইরূপ দিন আইসে, যখন মনুষ্যের প্রবৃত্তি এইরূপে মনুষ্যকে পরের কাজে প্রেরিত করিবে, তখন হয়ত রাজশাসন ও সমাজ-শাসনের প্রয়োজন হইবেক না; তখন নীতিপ্রচারক ও ধর্ম্মপ্রচারকের পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে না; এবং কারাগার ও গির্জাঘরের ভগ্নাবশেষ চিত্রশালিকায় একত্র রক্ষিত হইয়া মনুষ্যের অতীত ইতিহাসের পরিচ্ছেদ-বিশেষের সাক্ষ্য দিবে। মনুষ্যের ইতিহাসে এমন দিন আসিবে কি না জানি না; কিন্তু মনুষ্যের এই পরম ধর্ম্মের কল্পনা অন্ততঃ একটা দেশের মানবমস্তিষ্কে প্রতিফলিত হইয়াছিল। যে দেশের সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্যের নায়ক ভগবান্ রামচন্দ্র এই নিষ্কাম ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় আপনার প্রাণসমা ধর্ম্মপত্নীকে কর্ত্তব্যবোধে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, যে দেশের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মপ্রচারক ভগবান্ সিদ্ধার্থ সংসারের দুঃখ-যাতনা হইতে মানবমণ্ডলীর পরিত্রাণার্থ রাজ্য-সম্পত্তি পরিত্যাগ না করিয়া পারেন নাই, যে দেশের উপাস্য মানবদেব শ্রীকৃষ্ণ এই নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচারকর্ত্তা বলিয়া ইতিহাসে কীর্ত্তিত, সেই দেশে এই ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত প্রবৃত্তির ঐতিহাসিক উদাহরণও নিতান্ত বিরল হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই স্থলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত বর্ত্তমান যুগের বঙ্গ-সন্তানগণের অধিক সাদৃশ্য না থাকিতে পারে; কিন্তু সেই চরিত্র আমরা যে আদৌ দেখিতে পাই, তাহা সম্ভবে। কঠোরতার সহিত কোমলতার সমাবেশ ব্যতীত মনুষ্য-চরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না। ভারতবর্ষীয় মহাকবির কল্পনায় পূর্ণ মনুষ্যত্ব বজ্রের ন্যায় কঠোর ও কুসুমের ন্যায় কোমল; যুগপৎ ভীম ও কান্ত, অধৃষ্য এবং অভিগম্য।

রামায়ণ এবং উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। কোন একটা কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদনপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোন দীন

দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল; কোন বালিকা বিধবার মলিন মুখ দর্শন মাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষঃস্থলে গঙ্গা প্রবহমাণা; ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যুসংবাদ পাইবা মাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মত কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম্ম, বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। প্রতীচ্য দেশের কথা বলিতে পারি না; কিন্তু প্রাচ্য দেশে রোদনপ্রবণতা মনুষ্য-চরিত্রের যেন একটা প্রধান অঙ্গ। বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব এই যে, তিনি আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের অপেক্ষাও তাচ্ছিল্য করিতেন, কিন্তু পরের জন্য রোদন না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণশোকে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের উপদেশ তাঁহার নিকট এ সময়ে ঘেঁষিতে পারিত না। বায়ু-প্রবাহে দ্রুম-সানুমানের মধ্যে দ্রুমেরই চাঞ্চল্য জন্মে, সানুমান্ চঞ্চল হয় না। এ ক্ষেত্রে বোধ করি, দ্রুমের সহিতই তাঁহার সাদৃশ্য। কিন্তু আবার সানুমানেরই শিলাময় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে বারিপ্রবাহ নিঃসৃত হয়, তাহাই বসুন্ধরাকে উর্ব্বরা করে ও জীবকুলকে রক্ষা করে। সুতরাং সানুমান্ই বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃতপক্ষে তুলনীয়। ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্যধারায় যে ভূমি যুগ ব্যাপিয়া সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হইয়া রহিয়াছে, রামায়ণী গঙ্গার পুণ্যতর অমৃতপ্রবাহ সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জাতিকে সংসারতাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে, সেই ভূমির মধ্যে ও সেই জাতির মধ্যেই বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

ঈশ্বর এবং পরকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, তাঁহার চরিত-লেখকেরা সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট কথা বলেন না। তবে সংসার হইতে দুঃখের অস্তিত্ব এক নিঃশ্বাসে উড়াইয়া দিয়া সুখের এবং মঙ্গলের রাজ্য কল্পনার বলে প্রতিষ্ঠা করা বোধ করি, দয়ার সাগরের পক্ষে অসাধ্য ছিল। সমুদ্রতলে সার্ জন লরেন্স* ডুবাইয়া দিয়া দুনিয়ার মালিক কিরূপ

* এই নামে একখানা জাহাজ ৭০০ যাত্রী সহ কলিকাতা হইতে পুরী যাইবার সময় বাত্যাবর্ত্তে পড়িয়া সমুদ্রে মগ্ন হয়।

করুণা প্রকাশ ও মঙ্গল সাধন করিলেন, এক নিঃশ্বাসে তিনি তাহা আবিষ্কার করিতে পারিতেন না। বস্তুতই দুঃখদাবানলের কেন্দ্রস্থলে উপবেশন করিয়া জগতের মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করা তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল। বোধ করি, সেই জন্যই ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিতে তিনি চাহিতেন না। তাঁহার প্রবৃত্তি তাঁহাকে যে কর্ত্তব্যপথে চালাইত, তিনি সেই পথে চলিতেন। মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন ; গণ্ডগোলে প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার অবসর ছিল না। এমন দিন কবে আসিবে, যে দিন মনুষ্য-সমাজ সাম্প্রদায়িক কোলাহলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ; যে দিন আপামর সাধারণ বিতণ্ডা ত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগরের অনুবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্যনির্ণয়ে মন দিতে অবকাশ লাভ করিবে।

বিদ্যাসাগর এক জন সমাজসংস্কারক ছিলেন। সমাজসংস্কারের কথাটা উত্থাপন করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে যদি নিতান্ত আতঙ্ক জন্মে, তাহাতে শ্রোতৃবর্গের নিকট মার্জ্জনার ভিখারী হইতেছি। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া কথাটা একবারে না তুলিলেও চলে না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বিধবাবিবাহে পথ-প্রদর্শন তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। বস্তুতই এই বিধবাবিবাহ ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্ত্তিটা দেখিতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা উভয় গুণের আধাররূপে তিনি লোকসমক্ষে প্রতীয়মান হয়েন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানবনির্যাতন তাঁহার কোমল প্রাণকে দিবানিশি ব্যথিত রাখিত ; দুর্ব্বল মনুষ্যের প্রতি নিষ্করুণ প্রকৃতির অত্যাচার তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে ব্যথা দিত ; তাহার উপর মনুষ্যবিহিত, সমাজবিহিত অত্যাচার তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বিধাতার কৃপায় মানুষের দুঃখের ত আর অভাব নাই, তবে কেন মানুষ আবার সাধ করিয়া আপন দুঃখের বোঝায় ভার চাপায়। ইহা তিনি বুঝিতেন না, এবং ইহা তিনি সহিতেনও না। বালবিধবার দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল ; এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে করুণামন্দাকিনীর ধারা বহিল। সুরনদী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করে, তখন কার সাধ্য যে, সে প্রবাহ রোধ করে! বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল, তখন কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রূকুটীভঙ্গিতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার

পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই মেরুদণ্ড নমিত করে।

কিন্তু এই সমাজসংস্কার ব্যাপারেও বিদ্যাসাগরের একটু অসাধারণত্ব দেখা যায়। প্রথমতঃ, বিধবাবিবাহে হস্তক্ষেপের পূর্ব্বে তিনি পিতা-মাতার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে তিনি প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই দুইটাই আমাদের পক্ষে চিন্তনীয় বিষয়। সম্প্রতি আমরা নীতিশাস্ত্র হইতে 'মরাল কারেজ' নামক একটা সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছি।* কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় স্বার্থবিসর্জ্জন ব্যাপারটা যে কোন দেশের একচেটিয়া নহে, তাহা সদা সর্ব্বদা আমরা ভুলিয়া যাই। আমাদের প্রাচীনা ভারতভূমিতেও এই কর্ত্তব্যের জন্য স্বার্থ-বিসর্জ্জনের উদাহরণ ভূরি-পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। তবে দুঃখের বিষয় যে, অন্যত্র যে সব ঘটনায় ঢক্কানিনাদ হইয়া থাকে, এ দেশে তাহার অধিকাংশই নীরবে সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই মরাল কারেজটা এ দেশে নূতন আমদানি এক অপূর্ব্ব জিনিষ। আরও দুঃখের বিষয় যে, একালের শিক্ষার সহিত এই মরাল কারেজের কি একটা সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। লোকের বয়োবৃদ্ধি-সহকারে সংসারের হাইড্রলিক প্রেসের চাপ পড়িয়া ইহা অনেকটা সঙ্কুচিত ও শীর্ণ হইয়া পড়ে; কিন্তু শিক্ষানবিস বালকগণের নৈতিক সাহসের আক্রমণটা নিরীহ পিতামাতার উপর দিয়া, নিরীহতর প্রতিবেশীর উপর দিয়া ও নিরীহতম মাষ্টার মহাশয়ের উপর দিয়াই নিক্ষিপ্ত হয়।

বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর এই মরাল কারেজের প্রতি বিশেষ রাজি ছিলেন না। স্বাধীন আত্মাকেও কোন স্থানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরাধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। নিজের বুদ্ধি এবং নিজের প্রবৃত্তির মুখে বল্গা লাগাইয়া কোথায় তাহাদিগকে নিয়মিত রাখিতে হয়, তাহা তিনি বুঝিতেন। স্বর্গের দেবতায় তাঁহার কিরূপ আস্থা ছিল, জানি না; কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়ান্ জীবন্ত দেবের তুষ্টির জন্য সময়বিশেষে আপনার ধর্ম্মবুদ্ধিকে পর্য্যন্ত বলিদান দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন। তাঁহার ন্যায় স্বতন্ত্র পুরুষ বঙ্গদেশে তখন ছিল না।

* Moral courage.

কিন্তু মানবজীবনে এমন সময় আসিতে পারে, যখন সেই মুক্ত বায়ুমার্গে বিহারপ্রয়াসী স্বাতন্ত্র্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়; ইহা তিনি মানিতেন। সেই শৃঙ্খলকে কপটাচারের আয়স নিগড় মনে করিবার প্রয়োজন নাই। উহা প্রেমের শৃঙ্খল ও ভক্তির শৃঙ্খল;—মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের যে প্রেমের বন্ধন প্রকৃতি আপন হাতে নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে, যে ভক্তির বন্ধন ব্যক্তিনিহিত ক্ষুদ্র জীবনকে সমাজরূপী বিরাট্‌পুরুষের ঐতিহাসিক জীবনের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়াছে। এই প্রেমের শিকল ও ভক্তির শিকল গলায় পরিয়া মনুষ্য-জীবন ধন্য ও কৃতার্থ হয়; "মণিমুক্তার মোহন মালা" ইহার নিকট স্থান পায় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় লইয়া আমরা সকলেই কিছু ধরাতলে অবতীর্ণ হই নাই। বালবিধবার অশ্রুজল আমাদের পাষাণ-হৃদয়ে রেখাঙ্কন করে না; তাই আমরা ভণ্ড ব্রহ্মচর্য্যার মলিন পাংশুবিক্ষেপে সেই অশ্রুজল মুছিতে যাই। ঈশ্বরচন্দ্রের বীরত্ব বিধবার দুঃখমোচনে সমর্থ হয় নাই। দেশাচারের জয়লাভ ঘটিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু ইহাই বিধিলিপি, ইহাই প্রকৃতির নির্ব্বন্ধ। স্বাভাবিক, সরল, ছদ্মবেশহীন মনুষ্যত্ব ইহাতে ম্রিয়মাণ হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখপ্রকাশ নিষ্ফল;—কেন না, ইহা বিধিলিপি।

এই দেশাচারগুলির সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমাদের মধ্যে যাঁহাদের বিশ্বাস যে, প্রাচীন কালে এক দিন জন-কয়েক ব্রাহ্মণ পরামর্শ করিয়া লাভের প্রত্যাশায় এই জঘন্য দেশাচার-সকলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং জনসমাজ ভয়ে হউক বা নির্বুদ্ধিতায় হউক, সেই সকল ব্যবস্থা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাদের সহিত আমি একমত নহি। ব্যক্তি-বিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের চেষ্টায় সমাজের ধারাবাহিক জীবন যে এইরূপে বিপর্য্যস্ত হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। আজকাল সমাজ-শরীরের সহিত জীব-শরীরের তুলনা করা এবং সমাজের অন্তর্গত দেশাচারকে জীবশরীরোদ্গত ব্যাধিজনক বিস্ফোটকের সহিত তুলনা করা একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীববিদ্যার অন্তর্গত আধুনিক নিদানশাস্ত্রে বিস্ফোটকের উৎপত্তির যে কারণ নির্দ্দেশ করে, তাহাতে এই তুলনা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বাহির হইতে রোগের বীজ শরীরমধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়া বিস্ফোটকের সৃষ্টি করে। কিন্তু সমাজ-শরীরের অন্তর্ভুক্ত পুরুষপরম্পরাগত প্রথাগুলিকে সকল সময়ে বাহির হইতে আগত বলিতে পারা যায় না।

সমাজ-শরীরের বয়ঃক্রমানুসারে তাহারা জৈবিক নিয়ম মতেই আপনা হইতে উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও লয় পায়। সমাজ-শরীরকেও ঠিক জীবশরীরের মত দুরন্ত প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করিয়া সহস্র প্রতিকূল শক্তি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হয়; এবং সেই আত্মরক্ষার প্রয়াসফলে তাহাতে বিবিধ অঙ্গ ও বিবিধ অবয়ব ও বিবিধ যন্ত্রের বিকাশ হয়। জীবশরীরের মধ্যে কতকগুলা অবয়বের চিহ্ন দেখা যায়। শরীরবিজ্ঞানে তাহাদিগকে vestigial organ আখ্যা দেয়। এই ক্ষুদ্র অবয়বগুলার জীবন ধারণে ও জীবন রক্ষণে কোনরূপ উপকার দেখা যায় না; বরং সময়ে সময়ে তাহারা জীবনের সংহারক হইয়া উঠে। সাধারণতঃ তাহারা তাহাদের নিরর্থক, অনাবশ্যক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সমগ্র দেহের নিকট হইতে পুষ্টির ভাগ ও শক্তির ভাগ গ্রহণ করিয়া জীবনের প্রতিকূলতাই সাধন করে। ইহারা জীবনযাত্রার প্রতিকূল হইলেও আধুনিক জীববিদ্যার মতে বিস্ফোটকের বা ব্যাধির স্থানীয় নহে। জীবের ইতিহাসে এমন সময় ছিল, তখন তাহারা জীবনের পক্ষে আবশ্যক ছিল, তখন তাহারাও জীবনের আনুকূল্য সাধনে নিযুক্ত রহিত। তদানীন্তন বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধব্যাপারে জীবদেহকে সমর্থ করিবার জন্য তাহাদের আপনা হইতে বিকাশ হইয়াছিল। বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন সহ তাহাদের আবশ্যকতা অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে কাজেই তাহাদের অস্তিত্বও বিলোপের অভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। সমাজ-শরীরে দেশাচারগুলাও কতকটা যেন সেইরূপ। সমাজের অতীত ইতিহাসে বিশেষ প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশে তাহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল; এখন সেই প্রয়োজনের অভাব হওয়ায়, তাহারা অনাবশ্যক ও জীবনের যন্ত্রণাদায়ক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিনা অন্য কোন প্রণালী নাই, যাহাতে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন সময়সাপেক্ষ; এবং সেই দিনের প্রতীক্ষা করাই সঙ্গত। সমাজ-শরীরের চিকিৎসক তুমি বিস্ফোটকভ্রমে যেখানে-সেখানে ছুরিকা চালাইলে সর্ব্বত্র সুফল নাও হইতে পারে।

আমার যে সকল বন্ধুবর্গের অনুগ্রহবশে আজি আমি বিদ্যাসাগরের চরণোপান্তে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের অবকাশ পাইয়াছি, তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহারে প্রবৃত্ত হইব। আমাদের দেশে জীবনচরিত লেখা প্রচলিত নাই, এবং কোন ব্যক্তির জীবন-

চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেও তাহার উপকরণ উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত রচনা করিয়া যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের এই কলঙ্ক অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয়, এই অভাবের ও অসুবিধার বিশেষ ভুক্তভোগী। এরূপ স্থলে বিদ্যাসাগরের মত মহাশয়গণের স্পর্শে যিনি কখন আসিবার সুবিধা পাইয়াছেন, যিনি কোন-না-কোন সূত্রে তাঁহার চরিত্রের কোন একটা দোষ দেখিতে পাইয়াছেন, তৎসমস্ত সাধারণের নিকট ব্যক্ত করা তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমার যাহা কিছু বলিবার আছে, ব্যক্তিগত হইলেও তাহা বলিতে সাহসী হইতেছি। বঙ্গদেশের মধ্যে ছোট বড় এমন ব্যক্তি অল্পই আছেন, যিনি কোন-না-কোন প্রকারে বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণগ্রস্ত নহেন। দূর মফঃস্বলের পল্লীগ্রামের মধ্যেও তাঁহার প্রভাব কত দূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা চিন্তার অগোচর। মহাকবির বাক্যে আছে, যদধ্যাসিতমর্হদ্ভিস্তদ্ধি তীর্থং প্রচক্ষতে। মহতের আসনভূমি তীর্থস্বরূপ। বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যে সময়ে বিদ্যাসাগরের কর্ম্মবহুল জীবনের অন্যতম ব্যবসায় ছিল, সেই সময়ে আমার পিতামহের ক্ষুদ্র কুটীর এক দিন বিদ্যাসাগরের পাদস্পর্শে তীর্থস্থলে পরিণত হইয়াছিল। শৈশব কালে সেই গৌরবান্বিত দিবসের প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে নানা কথা অন্তঃপুর-বাসিনীগণের মুখেও শুনিতে পাইতাম। পাঠশালায় প্রবেশলাভের পর বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি পুস্তক-পরম্পরার শুভ্র মলাটের উপর একই নাম অঙ্কিত দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত পাঠশালা ও লেখাপড়া ও ছাপার বহি ও পণ্ডিত মহাশয়ের বেত্রদণ্ডের কিরূপ একটা অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ কল্পনায় স্থির করিয়া লইয়াছিলাম। বিদ্যাসাগরের আকৃতি ও পরিচ্ছদ ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যে সকল গল্প শুনিতাম, তৎসমুদয় সেই কল্পনার সহিত বিজড়িত করিয়া অন্তঃকরণ একটা বিদ্যাসাগরমূর্ত্তি গড়িয়া ফেলিয়াছিল। বটতলার পুস্তকের বোঝা মাথায় করিয়া চটিজুতাধারী রুক্ষবেশ পরুষমূর্ত্তি এক ব্যক্তি আমাদের পল্লীগ্রামে মাঝে মাঝে দেখা দিত। শ্রোতৃগণ মার্জ্জনা করিবেন, সেই লোকটাই যে নিশ্চিত বিদ্যাসাগর, এই ধারণা হইতে অব্যাহতি পাইতে আমাকে উত্তরকালে অনেক প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। আমার মনস্তত্ত্ববিৎ বন্ধুগণের উপর এই বিষম সমস্যার মীমাংসার ভার থাকিল। ১২৮৮ সালের

২১শে মাঘ তারিখে আমি কলিকাতা শহরে আসি; এবং ২৩শে তারিখে তীর্থযাত্রীর আগ্রহের সহিত পিতৃব্যদেবের সমভিব্যাহারে চিরাকাঙ্ক্ষিত বিদ্যাসাগরদর্শনলালসা তৃপ্ত করিয়া জীবন ধন্য করি। শৈশব কালের কাল্পনিক বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃত বিদ্যাসাগরের সাদৃশ্য দেখিয়াছিলাম কি না, সে কথা উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেই দিবস তাঁহার মুখ হইতে যে কয়েকটি বাক্য শুনিতে পাইয়াছিলাম, আজি পর্য্যন্ত তাহা আমার কর্ণবিবরে ধ্বনিত হইতেছে। আশা করি, সেই উদার প্রশস্ত স্নেহপূর্ণ হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর বঙ্গের যে সকল পুত্রকন্যার শ্রবণপথে প্রবেশ লাভ করিয়া হৃদয়ের ভিত্তিমূলে আঘাত দিয়াছে, তাঁহারা চিরদিন সেই কণ্ঠস্বরের স্মৃতিকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন। সেই প্রাচ্য মনুষ্যত্বের আদর্শ তাঁহাদের জীবনকে যুগপৎ প্রণোদিত ও সংযমিত রাখিবে। আমাদের এই দুর্দ্দিনেও যদি মনুষ্যত্বের সেই আদর্শের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রাচীনা পূজনীয়া জননীর দেহে নবজীবন সঞ্চারের আশা কি কখনই ফলিবে না! কিন্তু ভবিষ্যতের ঘনান্ধকার ভিন্ন করিয়া দীপবর্ত্তিকা আনয়ন করিবে কে? কে বলিবে, আমাদের পরিণতি কোথায়? মহাপুরুষের আবির্ভাব ভারতভূমিতে নূতন ঘটনা নহে। আশা যে, মহাপুরুষের আবির্ভাবই ভারতের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতের সেই মহাপুরুষ কোথায়? দগ্ধাস্থিপঞ্জরময় ভারতের এই মহাশ্মশানে এই মৃত জাতির শবদেহে নূতন জীবন সঞ্চার করিবে কে?

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বার বৎসর অতীত হইল, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শ্যামাঙ্গিনী জননীর অঙ্কদেশ শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু এত দিন আমরা তাঁহার স্মৃতির সম্মানার্থ কোনরূপ আয়োজন আবশ্যক বোধ করি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি যে এত দিন জাগে নাই, তাহা আমাদের অবস্থার পক্ষে স্বাভাবিক। বার বৎসর পরে যদি সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগিয়া থাকে, সেই প্রবুদ্ধিসাধনে আমাদের কৃতিত্ব বিচার্য্য বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং কোন্ তপোলোকে বা সত্যলোকে অবস্থিত হইয়াও মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার দুঃখিনী জননীকে আজও ভুলিতে পারেন নাই ;—সেইখানে বসিয়া "তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম, ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে" বলিয়া কাতরকণ্ঠে গান গাহিতেছেন ;—আর মানবের অশ্রুতিগোচর সেই সঙ্গীত সপ্তকোটি কণ্ঠে কলকল নিনাদ উত্থাপিত করিয়া বঙ্গভূমিকে জাগ্রত করিয়াছে। আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি আজ যদি জাগিয়া থাকে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদিগকে জাগাইয়াছেন, আমাদের উহাতে কোন কৃতিত্ব নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উপাসনার জন্য আজিকার সভা আহূত হইয়াছে ; এবং যাঁহারা এই উপাসনার আয়োজন করিয়াছেন এবং এই উপাসনাকর্ম্মকে সম্ভবতঃ সাংবৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা, কি কারণে জানি না, আজিকার অনুষ্ঠানের প্রধান ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন। আমার প্রতি তাঁহাদিগের এই অহৈতুকী শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমার ভক্তিপ্রকাশের অবসর লাভ করিয়া আমি যুগপৎ গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিতেছি, কিন্তু যোগ্যতর পাত্রে এই ভার অর্পিত হইলে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে বঞ্চিত হইতে হইত না। কেবল যে সময়োচিত বিনয়প্রকাশের জন্য আমি এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে ; বঙ্কিমচন্দ্র যে বিস্তীর্ণ বঙ্গীয়-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অনুচরগণের পথপ্রদর্শক হইয়া গিয়াছেন, আমিও সেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-ক্ষেত্রের এক প্রান্তে এক সঙ্কীর্ণ পথ আশ্রয় করিয়া মন্দগতিতে ধীরে ধীরে পদক্ষেপে সাহসী হইয়াছি ; ইহাই আমার জীবনের কাজ ও ইহাই আমার জীবিকা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল

আলোকবর্ত্তিকা হস্তে করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রের যে যে অংশ প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন, সেই সেই অংশে আমার "প্রবেশ নিষেধ"। আমি দূর হইতে সেই আলোকের উজ্জ্বল দীপ্তিতে মুগ্ধ হইয়াছি মাত্র, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাগ্যবান্ সহচরগণের ও অনুচরগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেও আমি অধিকারী নহি। আজিকার আয়োজনের অনুষ্ঠাতাদিগের অনুগ্রহজন্য অকপট কৃতজ্ঞতাস্বীকারে আমি বাধ্য আছি; কিন্তু আমি আশা করি যে, আপনারা তাঁহাদের পাত্র-নির্ব্বাচনে বিষয়বুদ্ধির প্রশংসা করিবেন না।

বাঙ্গালীর জীবনের উপর বঙ্কিমচন্দ্র কত দিকে কত উপায়ে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি; কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরে সম্ভবতঃ তিনি বাঙ্গালার সার্ ওয়াল্টার্ স্কট্ মাত্র। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত পরিচয় অতি অল্প বয়সেই ঘটিয়াছিল, সে বয়সে উপন্যাসগ্রন্থের সহিত আমার পরিচয় বড়-একটা স্পৃহনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। আমার যখন আট বৎসর বয়স, তখন বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ বাহির হইতেছিল এবং আমি বঙ্গদর্শনের কয়েক সংখ্যা হইতে বিষবৃক্ষের দুই-চারিটা পরিচ্ছেদ আত্মসাৎ করিয়াছিলাম। সেই বয়সে বিষবৃক্ষের সাহিত্য-রসের কিরূপ আস্বাদ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ঠিক মনে নাই; তবে এ কথা বেশ মনে আছে যে, পাঠশালায় গিয়া তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত ভূগোলবিবরণের ভারতবর্ষের অধ্যায়ে গঞ্জাম গঞ্জাম চত্বরপুর, মসলিপটম মসলিপটম, আর্কট আর্কট, মন্থরা মন্থরা, টিনিভেলি টিনিভেলি প্রভৃতি অপরূপ সুশ্রাব্য নামাবলী আবৃত্তির ত্রুটি ঘটিলে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট বেত্রাঘাত উপহার পাইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগ দাঁড়াইয়াছিল, নগেন্দ্রনাথের নৌকাযাত্রা ও কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদর্শন নিতান্তই তাহার সমর্থন ও পোষণ করে নাই। আমার বেশ মনে আছে যে, 'পদ্মপলাশলোচনে তুমি কে' এই পরিচ্ছেদের সহিতই আমার তাৎকালিক বিষবৃক্ষ-পাঠ সমাপ্ত হয় এবং ঐ পরিচ্ছেদের শীর্ষস্থিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি মনের মধ্যে বিস্ময় ও কৌতূহলের উদ্রেক করিয়া কিছু দিনের জন্য একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে। কিছু দিনের জন্য মাত্র, কেন না, পর-বৎসর আমি পাঠশালার পরীক্ষায় যে পুরস্কার পাইয়াছিলাম, বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, তাহার রাঙা ফিতার বন্ধনের মধ্যে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত দুর্গেশনন্দিনী ও বিষবৃক্ষ নামক দুইখানি পুস্তক রহিয়াছে। এই সভাস্থলে যাঁহারা পিতার বা পিতৃস্থানীয় অভিভাবকের গৌরবযুক্ত পদবী

গ্রহণ করেন, তাঁহারা শুনিয়া আতঙ্কিত হইবেন যে, ঐ পুরস্কার বিতরণে গ্রন্থ নির্ব্বাচনের ভার আমার পিতৃদেবের উপর অর্পিত ছিল এবং তিনিই আমার গঞ্জাম গঞ্জাম চত্বরপুর প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভৌগোলিক তত্ত্বে পারদর্শিতার পুরস্কার স্বরূপ ঐ দুইখানি গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার নবম বর্ষের পুত্রের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। পুরস্কারহস্তে বাড়ী আসিয়া রাত্রিটা একরকমে কাটাইয়াছিলাম, পরদিনে বিষবৃক্ষ ও তার পরদিনে দুর্গেশনন্দিনী টাইটেল্‌-পেজের হেড়িং মায় মূল্য পাঁচ সিকা হইতে শেষ পর্য্যন্ত একরকমে উদরস্থ করি। ঐ দুই গ্রন্থের কোন্ অংশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছিল, তাহা যদি এখন অকপটে বলিয়া ফেলি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনারা আমার কাব্য-রসগ্রাহিতার প্রশংসা করিবেন না। বিষবৃক্ষের মধ্যে যেখানে ছেলের পাল "হীরার আয়ি বুড়ী হাঁটে গুড়িগুড়ি" বলিয়া সেই বৃদ্ধার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল ও বৃদ্ধার ইষ্টিরস নামক ব্যাধির প্রতিকার বিষয়ে কেষ্টরস নামক ঔষধের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রতিবেশিনীর সহিত আলাপ করিতেছিল, সেই স্থানটাই গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলাম। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকেই দুর্গেশনন্দিনীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পাত্র স্থির করিয়াছিলাম, ইহাও নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছি। আশমানির ঘরে বিমলার আকস্মিক প্রবেশের সহিত বিদ্যাদিগ্‌গজ ঘরের কোণে লুকাইয়া আত্মগোপন করিলেন, এবং তাঁহার শীর্ষরক্ষিত হাঁড়ি হইতে অড়হরের ডাল বিগলিত হইয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মন্দাকিনীর ধারা বহাইল, সেই বিবরণ যখনই পাঠ করিলাম, তখনই বুঝিলাম যে, বাঙ্গালা সাহিত্য অতি উপাদেয় পদার্থ ; এই সাহিত্যের সরোবরে বিদ্যাদিগ্‌গজের মত শতদল কমল যখন বিদ্যমান আছে, তখন গঞ্জাম গঞ্জাম চত্বরপুরের কাঁটাবন ঠেলিয়াও সেই কমল চয়নের চেষ্টা অনুচিত নহে।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এত লোকে এত কথা কহিয়াছেন যে, আর সে বিষয়ে কোন কথিতব্য আছে কি না, আমি জানি না। কথিতব্য থাকিলেও আমি কোন কথা বলিতে সাহস করিব না। শ্রোতৃগণের মধ্যে অনেকেই হয় ত দাবি করিবেন যে, আমি যখন বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠে উদ্যত হইয়াছি, তখন আমি সূর্য্যমুখীর ও ভ্রমরের চরিত্র আর একবার সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া উভয় চরিত্রের তুলনামূলক সমালোচনে বাধ্য আছি। যদি কেহ এইরূপ দাবি রাখেন, তাঁহার নিকট আমি ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি। বাঁকনল আর টেষ্টটিউব হাতে দিয়া নানাজাতি কিম্ভূতকিমাকার দ্রব্যের

বিশ্লেষণ আমার ব্যবসায় বটে, কিন্তু মানবচরিত্র বা মানবীচরিত্র বিশ্লেষণে আমার কিছু মাত্র শিক্ষা বা দক্ষতা নাই; কেন না, নভেল-বর্ণিত মানবচরিত্র বিশ্লেষণে সলফরেট হাইড্রোজেনের কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই; ঐ মানবচরিত্র নমনীয়ও নহে, দ্রবণীয়ও নহে এবং জলে দ্রব করিয়া উত্তাপ প্রয়োগে উহার ভাস্বরতাপাদনও অসম্ভব। আর আমার কাব্যরসগ্রাহিতার যে নমুনা দিয়াছি, তাহাতে আপনারাও আমার নিকট সে আশা রাখেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে একটা স্থূল কথা আমার বলিবার আছে, সেই কথাটা সংক্ষেপে বলিয়াই আমি আপনাদিগকে রেহাই দিব।

এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন, তাঁহারা বলেন, মানবসমাজের সুখ-দুঃখ, রেষারেষি, দ্বেষাদ্বেষি এবং ভালবাসাবাসি যথাযথরূপে চিত্রিত করাই নবেলের মুখ্য উদ্দেশ্য; উহাতে কল্পনার খেলার অবসর নাই। ইঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সম্পূর্ণ প্রসন্ন নহেন। আর এক শ্রেণীর সমালোচক বলেন, পাপ-পুণ্যের ফলাফলের তারতম্য দেখাইয়া সমাজের নীতিশিক্ষার ও ধর্ম্মশিক্ষার বিধানই নবেলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা দেখিয়াই নবেলের উৎকর্ষ বিচার করিতে হইবে। ইঁহারাও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি সম্পূর্ণ প্রসন্ন নহেন। ব্যাকরণশাস্ত্রে যেমন ভট্টিকাব্য, ইঁহাদের মতে ধর্ম্মনীতিশাস্ত্রে তেমনি নবেল, কাব্যের ছলনা করিয়া পাঠকগণকে কাঁদানই নবেল রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। মানবসমাজের যথাযথ চিত্র আঁকিতে নৈপুণ্যের প্রয়োজন, আর নীতিশাস্ত্র অতি সাধু শাস্ত্র, ইহা স্বীকার করিয়াও আমরা মনে করিয়া লইতে পারি—নবেল এক কাব্য এবং সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্যের প্রাণ। কেবল নীতিশাস্ত্র কেন, যদি কেহ দর্শনশাস্ত্র বা রসায়নশাস্ত্রকেই নবেলের বিষয় করিতে চাহেন, তাহাতে আপত্তি করিব না। কিন্তু বিষয়টি যদি সুন্দর না হয়, তাহা হইলে তাহা কাব্য হয় না।

সৌন্দর্য্যেরও প্রকারভেদ আছে; গাছ-পালার ছবি সুন্দর হইতে পারে, গুপ্ত কথার হরিদাসও সুন্দর হইতে পারেন, কিন্তু মানবজীবনের ও জগৎ-সংসারের গোড়ার কথাগুলি যিনি সুন্দর করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রথম শ্রেণীর কবি। গোড়ার কথা দেখাইলেই কবি হয় না; সেটা দার্শনিকের ও বৈজ্ঞানিকের ও ধর্ম্মতত্ত্ববিদের কাজ, কিন্তু তাহা সুন্দর করিয়া দেখাইতে পারিলেই কবি হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের নবেলের মধ্যে সেই রকম

গোড়ার কথা দুই একটা সুন্দর করিয়া দেখান হইয়াছে ; এই জন্য কবির আসনে তাঁহার স্থান অতি উচ্চ।

মানবজীবনের একটা গোড়ার কথা এই যে, উহা আগাগোড়া একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা মাত্র। শুধু মানব-জীবনের কথাই বা বলি কেন, বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির নিরন্তর সামঞ্জস্য স্থাপনের নামই জীবন। যাঁহারা হার্বার্ট স্পেন্সার-প্রদত্ত জীবনের এই পারিভাষিক সংজ্ঞা জানেন, তাঁহারা আমার কথায় সায় দিবেন। জীবনের উহা অপেক্ষা ব্যাপকতর সংজ্ঞা আমি দেখি নাই। যাহার জীবন আছে, তাহাকে দুই দিকের টানাটানির মধ্যে বাস কবিতে হয়। . ধবলগিবি পর্ব্বত বহু কাল হইতে বরফের বোঝা মাথায় কবিয়া ভারতবর্ষের পুরুষপবম্পবা অবলোকন করিতেছেন, কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র তাঁহাব সজীবতায় সন্দেহ করেন। ধবলগিরি এত মহান্ হইয়াও শীতাতপের ও জল-বৃষ্টির ও তুষারবৃষ্টির উৎপাত অকাতরে সহিয়া আসিতেছেন, এবং শত স্রোতস্বিনীর সহস্র ধারা তাঁহার কলেবরকে শীর্ণ ও বিদীর্ণ ও ক্ষীণ করিয়া তাঁহার অভ্রভেদী মস্তককে সমভূমি করিবার চেষ্টা করিতেছে—সেই আপন্নিবারণের জন্য তাঁহার কোন চেষ্টাই নাই। কিন্তু সামান্য একটি পিপীলিকা ক্রমাগত আহার সংগ্রহ করিয়া আপনার ক্ষয়শীল দেহের পূরণ করিয়া থাকে এবং যদি কেহ তাহাকে দলিত করে, সে দংশন করিয়া আত্মরক্ষণে সাধ্যমত ত্রুটি করে না। এক দিকে বহিঃপ্রকৃতি তাহাকে ক্রমাগত ধ্বংসের মুখে টানিতেছে, অন্য দিকে সে ধ্বংস হইতে আত্মরক্ষার জন্য কেবলই চেষ্টা করিতেছে। তাহার কীটজীবন এই চেষ্টার পরম্পরামাত্র। যে দিন সেই চেষ্টার বিরাম, সেই দিন তাহার মৃত্যু। মানুষও ঠিক পিঁপীড়ার মতই জীবন ব্যাপিয়া আপনাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষার জন্য ব্যাপৃত। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিকে বহিঃপ্রকৃতির আক্রমণ নিবারণে সমর্থ করিয়া মৃত্যুনিবারণের ধারাবাহিক চেষ্টাই তাহার জীবন। সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে পণ্ডিত লোকে অর্দ্ধ ত্যাগে বাধ্য হন ; তাই মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়া পণ্ডিত-জীব আপনার অর্দ্ধেককে অপত্যরূপে রাখিয়া অপরার্দ্ধকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে জীবনের কিয়দংশ রক্ষার জন্য এই অপত্যোৎপাদন। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি প্রবৃত্তির এক মাত্র উদ্দেশ্য যেন-তেন প্রকারেণ জীবনরক্ষা। জীবনরক্ষার দুই উপায়,

আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা। পশুর সহিত নরের এই স্থলে সামান্য; কাজেই ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে আমরা পাশব প্রবৃত্তি বলিয়া থাকি।

কিন্তু মানুষের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। মানুষ অতি দুর্ব্বল পশু, সবল শত্রুর নিকট আত্মরক্ষার জন্য সে আর একটা কৌশল আশ্রয় করিয়াছে। মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করে; সেই দলের নাম সমাজ। দল বাঁধিয়া থাকিতে হইলে স্বাধীনতাকে ও স্বাতন্ত্র্যকে সংযত করিতে হয়—নতুবা দল ভাঙিয়া যায়। যে পাশব প্রবৃত্তি সমাজকে তুচ্ছ করিয়া মানুষকে কেবল আত্মরক্ষার দিকে প্রেরিত করে, দলের কল্যাণার্থ মানুষ সেই পাশব প্রবৃত্তির সংযমে বাধ্য হয়। সহজাত সংস্কারের অভাবে অতীতের অভিজ্ঞতায় ভর দিয়া, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, বুদ্ধিপূর্ব্বক পাশব প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হয়। এই জন্য যে বুদ্ধি আবশ্যক, তাহার নাম ধর্ম্মবুদ্ধি; ইহা বিশিষ্টরূপে মানবধর্ম্ম। ইহা সমাজরক্ষার অনুকূল, ইহা লোকস্থিতির সহায়। মানুষের পশুজীবনই ত দুই টানাটানির ব্যাপার; উহার উপর এই সামাজিক জীবন আর একটা নূতন টানাটানির সৃষ্টি করে। আত্মরক্ষার ও বংশরক্ষার অভিমুখে যে সকল প্রবৃত্তি, তাহা মানুষকে এক পথে প্রেরণ করে, আর মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি, যাহা মুখ্যতঃ সমাজরক্ষার অর্থাৎ লোকস্থিতির অনুকূল, গৌণতঃ আত্মরক্ষার অনুকূল মাত্র, তাহা মানুষকে অন্য দিকে প্রেরণ করে। সামাজিক মানুষকে এই দুই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কেবলই চেষ্টা করিতে হয়। এই সামঞ্জস্য স্থাপনের নিরন্তর চেষ্টাই মানুষের নৈতিক জীবন। প্রবৃত্তি তাহাকে উদ্দাম স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঠেলে, আর ধর্ম্মবুদ্ধি তাহার অন্তরের অন্তর হইতে তাহাকে নিবৃত্তিমার্গে চালাইতে চেষ্টা করে। এই দুই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া মনুষ্য কৃপার পাত্র। এইখানেই মনুষ্যের গোড়ায় গলদ; Original sin.; এইখানেই অমঙ্গলের মূল; সংসার-বিষবৃক্ষের বীজ। Origin of evil; মানব-জীবনের উৎকট রহস্যে ইহাই গোড়ার কথা। খোদার সঙ্গে শয়তানের চিরন্তন বিবাদের মূল এইখানে। মনুষ্যের হৃদয় সেই জীবনব্যাপী মহাহবের কুরুক্ষেত্র;—ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের মহাযুদ্ধ সেখানে নিরন্তর চলিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চারিখানি উপন্যাসে এই গোড়ার কথাটার আলোচনা করিয়াছেন। সেই মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র হইয়া মানব-হৃদয় কিরূপ ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া থাকে, তাহা তিনি সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতেই তিনি উচ্চশ্রেণীর কবি।

বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী, আর কৃষ্ণকান্তের উইল, এই চারিখানি উপন্যাসের কথা আমি বলিতেছি। এই চারিখানি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এক। প্রতাপ ও নগেন্দ্র, অমরনাথ ও গোবিন্দলাল, সকলেই কুসুম-সায়কের লক্ষ্য হইয়াছিলেন ; ধর্ম্মবুদ্ধির দৃঢ়তা ও প্রবৃত্তির তীব্রতার তারতম্যানুসারে কেহ বা জয় লাভ করিয়াছিলেন, কেহ বা পারেন নাই। বীর্য্যবন্ত প্রতাপ সারা-জীবন প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ জয় লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার জীবনব্যাপী কঠোর ও নীরব সাধনার বিষয় জগতের লোকে জানিতে পারিয়াছিল। মোহমুগ্ধ অমরনাথ আপনার পিঠের উপর আকস্মিক পদস্খলনের স্থায়ী চিহ্ন ধারণ করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক দম্ভের বলে পরবর্ত্তী জীবনে সন্ন্যাসী সাজিয়া বেড়াইয়াছিলেন ; পত্নীবৎসল নগেন্দ্রনাথ আপনার আত্মাকে ছিন্ন-ভিন্ন-বিদীর্ণ করিয়া অনাথা পিতৃহীনা বালিকার প্রতি দয়াপ্রকাশের ফল ভোগ করিয়াছিলেন ; আর সর্ব্বাপেক্ষা কৃপাপাত্র গোবিন্দলাল সর্ব্বতোভাবে আপনার অনধীন ঘটনাচক্রের নিষ্ঠুর পেষণে নিষ্পিষ্ট হইয়া আপনাকে কলঙ্ক-হ্রদে নিমগ্ন করিয়া অবশেষে অপমৃত্যু-দ্বারা শান্তিলাভে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই চারিটি মনুষ্যের বিভিন্ন দশার চিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমরা কখনও মানব-চরিত্রের মহিমা দেখিয়া স্পর্দ্ধিত ও গর্ব্বিত হইতে পারি, কখনও বা জাগতিক শক্তির সম্মুখে মানবের দৌর্ব্বল্য দেখিয়া ভীত হইতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র মানব-জীবনের ও জগদ্বিধানের এই সমস্যা—এই গোড়ার কথা অতি সুন্দর চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন এবং এই জন্য তিনি উচ্চশ্রেণীর কবি।

আজিকার দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের অদৃশ্য হস্ত আমাদের জাতীয় জীবনকে যেরূপে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে, তাহাতে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র যতই উচ্চ স্থানে অবস্থান করুন, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য মূর্ত্তির পদপ্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে আজ ব্যগ্র হইব, ইহা স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র কত দিক্ হইতে আমাদের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন, তাহার গণনা দুষ্কর। ইংরেজীতে একটা বাক্য চলিত হইয়াছে, যাহার মূলে গ্রীক নাই, সে জিনিষ জগতে অচল। বলা বাহুল্য, এখানে জগৎ অর্থে কেবল পাশ্চাত্য দেশ বুঝায়। আমরা যদি ঐ বাক্যকে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বলি যে, যাহার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র নাই, সে জিনিষ বাঙ্গলা দেশে অচল, তাহা হইলে নিতান্ত অত্যুক্তি হইবে না। ইংরেজী গতিবিজ্ঞানে একটা শব্দ আছে—মোমেন্টম্ ; বাঙ্গলায়

উহাকে 'ঝোঁক' শব্দে অনুবাদ করিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়েকটা জিনিষকে ঝোঁক দিয়া ঠেলিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই কয়টা জিনিষ বাঙ্গলা দেশে চলিতেছে। সেই জিনিষগুলা গতি উপার্জ্জনের জন্য যেন বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তের প্রেরণার অপেক্ষায় ছিল; বঙ্কিমচন্দ্র হাত দিয়া ঠেলিয়া দিলেন, আর উহা চলিতে লাগিল, তাহার পর আর উহা থামে নাই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথমে নবেলের কথাটাই ধরা যাক। বঙ্কিমবাবুর পূর্ব্বেও অনেকে বাঙ্গলা নবেল লিখিয়াছিলেন; তাহাতে কিসের যেন অভাব ছিল। ইংরেজীনবিস অনেক লেখক ইংরেজী নবেলের অনুকরণে বাঙ্গলা নবেল লিখিয়াছিলেন; কিন্তু কি-একটা অভাবের জন্য উহা বাঙ্গলা-সাহিত্যে লাগে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র নবেল লিখিলেন, আর এক দিনেই বাঙ্গলায় সাহিত্যের একটা নূতন শাখার সৃষ্টি হইল। স্রোতস্বতীর যে ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত হইতেছিল, এখন উহা নূতন পথ পাইয়া বিপুলকায় গ্রহণ করিয়া, শত উপশাখার সৃষ্টি করিয়া দেশ ভাসাইয়া জলপ্লাবন উপস্থিত করিল। সকলেই জানেন যে, এই জলপ্লাবনে সাহিত্যক্ষেত্র ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বাঙ্গলার অধিকাংশ নবেলই অপেয়, অদেয় ও অগ্রাহ্য; কিন্তু ইহার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র দায়ী নহেন। ইহাতে দেশের দারিদ্র্যের ও দুরবস্থারই পরিচয় দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের ইহাতে অঙ্গহানি হয় না। এখন হয়ত বাঁধ বাঁধিয়া দেশকে এই প্লাবন হইতে রক্ষা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার দিনে সেইরূপ বাঁধ বাঁধিবার কোন উপায় দেখি না। বঙ্কিমচন্দ্রের পর যাঁহারা নবেল লিখিয়াছেন, তাঁহারা যদি প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইয়া সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিকেই কাব্য-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য করিতেন, তাহা হইলে আমাদের এতটা আতঙ্কিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না।

বঙ্কিমচন্দ্রকেই আমরা এদেশে মাসিকপত্রের প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। 'বঙ্গদর্শনে'র পূর্ব্বেও অনেক মাসিকপত্রিকা বাহির হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও কি-যেন-কি একটার অভাব ছিল, তাই তাহারা সাহিত্য-সমাজে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে নাই। 'বঙ্গদর্শন'ই প্রথমে ভবিষ্যতের মাসিকপত্রের রচনারীতি ও সঙ্কলনরীতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল; তদবধি সেই রীতি মাসিকপত্রের সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে মাসিকপত্র দাঁড়াইয়া ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তের প্রেরণা পাইয়াই মাসিকপত্র বঙ্গসাহিত্যে চলিতে লাগিল।

নবেলের মত এই মাসিক সাহিত্যও বিদেশ হইতে এদেশে আমদানি। এক দেশের গাছের বীজ আনিয়া অন্য দেশে উহার চাষের চেষ্টা বহু দিন হইতে প্রচলিত আছে। আজ ক্ষুব্ধ ভারতবর্ষ বিদেশের দ্রব্য গ্রহণ করিব না বলিয়া আস্ফালন করিতেছে, কিন্তু বিদেশী জিনিষকে স্বদেশে স্থান দিতে ভারতবর্ষের কোন কালে আপত্তি ছিল না। আলুর বীজ ও পেঁপের বীজ বিদেশ হইতেই এদেশে আসিয়াছিল; এবং আফিমের জন্য ও তামাকের জন্য ভারতবাসী বিদেশের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ আছেন। অজ্ঞাতকুলশীল অতিথিকে আপন ঘরে স্থান দিতে ভারতবাসী কস্মিন্ কালে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। বিদেশের সামগ্রী গ্রহণ করিতে আমাদের কোন কালেই ঔদার্য্যের অভাব ছিল না। বিদেশের সকল বীজ এদেশের ক্ষেতে ধরে না, কিন্তু কোন-কোনটা বেশ ধরিয়া যায়। কোন কোন বীজ ফলাইবার জন্য চাষের প্রণালীকে ক্ষেতের অনুযায়ী করিয়া লইতে হয়। নবেলের বীজ ও মাসিক পত্রিকার বীজ বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বেই আসিয়াছিল;—যাঁহারা উহার আমদানি করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহা ফলাইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যে দিন চাষের ভার গ্রহণ করিলেন, সেই দিন উহা জমিতে লাগিয়া গেল; এখন উহার শস্য-সম্পত্তিতে সুজলা সুফলা বঙ্গধরিত্রী ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আফিম এবং তামাক, এই দুই উপাদেয় ফসল এদেশের জমিতে যেমন লাগিয়া গিয়াছে, নবেলের এবং মাসিক পত্রিকার শস্যসম্পৎ কিছুতেই তাহার নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিবে না।

বাঙ্গলায় নবেল-সাহিত্যের ও মাসিক-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি তার অপেক্ষাও বড় কাজ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলা-সাহিত্যে তাঁহার কোন্ কাজ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিব, তিনি সাহিত্য উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে আপন ঘরে ফিরিতে বলিয়াছেন এবং সে বিষয়ে তিনি যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছেন, অন্য কেহই সেরূপ হন নাই। বিদেশের ভাষা অবলম্বন করিয়া আমরা যে বড় হইতে পারিব না, বিদেশের ভাষার সাহায্যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া বড় হইবার চেষ্টা যে অস্বাভাবিক ও উপহাস্য, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদিগকে বুঝাইয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বহু পূর্ব্বে মহাত্মা রামমোহন রায় দেশের লোকের সঙ্গে কথা কহিবার জন্য দেশের ভাষারই আশ্রয় লইয়াছিলেন; তিনি বাঙ্গলায় সাময়িক-পত্র প্রচার করেন, বাঙ্গলায় বেদান্ত-

শাস্ত্র প্রকাশ করেন ; দেশের লোকের মতি-গতি ফিরাইবার জন্য দেশের লোকের অবোধ্য ভাষায় দেশের লোককে সম্বোধনের অদ্ভুত প্রণালী তাঁহার স্থিরবুদ্ধি সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করে নাই। এমন কি, তিনিই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙ্গলাভাষায় প্রথম ও শেষ ব্যাকরণ লিখিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায় যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী বাঙ্গালীরা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। হিন্দুকালেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপন্ন হইয়া গেল যে, হিন্দুস্থানে হিন্দুসন্তানের আশ্রয় বা আলম্বন হিন্দুসন্তানের জ্ঞাতব্য বা রক্ষিতব্য কিছুই নাই। বর্ব্বর জাতির প্রাচীন সাহিত্যে ক্ষীরসমুদ্র ও দধিসমুদ্রের কথা ভিন্ন আর কোন কথা নাই সিদ্ধান্ত করিয়া লর্ড মেকলে এদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষা আনয়ন করিলেন। বিদেশের এই নূতন আমদানি শিক্ষাকে এদেশের লোকে সমাদরে গ্রহণ করিল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিল যে, এই বর্ব্বরের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা হইবে। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ধাক্কায় আমাদিগকে ঘর হইতে বাহিরে লইয়া পরের দ্বারে ভিক্ষার্থিবেশে স্থাপিত করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে আপন ঘরে ডাকিয়া আনেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গলা ভাষাকে সংস্কৃত করিয়া উহাকে সাহিত্য-সৃষ্টির উপযোগী করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র উহাকে পুনঃসংস্কৃত করিয়া বাঙ্গলা-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজী লিখিয়া যশস্বী হইবার অস্বাভাবিক দুরভিলাষের বন্ধন হইতে বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদিগকে মুক্তি দিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যাহার মূলে নাই, সে জিনিষ বাঙ্গলা দেশে চলে না। রামমোহন রায় বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে বাঙ্গলা-সাহিত্যের সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা চলে নাই ; তাঁহার পরবর্ত্তী শিক্ষিত বাঙ্গালী সেই গতির রোধ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার ও সংস্কৃত সাহিত্যের পুণ্য তোয়ে বাঙ্গলা ভাষাকে স্নান করাইয়া তাহার দীপ্ত কলেবর শিক্ষিত-সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু শিক্ষিত-সমাজ তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ কর্ত্তব্য বোধ করে নাই। রামমোহন রায়ের ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেব-দেহের জ্যোতির্ম্মণ্ডিত শিরোভূষণ হইতে একখানি মাণিক্য অপসারণ না করিয়াও আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, তাঁহারা যে কার্য্যে অসমর্থ হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অবলীলাক্রমে সেই কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিল।

আমার প্রিয়সুহৃৎ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয় সে দিন রাগের মাথায় তাঁহার বহু পরিশ্রমে উপার্জ্জিত ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়-দত্ত ডিপ্লোমাখানিকে চোতা কাগজ বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। উপস্থিত প্রবন্ধলেখকেরও ঐরূপ একখানি কাগজ আছে; কিন্তু যখন উহার উপর নির্ভর করিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করিতেছি এবং উহার বলেই আজি আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করিতেছি, তখন ঐ কাগজখানির প্রতি ওরূপ অপভাষা প্রয়োগ করিতে চাহি না। এ বৎসর অনেকে বিলাতী লবণ খাইব না, এই জেদ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের রক্তবিন্দুর রাসায়নিক বিশ্লেষণে এখনও ঐ দ্রব্যের অস্তিত্ব ধরা পড়িবে। এত দিন ধরিয়া বিলাতী লবণ হজম করিয়া তাহার গুণ গাহিব না, পণ ধরিয়া বসিলে নিমকহারামি হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা হইতে আমরা কোন উপকারই পাই নাই, এ কথা পুরা দমে বলিতে পারিব না। পাশ্চাত্য শিক্ষা হইতে কিছু লাভ করিয়াছি সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের সকলকেই অল্পবিস্তর মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়াছিল, ইহাও ততোধিক সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন, বঙ্কিমচন্দ্রও এই আক্রমণ হইতে নিস্তার পান নাই।

তবে বঙ্কিমের সহিত অন্যের এ বিষয়ে প্রভেদ আছে। নীর বর্জ্জন করিয়া ক্ষীর গ্রহণের ক্ষমতা একা রাজহাঁসেরই আছে। বঙ্কিমচন্দ্ররূপী রাজহংস পাশ্চাত্য-নীর হইতে যে পরিমাণ ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া স্বজাতিকে উপহার দিয়াছেন, আমাদের মত দাঁড়কাকের দ্বারা ততটার সম্ভাবনা নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মাহাত্ম্য এই যে, তিনি কেবল ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া নিরস্ত হন নাই, তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার আকর্ষণ ও মোহপাশ সবলে ছিন্ন করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া আপন ঘরে ফিরিয়াছিলেন ও মাতৃমন্দিরে আনন্দমঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদিগকে তাহার ভিতর আহ্বান করিয়াছিলেন।

'বঙ্গদর্শনে'র বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহবন্ধন সম্পূর্ণ কাটাইয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু 'প্রচারে'র পশ্চাতে যে বঙ্কিমচন্দ্র দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকে রাহুগ্রাসমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত দীপ্তিমান্ দেখি। তিনি তখন গীতার উক্তির আশ্রয় লইয়া স্বদেশবাসীকে ভয়াবহ পরধর্ম্ম হইতে স্বধর্ম্মে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আহ্বান করিতেছিলেন। ভয়াবহ অভিধান দিয়া পরধর্ম্মকে নিন্দা করা আমার অভিপ্রেত নহে; ধর্ম্মের একটা সার্ব্বভৌমিক এবং সনাতন অংশ আছে, তাহা সকল ধর্ম্মেই সমান; সে অংশটুকুতে

কাহারও ভীত হইবার কোন কারণ নাই ; কিন্তু ধর্ম্মের আর একটা অংশ আছে, তাহা দেশভেদে ও কালভেদে মূর্ত্ত্যন্তর গ্রহণ করে। ধর্ম্ম যখন লোকস্থিতির সহায়, এবং লোকস্থিতির নিয়ম যখন বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে বিভিন্ন, তখন ধর্ম্মের এই অংশ দেশ-কালের অপেক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে না। কোন দেশেই মানব-সমাজের অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না। একটা মানব-সমাজ পার্শ্ববর্ত্তী মানব-সমাজের সংস্পর্শে বা সংঘর্ষে আসিয়া তাহার সমাজব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হয়। কাজেই ধর্ম্মের এই অংশ দেশকালানুরূপ না হইলে উহা তদ্দেশে ও তৎকালে লোকস্থিতির অনুকূল হয় না। তত্তৎদেশে ধর্ম্মের এই অংশের সহিত তত্তৎদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রাচীনের সহিত সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন করিলে কোন সামাজিক ব্যবস্থাই কোন দেশে লোকস্থিতির অনুকূল হয় না। যখন বিভিন্ন সমাজের ইতিহাস বিভিন্ন পথে চলিয়াছে, তখন লোকস্থিতির অনুরোধে ধর্ম্মকেও আত্মসমাজের অনুকূল মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে হয়। এইখানেই আত্মধর্ম্ম ও পরধর্ম্মে ভেদ আসিয়া পড়ে। যে ধর্ম্ম এক সমাজে লোকস্থিতির অনুকূল, সে ধর্ম্ম অন্য সমাজে অনুকূল না হইতে পারে। এইখানে এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে যে, ধর্ম্ম শব্দের লক্ষ্য কেবল রিলিজন নহে। আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম্ম শব্দের সংজ্ঞা আরও ব্যাপক ; মানুষের অনুষ্ঠেয় প্রত্যেক কর্ম্ম,— দাঁতন-কাঠির ব্যবহার হইতে ঈশ্বরোপাসনা পর্য্যন্ত সমস্তই ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। এই হিসাবে যাহা বিদেশীর ধর্ম্ম, তাহা ভারতবাসীর ধর্ম্ম হইতেই পারে না। ইয়ুরোপের প্রাচীন ইতিহাস ও ইয়ুরোপের আধুনিক সমাজতন্ত্র যখন ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও ভারতবর্ষের আধুনিক সমাজতন্ত্রের সহিত এক নহে, তখন ইয়ুরোপীয়দের ধর্ম্ম আমাদের পক্ষে পরধর্ম্ম। উঁহাদের খ্রীষ্টানির কথা বলিতেছি না, উঁহাদের আইন-কানুন, আহার-বিহার, চাল-চলন, আদব-কায়দা, সমস্তই আমাদের নিকট পরধর্ম্ম ; আমাদের ধর্ম্মও তেমনি উঁহাদের নিকট পরধর্ম্ম ; এবং বিনা বিচারে ও বিনা কারণে একের পক্ষে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ প্রকৃতপক্ষেই ভয়াবহ। সৌভাগ্যক্রমে এই পরধর্ম্মবাৎসল্যের মোহ শীঘ্রই কাটিয়া গিয়াছিল, এবং বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার স্বজাতিকে আপন ঘরে ফিরিবার জন্য ডাক দিলেন, তখন আমরা আগ্রহের সহিত সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। আজি আমরা যে আপন ঘরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, বিশ বৎসর পূর্ব্বেই সেই প্রত্যাবর্ত্তনের ডাক পড়িয়াছিল ;

এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পথভ্রষ্ট স্বদেশবাসী সেই ডাকে সাড়া দিতে ঔদাসীন্য দেখায় নাই। আজ সেই ডাক আরও উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়াছে, এবং তপস্বী বঙ্কিমচন্দ্র মর্ত্ত্যলোকের তপস্যার সমাধান করিয়া অদৃশ্য তপোলোক হইতে আমাদিগকে সেই পরিচিত স্বরে আবার ডাকিতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রকে কেহ কেহ apostle of culture বলিয়া থাকেন। ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক অংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সমুদয় বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য বিধানকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা ধর্ম্মের এই সংজ্ঞা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির অবিরত সামঞ্জস্য-সাধন-চেষ্টার নাম জীবন, এবং যখন সমুদয় বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য-বিধান না ঘটিলে বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তখন ধর্ম্মই জীবন রক্ষার এক মাত্র উপায় —"ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ"। ধর্ম্মই মানব-জীবনকে রক্ষা করে, কেবল ব্যক্তির জীবন বা বংশের জীবন কেন, সমাজের জীবনও ধর্ম্মই রক্ষা করে; এবং যদি কেহ ঐহিক জীবনের উপর পারত্রিক জীবনের রক্ষাকেও ধর্ম্মের উদ্দেশ্য বলিতে চাহেন, তাঁহারও সহিত আমি আজ বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহি। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রযুক্ত ধর্ম্মের এই বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে উহা culture অপেক্ষা ব্যাপক হইয়া উঠে। এই ধর্ম্মের অন্বেষণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র আপন ঘরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গীতাশাস্ত্রের আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই ব্যাপক অর্থে ধর্ম্ম শব্দ প্রয়োগ করিলে সার্ব্বভৌমিক ও প্রাদেশিক, উভয় ধর্ম্ম উহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে; এবং বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, সেই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের বা প্রাদেশিক যুগধর্ম্মের অন্বেষণের জন্যও আমাদিগকে পরের দ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে না। আজ গীতার সুলভ সংস্করণ লোকের পকেটে-পকেটে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে গীতার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন ইংরেজী-শিক্ষিত লোকের মধ্যে উহা বিরলপ্রচার ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যাহার মূলে, বাঙ্গলা দেশে সে জিনিষ অচল থাকে না, তাহা প্রচলিত হয়; তাই বঙ্কিমচন্দ্র যে দিন 'নবজীবন' ও 'প্রচার' আশ্রয় করিয়া বঙ্গবাসীকে তাহার আপন শাস্ত্রের সহিত পরিচিত করিলেন, সেই দিন হইতে সেই শাস্ত্রকথা বাঙ্গলা দেশের শিক্ষিত-সমাজে চলিতে লাগিল। তদবধি উহা আর থামে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সম্মুখে স্বদেশের শাস্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলে ভুল হইবে। তাঁহার অনেক পূর্ব্বে বঙ্গজননীর আর এক সন্তান বিশ্বজগতে পুরাণকবির চতুর্ম্মুখনিঃসৃত এবং ভারতের প্রাচীন ঋষিগণের শ্রুতিপ্রবিষ্ট বাণীর মধ্যে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সন্ধান পাইয়া পুলকিত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার পরে বঙ্গজননীর আর এক জন সন্তান ঈশোপনিষদ্ গ্রন্থের পরিত্যক্ত পাতার মধ্যে সেই ধর্ম্মের সন্ধান পাইয়া আপনাকে ধন্য মানিয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রুতিবাক্যের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহারা ভারতবর্ষকে স্বকীয় সামর্থ্যের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে আহ্বান করিয়া ভারতবাসীর যে জ্ঞানান্ধতা অপনোদন করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের স্বদেশে জন্মিয়া ধন্য হইয়াছি। এ কথা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই যে, ঐ দুই মহাপুরুষের অনুবর্ত্তীরা ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধানের জন্য বিদেশে যাত্রা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন এবং অন্য দেশের অন্য জাতির শাস্ত্র হইতে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সার সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপিপাসুর পিপাসা যদি তাঁহাদিগকে পানীয় অন্বেষণে পৃথিবী-ভ্রমণে বাধ্য করে, তাহাতে দুঃখিত হইবার কোনই কারণ নাই। এই বিদেশ-যাত্রীদিগের পরিশ্রমের জন্য আমরা তত দুঃখিত নহি, কিন্তু বিদেশের আকর্ষণে তাঁহারা স্বদেশী সামগ্রীর প্রতি যদি উপেক্ষা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহার জন্য ক্ষোভ করিবার হেতু আছে। যাহাই হউক, ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে বিদেশ পর্য্যটন অনাবশ্যক হইলেও আমরা ঐ অনাবশ্যক পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; এমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে আপন ঘরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ডাক দিলেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী সেই আহ্বান শুনিল ও মাতৃমন্দিরে, আনন্দমঠে ফিরিয়া আসিতে সঙ্কোচ বোধ করিল না।

গীতাশাস্ত্র ধর্ম্মের কেবল সার্ব্বভৌমিক সনাতন অংশের উপদেশ দিয়া নিরস্ত হন নাই, প্রাদেশিক ধর্ম্ম ও যুগধর্ম্মের তত্ত্বও ঐ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। কয়েক সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবাসী গীতাশাস্ত্রে যে সহস্রশীর্ষা পুরুষের মুখ-নিঃসৃত অভয়বাণী শুনিয়া আসিতেছে, তাঁহার সহস্র অক্ষি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতম অংশে নিবদ্ধ আছে। অতএব ঐ শাস্ত্রের উক্তির মধ্যে প্রাদেশিক ধর্ম্মের ও যুগধর্ম্মের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইবে না।

যুগধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যিনি যুগে যুগে সম্ভূত হন, তিনি ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের মহাহবের যুগে কোন্ মূর্ত্তিতে সম্ভূত হইয়াছিলেন, মহাভারতের মহাসাগর মন্থন করিয়া ভারতবাসীর নিকট লুপ্তপ্রায় সেই মূর্ত্তির উদ্ধারের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যত্নপর হইয়াছিলেন। লুপ্তপ্রায় বলিলাম, তাহার একটু তাৎপর্য্য আছে। ভারতবর্ষের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ভগবানের যে মূর্ত্তিকে পূজার জন্য আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কুরুক্ষেত্রে সংশপ্তক সেনার সম্মুখীন পার্থসারথির মূর্ত্তি নহে, তাহা বৃন্দাবনবিহারী গোপীজনবল্লভ বংশীবদনের মূর্ত্তি; তাহা নবনীতচোর উদূখলবদ্ধ বালগোপালের মূর্ত্তি; তাহা বৎসকুলের সহিত কেলিপর যমুনাপুলিনবিহারী গোপসখার মূর্ত্তি;—যে মূর্ত্তিতে ভগবান্ শ্রী-করধৃত মোহন মুরলীর প্রত্যেক রন্ধ্র শ্রীমুখমারুতে পূর্ণ করিয়া তদুদ্গত স্বরস্রোতে বিশ্বপ্রকৃতির মর্ম্মস্থলে আনন্দের ধারা সঞ্চার করেন, উহা সেই মূর্ত্তি। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত মূর্ত্তি ভারতবর্ষের উপাসক-সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ তৃপ্তি জন্মাইতে পারে নাই; ভারতবাসী ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা মাধুর্য্যের উপাসনায় পক্ষপাতিতা দেখাইবে, ইহাতেও বিস্মিত হইব না। বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতসাগর মন্থন করিয়া যে মূর্ত্তিকে স্বদেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মূর্ত্তি; তাহা ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপকের মূর্ত্তি—ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তিনি সম্ভূত হন, উহা সেই মূর্ত্তি; রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়া যিনি রাষ্ট্র রক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্ত্তি; জীবন-সংগ্রামে জীবন ধ্বংস করিয়া যিনি জীবন রক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্ত্তি; লোকস্থিতির অনুরোধে যিনি নির্ব্বিকার ও নিষ্করুণ হইয়া বসুন্ধরাকে শোণিতক্লিন্ন দেখিয়া থাকেন, উহা তাঁহারই মূর্ত্তি। যিনি বিশ্বজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত করুণাপ্রবাহের এক মাত্র উৎস, তিনি যে কি কারণে ও কি উদ্দেশ্যে এই নিষ্করুণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জীবরক্তে বসুধা সিক্ত দেখিতে বাধ্য হন, তাহা তিনিই জানেন; মনুষ্যের শাস্ত্র এখানে মূক; অথবা এই মূর্ত্তিগ্রহণ সেই সনাতনী মায়ার সহিত অভিন্ন,—যাহা হইতে এই বিশ্বজগতের জন্মাদি, যাহা হইতে জীবের জীবন, যাহা হইতে জীবনে বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির নিরন্তর সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা ঘটিতেছে, যাহা হইতে মানবের সকল দুঃখের নিদান সেই খ্রীষ্টান-কথিত পাপপ্রবণতার উৎপত্তি হইয়াছে; অথবা কবির ভাষায় বলিতে পারি,—ইহা সেই আধ-সত্য, জ্ঞানী যখন তাঁহার আত্মার মধ্যে জগৎকারণের

সন্ধান পাইবেন, যখন তিনি আপনাকেই এই জগদ্‌ভ্রান্তির কারণ বলিয়া জানিতে পারিবেন, যখন তাঁহার অপূর্ণ জগৎস্বপ্ন উদ্বোধনে বিলীন হইবে, তখন সেই মহাস্বপ্নভাঙ্গা দিনে যে আধ-সত্য—

সত্যের সমুদ্রমাঝে হ'য়ে যাবে লীন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' আর বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রে' আমরা এই যুগধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট চেষ্টা দেখিতে পাই। তাঁহার জীবনের শেষ ভাগের প্রত্যেক কার্য্যই বোধ করি এই উদ্দেশ্যের অভিমুখ। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে আমাদিগের নিকট যুগধর্ম্মের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং যুগধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য যিনি যুগে যুগে সম্ভূত হন, তাঁহার মহৈশ্বর্য্যমণ্ডিত মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বঙ্গজননীর প্রত্যেক সন্তানের হৃদয়ভূমি মাতৃভক্তির জাহ্নবী-জলে মার্জ্জিত করিয়া তাহাকে তাঁহার সিংহাসন স্থাপনের উপযোগী করিতে হইবে। তিনি যে পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইবেন, তাহা পুণ্য তোয়ে অভিষিক্ত করা আবশ্যক।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

আমরা যাঁহার বরণীয় স্মৃতির উপাসনার জন্য আজ এই সভাস্থলে* উপস্থিত হইয়াছি, ব্রাহ্মসমাজের সহিত ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করা একান্ত কঠিন। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক সাহিত্য-পরিষদের সঙ্কীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আমাদিগকে সেই কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তবে পারিভাষিক হিন্দুধর্ম্ম বা পারিভাষিক ব্রাহ্মধর্ম্ম অপেক্ষা যে সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি প্রশস্ততর, সেই ভিত্তির আশ্রয়ের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্যসমুজ্জ্বল মূর্ত্তির প্রতি অকুতোভয়ে দৃষ্টিপাত করিতে পারি। আরও আহ্লাদের বিষয় এই যে, সেই সনাতন ধর্ম্মের প্রকোষ্ঠ হইতে সাহিত্যকে নির্ব্বাসিত করিয়া,—সাহিত্যকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। অন্য দেশে ধর্ম্মের পারিভাষিক সংজ্ঞা যাহাই হউক, আমাদের এই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের সংজ্ঞা আয়ত ও প্রশস্ত। যাহা ধরিয়া আছে, তাহাই ধর্ম্ম ; যাহা মানবের ব্যক্তিগত জীবনকে ধরিয়া আছে, যাহা মানবের সামাজিক জীবনকে ধরিয়া আছে ও আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া আছে, আমাদের শাস্ত্রের নির্দ্দেশক্রমে তাহারই নাম ধর্ম্ম। সাহিত্য তাহার অঙ্গীভূত। ধর্ম্মরূপ সনাতন অশ্বত্থের মূল রহিয়াছে ঊর্দ্ধে দেবলোকে ; ইহার শাখাপ্রশাখা অবাঙ্মুখে প্রসারিত হইয়া মানব-সমাজে কর্ম্মরূপ ফুল-ফলে ও পত্রপল্লবে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। মানব-জীবনের যাহাতে স্ফূর্ত্তি, ধর্ম্মের তথায় অধিকার ; সাহিত্যে মানব-জীবনের স্ফূর্ত্তি, অতএব সাহিত্য ধর্ম্মের অধিকারবহির্ভূত নহে। লোকস্থিতি ধর্ম্মের অভিপ্রায়—সাহিত্য লোক-স্থিতির সহায়—অতএব সাহিত্যকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। মানুষের সহিত মানুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, অতীতের সহিত ভবিষ্যতের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, মানুষকে মানুষের সহিত করিয়া, ভবিষ্যৎকে অতীতের সহিত করিয়া লোকস্থিতির আনুকূল্য করাই

* মহর্ষির মৃত্যুর পর সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক জেনারল এসেম্ব্লি কলেজে যে শোকসভার অধিবেশন হয়।

সাহিত্যের এক মাত্র ব্যবসায়। অতএব সাহিত্যকে ধর্ম্মের সহিত বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়োজন নাই। যে চতুষ্টয়ী বাণী বিশ্ববিধাতার চতুর্ম্মুখ হইতে সমীরিত হইয়া আমাদের পূর্ব্বপিতামহ মহর্ষিগণের দৃষ্টিপথে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল ও তাঁহাদের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাই ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভারতসমাজে আদর্শ সাহিত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে; আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের ব্যবহার সম্পাদনার্থ যে কিছু লৌকিক সাহিত্য বর্ত্তমান আছে বা ভবিষ্যতে আবির্ভূত হইবে, তাহা সেই অপৌরুষেয় বাণীর স্মৃতি ও অনুস্মৃতি ও প্রতিধ্বনি বলিয়া আমরা ভারতবাসী যুগ ব্যাপিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছি; পুরাতনী বাগ্বাদিনীর বীণার তন্ত্রীতে তাহাই বিবিধ মূর্চ্ছনায় যুগ ব্যাপিয়া ঝঙ্কৃত হইয়া আসিতেছে; তাঁহার করধৃত-পুস্তক-মধ্যে তাহাই মসীলেখে অঙ্কিত ও নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রলয়কালে মহাবরাহের দ্রংষ্ট্রার উপর যখন বসুন্ধরা অবস্থান করেন, ধর্ম্ম তখন মূর্ত্তিমান্ হইয়া সেই সনাতন সাহিত্যকে উদ্ধার করিয়া রক্ষা করেন। এই পুরাতন সমাজতরণী যখন স্বদেশের অজ্ঞানে ও বিদেশের অনাচারে বিপ্লুত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকস্থিতির আনুকূল্যের জন্য সেই প্রাচীন সাহিত্যের আশ্রয় লইয়াছিলেন; সেই পুরাতনী বাণীর বৈদেশিক বিকৃত প্রতিধ্বনিতে কর্ণপাত করা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

যাহার নাম ধর্ম্ম, তাহাই স্বভাব এবং স্বভাবের নামান্তর স্বাস্থ্য। স্বভাবের অতিক্রমের নাম ব্যাধি, এবং আমার বিবেচনায় আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বিদেশের প্রবল আক্রমণে আমাদিগকে যে অস্বাভাবিকতায় উপনীত করিয়াছে, তাহাই আমাদের এক মাত্র ব্যাধি। এই অস্বাভাবিকতারূপ মহাব্যাধি আমাদিগের পক্ষে নানা উৎকট লক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা বৈদেশিকের পরিচ্ছদে অঙ্গ আবরণ করিতে লজ্জা বোধ করি না, আমরা স্বদেশীকে বিদেশীর ভাষায় বিকৃত উচ্চারণে আহ্বান করিতে লজ্জিত হই না। এই সকল অস্বাভাবিক আচরণ আমাদিগকে সর্ব্বত্র অশোভন ও অসমঞ্জস করিয়া তুলিয়াছে। মহর্ষি নিজ জীবনে এই অস্বাভাবিকতাকে কখনই প্রশ্রয় দেন নাই। যাঁহারা তাঁহার জীবনের আখ্যান জানেন, তাঁহারাই বলিবেন, এই অস্বাভাবিকতার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কি উৎকট ত্যাগ-স্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। সে দিন 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় পড়িতেছিলাম, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম্মপ্রচারকালে ইংরেজী

বাগ্মিতার প্রশ্রয়দাতা ছিলেন না। এই একটি আচরণেই আমরা তাঁহাকে আমাদের অস্বাভাবিক অবস্থার বিরোধিরূপে দেখিতে পাই ; অন্য উদাহরণের সম্প্রতি প্রয়োজন নাই।

সাক্ষাৎসম্বন্ধে মহর্ষিকে বঙ্গসাহিত্যের সেবকরূপে প্রতিপন্ন করিতে গেলে তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি সমাজমধ্যে যে ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, যে আন্দোলনে আমাদের শিক্ষিতসমাজ এক কালে ক্ষুব্ধ ও তরঙ্গিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে স্থায়িভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। সেই বর্ষাকালের ঝটিকা-দুর্য্যোগ এখন প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে ; কিন্তু তখন যে সকল ভাবের উৎস খুলিয়া গিয়াছিল, তাহার ধারাপ্রবাহে যে কলনাদিনী স্রোতস্বতীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বঙ্গের সাহিত্যভূমিকে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিয়াছে।

যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্যক্‌ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, স্বাতন্ত্র্যের সহকারে সংযমই ভারত-সমাজের প্রধান লক্ষণ। আমরা যাঁহার তিরোভাবে শোকপ্রকাশের জন্য অদ্য এই সভাস্থলে সমবেত হইয়াছি, তিনি সেই ভারত-সমাজের নেতা মহর্ষিগণেরই সন্তান ছিলেন ও স্বাতন্ত্র্যের সহিত সংযমই তাঁহার মহনীয় চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। ভগীরথের ন্যায় শঙ্খধ্বনিপূর্ব্বক তিনি যে অভিনব সাহিত্যের ভাগীরথী বঙ্গভূমিতে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, স্বাতন্ত্র্যের সহিত সংযমকেই তাহার প্রধান লক্ষণস্বরূপে দেখিতে পাই। তাঁহার অসামান্য ক্ষমতাশালী পুত্রগণ বঙ্গসাহিত্যে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, পুত্রগণের সেই কৃতিত্ব পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার কোন উপায় নাই। মাননীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণে' যে উদ্দাম স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাই, সার সত্যের আলোচনায় তাহা সংযমদ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে ; রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' ও 'মানসী'র স্বাতন্ত্র্য 'স্বদেশী সমাজ'-এর কল্যাণপ্রদ সংযমে পরিণত হইয়াছে। তিনি একাধারে যে স্বাতন্ত্র্য ও সংযমের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, প্রার্থনা করি, সেই মহাদর্শ বঙ্গীয় সমাজকে ও বঙ্গীয় সাহিত্যকে কর্ত্তব্যপথ প্রদর্শন করুক। তিনি যে মনস্বী পুত্রগণে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্মরণচিহ্ন আমাদিগকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা চিরজীবী হইয়া বঙ্গভারতীর ক্রোড়দেশ অলঙ্কৃত করুন।

হর্ম্মান হেলম্‌হোলৎজ

চারি মাস মাত্র হইল,* হেলম্‌হোলৎজের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয় জন জানে যে, পৃথিবী হইতে একটা দিক্‌পাল অন্তর্হিত হইয়াছে। হেলম্‌হোলৎজের জন্য শোক করিবার অবস্থা আমাদের এখনও হয় নাই। কখনও হইবে কি?

জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মদ্বিধাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ; কিন্তু হেলম্‌হোলৎজের মত লোক ধরাধামে কয়টা জন্মিয়াছে? হেলম্‌হোলৎজ মরিয়াছেন সত্য, কিন্তু মনুষ্য যতটুকু অমরতার দাওয়া করিতে পারে, তাহা তাঁহার প্রাপ্য।

ছোটখাট পাহাড়-পর্ব্বত যথেষ্ট সংখ্যায় বর্ত্তমান থাকিয়া ধরাতলের বন্ধুরতা সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু গৌরবে ও মহিমায় ধবলগিরি অধিক স্থানে স্পর্দ্ধিত হয় না। হেলম্‌হোলৎজ নরসমাজে এইরূপ একটা ধবলগিরি ছিলেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে যদি অবতারের আবশ্যকতা স্বীকার করা যায়, এবং জ্ঞানের বিস্তার যদি ধর্ম্মসংস্থাপনের একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে হেলম্‌হোলৎজ নরসমাজে 'অবতীর্ণ' হইয়াছিলেন।

হেলম্‌হোলৎজ জ্ঞানের পরিধি কত দূর প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যথাযথ বিবৃত করিতে পারি, এমন স্পর্দ্ধা করি না। সৌভাগ্যক্রমে লণ্ডন রয়াল সোসাইটির গত অধিবেশনে স্বয়ং লর্ড কেল্‌বিন এ বিষয়ে আপনার অক্ষমতা স্বীকার করিয়া, সম্প্রতি ভূপৃষ্ঠে বর্ত্তমান অন্যান্য প্রাণীকে তজ্জন্য লজ্জার দায়ে অব্যাহতি দিয়াছেন। মহাজনের নামকীর্ত্তনে যদি কিছু পুণ্য থাকে, কিঞ্চিন্মাত্রায় সেই সুলভ পুণ্যসঞ্চয়ের প্রয়াসে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

জর্ম্মনির পত্‌সদাম নগরে ১৮২১ সালে হেলম্‌হোলৎজের জন্ম হয়। ১৮৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ভবিষ্যতে যিনি মানবের বিজ্ঞানেতিহাস লিপিবদ্ধ করিবেন, এই তেয়াত্তর বৎসর বিস্মৃত হইলে তাঁহার চলিবে না।

* ১৮৯৪ অব্দে পঠিত।

আমাদের দেশের বালকগণের প্রবল বমনোদ্রেক সত্ত্বেও, ইংরাজী ব্যাকরণ, ইংরাজী ভূগোল, ইংরাজী ইতিহাস কিছু মাত্র দন্তস্ফুট করিবার সম্ভাবনা ব্যতিরেকেও, গলাধঃকরণ করিবার সনাতন নিয়ম প্রচলিত আছে। আমনু-প্রচলিত নিয়মচক্রের নেমি ভারতবর্ষেও ক্ষুণ্ণ পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে ; এমন কি, জগৎচক্রের নিয়ম-গ্রন্থিও দুই একটা শিথিল হইবার সম্ভব ; কিন্তু আমাদের পাঠশালামধ্যে এই প্রাচীন নিয়মগুলির রেখা মাত্র ব্যভিচারের কোনও সম্ভাবনা নাই। তবে একটা ভরসা, আমাদের ভারতবর্ষে ইংরাজী সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রচলিত, ইউরোপেও গ্রীক-লাতিনের অধ্যাপনা সম্বন্ধে অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান। সুতরাং আমাদের ক্ষোভের কারণ নাই ; যেহেতু, 'মহাজনো যেন গতঃ' ইত্যাদি।

যাহা হউক, সনাতন নিয়মানুসারে হেলম্‌হোলৎজকেও ক্লাসে বসিয়া গ্রীক-লাতিন গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছিল। শুনা যায়, প্রহ্লাদ 'ক' অক্ষরেই কৃষ্ণনাম স্মরণে কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং যণ্ডামার্কের প্রচণ্ড শাসনও সরস্বতীর নিকট তাঁহার মাথা নোয়াইতে সমর্থ হয় নাই। হেলম্‌হোলৎজের সম্বন্ধে সেরূপ কোনও নিন্দাবাদ প্রচলিত নাই ; তবে তিনি যে ক্লাসে বসিয়া ক্লাসিকের মাষ্টারকে ফাঁকি দিয়া জ্যামিতির আঁক কষিতেন, তাহা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। এই নীতিবিরুদ্ধ অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য কখনও তাঁহাকে মাষ্টারের বেত্রাঘাত লাভ করিতে হইয়াছিল কি না, জানি না। জানিলে, অন্ততঃ আমরা কিছু সান্ত্বনা লাভ করিতাম।

পাঠাবস্থায় পদার্থবিদ্যার প্রতি তাঁহার একটু অনুরাগ ও ঝোঁক ছিল ; এমন কি, জ্যামিতি ও বীজগণিতের অপেক্ষাও তিনি জড় ও জড়ের গুণ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে ভাল বাসিতেন। সাংসারিক অবস্থার অনুরোধে পিতার আদেশে তাঁহাকে ডাক্তারি শিখিতে হয়। "ফ্রেডরিক উইলিয়ম ইনষ্টিটিউটে" ডাক্তারি শিখিয়া সৈনিক-বিভাগে কর্ম্ম লইয়া তিনি সংসারে প্রবেশ করেন। তবে ডাক্তারি ব্যবসায়ে সেই মহার্ঘ জীবনের অপব্যয় হয় নাই। ডাক্তারি হইতে জীববিদ্যা, তাহা হইতে পদার্থবিদ্যা, তাহা হইতে গণিতবিদ্যা, তাহা হইতে মনোবিজ্ঞান ও দর্শন, এইরূপে ক্রমে মনুষ্যজাতির জ্ঞানমহার্ণবের এ-পার হইতে ও-পার পর্য্যন্ত সাঁতার দিয়া চলিয়া যাইতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। কি পরাক্রম!

ডাক্তারি ছাড়িয়া তাঁহাকে নানা স্থানে অধ্যাপকতা করিতে হইয়াছিল। প্রথমে সহকারিত্ব, পরে অধ্যাপকতা। তিনি কনিগ্‌সবর্গ, হিদেলবর্গ, বন, এই তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিদ্যা ও শরীরবিদ্যার অধ্যাপনা করিয়া, পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। ১৮৭১ সাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন।

আর সম্মানের কথা! রাজগোষ্ঠী, পণ্ডিতসমাজ ও জনসমাজ, দেশী ও বিদেশী, যাঁর যত দূর সাধ্য, তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়া, আপনাকে গৌরবান্বিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। এরূপ স্থলে সম্মান প্রদর্শনের অর্থ কৃতজ্ঞতা-স্বীকার ও ঋণশোধের চেষ্টা; কিন্তু এ ঋণ কি শোধিবার?

শরীরবিদ্যা বিষয়ে হেলম্‌হোলৎজ জোহান মূলরের ছাত্র ছিলেন। যেমন গুরু, তেমনই শিষ্য; কাহাকে দেখিবে বল? আমাদিগকে দৃষ্টি মাত্রেই তুষ্ট থাকিতে হইবে। আমাদের স্বদেশে গুরুও নাই, শিষ্যও নাই; এখানে কাহাকে দেখিব? হায় আমাদের অদৃষ্ট! চিরদিনই কি আমাদের এমনই ছিল! এমন দিন কি আসিবে না যে শিষ্যের মত গুরু ও গুরুর মত শিষ্য এই ভারতবর্ষেও আবার দেখা যাইবে?

গুরুর প্রবর্ত্তনায় হেলম্‌হোলৎজ অজ্ঞানের তামস রাজ্যে দিগ্বিজয়ার্থ প্রবেশে সাহসী হয়েন। সে পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বের কথা; তার পর সেই তামস রাজ্যের কতটা তাঁহারই অধ্যবসায়ে আলোকিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা কিরূপে জানাইব?

সেই সময়ে হেলম্‌হোলৎজ টাইফস জ্বরে আক্রান্ত হয়েন। জ্বর হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ যাহা সঞ্চয় ছিল, তাহার দ্বারা তিনি একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র ক্রয় করেন। আজকাল শিক্ষার্থীর ঘরে ঘরে অণুবীক্ষণ রহিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর আগে জর্ম্মনিতেও তাহা ছিল না। অণুবীক্ষণ অনেকের ঘরে দেখা যায় বটে, কিন্তু হেলম্‌হোলৎজ তাহার মধ্যে কয় জন?

যাহা হউক, সেই অণুবীক্ষণ ক্রয়ের পর তাঁহার হাতে যে দুই একটা প্রকাণ্ড কাজ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

বাক্‌টিরিয়ার নাম আজ লোকের মুখে মুখে;—বিশেষ, সম্প্রতি কলিকাতা শহরে ওলাউঠা ও বসন্তের এই প্রকোপকালে। সম্প্রতি কলিকাতার অর্দ্ধেক লোক বসন্তের টীকা লইল; বাকী অর্দ্ধেক হয়ত দুই দিন পরে ওলাউঠার

টীকা লইবে। যেরূপ হাওয়ার গতি দেখিতেছি, তাহাতে কিছু দিন পরে কুক্কুরদংশনেও টীকা লইতে হইবে, ইহা বোধ করি বিধাতার বিধান,—ভবিতব্য। বস্তুতঃ শ্বাপদসমাকুলা অরণ্যানী আর মানুষের ভয়বিধায়িনী নহে; শয্যাতলে লুক্কায়িতা কালভুজঙ্গিনীও আর যমদূতী নহে; এখন স্থূল দৃষ্টির অগোচর কমা-বাসিলাস অথবা দাঁড়ি-ভিব্রিও কখন কোন্ অলক্ষিতে দেহমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া অকস্মাৎ অন্তরাত্মাকে তাহার প্রিয়তম আধার হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিবে, এই আশঙ্কাতেই অন্তরাত্মা এক রকম পূর্ব্ব হইতেই ওষ্ঠপ্রান্তে অবস্থিত থাকেন। প্রকৃতই আজকাল শঙ্কাভিঃ সর্ব্বমাক্রান্তম্। জীবিতব্য কিরূপে, ভাবিবার দরকার নাই; জীবন যে এ পর্য্যন্ত রহিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য।

জীববিদ্যাঘটিত এই নূতন তত্ত্বের সহিত মহাত্মা পাস্তুরের নাম চিরকালের জন্য গ্রথিত রহিয়াছে; কিন্তু সকলে হয়ত জানেন না যে, এই নূতন মন্ত্রের হেলমহোলৎজই পুরাতন ঋষি।

জৈব পদার্থ কিরূপে পচিয়া যায়, ইহা একটা রসায়নশাস্ত্রের সমস্যা। পচিবার সময় জৈব পদার্থের অঙ্গারভাগ বায়ুস্থিত অম্লজানের সহযোগে ধীরে ধীরে পুড়িয়া যায়, ইহা অবশ্য রাসায়নিকগণের পুরাতন আবিষ্কার। কিন্তু কতকগুলি ক্ষুদ্র ও প্রায় অতীন্দ্রিয় জীবাণু যে এই অবকাশে অপ্রতিহত প্রভাবে আপনাদের শরীরপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি সাধিত করিয়া লয়, এই গুপ্ত বার্ত্তাটুকু কিছু দিন পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না। আজকাল অবশ্য টিণ্ডাল প্রভৃতির প্রসাদে এইরূপ দুই-চারিটা কথার সংবাদ রাখা বড়ই সুকর হইয়াছে; এবং যে জানে না, সে কতকটা সেকেলে যুগের জীব বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু কলে হেলমহোলৎজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার নূতন ক্রীত অণুবীক্ষণ-সাহায্যে পচনশীল দ্রব্যে এই জীবাণুর অস্তিত্বের প্রথম আবিষ্কার করেন। শুধু অস্তিত্বের আবিষ্কার নহে; এই জীবাণুর অবস্থিতিই যে পচনক্রিয়ার এক মাত্র কারণ; যেখানে জীবাণুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ, সেখানে জৈব পদার্থ সহস্র বৎসর অম্লজানের স্পর্শে রক্ষিত হইলেও পচিবে না; শর্করায় মাদকত্বের উৎপত্তি ঠিক এই পচনক্রিয়ারই অনুরূপ; ইহাতেও জীবাণু-বিশেষের অবস্থিতি আবশ্যক; এ সমুদয়ই হেলমহোলৎজ সপ্রমাণ করেন। একটা আপত্তি উঠিবার সম্ভাবনা ছিল—হয়ত সেই সেই জীবাণুর শরীর হইতে এরূপ কোনও রস বা বিষ নিঃসৃত হয়, যাহা শুদ্ধ রাসায়নিক

ক্রিয়াবলে জৈব পদার্থকে বিকৃত করে ও শর্করাকে সুরায় পরিণত করিয়া থাকে। হেলম্‌হোলৎজ শর্করা ও জীবাণুর মাঝে একখানি সূক্ষ্ম পর্দ্দা রাখিয়া দেখাইলেন যে, পর্দ্দাখানি নিঃসৃত রসের সঞ্চার রোধ করিতে পারে না, জীবাণুগণেরই সঞ্চার রোধ করে মাত্র। কিন্তু এরূপ স্থলে চিনিরও মদ্যে পরিণতি ঘটে না। সিদ্ধান্ত হইল, এই ব্যাপারটা জৈব প্রক্রিয়া; রাসায়নিক প্রক্রিয়া নহে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে মনুষ্যের চিন্তাপ্রণালী কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা সকলে না জানিতে পারেন; এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার উল্লেখও অসম্ভব। পাস্তুরের মহিমান্বিত আবিষ্ক্রিয়াপরম্পরার ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিয়া হেলম্‌হোলৎজের নাম উল্লেখ না করিলে চলিবে না।

জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হয়; নির্জীব জড় হইতে কখনও জীব জন্মিতে দেখা যায় নাই; এই তথ্যের আবিষ্কার উল্লিখিত সিদ্ধান্ত হইতেই আসিয়াছে। যাঁহারা বানর হইতে মানুষ উৎপন্ন হইয়াছে মনে আনিতেও একটা নৈতিক মহাপ্রলয়ের আশঙ্কা করিয়া স্তম্ভিত হয়েন, তাঁহাদের অনেকে অবলীলাক্রমে নির্জীব জড় পদার্থ হইতে অকস্মাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত শরীরী জীবের উদ্ভব স্বীকার করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। স্বেদ, মল, আবর্জ্জনা হইতে বিধাতার মর্জ্জিতে বড় বড় কীটের বা পতঙ্গের উৎপত্তি আপনা হইতে হয়, ইহাতে আমাদের দেশে অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরও ধ্রুব বিশ্বাস। তবে শুধু আমাদের দেশেই নহে।

শরীরবিদ্যায়, স্নায়ুযন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে হেলম্‌হোলৎজ যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা ও উদ্ভাবনশক্তি কিরূপে জটিল সমস্যার তথ্যোদ্ভেদে সমর্থ হইত, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

জীবদেহে স্নায়ুসূত্রগুলি টেলিগ্রাফের তারের সহিত তুলনীয় হইয়া থাকে। তাহারা বাহিরের খবর ভিতরে পৌঁছাইয়া দেয় ও ভিতরের আদেশ বাহিরে আনে। সংবাদবহন তাহাদের কাজ। তাড়িতশক্তি যেমন কয়েকটি সঙ্কেত আশ্রয় করিয়া এক প্রান্তের বার্ত্তা অন্য প্রান্তে উপস্থিত করে, ইহারাও সেইরূপ সঙ্কেতের আশ্রয় করিয়া বাহিরের বার্ত্তা ভিতরে প্রেরণ করে ও ভিতরের আদেশ বাহিরে আনয়ন করে। মস্তিষ্ক অর্থাৎ হেড আপিস কতকগুলি সঙ্কেত পাইয়া তাহার অর্থ আবিষ্কার করিতে ব্যাপৃত থাকে ও অর্থ আবিষ্কারের পর তদনুযায়ী কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা করে।

স্নায়ুসূত্রের কার্য্য সংবাদ প্রেরণ ; তবে এই সংবাদ প্রেরণে সময় আবশ্যক হয় কি না ? তাড়িত প্রবাহযোগে বার্ত্তা প্রেরণেও কিছু-না-কিছু সময় দরকার ; আলোকেরও সুদূরস্থ নক্ষত্র হইতে পৃথিবী পৌঁছিতে সময় দরকার হয়। স্নায়ুসূত্রের ভিতরে এই স্রোত কি বেগে প্রবাহিত হয় ? হেলম্‌হোলৎজ প্রথমে দেখান, এই স্রোতের বেগ সেকেণ্ডে ষাটি হাত মাত্র ; তাড়িত প্রবাহ বা আলোকতরঙ্গের তুলনায় নগণ্য। অর্থাৎ কি না, একটা ষাটি হাত লম্বা তিমি মাছের লেজে বল্লমের খোঁচা বিঁধিলে মস্তিষ্কে তাহার খবর পৌঁছিতে অন্ততঃ এক সেকেণ্ড সময় লাগিবে ; অথবা এক সেকেণ্ড পরে সে বুঝিবে যে, এত বড় একটা প্রাণঘাতক ব্যাপার উপস্থিত। আবার, আঘাতের পরে মস্তিষ্ক হইতে আদেশ আসিয়া তাহার লেজ সরাইয়া লইতে অন্ততঃ আর এক সেকেণ্ড সময় অতিবাহিত হইবে।

শুনা যায়, ত্রেতা যুগের কুম্ভকর্ণের মস্তিষ্ক হইতে কর্ণ দুই ক্রোশ তফাতে অবস্থিত ছিল। হে ত্রৈরাশিকজ্ঞ মানব, বল দেখি, কপিরাজ সুগ্রীব কর্তৃক উক্ত রক্ষঃপ্রবীরের কর্ণচ্ছেদন ব্যাপার সংঘটনের কত ক্ষণ পরে তিনি টের পান ?

বলিতে গেলে আধুনিক শব্দবিজ্ঞান হেলম্‌হোলৎজেরই গঠিত ; তাঁহারই "হাতে-মানুষ-করা" ছেলে। হেলম্‌হোলৎজের পূর্ব্বে শব্দবিজ্ঞান ও সঙ্গীত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গোটা-কতক মোটা কথা আবিষ্কৃত হইয়াছিল মাত্র। তিনিই সঙ্গীতবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। কিরূপে একটি বিশুদ্ধ স্বরের সহকারে তাহার ঊর্দ্ধতনগ্রামবর্ত্তী স্বরাবলী সমবেত ও জড়িত হইয়া ঐ মূল স্বরটিকে বিবিধ নাদে ধ্বনিত করে ; কখন সুরের সহিত সুরের মিল ঘটিয়া প্রীতি জন্মে, কখন মিলের অভাবে প্রীতির ব্যাঘাত হয় ; নরকণ্ঠনিঃসৃত বিবিধ স্বরকে বিশ্লিষ্ট করিয়া কি কি মৌলিক সুর বাহির করা যায়, কিরূপে যন্ত্রোদ্গত কতিপয় মৌলিক সুরকে সংশ্লিষ্ট করিয়া বিভিন্ন নরকণ্ঠাগত স্বরে উৎপাদন করিতে পারা যায় ; ইত্যাদি নানা কথা এবং এই সকল শব্দব্যাপারের সময়ে শব্দসঞ্চালক বায়ুমধ্যে ও শব্দোৎপাদক কঠিন দ্রব্যে কিরূপ আণবিক গতি সংঘটিত হয়, হেলম্‌হোলৎজের শব্দবিজ্ঞান সংক্রান্ত মহাগ্রন্থ প্রচারের পূর্ব্বে এ সমুদয়ই আঁধারে ছিল। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংগঠনপ্রণালী, এবং কিরূপে বায়ুসঞ্চারী ঊর্ম্মিগুলি শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন্ অঙ্গে কিরূপে প্রতিহত হইয়া কিরূপ কাণ্ড ঘটাইয়া দেয় ; এ সমুদয় তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার পূর্ব্বে ছিল না।

স্বরবিজ্ঞান ও সঙ্গীতবিজ্ঞানের সহকারে যে যে মনোবিজ্ঞানঘটিত গভীর সমস্যা আপনা হইতে উপস্থিত হয়, হেলম্‌হোলৎজের পূর্ব্বে কে তাহার মীমাংসায় সাহসী হইত ?

শব্দবিজ্ঞানের পর দৃষ্টিবিজ্ঞান। হেলম্‌হোলৎজের আবিষ্কৃত দৃষ্টি-বিজ্ঞানঘটিত তথ্যগুলির মাহাত্ম্যের উপলব্ধি করাই কঠিন। তাঁহার আবিষ্কৃত চক্ষুরীক্ষণ (ophthalmoscope) যন্ত্রের উল্লেখ বোধ করি অনাবশ্যক। চক্ষুর অভ্যন্তর পরীক্ষার জন্য আজকাল এই যন্ত্র ডাক্তারদের এক মাত্র অবলম্বন।

দৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক রহস্য, যাহা সর্ব্বদা আমাদের জ্ঞানের ভিতর আইসে না, তাহা হেলম্‌হোলৎজ প্রথমে দেখাইয়া দেন। রেটিনা নামক স্নায়বিক পর্দ্দার গঠন কিরূপ, চোখের পরকলার কোথায় কতটা বক্রতা, দর্শনেন্দ্রিয়ের গঠনে কি কি নানাবিধ সাধারণ ও অসাধারণ দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে, দূরদৃষ্টির ও নিকটদৃষ্টির সময়ে কিরূপে দর্শনেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন অংশ ঘুরাইতে ফেরাইতে হয়, কিরূপে বিভিন্ন পদার্থের দূরত্বের উপলব্ধি হয়, কিরূপে দ্রব্য মাত্রকে দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ, তিনগুণবিশিষ্ট বলিয়া বোধ জন্মে ; বর্ণের উজ্জ্বলতায় কিরূপে ছোট জিনিষকে বড় দেখায় ; কিরূপে তিনটি মাত্র মূল বর্ণের বোধ স্বীকার করিয়া লইলে সেই তিনটি মৌলিক অনুভূতিরই বিবিধ বিধানে সংমিশ্রণদ্বারা অসংখ্য বিচিত্র বর্ণজ্ঞানের উৎপত্তি বুঝান যাইতে পারে ; কিরূপে ইহারই মধ্যে একটি মৌলিক বোধের অভাব ঘটিলে মানুষে রঙ্‌কাণা হইয়া যায় ; দৃষ্টিগোচর দ্রব্য মাত্রেরই কোন্ অংশটা বস্তুতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর, আর কোন্ অংশটাই বা মানসগোচর মাত্র, অর্থাৎ একটা বস্তুর কতটা আমরা বাস্তবিক দেখিতে পাই, আর কতটাই বা মনে মনে কল্পনা দ্বারা গড়িয়া লই ; ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে হেলমহোলৎজ যে সকল রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহার নামোল্লেখ মাত্র দ্বারা বিবরণ দেওয়াই অসম্ভব।

অতি প্রাচীন কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। কিন্তু জ্ঞান কিরূপে বাহির হইতে এই দ্বারপথে প্রবেশ লাভ করে, তাহার সম্বন্ধে আমাদের পরিচয় এ পর্য্যন্ত নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও পরিমিত ছিল। বাহিরে জড় প্রকৃতিতে নানাবিধ আনাগোনা আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিতেছে ; ইন্দ্রিয়গণ সেই সকলের বার্ত্তা কোনও মতে মস্তিষ্কের হেড আপিসে পৌঁছাইয়া দেয়, এবং আমাদের অন্তঃকরণ সেই সঙ্কেতগুলি বাছিয়া গোছাইয়া

সাজাইয়া নানাবিধ প্রণালীতে নানাবিধ গঠন প্রস্তুত করে, কতক সুন্দর বোধে ও আবশ্যক বোধে গ্রহণ ও কতক অনাবশ্যক বোধে ত্যাগ করিয়া জীবনের স্থিতি, গতি, পুষ্টি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধানে নিরত থাকে। বাহিরে কিরূপ আনাগোনা আন্দোলন চলিতেছে, ইহা জড়বিজ্ঞান বা পদার্থবিদ্যার বিষয়; ইন্দ্রিয়গণ কিরূপে এই সকল আন্দোলনের বার্ত্তা মস্তিষ্কে হাজির করে, ইহা জীববিদ্যা ও শরীরবিদ্যার বিষয়; এবং অন্তঃকরণ সেই বার্ত্তাগুলি বা সঙ্কেতগুলিকে কিরূপে গোছাইয়া ও সাজাইয়া সেই উপাদানসকলে বিশ্বজগৎ নির্ম্মাণ করিতে বসে, তাহা মনোবিজ্ঞানের বিষয়। স্থূলতঃ এই তিন ছাড়িয়া আর কোনও বিজ্ঞান নাই। পণ্ডিতগণের মধ্যে এক এক ব্যক্তি ইহার একটি মাত্র অথবা একটিরই কোন সঙ্কীর্ণ অংশ মাত্র লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। জ্ঞান-সাম্রাজ্যের তিন মহাদেশে একই সময়ে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতে পারেন, হেলম্‌হোলৎজ এইরূপ কৃতকর্ম্মা পুরুষ ছিলেন; বোধ করি, এ বিষয়ে তিনি তাৎকালিক মনুষ্যমধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন।

শ্রুতি ও দৃষ্টি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান; সূক্ষ্মতায় অথবা প্রভাবে অন্য ইন্দ্রিয় এই উভয়ের সমকক্ষ নহে। প্রধানতঃ শ্রুতি ও দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই আমরা এই বিচিত্র সুন্দর জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছি। অন্যান্য ইন্দ্রিয় ইহাদের সাহায্য করে মাত্র। এই দুই ইন্দ্রিয়, ইহাদের গঠন, ইহাদের বিষয় ও ইহাদের ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা অপর কেহ করে নাই।

জড় জগতের সহিত আমাদের অ[illegible]সংস্রব, এমন কি সম্বন্ধ আছে যে, কতকগুলি জিনিসকে আমরা সুন্দর [illegible] ও কতকগুলিকে কুৎসিত দেখি? আমাদের এই সৌন্দর্য্যবোধের মূল কি? এই সৌন্দর্য্যবোধ কোথা হইতে আইসে? এই গভীর তত্ত্বের মীমাংসার জন্য মানব বহু দিন হইতে লালায়িত। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের মীমাংসা একা হেলম্‌হোলৎজ হইতে যত দূর অগ্রসর হইয়াছে, অন্য কোন ব্যক্তি হইতে তাহা হয় নাই। হেলম্‌হোলৎজই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক মনস্তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। জড়ের সহিত মনের কি সম্বন্ধ, এই গভীর সমস্যার মীমাংসার জন্য মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ। যে পথে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে, হেলম্‌হোলৎজই তাহা দেখাইয়াছেন।

১৮৪৭ সালে ভৌতিক শক্তির অনশ্বরতা সম্বন্ধে হেলম্‌হোলৎজের বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকটিত হয়। তাহার পর পদার্থবিদ্যা রূপান্তর পরিগ্রহ

করিয়াছে। একটা স্থ-কৌশল যন্ত্র বানাইয়া দিলে উহা বিনা শ্রমে বিনা ব্যয়ে চিরদিন ধরিয়া চলিতে পারিবে ও কাজ দিবে, সে কালের লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। এখনও যে এই বিশ্বাসের ধারা অন্তঃসলিল প্রবাহের ন্যায় বহিতেছে না, এমন নহে। জড়ের সৃষ্টি নাই, বিনাশও নাই, এই তত্ত্ব কিছু দিন পূর্ব্বে রসায়নবিজ্ঞানের জন্মদাতা লাবোয়াশিয়ে কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছিল; কিন্তু শক্তিরও যে সৃষ্টি নাই, বিনাশও নাই, এ তত্ত্ব তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না, সৎ অসতে পরিণত হয় না, এইরূপ একটা বাক্য দার্শনিকগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল বটে; কিন্তু ইহার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও প্রমাণ ছিল না; এবং এই স্বতঃসিদ্ধ হইতে কি সিদ্ধান্ত হয় বা না হয়, তাহারও কেহ ধ্রুব নির্দ্দেশে সাহস করিতেন না। শক্তির বহুরূপিতা হেলম্‌হোলৎজের কিছু দিন পূর্ব্বেই বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু শক্তির অনশ্বরতাকে একটি বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে প্রতিপাদনের কার্য্য হেলম্‌হোলৎ-জেরই প্রতিভার অপেক্ষায় ছিল।

এক হিসাবে মনুষ্য-শরীরকে যন্ত্র হিসাবে দেখা যায়। তবে সে কালে অন্য যন্ত্রের সহিত দেহযন্ত্রের কোনরূপ তুলনা সম্ভবিত না। বাষ্পযন্ত্রে কয়লা পোড়াইতে হয়। ঘটিকাযন্ত্রে মাঝে মাঝে দম দিতে হয়; কিন্তু দেহযন্ত্রে জীবনরূপ একটা কি-জানি-কি অতিপ্রাকৃত শক্তি বিনা ব্যয়ে, বিনা শ্রমে কার্য্য চালাইতেছে, এইরূপ একটা বিশ্বাস সকলেরই ছিল। হেলম্‌হোলৎজের লিখিত উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের পর হইতে কথা উঠিয়াছে যে, জীবন হয়ত একটা কবিজনোচিত কল্পনা মাত্র, একটা আভিধানিক শব্দ মাত্র, কতকগুলি ক্রিয়াসমষ্টির অভিধান মাত্র। কয়লা না পোড়াইলে যেমন বাষ্পযন্ত্র চলে না, কয়লা না পোড়াইলে সেইরূপ দেহযন্ত্রেরও চলিবার সম্ভাবনা নাই, এবং এই উভয় কয়লাই আমাদের সেই চিরপরিচিত কৃষ্ণকায় অঙ্গার।

আমাদের সৌর জগৎ আর একটা প্রকাণ্ডতর যন্ত্র। সূর্য্যমণ্ডল হইতে রাশি রাশি শক্তি বাহির হইয়া তাপরূপে ও আলোকরূপে দিগ্‌দিগন্তে আকীর্ণ হইতেছে ও তাহারই কণিকা মাত্র পাইয়া গ্রহে উপগ্রহে নানাবিধ ভৌতিক ক্রিয়া চলিতেছে। এই পৃথিবীতে যে বায়ু বহে, জল পড়ে, মেঘ ডাকে, বৃক্ষ লতা কীট পতঙ্গ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত জন্মে ও মরে, হাসে ও

কাঁদে, খেলা করে ও নাচিয়া বেড়ায়, সূর্য্যমণ্ডল হইতে সমাগত কণিকাপ্রমাণ শক্তিই এই সমুদয়ের কারণ। কিন্তু এই অপরিমেয় শক্তি আসিল কোথা হইতে? হেলম্‌হোলৎজ দেখাইয়াছিলেন যে, সূর্য্যমণ্ডলে এই শক্তির ভাণ্ডার, অন্যত্র নহে; ইহারও পরিমাণ আছে ও ক্ষয় আছে। কোথা হইতে এই ভাণ্ডার সংগৃহীত হইল, এবং এই ব্যয়েরই বা পরিমাণ কি, হেলম্‌হোলৎজ তাহারও হিসাব দিলেন। বলা বাহুল্য, সেই হিসাব সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। সৌরজগৎরূপ মহাযন্ত্র কিরূপে কত দিন হইতে চলিতেছে, তাহা গণিবার উপায় হেলম্‌হোলৎজের নিকটেই মানবজাতি শিখিয়াছে।

গণিতশাস্ত্রে হেলম্‌হোলৎজ কি করিয়াছেন, কিরূপে বুঝাইব? দীনা বঙ্গভাষা ও দীন বঙ্গসাহিত্য; অন্য দেশে যাহা সম্পাদিত হইয়াছে, এ দেশে তাহার বর্ণনারও উপায় নাই।

মহামতি লর্ড কেল্‌বিনের বিখ্যাত vortex theoryর কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। জগদ্ব্যাপী আকাশে বা ঈথরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্তের নাম জড় পরমাণু। হেলম্‌হোলৎজের প্রতিভা এই পরমাণুতত্ত্বের বীজ রোপণ করিয়াছিল। ঘর্ষণক্ষমতা-বর্জ্জিত তরল পদার্থে আবর্ত্তোৎপাদন গণিবার যে প্রণালী তিনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, বেলাভূমিতে উর্ম্মিরেখার ও বায়ুমধ্যে মেঘের উৎপত্তি হইতে আকাশমধ্যে জড় পরমাণুর উৎপত্তি পর্য্যন্ত বুঝাইতে সেই প্রণালী ব্যবহৃত হইয়াছে।

হেলম্‌হোলৎজ অনেক নূতন গড়িয়াছেন, আবার অনেক পুরাতন ভাঙ্গিয়াছেন। ইউক্লিডের সময় হইতে মানবজাতি আজ পর্য্যন্ত কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ লইয়া জ্যামিতি-বিদ্যা অথবা দেশতত্ত্ব গঠন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। আজকাল সেই স্বতঃসিদ্ধগুলির মূল ভিত্তি লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইয়াছে। কে বলিল, আমাদের দেশের (অর্থাৎ আকাশের) সীমা নাই? কে বলিল, আমাদের দেশ সর্ব্বত্রই সমাকার? দুইটা দ্রব্য দৈর্ঘ্যে তৃতীয় দ্রব্যের সমান হইলে তাহারাও পরস্পর সমান, কে বলিল, ইহা অখণ্ডনীয় স্বতঃসিদ্ধ? মনুষ্যজাতি আবহমান কাল হইতে কতকগুলি বাক্যকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। মানুষের মতে ইহারা সত্য, ইহারা স্বতঃসিদ্ধ। মানুষের সংস্কার যে, ইহাদিগকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া না ধরিলে জীবনযাত্রা যেন চলিবে না, যেন জগৎপ্রণালী উল্টাইয়া যাইবে, যেন জগদ্‌যন্ত্র বিপর্য্যস্ত হইবে। বিখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট এইরূপ অধিকাংশ

সত্যের স্বতঃসিদ্ধতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যাহা প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট প্রকৃতিগত সত্য বলিয়া মানিতেছ, তাহা প্রকৃতপক্ষে মানুষেরই সুবিধার জন্য মনুষ্যকর্ত্তৃক সৃষ্ট বা কল্পিত; মানুষেরই হাতগড়া পুত্তলী। কিন্তু জ্যামিতি-বিদ্যার মূল সত্যগুলির স্বতঃসিদ্ধতায় সন্দেহ করিতে ইমানুয়েল কান্টও সাহসী হয়েন নাই। হেলম্‌হোলৎজ জ্যামিতি-স্বীকৃত স্বতঃসিদ্ধের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেন। তিনি প্রথমে দেখান, মনুষ্যের মনের বাহিরে সত্যও কিছুই নাই, স্বতঃসিদ্ধও কিছুই নাই। বিষয়টি বড় গুরুতর, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উল্লেখ মাত্র করিয়াই নিরস্ত থাকিতে হইল।

অধ্যাপক মক্ষমূলর

ভারতবাসীর নিকট অধ্যাপক মক্ষমূলরের নাম যতটা পরিচিত ছিল, বোধ করি আর কোন বৈদেশিক পণ্ডিতের নাম ততটা পরিচিত ছিল না। তাঁহার অপেক্ষাও কৃতকর্ম্মা প্রতিভাশালী ব্যক্তি বিদেশে জন্মিয়াছেন এবং এবং এখনও হয়ত বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু ভারতবাসীর সহিত তাঁহাদের তেমন পরিচয় নাই ; শিক্ষিতগণের মধ্যে অনেকে তাঁহাদের নাম শুনিয়াছেন, অনেকে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যে ও প্রতিভায় মুগ্ধ থাকিতে পারেন, কিন্তু আমাদের দেশে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও মক্ষমূলরের নাম শুনিয়াছেন, এমন উদাহরণ বিরল নহে।

মক্ষমূলরের জীবনচরিত আমাদের সাময়িক পত্রাদিতে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে ; সেই জীবনচরিত পুনরায় কীর্ত্তনের সম্প্রতি আবশ্যকতা দেখি না।

কিন্তু মক্ষমূলরের পাণ্ডিত্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল এবং আমাদের সহিত তাঁহার এমন একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, যে সূত্রে তিনি আমাদের মধ্যে এতটা খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

মক্ষমূলর সংস্কৃত শাস্ত্রে অভিজ্ঞতার জন্যই আমাদের দেশে বিখ্যাত ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তিনি বিবিধ ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। বর্ত্তমান কালের ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া তাঁহাকে গণ্য করিলে ভুল হইবে না। সুবিখ্যাত সার্ উইলিয়ম জোন্স যে দিন সংস্কৃত সাহিত্য নামে একটা অতি প্রাচীন সাহিত্য আছে, এই তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন, সেই দিনই বর্ত্তমান কালে ভাষাবিজ্ঞানের জন্মদিন বলিয়া গণ্য করিতে হয়। তৎপূর্ব্বে ইউরোপের পণ্ডিতেরা যেমন যাবতীয় মানবকে ইহুদী জাতি-বর্ণিত আদি মানব আদমের সন্তান বলিয়া স্থির করিতেন, সেইরূপ সভ্য জাতির কথিত ভাষাসমূহকে ইহুদী জাতির ভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেন। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য পাশ্চাত্য দেশে আবিষ্কৃত হওয়ার পর সহসা প্রতিপন্ন হইয়া গেল যে, ইহুদী ভাষার সহিত বিবিধ ইউরোপীয় ভাষার কোন সম্পর্ক নাই ; এবং ইহুদী জাতির সহিত ইউরোপীয় জাতিসমূহের কোনরূপ নিকট শোণিতসম্পর্কও নাই। বরঞ্চ সংস্কৃত ভাষার সহিত ঐ সকল ভাষার অত্যন্ত সম্পর্ক রহিয়াছে ; এবং

সংস্কৃতভাষী ভারতবাসীর সহিত পাশ্চাত্য জাতিগণের শোণিতসম্পর্কও রহিয়াছে। মক্ষমূলরের পূর্ব্বেই এই সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহাকে এই নূতন ভাষাতত্ত্ব ও এই নূতন জাতিতত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পর হইতেই তিনি এই নূতন ভাষাতত্ত্ব ও নূতন জাতিতত্ত্বের তথ্যানুসন্ধানে ও সাধারণের সমক্ষে প্রচারে আগ্রহসহকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় আর্য্যভাষাসমূহের সম্বন্ধ-নিরূপণে ও আর্য্যজাতিগণের সম্বন্ধ-নির্ণয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

ভাষাগত সম্পর্কের মূলে জাতিগত সম্পর্ক বর্ত্তমান রহিয়াছে; ইংরাজের ভাষার সহিত আমাদের ভাষার সম্পর্ক আছে, সুতরাং ইংরাজের সহিত আমাদের শোণিতগত সম্পর্ক আছে, আমরা উভয়েই আর্য্যবংশধর, এই মোটা কথাটা আজকাল সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে অনেকে হয়ত আছেন, যাঁহারা ইংরাজদিগকে আর্য্য নাম প্রদান করিতে কুণ্ঠা বোধ করিবেন, এবং বিশুদ্ধ আর্য্য নামটা কেবল আমাদের নিজস্ব মনে করিয়া আনন্দ বোধ করিবেন। তাঁহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে আমার ইচ্ছা নাই, তবে আমরা যে আর্য্যবংশধর, সে কথা আমরা বহু শত বৎসর ধরিয়া সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; এবং আমরা যে সেই অতি পুরাতন সত্যটা পুনরায় জানিতে পারিয়াছি ও আমাদের আর্য্যত্বের জন্য স্থানে অস্থানে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইয়াছি, তজ্জন্য আমরা আর্য্য মক্ষমূলরের নিকট সম্পূর্ণভাবে ঋণী; ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ঋগ্বেদসংহিতার প্রচার মক্ষমূলরের জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য, এবং ঋগ্বেদসংহিতার মাহাত্ম্য তিনিই পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করেন। ঋগ্বেদ-সংহিতাকে তিনি আর্য্যজাতির প্রাচীনতম ও মানবজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন, এবং ঋগ্বেদসংহিতার কালনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি আর্য্যজাতির ভারতবর্ষপ্রবেশের কালনির্ণয়েরও চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের সাহায্যেই তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশের প্রাক্‌কালীন পুরাতন আর্য্যসমাজের অবস্থা নির্ণয়েও প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এইরূপে মানবজাতির অতীত ইতিহাসের একটা বিস্মৃত পরিচ্ছেদ তিনি নূতন করিয়া আবিষ্কারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তৎকৃত কাল-নির্ণয় এবং তদুদ্‌ঘাটিত ইতিহাস

সকলে হয়ত নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না; জ্ঞানবৃদ্ধির সহকারে এই ইতিহাস হয়ত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিবে। কিন্তু তাহা হইলেও মক্ষমূলর যে অসাধারণ পরিশ্রম, চিন্তাশীলতা ও অধ্যবসায়ের উদাহরণ দেখাইয়াছেন, তাহা বিজ্ঞানের ইতিবৃত্তে সযত্নে লিপিবদ্ধ হইবে।

আমাদের মধ্যে এক অতি বিজ্ঞ সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা বৈজ্ঞানিকগণের পুনঃ পুনঃ মত-পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিজ্ঞানকে উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, বিজ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের এইখানেই প্রভেদ। বিজ্ঞান দিন দিন আপনাকে সংশোধিত ও উন্নত করিয়া থাকে, কিন্তু অজ্ঞানের মূর্ত্তি চিরকালই একরূপ। তথায় কোনরূপ বিকারের সম্ভাবনা নাই। আলোকেরই নীল ও পীত ও হরিৎ এবং উজ্জ্বল ও তীব্র ইত্যাদি বিবিধ বিশেষণ আছে; কিন্তু অন্ধকার চিরদিনই আঁধার; তাহার অন্য বিশেষণ নাই।

অধ্যাপক মক্ষমূলর কর্ত্তৃক প্রচারিত ঐতিহাসিক তথ্যসকলে ভ্রম বাহির হইতে পারে এবং তৎকৃত বৈদিক শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় কালক্রমে ভ্রান্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু এ কথা সকলেরই জানা উচিত, যে-ব্যক্তি কাজ করে, তাহারই ভ্রান্তি ঘটে, যে-ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয়, তাহার ভ্রান্তির আবিষ্কার বিধাতারও অসাধ্য।

মক্ষমূলরের প্রতিভা কেবল ভাষাতত্ত্বেই আবদ্ধ ছিল না; ভাষাতত্ত্বের পরিধি ছাড়াইয়া অন্যান্য শাখাতেও তিনি যে সকল কথা কহিয়া গিয়াছেন, তাহা লইয়া পণ্ডিতসমাজে সময়ে সময়ে তুমুল আন্দোলন ঘটিয়া গিয়াছে। ভাষাগত সম্পর্কের মূলে জাতিগত সম্পর্ক বিদ্যমান, এই হিসাবে ভাষাবিজ্ঞান অর্থাৎ philology মানব-বিজ্ঞানের বা anthropologyর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে, পূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করা গিয়াছে। কিন্তু মানবের মধ্যে শোণিত-সম্পর্কের নির্ণয় প্রকৃতপক্ষে জীবতত্ত্বের বিষয়। তোমার সহিত আমার শোণিতগত সম্বন্ধ আছে কি না, উভয়ের কথিত ভাষা ধরিয়া বিচার করিতে গেলে অনেক সময় এ বিষয়ে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। কিন্তু উভয়ের শরীরগত সাদৃশ্য, উভয়ের গায়ের রঙ, মাথার চুল, হাতের গঠন, চোখের চাহনি প্রভৃতি ধরিয়া বিচার করিতে গেলে সিদ্ধান্ত অনেকটা নির্ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে। কিছু দিন পূর্ব্বে মক্ষমূলর-প্রমুখ ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা কেবল ভাষাগত সাদৃশ্য ধরিয়া বিবিধ মানবজাতির শোণিত-সম্পর্ক নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা

তাঁহাদের এই আবদার সহ্য করিতে পারিতেছেন না; এবং তাঁহাদিগকে স্বকীয় গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করিতে উপদেশ দিয়া শরীরতত্ত্বের সাহায্যে মানবগণের জাতি নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের সমালোচনায় ভাষাতাত্ত্বিকগণের সিদ্ধান্ত বহু স্থলে সংশোধন-সাপেক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং কালে আরও সংশোধনের প্রয়োজন হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ভাষা-বিজ্ঞানের মীমাংসা একেবারে উল্‌টাইয়া যাইবে, এরূপও বোধ হয় না।

আমাদের বৈদিক শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ও তৎসহ গ্রীক প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির প্রাচীন শাস্ত্রের তুলনা করিয়া অধ্যাপক মক্ষমূলর একটা অভিনব দেবতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বের স্থাপনায় প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, অতি প্রাচীন কালে পুরাতন আর্য্য জাতি যখন মধ্য-এশিয়ায় বাস করিতেন, তখন তাঁহাদের একটা বিশিষ্ট ধর্ম্মপ্রণালী ও উপাসনা-প্রণালী ছিল। আর্য্যগণের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন দেশে উপনিবিষ্ট হইলে সেই প্রাচীন ধর্ম্মপ্রণালীই ক্রমশঃ প্রাদেশিক বিকার ও পরিবর্ত্তন সহকারে বিবিধ আর্য্যধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়াছিল; কিন্তু অদ্যাপি হিন্দুজাতির দেবদেবীগণের সহিত প্রাচীন গ্রীক ও জর্ম্মন জাতির দেবদেবীগণের পুরাতন সম্বন্ধ নির্ণয় অসাধ্য নহে; আর্য্য জাতির প্রাচীন দেবতাগণের সম্বন্ধে বিবিধ উপাখ্যান কিরূপে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া বিবিধ জাতির পৌরাণিক উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে, তাহার নির্দ্দেশও সম্পূর্ণ অসাধ্য নহে। আর্য্য জাতির দেবতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া মক্ষমূলর বিস্তীর্ণতর ক্ষেত্রে সমগ্র মানব-জাতির ধর্ম্মতত্ত্বের ইতিবৃত্ত নির্ণয়ে প্রয়াস করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, এবং বিজ্ঞানের অন্য যে-কোন শাখার আলোচনাতেই তিনি হাত দিতেন, তিনি তাহাতে ভাষাতত্ত্বের সম্পূর্ণ সাহায্য লইতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। রঙিন চশমা চোখে দিলে যেমন জগৎসুদ্ধই রঙিন দেখায়, তিনি সেইরূপ ভাষাবিজ্ঞানের রঙিন পর্দ্দার অন্তরাল হইতে জগতের দিকে চাহিতেন। কাজেই অন্যান্য বিজ্ঞানে তাঁহার সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই; তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মতত্ত্বও পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে নির্ব্বিবাদে গৃহীত হয় নাই। ইংরাজগণের মধ্যে হার্বার্ট স্পেন্সার, এড্‌ওয়ার্ড টাইলর, এণ্ড্রু ল্যাং প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অন্যবিধ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিতদিগের বিরোধী মতের সহিত মক্ষমূলরের

মতের বিসংবাদ প্রায়ই ঘটিত। ধর্ম্মতত্ত্বের ভবিষ্যৎ কি, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু মক্ষমূলরের প্রতিভা কিরূপ সর্ব্বতোমুখিনী ছিল, তাহা দেখাইবার পক্ষে ইহা একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে।

মনুষ্যের ভাষার সহিত মনুষ্যের চিন্তাপ্রণালীর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ;—আমাদের চিন্তা ক্রিয়াটাই ভাষাসাপেক্ষ বটে কি না, তাহা লইয়া বিতণ্ডা চলিতে পারে। অন্ততঃ ভাষার সাহায্য না পাইলে মনুষ্যের চিন্তাপ্রণালী কিরূপ হইত, তাহা গভীর আলোচনার বিষয় বটে। মক্ষমূলর মনোবিজ্ঞানের এই দুরূহ সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের নিকট কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে বা করিবে, তাহা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে উপস্থিত করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না।

যাহাই হউক, ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মধ্যে এবং বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক সমাজে মক্ষমূলরের স্থান অতি উচ্চে ছিল,—কত উচ্চে ছিল, তাহার নির্দ্ধারণে সম্প্রতি প্রয়োজন নাই, এবং সম্ভবতঃ সম্প্রতি তাহার নির্দ্ধারণের সময়ও উপস্থিত হয় নাই। সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস প্রণয়নে তাঁহার কৃতিত্বও ভবিষ্যৎ সমালোচনার বিষয়।

প্রাচ্যবিদ্যায় মক্ষমূলরের পাণ্ডিত্য অতি উচ্চশ্রেণীর ছিল, সে বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে তাঁহার একটু বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহা অন্যান্য পণ্ডিতের নাই, এবং যাহার গুণে তিনি ভারতবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি পাইবার অধিকারী ছিলেন।

এই বৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষের প্রতি ও ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ। তিনি ভারতবর্ষকে ও ভারতবাসীকে মনের সহিত ভাল বাসিতেন ; বলা বাহুল্য যে, পণ্ডিত মাত্রেই—প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত মাত্রেই সেরূপ ভাল বাসেন না। ভারতবাসীর প্রতি এই আন্তরিক অনুরাগ তাঁহার নানা কার্য্যে প্রকাশ পাইত। ভারতবর্ষের সাহিত্য লইয়া, ভারতবর্ষের ইতিহাস লইয়া অনেক বড় বড় পণ্ডিত মাথা ঘামাইয়াছেন ও উৎকট পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু What India can teach us, ভারতবর্ষ ইউরোপকে কি শিক্ষা দিতে পারে, এই বিষয়ের আলোচনায় অন্য কাহারও লেখনী এত ব্যাকুল হয় নাই। অধম ভারতবাসীর জীবনচরিত লিখিয়া সময় ব্যয় করা বোধ হয়, তৎশ্রেণীস্থ আর কোন পণ্ডিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য করেন নাই। মক্ষমূলরের সহিত যে সকল আধুনিক কৃতী ভারত-

সন্তানের পরিচয় ছিল, অথবা পরিচয় না থাকিলেও যাঁহাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল, তিনি তাঁহাদের জীবনচরিত লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে ও আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা ফেলিবার কথা নহে। ভারতবর্ষের হিত-চিন্তায় তাঁহার জীবৎকালের অনেকটা অংশের ব্যয় হইয়াছে। ছোট ছোট কাজেও তাঁহার এই আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যাইত। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলকের কারাবাসকালে স্বপ্রকাশিত ঋগ্বেদসংহিতা তাঁহাকে উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া তিনি এই সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। কাজটা ছোট; কিন্তু এইরূপ ছোট কাজেই আত্মীয় চেনা যায়; বিশেষতঃ বন্ধুবর্গের আত্মীয়তার সারতা আপন্নিকষপাষাণেই ধরা পড়ে। গল্প শোনা যায় যে, মক্ষমূলর ভারতবর্ষের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াও ভারতভূমিতে পদার্পণে সাহসী হন নাই; তাঁহার আশঙ্কা ছিল, মনঃকল্পিত ভারতবর্ষের যে আদর্শ বহু দিন হইতে তাঁহার মনের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল, ভারতবর্ষ চোখের সম্মুখে আসিলে কোথায় তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। এত মিষ্ট কথা আমরা বড় শুনিতে পাই না। ভারতবর্ষের লোকেও তাঁহার অনুরাগ অনুভব না করিত, এমন নহে। বিলাতপ্রবাসী ভারতবাসীর অনেকেই মক্ষমূলরের সহিত আলাপ করিয়া আসা একটা কর্ত্তব্যমধ্যে বিবেচনা করিতেন; এই আলাপসূত্রে অনেকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। অনেক তরুণবয়স্ক ছাত্র তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শরণাপন্ন হইত। একবার শুনিয়াছিলাম, কলিকাতায় কোন ধনিসন্তান পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে অধ্যাপকবিদায় স্বরূপে মক্ষমূলরকে এক জোড়া শাল উপহার পাঠাইয়াছিলেন। এ দেশের অনেক পণ্ডিত লোকে তাঁহাদের গ্রন্থের জন্য মক্ষমূলরের প্রশংসাপত্র না পাইলে যেন তৃপ্তিবোধ করিতেন না। এ দেশের অনেকের সহিতই তাঁহার চিঠিপত্র চলিত। ফল কথা, মক্ষমূলর আমাদের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন; আমরা সেই বন্ধু হারাইয়াছি। পণ্ডিতপ্রসূ পাশ্চাত্যভূমিতে আরও কত বড় বড় পণ্ডিত জন্মিবেন। কিন্তু আর এক জন মক্ষমূলরকে আমরা কবে পাইব, কে বলিতে পারে?

শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তীক্ষ্ণ ছুরিকার সাহায্যে মনুষ্যের শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার কোথায় কি আছে, সন্ধান করিয়া দেখেন; এবং সেই অনুসন্ধানে কত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। কিন্তু সেই শবদেহের প্রতি তাঁহাদের যে বিশেষ একটা অনুরাগ জন্মে তাহা বলা

যায় না। আপনার কাজটা সারিয়া ফেলিয়াই তাঁহারা বিবিধ 'ডিস্ইনফেক্টাণ্ট' প্রয়োগে আপনার শরীরের অশুদ্ধি ও ছুরিকার অশুদ্ধি ও টেবিলের অশুদ্ধি তাড়াতাড়ি শোধনের জন্য ব্যস্ত হয়েন। দুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু জাতির প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাচীন ইতিহাস লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের অনেকের কার্য্যকে কতকটা ঐরূপ শব-ব্যবচ্ছেদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহারা এই মৃত জাতির শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া, তাহা হইতে নানা তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া যথেষ্ট আনন্দ বা কৌতুক বোধ করিয়া থাকেন; কিন্তু এই শবদেহের স্পর্শ তাঁহাদের পক্ষে কতটা প্রীতিকর হয়, তাহা বলিতে পারি না। আচার্য্য মক্ষমূলর কিন্তু ইহাকে ঠিক শবদেহ বলিয়া ভাবিতেন না। অন্ততঃ এই দেহের ধমনীগুলার মধ্যে এক কালে রক্তপ্রবাহ সঞ্চালিত হইত, এবং ইহার হৃৎপিণ্ড এক কালে প্রাণের শক্তিযোগে স্পন্দিত হইত, ইহা তিনি বুঝিতেন; এবং বাক্যের দ্বারা এবং কার্য্যের দ্বারা তাঁহার সেই মনোভাবের পরিচয় দিতেন। সুতরাং আমরা সেই স্বর্গগত আচার্য্যের নিকট চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্মাবধি যাঁহারা ইহার সহিত সংস্পৃষ্ট আছেন, তাঁহাদের স্মরণ থাকিতে পারে, সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপনের সময় উপদেশ যাচ্ঞা করিয়া মক্ষমূলরকে পত্র লেখা হইয়াছিল। মক্ষমূলর সেই পত্রের উত্তরে নবীন পরিষৎকে কয়েকটি ছোটখাট উপদেশ দিয়াছিলেন। একটা উপদেশ এইরূপ। বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেক গ্রামের ও প্রত্যেক নদ নদী, বিল খাল প্রভৃতির নাম সংগ্রহ করিয়া, সেই সেই নামের উৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা পরিষদের একটা কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য যে, কাজটা অতি ছোট; এবং আমাদের পরিষৎ এ পর্য্যন্ত এত ছোট কাজে হস্তার্পণ করিয়া আপনার মহত্ত্বকে সঙ্কুচিত করিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু পরিষদের জানা উচিত ছিল যে, ছোট বীজ হইতে বড় গাছ হয়; এবং ছোট কাজের মাহাত্ম্য যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই বড় কাজের সম্পাদনে সমর্থ হয়েন। রোম-সাম্রাজ্যের ইতিহাস-লেখক যদি কেহ না থাকিত, তাহা হইলেও বর্ত্তমান ইংলণ্ডের গ্রামগুলির ও নগরগুলির নামতত্ত্বের আলোচনা করিয়া সেই দেশে রোমের প্রভুত্বের কথা আবিষ্কৃত হইতে পারিত। সেইরূপ এই ছোট কাজে বাঙ্গলা দেশের বিস্মৃত অতীত ইতিহাসের কোন্ অংশ

উদ্ঘাটিত হইতে পারে না-পারে, তাহা আমরা কিরূপে বলিব? মক্ষমূলর স্বয়ং ছোট কাজকে অবজ্ঞা করিতেন না। কোথায় দেখিয়াছিলাম মনে হইতেছে না, মক্ষমূলর বিভিন্ন ভাষায় বিড়ালের নামের ইতিবৃত্ত অতি গম্ভীরভাবে আলোচনা করিতেছেন। প্রাচীন গ্রীসের ও প্রাচীন ইউরোপের প্রাচীনতম সাহিত্যে না কি বিড়ালের কোন উল্লেখ নাই। আমাদের সংস্কৃত প্রাচীনতম সাহিত্যেও অনেক জন্তুর নাম আছে, বিড়ালের না কি নাম নাই। বৈদূর্য্য নামক রত্ন, ইংরাজীতে যাহাকে cat's eye বলে, উহাকে বিড়াল শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন করা যাইতে পারে; কিন্তু এই বৈদূর্য্য রত্নেরও না কি অতি প্রাচীন সাহিত্যে নাম নাই। কাজেই অনুমান হইতে পারে যে, প্রাচীন আর্য্য জাতির মধ্যে এবং আর্য্য জাতির বিভিন্ন শাখা যে সকল দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, সেই সকল দেশে বিড়াল ছিল না। তার বহু দিন পরে কোন সময়ে আলুর মত ও তামাকের মত কোন্ অনার্য্য বিদেশ হইতে বিড়াল আসিয়া আর্য্যদেশমধ্যে ও আর্য্যগৃহমধ্যে ও আর্য্য-সাহিত্যমধ্যে চিরস্থায়ী স্থান লাভ করিয়াছে। সেই বিদেশী বিড়াল জাতির স্বর্গাদপি গরীয়সী আদি মাতৃভূমি কোন্ দেশ? সম্ভবতঃ উহা মিশরদেশ; মিশরদেশে অতি প্রাচীন কালে বিড়াল-দেবতা পূজা পাইতেন; এবং সম্ভবতঃ প্রাচীন মিশরদেশে, ব্যাঘ্রজাতীয় কোন আরণ্য জন্তু গ্রাম্যতাপাদিত হইয়া বিড়ালরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পরে কালক্রমে মিশর হইতে বিড়ালের আধিপত্য অন্যান্য স্থলে বিস্তৃত হয়। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জীবতত্ত্ববিদেরা ভাষাতত্ত্বের নিকট আর একটা ঋণ গ্রহণ করিবেন। মক্ষমূলরের অনুমান সঙ্গত, কি অসঙ্গত, তাহা বিচার করিবার এই স্থান নহে; আমি কেবল একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে চাহি যে, বড় লোকে ছোট কাজকে অবজ্ঞা করেন না; তাঁহাদের যত্নে ছোট বীজ হইতে বড় গাছ উৎপাদিত হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্মকালে ভারতবাসীর হিতৈষী জর্ম্মনদেশোদ্ভব আচার্য্য মক্ষমূলর নবীন পরিষৎকে ক্ষুদ্র কার্য্যে অবজ্ঞা না করিতে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা যদি সেই পরলোকগত মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ক্ষুদ্র কার্য্যের মাহাত্ম্য বুঝিয়া চলিতে পারি, তাহা হইলে সেই মহাত্মার উপদেশ ও তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশার্থ আহূত অদ্যকার এই সভা নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল

আমার যখন পঠদ্দশা, তখন প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-বৃত্তিধারী উমেশচন্দ্র বটব্যালের নাম ছাত্রসমাজে অপরিচিত ছিল না; কিন্তু তিনি তখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমাজে বোধ হয় অপরিচিত ছিলেন। 'সাহিত্য' পত্রে "বৈদিক কালে গোহত্যা" বিষয়ক যে কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হয়, বোধ হয়, তাহাই তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা রচনা। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকায় প্রাচীন ইতিহাস-ঘটিত গবেষণাপূর্ণ যে সকল প্রবন্ধ সর্ব্বদা বাহির হয়, সাধারণ পাঠকের অন্তঃকরণে তাহা কি রকম একটা ভীতির সঞ্চার করে; বোধ করি, সেই ভীতির বশবর্ত্তী হইয়াই আমি তখন সেই বৈদিক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতে সাহস পাই নাই। 'সাধনা' পত্রিকায় সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা তাঁহার লেখনী হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে আমি তাঁহার রচনায় আকৃষ্ট হই, এবং তখনই বুঝিতে পারি, বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্রে এক জন মহারথের আবির্ভাব হইয়াছে। তদবধি বাঙ্গালা সাময়িক-পত্রে তাঁহার যত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, প্রায় সকলই আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি, এবং পড়িয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। অথচ, এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশই ঐতিহাসিক গবেষণায় পরিপূর্ণ।

ইহাও স্বীকার করিতে দোষ দেখি না যে, 'সাহিত্য' পত্রের মলাটের উপর উমেশচন্দ্র বটব্যালের নাম মুদ্রিত দেখিলেই মনে একটা হর্ষ উপস্থিত হইত। আশা হইত যে, এমন একটা কিছু তাঁহার রচনামধ্যে দেখিতে পাইব, যাহা অন্যত্র দুর্লভ। কখনই সে আশা হইতে বঞ্চিত হইতে হয় নাই।

কিন্তু তখন জানিতাম না যে, এত শীঘ্র এই আনন্দের জনয়িতা বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইবেন, এবং যে আকাঙ্ক্ষার সহিত মাসের পর মাস উমেশচন্দ্রের নাম মাসিকপত্রের মলাটে অঙ্কিত দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহা এত শীঘ্র চিরদিনের জন্য নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার স্মৃতির প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমাজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভার আমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও কখন মনে করি নাই।

বটব্যাল মহাশয়ের সহিত আমার কখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে নাই; এবং তিনি সাহিত্যের যে অংশের প্রধানতঃ আলোচনা

করিতেন, তাহাও সর্ব্বতোভাবে আমার অধিকার-বহির্ভূত। এই অবস্থায় তাঁহার জীবন বা কর্ম্ম সম্বন্ধে সমালোচনায় আমি কোন ক্রমেই যোগ্য নহি। তথাপি যখন 'সাহিত্য' পত্রের সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতি এই ভার অর্পণ করিলেন, এবং তজ্জন্য আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন এই অনধিকার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে আমি দ্বিধা বোধ করি নাই। দূর হইতে তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি যে অত্যধিক অনুরাগ ও ভক্তি জন্মিয়াছিল, তাহা প্রকাশের অবসর লাভ করিয়া, সেই লোভের সংবরণ আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছিল।

উমেশচন্দ্রের জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আশা করি, যোগ্যতর ব্যক্তি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন। উমেশচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার জীবন-চরিত লিখিবার ইচ্ছা করিয়া তাহার ভূমিকা মাত্র লিখিয়া গিয়াছেন। সেই অসম্পূর্ণ ভূমিকা হইতে ও তাঁহার পুত্রগণের নিকট হইতে সংগৃহীত বিবরণ হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জীবনের স্থূল ঘটনা কয়টির উল্লেখ করিতেছি।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুলের অন্তর্গত রামনগর গ্রাম উমেশচন্দ্র বটব্যালের জন্মস্থান। ১২৫৯ সালের ভাদ্র মাসে তাঁহার জন্ম হয়। ১৩০৫ সালের ১লা শ্রাবণ তাঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তি ঘটে। ছেচল্লিশ বৎসর পূর্ণ না হইতেই এই কৃতী বঙ্গসন্তানের অকালমরণ কেশবচন্দ্র সেন ও কৃষ্ণদাস পাল ও অন্যান্য বঙ্গসন্তানের স্মৃতি জাগাইয়া দিবে।

খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামও অন্যান্য কৃতী বঙ্গসন্তানের জীবনের সহিত সম্পর্কসূত্রে সাহিত্য-সমাজে অপরিচিত নহে। এই গ্রামের অন্তর্গত অন্যতর পল্লী রাধানগর রামমোহন রায়ের জন্মভূমি। রামমোহন রায়ের ও উমেশচন্দ্র বটব্যালের পূর্ব্বপুরুষেরা স্থানীয় সমাজের উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নেতা ছিলেন ও এই সম্পর্কে রামমোহন রায়ের সময়েও উভয় দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল।

রামমোহন রায়ের সমকালবর্ত্তী রামকানাই বটব্যাল উমেশচন্দ্রের বৃদ্ধ-পিতামহ। রামকানাইয়ের পিতৃ-পিতামহ বৈষ্ণব ছিলেন; রামকানাই আপন পরিবার মধ্যে স্বকল্পিত যন্ত্র-সহকারে অভিনব পদ্ধতিতে শক্তিপূজা প্রচলন করিয়া যান। তাহা এখনও তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। উমেশচন্দ্র সেই শক্তি-উপাসনার তাৎপর্য্য-বর্ণনা করিতে প্রচুর আনন্দ অনুভব

করিতেন। উমেশচন্দ্রের পিতার নাম দুর্গাচরণ বটব্যাল, মাতার নাম প্রসন্নকুমারী দেবী।

৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারি-প্রতিষ্ঠিত রাধানগর ইংরেজী স্কুলে ১৮৬৮ অব্দে উমেশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা আসেন; ১৮৭২ অব্দে সংস্কৃত কলেজ হইতে বি. এ. উপাধি লাভ করেন; ১৮৭৪ অব্দে সংস্কৃত শাস্ত্রে এম. এ. এবং পর-বৎসর বি. এল্. উপাধি লাভ করিয়া শিক্ষকতা-বৃত্তি গ্রহণ করেন। অনন্তর ১৮৭৬ অব্দে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া মৌয়ট পদক পুরস্কার পান। পঠদ্দশার অন্য পরিচয় অনাবশ্যক।

উমেশচন্দ্র ১৮৭৭ অব্দে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে গবর্ণমেণ্টের কাজে নিযুক্ত হয়েন; কয়েক স্থানে ঐ কার্য্যের পর দশ বৎসর পরে ষ্ট্যাটুটারী সার্ভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিভিলিয়ানি লাভ করেন; শেষে বিভিন্ন জেলায় প্রশংসার সহিত ম্যাজিষ্ট্রেটি কার্য্য সম্পাদন করেন। গত বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে বগুড়ায় অবস্থানকালে তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন। চিকিৎসায় বা স্থান-পরিবর্ত্তনে কোন উপকার হইল না। ১লা শ্রাবণ তারিখে কলিকাতার বাটীতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

রাজকীয় কার্য্যে তিনি প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন; নম্রতা, রসজ্ঞতা, গর্ব্বাভাব ইত্যাদি গুণে সকলের প্রিয় ছিলেন: সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য-সাধনে সর্ব্বদা উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র বর্ত্তমান লেখক-কর্ত্তৃক যথোচিত বর্ণিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

গার্হস্থ্য-জীবনে বা রাজকীয় কর্ম্ম সম্পর্কে তিনি বৃহৎ সমাজের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন; সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তিনি বৃহত্তর সমাজের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন। এই সমাজেই তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ। আর কিছু দিন জীবিত থাকিলে তিনি এই বৃহত্তর সমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া যাইতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

বাস্তবিকই বাঙ্গালা-সাহিত্যে তাঁহার রচনা অপূর্ব্ব সামগ্রী ছিল। এই দুর্ভাগ্য দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায় সমগ্র প্রদেশটা যে সেনা-কর্ত্তৃক অধিকৃত, সেই সেনাভুক্ত বীর পুরুষগণের বীরত্বের আস্ফালন যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাঁহাদের শরীরে মেরুদণ্ডের ও অস্থিকঙ্কালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোর প্রমাণাভাব। রামায়ণের আমলে ও হোমারের আমলে বীর পুরুষেরা বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বাগ্‌যুদ্ধটাকে একেবারে অনাবশ্যক বলিয়া

জানিতেন না ; তবে বাহুযুদ্ধটা একবার আরম্ভ হইলে, তাহার ফল শত্রুর পক্ষে বড় বিষম হইত। কিন্তু বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রের বীরেরা যে বাক্যবাণ প্রয়োগ করেন, তাহার তীক্ষ্ণতা কখন অনুভবের বিষয় হয় না ; এবং তাঁহারা যে অস্ত্রের আস্ফালন করেন, তাহা কাহারও পৃষ্ঠে কখন কাটিয়া বসে না। এক শ্রেণীর লেখকের অত্যাচারে মনে হয়, কি অশুভ ক্ষণেই এ দেশে কমলাকান্তের দপ্তর ও উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের প্রকাশ হইয়াছিল। আর এক শ্রেণীর লেখক নিতান্ত পুরাতন জীর্ণ সত্যকে জীর্ণতর বেশভূষায় কথঞ্চিৎ সজ্জিত ও আবৃত করিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করেন, তাহার প্রতিও কোনরূপ অনুরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। বঙ্গভূমি স্বয়ং যে ব্রীহিশস্য বর্ষে বর্ষে উৎপাদন করেন, তাহা, শুনিতে পাই, একান্ত নাইট্রোজেন-বর্জ্জিত ; আর বঙ্গের বাগ্‌দেবতা যে-সাহিত্যের সৃষ্টি করেন, তাহা "ধূম-জ্যোতিঃ-সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ" ; বঙ্গদেশে কাঠিন্য ধর্ম্মবিশিষ্ট সামগ্রীর এত অভাব কেন, তাহা সুধীগণের আলোচ্য।

উমেশচন্দ্র বটব্যালে বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। উচ্ছ্বাসের হাঁওয়া ও বাক্যের কুয়াসা কাটাইয়া উন্মুক্ত আলোকে ও কঠিন মৃত্তিকায় দুই দণ্ড দাঁড়াইবার অবসর দিয়া তিনি আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। তাঁহার উদ্যত অস্ত্রে কেবল ঔজ্জ্বল্য ও ক্ষমতা ছিল না ; তাহাতে ধার ছিল ; যে বাহুতে তিনি সেই অস্ত্র ধারণ করিতেন, তাহাতে অস্থি ও পেশী বর্ত্তমান ছিল। কেবল পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিরক্তি জন্মাইতেন না। তিনি প্রায়ই নূতন কথা বলিতেন ও পুরাতন কথাকেও নূতন ভাষায় বলিতেন। নূতন সামগ্রীর আস্বাদনে আমাদের রসনা নিত্য নিত্য পরিতৃপ্ত হইত ; নূতন নূতন তথ্যের আভাস পাইয়া আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় বহির্ম্মুখে আসিত ও তন্দ্রা ত্যাগ করিয়া জাগিয়া উঠিত। এ দেশে লেখকের পক্ষে ইহা সামান্য প্রশংসা নহে ; এবং এ দেশে পাঠকের পক্ষে ইহা সামান্য সৌভাগ্য নহে।

উমেশচন্দ্র প্রধানতঃ স্বদেশের পুরাতন ইতিহাস উদ্ধারে ব্যাপৃত ছিলেন। সম্প্রতি স্বদেশের ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা যেন একটু জাগিয়া উঠিয়াছে বোধ হইতেছে। এটা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এত দিন ধরিয়া আমাদিগকে যে বিদ্যা বিতরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহার ফলে দেশে ইতিহাস জানিবার আকাঙ্ক্ষা বিশেষ উদ্দীপিত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত

এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা ইতিহাসের গৌরব বুঝিতেন না, এইরূপ একটা বিলাপধ্বনি সচরাচর শুনা যায় ; কিন্তু আমাদের নব্য সম্প্রদায়ের কৃতবিদ্যেরাও যে ইতিহাসের গৌরব বুঝিয়াছেন, তাহাও প্রমাণ-সাপেক্ষ। পরন্তু নব্যসম্প্রদায়ের এ বিষয়ে আচরণ অনেক সময় স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনাজনক। পাশ্চাত্য হিসাবে স্বদেশানুরাগ যাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় প্রাচীন কালেও আমাদের ছিল না, এবং এ-কালের শিক্ষাও তাহা হয়ত জন্মাইতে পারে নাই। মূলে স্বদেশানুরাগের ভিত্তি না থাকিলে স্বদেশের উন্নতিচেষ্টা কেবল পণ্ডশ্রম ; এবং যে-জাতির আপনার পুরাতন কাহিনী জানিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহার স্বদেশানুরাগের আস্ফালন সর্ব্বতোভাবে উপহাস্য। স্বদেশের উন্নতির জন্য এ দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন, শিল্প-শিক্ষার প্রচার, বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচার, শিল্প-সমিতি স্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ উদ্যম দেখা যাইতেছে ; কিন্তু সকল উদ্যমই ব্যর্থ ও বন্ধ্য হয়। তাহার মূল কারণ এক। আপনার জাতির অতীত ইতিহাসে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে যেন স্বদেশপ্রিয়তার স্পর্দ্ধা না করে ; আপনার জাতিকে যে চেনে না, সে যেন কৃত্রিম স্বদেশানুরাগের আস্ফালন না করে।

আধুনিক কৃতবিদ্যগণের মধ্যে যে দুই চারি জন সুধী পুরুষ আপনার জাতিকে চিনিতে চেষ্টা করিয়াছেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল তাঁহাদের অন্যতম। আমাদের শিক্ষিত সমাজে তাঁহাদের স্থান অতি উচ্চে। সত্য কথা, উমেশচন্দ্র তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ও ক্ষমতানুরূপ কাজ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পারেন নাই, সে আমাদের দুর্ভাগ্য। এক-এক বার মনে হয়, যদি তিনি রাজকার্য্য জীবিকার উপায় স্বরূপ গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আরও অধিক কাজ করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু সেও বুঝি মনের ভ্রম। কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহাদিগকে পরাধীন বৃত্তি গ্রহণ করিতে হয় নাই, যাঁহাদের শক্তির বা অর্থ-সামর্থ্যের বা অবকাশেরও অভাব নাই, তাঁহাদের মধ্যেই বা কয় জন উমেশচন্দ্রের মত দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্তের জন্য অনুরাগ দেখাইতেছেন।

আমাদের শিক্ষিতগণের মধ্যে যাঁহারা ভাবেন, এ দেশের প্রাচীন ইতিহাসের শিক্ষায় বা আলোচনায় কোন লাভ নাই, তাঁহাদের কথা ধরিলাম না। যাঁহারা প্রাচীন কালের জন্য কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন, তাঁহাদের পরিতাপও স্বদেশানুরাগের দৃঢ়তার অভাব প্রকাশ করে মাত্র। এই অবস্থায়

যিনি অন্য কার্য্যে লিপ্ত হইয়াও দেশের অতীত স্মৃতি জাগরিত করিবার জন্য কিঞ্চিন্মাত্র উদ্যম দেখাইয়াছেন, তিনি সার্থকজন্মা।

উমেশচন্দ্র এই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলীর সমালোচনা আমার সাধ্য নহে। তিনি কালস্রোতে নীয়মান যে দুই একটি চিহ্ন মাত্র অবলম্বন করিয়া অতিদূরস্থ বিস্মৃতপ্রায় অতীত দেশের চিত্রাঙ্কনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহাতে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার নির্ণয়ে আমি সমর্থ নহি। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলী জনসমাজে তেমন সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহাও বোধ হয় না। তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যে সকলেই আস্থা স্থাপন করিবেন, তাহাও মনে করি না। অল্প প্রমাণ আশ্রয়ে অধিকাংশ স্থলে কল্পনার সাহায্যে যে ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়, তাহার যাথার্থ্যে সন্দেহ চিরকালই থাকিবে।

অন্যের পক্ষে যাহাই হউক, উমেশচন্দ্রের বৈদিক প্রবন্ধসমূহ আমার নিকট অয়স্কান্তের কাজ করিত। একটা অনিবার্য্য মোহের আবেগে আমি সেই রচনাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হইতাম। তিনি পাশ্চাত্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দেশের প্রাচীন অবস্থার আলোচনা করিতেন; কিন্তু কেবল বৈদেশিক মতের অনুসরণ করিয়া যাইতেন না, স্বাধীন ভাবে নূতন পথে চলিতে চাহিতেন। স্বাধীন চিন্তা তাঁহাকে যে পথে চালাইত, তিনি সেই পথে চলিতেন। তাঁহার এক-একটি প্রবন্ধ বৈদিক কালের আর্য্য সমাজের এক-একটি পট মানস-চক্ষুর নিকট উজ্জ্বল আলোকে ধরিয়া দিত। সেই পট যে সর্ব্বত্র প্রকৃত তথ্যের অঙ্কনে সমর্থ হইয়াছে, তাহা আমিও বিশ্বাস করিতাম না; কিন্তু সেই পটের অভিনবত্ব, তাহার স্পষ্টতা, তাহার ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতাম। কল্পনার তুলিকা যে স্থানে অস্থানে বিবিধ বর্ণের বিন্যাস করিয়া তাহাকে মূর্ত্তি প্রদান করিত, তাহা বুঝিতাম। অতিরঞ্জনই হয়ত তেমন ঔজ্জ্বল্যের হেতু, ইহাও সম্ভবপর হইতে পারে। তথাপি সেই পট এক একখানা যখন দৃষ্টি-পথ হইতে সরিয়া যাইত, তখন সুখস্বপ্নের স্মৃতির মত মনের মধ্যে স্থায়ী রেখা অঙ্কিত করিয়া যাইত। ইহা ভারতবর্ষের অতীত সমাজের অন্যান্য ইউরোপীয় চিত্রকরগণের অঙ্কিত চিত্র হইতে কত বিভিন্ন! হয়ত ইহা কল্পনাকৃত অতিরঞ্জনে বিকৃত ও অসত্য, হয়ত আত্যন্তিক স্বজাতিপ্রিয়তা হইতে উদ্ভূত হওয়ায় ও আত্যন্তিক স্বজাতিপ্রিয়তার উৎপাদক বলিয়া বৈজ্ঞানিকের নিকট সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার অনধিকারী। কিন্তু ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ অন্যরূপে

করিতে হইবে। ইহা যে অস্পষ্ট স্মৃতি জাগাইয়া দিত, যে আকাঙ্ক্ষার, যে অতৃপ্তির উদ্দীপনা করিত, তদ্দ্বারা ইহার মূল্যের পরিমাণ করিতে হইবে।

এই আকাঙ্ক্ষার ও অতৃপ্তির উদ্বোধনই এখন আমাদের প্রয়োজন। আমাদের অলস, জড় ও সুপ্ত চিত্তবৃত্তিসমূহকে প্রবোধিত করিতে এই আকাঙ্ক্ষার ও অতৃপ্তিরই এখন প্রয়োজন। কর্ম্ম সম্পাদনে আমাদের এখন শক্তি নাই, সত্যাবিষ্কারে আমাদের ক্ষমতা নাই। এখন কর্ম্মের প্রতি ও সত্যের প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন আবশ্যক। এই আকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্যম জন্মিবে, এই উদ্যম কালে ফলপ্রসবে সমর্থ হইবে।

এই আকাঙ্ক্ষার ভাব ও অতৃপ্তির ভাব উমেশচন্দ্রের রচনার প্রত্যেক ছত্রে প্রকাশ পাইত। তিনি একটা পিপাসার উত্তেজনায় পানীয় আহরণে উদ্যত হইয়াছেন, এইরূপ বুঝিতে পারিতাম। শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি প্রাণের চেষ্টায় যেন জলের অন্বেষণ করিতেন; এবং সময়ে সময়ে মরীচিকাদর্শনেও যেন তৎপ্রতি ধাবিত হইতেন। অন্ধকূপস্থিত জীব নূতন জ্যোতির দেখা পাইয়া যেন তাহার অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, এইরূপ বোধ হইত। এই জন্য উমেশচন্দ্রের বৈদিক রচনা আমার নিকট এত ভাল লাগিত। বাঙ্গালায় আরও কতিপয় মনস্বী ব্যক্তি ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছেন, অনেকেই বৈদেশিকের পদাঙ্ক অনুসরণ ও বৈদেশিকেরই অনুবৃত্তিতে নিরত হইয়াছেন। কেহ কেহ বৈদেশিক প্রণালী ক্রমে নূতন সত্যাবিষ্কারেও সমর্থ হইয়াছেন। উমেশচন্দ্রের সম্পাদিত কর্ম্মের অপেক্ষা তাঁহাদের সম্পাদিত কর্ম্ম এক হিসাবে অধিক মূল্যবান্। কিন্তু উমেশচন্দ্রে যে চিত্ত-প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি দেখিয়াছি, যে অনুরাগের, পিপাসার উত্তেজনা দেখিয়াছি, তাহা অন্যত্র দেখিয়াছি বোধ হয় না। কোথাও দেখি নাই বলিলে হয়ত ভুল হয়। অক্ষয়চন্দ্র দত্তে এই অনুরাগ ও পিপাসা পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। বিধাতার নিগ্রহ তাঁহার সেই পিপাসা তৃপ্ত করিতে দেয় নাই। বিধাতার নিগ্রহে উমেশচন্দ্রেও সেই পিপাসার কিঞ্চিৎ নিবৃত্তির অবসর ঘটিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র এক কালে বাঙ্গালার একখানি ইতিহাস রচনার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইতিহাসের উপকরণ তখনও সংগৃহীত হয় নাই; এখনও সংগৃহীত হইতে অনেক বিলম্ব। তিনি বঙ্গের ঐতিহাসিকদিগকে পথপ্রদর্শনের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছিলেন; সে চেষ্টা তাঁহার আন্তরিক

স্বদেশানুরাগ হইতে প্রসূত। উমেশচন্দ্রেরও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা ছিল। কোন বন্ধুকে তিনি পত্র দ্বারায় ইহা জানাইয়াছিলেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি উপাদানেরও সংগ্রহ করিতেছিলেন। উপাদান সংগ্রহ অনেকেরই সাধ্য; কিন্তু এ দেশে সেই সাধ্য সাধনেও সকলে পরাঙ্মুখ। উপাদান একত্র করিয়া তাহাকে যথাবিধানে সজ্জিত ও যথাস্থানে বিন্যস্ত করা সকলের সাধ্য নহে। সংগৃহীত উপাদানের মূল্য নির্দ্ধারণ, তাহার অর্থ আবিষ্কার, পুরাতন জিনিষকে নূতন চোখে দেখা, এ সকলই দুরূহ ব্যাপার। উমেশচন্দ্রে এ শক্তি প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এই অনন্যসাধারণ শক্তির কার্য্যে বিনিয়োগ ঘটিল না। দরিদ্রের মনোরথ হৃদয়ে থাকিয়াই লয় পায়। আমাদের জাতীয় দারিদ্র্য কি চিরদিনই এইরূপ ফলোৎপাদনের প্রতিহর্ত্তা থাকিবে?

উমেশচন্দ্রের দার্শনিক মত তাঁহার সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অন্যত্রও তাহার আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনামধ্যে তাঁহার দার্শনিক মতের বিশদ উল্লেখ আছে। তিনি সাংখ্য-মতানুবর্ত্তী দ্বৈতবাদী ছিলেন; প্রকৃতি ও পুরুষ, বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জগতের অন্তস্তলে এই দুই স্বতন্ত্র অনির্ব্বচনীয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। ইংরেজী দর্শনে যাহাকে noumenon বলে বা যাহাকে substance বলে, প্রকৃতি ও পুরুষ, সাংখ্য-মতে সেইরূপ noumenon, এবং বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের অন্তস্তলে অবস্থিত substance; কোন অজ্ঞেয় কারণে প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলনে বা সম্বন্ধ স্থাপনে এই প্রতীয়মান বিশ্ব-জগতের অর্থাৎ phenomenon-সমষ্টির উৎপত্তি। এই সম্বন্ধ স্থাপনেই বিশ্ব-জগতের উৎপত্তি, সৃষ্টি ও অভিব্যক্তি। এই সৃষ্টি-ব্যাপারকে তিনি "দার্শনিক সৃষ্টি" আখ্যা দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সাংখ্যদর্শনকে এভলুশনিষ্ট বা অভিব্যক্তিবাদী বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা এই অভিব্যক্তির তাৎপর্য্য ঠিক বুঝিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। ইংরেজী দর্শনে যে এভলুশন শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহাতে জড় জগতের অভিব্যক্তি বুঝায়, তাহাতে ব্যাবহারিক প্রতীয়মান জগতের বা ফেনোমেনাল জগতের ব্যাবহারিক অভিব্যক্তি বুঝায়। সাংখ্যদর্শনের অভিব্যক্তি বা দার্শনিক পারমার্থিক অভিব্যক্তি ঐ ব্যাবহারিক বা বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-প্রকৃতিক, এই কথাটা বটব্যাল মহাশয়ের সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যায় যেমন

স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, তেমন অন্য কোথাও হইয়াছে কি না, জানি না ; অন্ততঃ, আমার জ্ঞানের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে কোথায়ও দেখি নাই। ভবিষ্যতের দর্শন-ব্যাখ্যাতৃগণ যদি এই পার্থক্যটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন তাহা হইলে হিন্দুজাতির দর্শনশাস্ত্র অনেক অপব্যাখ্যা হইতে নিষ্কৃতি পায়।

উমেশচন্দ্রের সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যাপাঠে যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি, কিন্তু তাঁহার দার্শনিক দ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে পারি নাই। পুরুষের বাহিরে বহির্জগতের অন্তস্তলে প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব একটা অনুমান বা হাইপথেসিস্ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই অনুমানের পক্ষে স্বতন্ত্র প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও জাগতিক রহস্য ও দার্শনিক সৃষ্টি বুঝা যাইতে পারে। সে বিষয়ের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক। পুরুষ অর্থে স্থূলতঃ যদি আত্মা ধরা যায়, তাহা হইলে আমার মত অন্যান্য মানবেরও আত্মা আছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে উমেশচন্দ্র গণ্য করিতেন। এ কথাটাও ঠিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আমার আত্মা আমাব নিকট স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ হইলেও অপরের আত্মা আমার নিকট অনুমান-গম্য ও কল্পিত পদার্থ। জড় জগৎ যেরূপ আমার অনুমান-লব্ধ কল্পিত পদার্থ, জড় জগতে বিচরণশীল জড় শরীরধারী জীবগণের অজড় আত্মাও আমার নিকট সেইরূপ অনুমান-লব্ধ কল্পিত পদার্থ ; ইহার অধিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে আসে না। বৈদান্তিক সমগ্র বিশ্বকে একমাত্র "অহম্" পদার্থে পরিণত করিয়াছিলেন ; এবং সেই "অহম্"কেই ব্রহ্ম উপাধি দিয়া বিশ্বের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতার স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন। সাংখ্য-মতে যেমন অনির্দ্দেশ্য কারণে প্রকৃতি ও পুরুষের, জ্ঞ ও জ্ঞেয়ের সম্মিলনে জ্ঞানের উৎপত্তি, অর্থাৎ বিশ্বের দার্শনিক সৃষ্টি ; বেদান্ত-মতে সেইরূপ "অহম্" বা ব্রহ্ম নামধেয় পদার্থ হইতে কোনও অনির্দ্দেশ্য কারণে বা অবিদ্যাযোগে বিশ্বের উৎপত্তি। উভয়ত্রই একটা অনির্দ্দেশ্য কারণ বর্ত্তমান আছে। জ্ঞ ও জ্ঞেয়ের সম্মিলন কিরূপে ঘটিল, অথবা "অহম্"-এর কিরূপে বিকার ঘটিয়া বিশ্ব-জগতে পরিণতি হইল, তাহার প্রণালী নির্দ্দেশ করিতে গেলেই এই অনির্দ্দেশ্য হেতুর অবতারণা আসিয়া পড়ে। প্রচলিত ঈশ্বরবাদ সগুণ অথচ বচনাতীত, অনুভবগম্য অথচ অনির্দ্দেশ্য, ঈশ্বর নামক সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনা করিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় হেতুর স্থান পূরণ করে।

উমেশচন্দ্র অন্ততঃ শেষ বয়সে সাংখ্য-মত হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া এই শেষোক্ত ঈশ্বরবাদের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বৈদান্তিক "সোঽহং" বাদটিই কিন্তু বিজ্ঞানদৃষ্টিতে সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

পঠদ্দশায় ইংরেজী শিক্ষার হাওয়ায় উমেশচন্দ্র পৌত্তলিকতার প্রতি ও হিন্দুর প্রচলিত উপাসনাপদ্ধতির প্রতি আস্থা হারাইয়াছিলেন। কিন্তু এই অনাস্থা কখনও তাঁহাকে শাস্ত্রবিরোধী আচারে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, বোধ হয় না। তাঁহার কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, এক কালে ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাসও তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মত অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। উপরেই বলিয়াছি, সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলনের অনির্দ্দেশ্য কারণের স্থলে তিনি ঈশ্বর স্থাপন করিয়াছিলেন। ঈশ্বর অর্থে তাঁহার নিজ ভাষায় "An intelligent being to whose intelligent action the present form and arrangement of the world of matter and the connection between human souls and that world are owing." এই ঈশ্বর কিন্তু অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, তিনি অমঙ্গল হইতে মনুষ্যকে উদ্ধার করেন। এই অমঙ্গল আবার জগৎ-প্রকৃতির অংশ মাত্র। তাঁহার স্বভাষায় "Evil is a part of nature and the energy of God is directed to the purging of our nature from evil and to the raising of us to a higher state." এই মতের সহিত তাঁহার সাংখ্যমতের সামঞ্জস্য ঠিক বুঝা গেল না। অন্যান্য পণ্ডিতের ন্যায় তিনি বেদের বহুদেব-বাদের মধ্যে একেশ্বরবাদের আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে ইহার প্রমাণ আছে। বৈদিক কালের উপাস্য দেবতার তত্ত্ব নির্ণয়ে নানা মতভেদ প্রচলিত আছে। কোন্ মত সমীচীন, তাহা জানি না। অন্ততঃ, জৈমিনি-প্রমুখ যে মীমাংসক সম্প্রদায় বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকার করিয়া বেদের প্রভুত্ব হিন্দু জাতির সমাজতন্ত্রের মূলে স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং শ্রৌত ও স্মার্ত্ত আচারের ব্যবস্থাপনে যাঁহাদের নির্দ্দেশ সমস্ত হিন্দুসমাজ শিরোধার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাঁহারা প্রচলিত অর্থে ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করিতেন না, এরূপও শুনিতে পাওয়া যায়।

দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসায় বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবেন, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সামাজিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে আধুনিক

হিন্দুর কোন্ পন্থা অবলম্বনীয়, এ সম্বন্ধে উমেশচন্দ্র বটব্যালের মতে কোনরূপ অস্পষ্টতা ছিল না। প্রথম বয়সে "পৌত্তলিকতা" সম্বন্ধে তাঁহার মত যাহাই থাক্, জীবনের শেষ ভাগে তিনি যন্ত্রযোগে উপাসনার সমর্থন করিতেন, এবং যন্ত্রযোগে উপাসনা ও স্তুতি মাত্র বা ধ্যান মাত্র অবলম্বনে উপাসনার মধ্যে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য স্বীকার করিতেন না। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনা-মধ্যে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিলাম। সমাজধর্ম্ম পালনে তিনি চাতুর্বর্ণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদমূলক ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত সামাজিক ব্যবহারের অনুরাগী ছিলেন। কালভেদের সহকারে ব্যবস্থাভেদের প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করিতেন না; এবং শত বৎসর পূর্ব্বে আচার বিষয়ে যে সকল শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ বর্ত্তমান ছিল, বর্ত্তমান কালে তাহার সকলগুলির উপযোগিতা না থাকিতে পারে, ইহা স্বীকার করিতেও সম্ভবতঃ কুণ্ঠিত হইতেন না। ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথই যে সমাজভুক্ত ব্যক্তির অবলম্বনীয় পথ, এই স্থূল সিদ্ধান্তের সহিত ঐরূপ পরিবর্ত্তনপ্রিয়তার বস্তুতঃ কোন অসামঞ্জস্য নাই। ভগবান্ শাক্যমুনির সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যে-সকল নূতন নূতন বেদ-বিরোধী সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে, তৎপ্রতি কটাক্ষপাত করিতে বোধ করি এই জন্যই উমেশচন্দ্র দ্বিধা বোধ করেন নাই।

প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের চরিত সমালোচনকালে উমেশচন্দ্র যে ভাষার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার আমি অনুমোদন করিতে পারিব না। কিন্তু যে ভাবপ্রবণ সমাজদ্রোহ ও কর্ম্মদ্রোহ শাস্ত্রসম্মত নিষ্কাম কর্ম্মপরতা হইতে আমাদের সমাজকে ভ্রষ্ট করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, উমেশচন্দ্র তৎপ্রতিকূলে দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছিলেন।

রজনীকান্ত গুপ্ত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। অদ্যকার সভাস্থলে উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা এই সাত বৎসরের বৃত্তান্ত অবগত আছেন, তাঁহাদের অনেকেই জানেন, আমি পরিষদের অধিবেশনে আহূত হইয়া যদি কোন দিন একাকী সভাগৃহে প্রবেশ করিতাম, তাহা হইলে চারি দিক্ হইতে আমার প্রতি প্রশ্ন হইত, "রজনীবাবু কোথায়, রজনীবাবু কোথায়?" আজিকার অধিবেশনেও আমি আহূত হইয়া একাকী এই সভাগৃহে প্রবেশ করিয়াছি; কিন্তু আজি কেহই জিজ্ঞাসা করেন নাই, রজনীবাবু কোথায়? ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমি তাঁহার সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলাম। তদবধি পরিষদের সম্পর্কীয় সকল কার্য্য সম্পাদনেই আমি তাঁহার সহচর ছিলাম; যে দিন কোন কারণে তাঁহার সঙ্গ না পাইয়া আমাকে একা আসিতে হইত, সে দিন কোথায় যেন কিছু ফাঁক পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইত। ছয় বৎসর মাত্র অতীত না হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সহসা তাঁহার জন্য শোক-প্রকাশার্থ আমাকে আহ্বান করিবেন, তাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই। Bengal Academy of Literature যখন বিজাতীয় নাম ও বিজাতীয় বেশ ত্যাগ করিয়া আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-রূপে প্রথম আবির্ভূত হয়, সেই দিন হইতেই রজনীবাবুর সহিত পরিষদের নিতান্ত নিকট-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। রজনীবাবুর সহিত পরিষদের কত নিকট-সম্পর্ক ছিল, তাহা পরিষদের প্রাচীন সদস্য মাত্রেই অবগত আছেন; পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধুস্বরূপে তিনি সদস্যমণ্ডলীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন; বঙ্গ-সাহিত্যের অনুরক্ত ভৃত্যস্বরূপে তিনি বঙ্গের সাহিত্যিক সমাজের শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত আমার অন্যরূপ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছিল; কলিকাতার মধ্যে তাঁহার ন্যায় আত্মীয় আমার দ্বিতীয় ছিল না; এবং এই স্থানে আমি পরিষদের সদস্য ও পরিষদের প্রতিনিধি-স্বরূপে দণ্ডায়মান হইলেও আমার পক্ষে সেই ব্যক্তিগত সম্পর্ক পরিহারপূর্ব্বক কোন কথা বলা নিতান্ত কঠিন। আমার উক্তির অধিকাংশই আমার

ব্যক্তিগত কথা ; আশা করি, পরিষদের সভ্যগণ তজ্জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।

আমার বয়স যখন ৮।৯ বৎসর, গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালার নিম্ন শ্রেণীতে যখন আমি অধ্যয়ন করিতাম, তখন এক দিন আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতে dictation দেওয়া হইতেছিল। কয়েক দিন পরে দেখিলাম, সেই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি আমাদের বাড়ীতে তক্তাপোশের উপর পড়িয়া আছে। পুস্তিকাখানির নাম 'জয়দেব-চরিত' ; গ্রন্থকারের নাম দেখিলাম, শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত। বইখানি পড়িবার চেষ্টা করিয়া ভাল বুঝিতে পারিলাম না ; কিন্তু উহার বিজ্ঞাপনটা পড়িয়া মনের মধ্যে কিরূপ একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল, তাহা আজ প্রায় ২৭।২৮ বৎসর পরে মনে ঠিক আসিতেছে না।

এই ঘটনার ৫।৬ বৎসর পরে যখন আমি ইংরেজী স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন বাঙ্গলা বহি, বাঙ্গলা কাগজ পড়া আমার রোগের মধ্যে ছিল। সেই সময়কার একখানা 'বান্ধব' পত্রিকায় একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পাঠ করি। সেই প্রবন্ধের শেষ ভাগে দেখিলাম যে, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত,—যাঁহার নামের সহিত পূর্ব্বেই আমার পরিচয় ঘটিয়াছিল, সেই রজনীকান্ত গুপ্ত—সিপাহী যুদ্ধের বৃহৎ ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষায় একখানি সুবৃহৎ ইতিহাস-গ্রন্থ রচিত হইবে, এই চিন্তায় আমার বালক-হৃদয় আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছিল। এক দিন সহসা দেখিলাম, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসের খণ্ডশঃ প্রকাশিত প্রথম ভাগ রজনীবাবুর অন্যতম বন্ধু বাঁকিপুরের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট উকিল শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ কর্ত্তৃক পিতাঠাকুর মহাশয়ের নামে প্রেরিত হইয়াছে। আগ্রহ সহকারে গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম ; এক বার পড়িয়া তৃপ্তি হইল না, পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলাম। গ্রন্থের ওজস্বিনী ভাষা ও বিষয় বর্ণনায় গ্রন্থকারের এরূপ অনুরাগ ও উৎসাহ কোন বাঙ্গলা গ্রন্থে ইহার পূর্ব্বে দেখি নাই। সত্যের প্রতি অনুরাগ, স্বজাতির প্রতি অনুরাগ, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠে ব্যক্ত দেখিয়া আমার বালক-হৃদয় পুলকিত হইল।

গ্রন্থ পাঠ করিয়া যেন গ্রন্থকারের চরিত্র চোখের উপরে দেখিতে পাইলাম ; গ্রন্থপাঠে যে গ্রন্থকারের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহার পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল না। কত বার আমার বাল্যবন্ধুগণকে জোর করিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস পড়িয়া শুনাইতাম; আমি স্বয়ং যে আনন্দ পাইয়াছিলাম, সেই আনন্দভোগে অপরকে অধিকারী করিয়া আরও আনন্দ পাইতাম।

তাহার পর তিন চারি বৎসর অতীত হইল। আমি যে বার এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিই, রজনীবাবু সে বার এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আসিয়া আমি সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে কি না, অনুসন্ধানে বাহির হই। আর কোন বাঙ্গলা পুস্তকের আমি তাহার পূর্ব্বে অনুসন্ধান লই নাই। সে দিনের কথা আমার আজও মনে আছে। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং বাড়ী দোকানের বাহিরে ফুটপাথের উপর সন্ধ্যার পর গুরুদাসবাবু মোড়ার উপর বসিয়া ছিলেন। নিকটে আর কেহ ছিল না। আমি আগ্রহের সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন আশাপ্রদ উত্তর পাইলাম না। তখন নিতান্ত নিরুৎসাহ ও ক্ষুণ্ণ হইয়া বাসায় ফিরিলাম। এই সময়ে চাঁপাতলা ফার্ষ্ট লেনের উপরে, 'বঙ্গবাসী'র কার্য্যালয় ছিল। রজনীবাবু তাঁহার চাঁপাতলার বাসা হইতে মাঝে মাঝে চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন দিয়া বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়ে যাইতেন। ঐ লেনে আমার বাসা হইতে আমি রজনীবাবুকে মাঝে মাঝে দেখিতে পাইতাম। 'বঙ্গবাসী' কাগজে তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধ যাহা কিছু বাহির হইত, যত্নের সহিত তাহা পাঠ করিতাম। এই সকল প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়া 'আর্য্যকীর্ত্তি' প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে শুনিবা মাত্র একখানা কিনিয়া আনিয়া পাঠ করি। রাজপুত ও শিখ ও মারাঠার কাহিনী রজনীবাবুর স্বাভাবিক ভাষায় বর্ণিত হইয়া মনের মধ্যে নানা ভাবের উদ্দীপনা করিত। প্রেসিডেন্সি কালেজে আমার পঠদ্দশার শেষ সময়ে রজনীবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় ঘটে। অখিল মিস্ত্রির লেনে পরলোকগত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর বাসায় তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া বাল্যাবধি আমি তাঁহার নামে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। পরিচয়ের পর তাঁহার চরিত্র-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমি ততোধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই চরিত্রের সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে ও ঔদার্য্যে এই সভাস্থলের অনেকেই মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমার বাগ্‌বাহুল্যের কোন প্রয়োজন নাই।

রিপন কলেজে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অবধি আমি রজনীবাবুর প্রতিবেশী ছিলাম। পরিচয় ক্রমশঃ বন্ধুতায় এবং বন্ধুতা ক্রমশঃ আত্মীয়তায় ঘনীভূত হইয়াছিল। তাঁহার মধুর প্রকৃতির কোন অংশ আমার অজ্ঞাত ছিল না; তাঁহার সহিত অবস্থান আমার বিদেশ-প্রবাসের সর্ব্বপ্রধান আনন্দ ছিল। প্রায় দুই বৎসর হইল, তাঁহার অন্তিম রোগের সঞ্চার হয়, অন্ততঃ তাঁহার মনের ভিতর ঐরূপ আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। কিন্তু ঐ রোগের বাহ্য লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় নাই; স্বাস্থ্যভঙ্গের কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়াই উড়াইয়া দিতাম। তিনিও দুই এক জন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত অন্যের নিকট তাহা প্রকাশ করেন নাই। এমন কি, তাঁহার নিজ পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিই এই আশঙ্কার কথা জানিতেন না। কিন্তু তদবধি তিনি স্বাস্থ্যের জন্য কিছু চিন্তিত হইয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রাতঃকালে বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নান করিতেন। গত শীতকালের অবসানে বাইসাইকেল অভ্যাসের চেষ্টা করিতেন। ক্বচিৎ বা শিয়ালদহ ষ্টেসনে যাইয়া ওজন লইয়া আসিতেন।

এই সময়ে রজনীবাবু তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্যসকল সম্পূর্ণ করিবার জন্য কিছু ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার গৃহের লাইব্রেরিটির পূর্ণতা সাধনের জন্য তিনি অকাতরে পুস্তকসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; গত বৎসর পূজার পর গয়াধামে গিয়া পিতৃকৃত্য সমাধান করিয়া আসিয়াছিলেন; তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসখানি শেষ করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। তিনি কথায় কথায় হাসিতে হাসিতে প্রায়ই বলিতেন, পরিবারবর্গের জন্য একটা ব্যবস্থা করিয়া শীঘ্রই কাশীবাসী হইবেন। বিগত ২রা বৈশাখ তারিখে তিনি পরিষদের অপর চারি জন সদস্যের সহিত পরিষদের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ভূমি প্রার্থনায় কাশীমবাজারে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র বাহাদুরের সমীপে যাত্রা করেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহার হাতে সামান্য একটি ব্রণ হইয়াছিল। আমার সহিত প্রায় প্রত্যহই তাঁহার দেখা হইত। কিন্তু সেই ব্রণের বিষয় আমিও জানিতাম না। কাশীমবাজার হইতে ফিরিয়া আসিলে আরও কয়েকটা ব্রণ হয়; তৎপরে পৃষ্ঠে একটা ব্রণ দেখা দেয়। ২১শে বৈশাখ ও ৩১শে বৈশাখ তিনি সেই পৃষ্ঠ-ব্রণের সংবাদ দিয়া আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে পত্র লেখেন। ৩১শে বৈশাখের পর আর তাঁহার পত্র পাই নাই। ঐ পত্রের দুই চারি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—"উহা

সাধারণ ফোড়া বলিয়া বোধ হয় না ; ডাক্তার বলেন, carbuncular boil ; কার্বঙ্কলের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়াতে আমার বড় চিন্তার কারণ হইয়াছে। ঘা ভাল হইলে একবার বাড়ী যাইব, কারণ সর্ব্বাগ্রজ মহাশয় বাড়ীতে বড় পীড়িত অবস্থায় আছেন। ১০।১২ দিনের পর বাড়ী হইতে ফিরিব। তখন তোমাকে চিঠি লিখিব। শরীর ভাল থাকিলে তোমাদের ওখানে যাইবার বন্দোবস্ত করিব।"

ইহার পর সিপাহী যুদ্ধের শেষ ভাগের শেষ ফর্ম্মা ছাপাখানায় দিয়া তিনি বাটী গমন করেন এবং কার্বঙ্কলের পরিণত অবস্থা লইয়া ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। তখন তাঁহার জীবনের আশা ছিল না।

রজনী বাবু ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ী আসিবেন, আমি ও আমার বন্ধুগণ যে সময়ে ব্যগ্র ভাবে এই প্রতীক্ষায় ছিলাম, সেই সময়ে সংবাদ আসিল, আমাদের সেই আশা আর পূর্ণ হইবার নহে। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টার সময় রজনী বাবু ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু আমাদের আশা অপূর্ণ রহিয়া গেল। সাহিত্যসমাজে রজনীবাবুর স্থান কোথায়, তাহা নির্ণয়ের এ সময় নহে। বাঙ্গালা-সাহিত্যে তাঁহার সম্পাদিত কার্য্যের সমালোচনা আমার সাধ্য নহে। অন্যে সেই ভার গ্রহণ করিবেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাহার একান্ত অনুগত সুহৃদ্‌কে হারাইয়াছে। পরিষদের জন্য তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, সেরূপ বোধ হয় সে সময়ে অপর কেহ করেন নাই। তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, শ্রদ্ধার সহিত ও অনুরাগের সহিত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন। সেই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম অনুরাগ পৃথিবীতে অতি বিরল সামগ্রী। পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে অনেকেই সেই শ্রদ্ধার ও অনুরাগের পরিচয় পাইয়াছেন। আমি অনর্থক বাগ্‌বাহুল্য দ্বারা পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব না।

২

১২৫৬ সালে ভাদ্র মাসে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন মতুগ্রামে মাতুলালয়ে রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺কমলাকান্ত দাসগুপ্ত তেওতা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে রজনীকান্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ।

রজনীকান্তের তিন ভ্রাতা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস মহাশয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য সুখ্যাতির সহিত সম্পাদন করিয়া সম্প্রতি পেন্‌শন ভোগ করিতেছেন।

সাত আট বৎসর বয়সে রজনীকান্তের কঠিন পীড়া হয় ও তাহার ফলে তাঁহার শ্রবণশক্তি চিরদিনের জন্য দুর্ব্বল হইয়া যায়। এই দৌর্ব্বল্যের জন্য তাঁহার বিদ্যালয়ে অধিক দূর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন ও উপাধিলাভাদি ঘটিয়া উঠে নাই।

বাল্যকালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি হয়েন। কিছু সংস্কৃত শিক্ষার পর আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্যবসায় চালাইবেন এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃত কালেজে তিনি এনট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন মাত্র।

বিদ্যালয় ত্যাগের পরবর্ত্তী কালে তিনি কিছু দিন পরলোকগত কবিরাজ ব্রজেন্দ্রনাথ কণ্ঠাভরণের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থ যাতায়াত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা গবর্ণমেণ্টের অধীন চাকরি গ্রহণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায় বা চাকরি কিছুই তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী না হওয়ায় তিনি ঐ পথে যান নাই।

এই সময় হইতেই তাঁহার বাঙ্গলা রচনার প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক ছিল ও বাঙ্গলা-সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা যশোলাভের বাঞ্ছা ছিল। তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তক 'জয়দেব-চরিত' বাঙ্গালা ১২৮০ সালে প্রকাশিত হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ পুস্তক লিখিয়া তিনি রাজা সার্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রদত্ত পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তৎপরে ১২৮২ সালে প্রধানতঃ গোল্‌ডষ্টুকারের পাণিনি অবলম্বন করিয়া 'পাণিনি' পুস্তক প্রকাশ করেন।

সাহিত্যচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিবেন, রজনীকান্তের এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে সাহিত্যচর্চ্চায় জীবিকা চলিতে পারে কি না, তাহা তখনও প্রমাণসাপেক্ষ ছিল। সে সময়ে রজনীকান্তের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; কলিকাতার খরচ অতি কষ্টে চালাইতেন। তাঁহার সমকালে যাঁহারা তাঁহার সহিত হিন্দু-হোষ্টেলে বাস করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে সমাজে মান্যগণ্য হইয়াছেন। রজনীকান্তের কোন উপাধি লাভ ঘটিয়া উঠে নাই। শ্রবণ-শক্তির দৌর্ব্বল্য তাঁহার জীবিকার্জ্জন বিষয়ে দারুণ অন্তরায় হইয়াছিল।

এরূপ অবস্থায় ও এরূপ সময়ে সাহিত্যচর্চ্চা দ্বারা জীবন অতিবাহনের সঙ্কল্প অসাধারণ সাহসের বা দুঃসাহসের পরিচায়ক। রজনীকান্ত সেই সাহস বা দুঃসাহস লইয়া সাহিত্যচর্চ্চা জীবনের ব্রতস্বরূপ অবলম্বন করিলেন। সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে এরূপ ঘটিতে পারে না। মৌখিক অনুরাগ এইরূপ দুঃসাহস জন্মাইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগে আমাদের মধ্যে এইরূপ উদাহরণ বিরল।

এই সময়ে তিনি স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির নিকট পরিচিত হন। ভূদেববাবুর অনুরোধে তিনি সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া 'এডুকেশন গেজেটে' প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন।

রজনীকান্তের এই সময়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থা। তথাপি তাঁহার প্রবল সাহিত্যানুরাগ দমিত হয় নাই। এই অবস্থাতেও তিনি পাঠের জন্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিতেন। এই অবস্থাতেই তিনি সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প করেন। ১২৮৮ সালে 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে ঐ সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখকশ্রেণীর মধ্যে রজনীকান্তের নাম বাহির হয়। ঐ বৎসর পরলোকগত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এনট্রান্স পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েন ও তৎপর বৎসর তাঁহার সঙ্কলিত সংস্কৃতগ্রন্থ এনট্রান্স পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হয়। এই ঘটনার পর হইতে আর তাঁহাকে জীবিকার জন্য ক্লেশ পাইতে হয় নাই।

'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি নিবদ্ধ হইয়া 'আর্য্যকীর্ত্তি' প্রকাশিত হয়। উহাই তাঁহার বালকপাঠ্য প্রথম রচনা। তৎপরে তিনি বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অনেকগুলি গ্রন্থ টেক্‌ষ্ট-বুক কমিটির অনুমোদিত হইয়াছিল; কোন কোন-খানি ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি পরীক্ষায় পাঠ্যরূপেও নির্দ্দিষ্ট হইত। এইরূপে স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রচারে তাঁহার যে আয় দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সাহায্যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আর সংসার চালাইবার জন্য কষ্ট করিতে হয় নাই। তাঁহার অমায়িক ভদ্র স্বভাবে ও উদার সরল ব্যবহারে তাঁহার বন্ধুগণ মুগ্ধ ছিলেন। এমন শান্ত স্বভাবের ও সরল ব্যবহারের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। যিনি একবার অল্প সময়ের জন্য তাঁহার স্পর্শে আসিতেন, তিনি তাঁহার অকৃত্রিম সারল্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে তাঁহার

বন্ধুগণ আত্মীয়বিয়োগের ব্যথা পাইয়াছেন। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিত ; যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন, সে স্থানকে আনন্দময় করিয়া তুলিতেন। তিনি প্রায় সকল সময় সাহিত্যের আলোচনায় ও সদালাপে অতিবাহিত করিতেন। বঙ্গসাহিত্যে রজনীকান্তের অভাব তদপেক্ষা ক্ষমতাশালী পণ্ডিত জন কর্ত্তৃক পূর্ণ হইবে ; কিন্তু সেই অকপট, শ্রদ্ধাশীল, অমায়িক, অনুরক্ত, সদানন্দ বন্ধুর অকালমরণে তাঁহার বন্ধুসমাজ যে অভাব বোধ করিবেন, তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হওয়া অবধি রজনীকান্ত গুপ্ত উহার অনুগত সেবক ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের আশ্রয়ে যখন Bengal Academy of Literature বিজাতীয় বেশ ত্যাগ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রূপান্তরিত হয়, রজনীবাবু তদবধি উহার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র তিনিই প্রথম সম্পাদক। প্রথম দুই বৎসর তিনি দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা ও প্রবন্ধ সংগ্রহ হইতে মুদ্রণকার্য্যের তত্ত্বাবধান ও প্রুফ দেখা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে একাকী সম্পন্ন করিতে হইত। এই জন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইত। পরিষদের প্রতিষ্ঠার ও উন্নতির জন্যও তিনি প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর ও তদানীন্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রজনীবাবুর পরামর্শ না লইয়া পরিষদের জন্য কোন কাজই করিতেন না। পরিষদের কার্য্য-প্রণালীর আলোচনায় তিনি প্রচুর সময়ক্ষেপ করিতেন। পরিষদের উদ্দেশ্য কিরূপ হওয়া উচিত, পরিষৎ-পত্রিকার আলোচনার বিষয় কিরূপ হওয়া উচিত, এই সকল বিষয় লইয়া তিনি সর্ব্বদাই আলোচনা করিতেন। সাহিত্য-পরিষৎ যে যে প্রধান কার্য্যে এ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, রজনীকান্ত সেই সকল কার্য্যেই প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবে পরিষদের পরিভাষা-সমিতি ও ব্যাকরণ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যকে পরিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদে গ্রন্থরচনা-সমিতি স্থাপনার প্রস্তাব করেন। তাঁহারই প্রস্তাবে সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা-ভাষার ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনা প্রবেশ করাইবার জন্য চেষ্টা করেন। পরিষদের প্রস্তাব তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সর্ব্বাংশে গৃহীত হয় নাই ; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট আর্টস্ ও বি. এ. পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষা

প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার পর হইতেই রজনীকান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য পরিষৎ কর্ত্তৃক ও পরিষদের বাহিরে যে চেষ্টা হয়, রজনীবাবু তাহাতে আন্তরিক উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই চেষ্টার আংশিক সফলতা তাঁহার নিরতিশয় আনন্দের কারণ হইয়াছিল। রজনীকান্ত কোনরূপ সঙ্কীর্ণ ভাব বা গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি ভিন্নমতাবলম্বীদিগকেও শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন। রাজনীতি বিষয়ে তিনি উদারমতাবলম্বী ছিলেন। কটন সাহেবের নিউ ইণ্ডিয়া প্রচারিত হইবা মাত্র তিনি ঐ গ্রন্থের অনুবাদ বঙ্গসমাজে প্রচার করেন।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে রজনীকান্তের স্থান কোথায়, তাহা নির্ণয়ের এ সময় নহে। স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস আলোচনায় তিনিই পথপ্রদর্শক। তৎপূর্ব্বে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামদাস সেন প্রভৃতি ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের স্বাধীন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। রজনীকান্তের প্রথম গ্রন্থ 'জয়দেব-চরিত' ও 'পাণিনি' দেখিলে মনে হয়, তাঁহারও বোধ করি সেই পুরাতত্ত্ব আলোচনার দিকেই প্রথমতঃ প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু শীঘ্রই তিনি উহা ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের জন্য রজনীকান্ত যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার মূলে একটা কথা পাওয়া যায় ;—স্বজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ। এই অনুরাগই প্রথমতঃ তাঁহাকে পুরাতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল ; এই অনুরাগই তাঁহাকে পরে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনায় প্রবৃত্ত করে।

বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীন ভাবে ইতিহাস আলোচনার পথ নিতান্ত সরল নহে। প্রথমতঃ ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য বৈদেশিক লেখকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আপন দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা বা স্মরণে রাখা আমাদের স্বভাব নহে। সিপাহী-যুদ্ধের মত নিতান্ত আধুনিক ঘটনা সম্বন্ধেও এ দেশের লোক কোন কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য বোধ করে নাই। তৎকালবর্ত্তী প্রাচীন লোক যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদেরও স্মৃতিশক্তির উপর কোন ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ নির্ভর

করিতে পারেন না। ইংরাজীতে এই একটা ঘটনা লইয়া এত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে যে, তাহাতে একটা লাইব্রেরি হয়। রজনীকান্ত তাঁহার উৎকৃষ্ট লাইব্রেরিতে বৈদেশিকের লিখিত এই সমস্ত গ্রন্থই প্রায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বদেশীয়ের নিকট তিনি কোন সাহায্যই পান নাই। রজনীকান্ত যাঁহাদের রচিত ইতিহাসের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথার উপরেই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল।

রজনীকান্তের প্রদর্শিত পথে আজ কাল অনেকেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন; কতিপয় কৃতবিদ্য লোকে স্বদেশের ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। রজনীকান্তের অনুবর্ত্তীর আজকাল অভাব নাই; কিন্তু ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তিনি যে ওজস্বিনী ভাষার অবতারণা করিয়াছিলেন, তেমন ভাষায় কথা কহিতে সকলে সমর্থ হন নাই। তাঁহার ভাষা তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির প্রতিপত্তির অন্যতম কারণ। উপরে যে আন্তরিকতা ও সহৃদয়তাকে তাঁহার বিশিষ্ট গুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সেই আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা হইতে এই ভাষা উৎপন্ন। তাঁহার মনের আবেগ, বর্ণিত বিষয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, সেই ভাষায় স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইত; তাঁহার মর্ম্ম হইতে সেই ভাষা বহির্গত হইয়া পাঠকের মর্ম্মে গিয়া প্রতিহত হইত। ভাষার বিশুদ্ধির দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম পালন করা উচিত কি না, এ বিষয়ে তাঁহার মত সম্পূর্ণ উদার ও অসংকীর্ণ ছিল; তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সর্ব্বতোভাবে অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না; অথচ তিনি স্বয়ং যেরূপ মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করিতেন, তাহা বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে দুই এক জন ব্যতীত আর কেহ করিয়াছেন কি না জানি না। কিন্তু বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য এই প্রয়াস তাঁহার রচনাকে কখনও কৃত্রিমতাদুষ্ট করে নাই। তাঁহার আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা তাঁহাকে এই দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভাষাকে তিনি কেবল ভাবপ্রকাশের উপায়স্বরূপ মনে করিতেন না। এই কারণে তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সাহিত্যের শরীর পোষণ করিবে; সাহিত্যমধ্যে তাহারা আসন লাভ করিবে। সে স্থান কত উচ্চে, তাহার নির্ণয়ের কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান দরিদ্র অবস্থায়

বাঙ্গালায় লিখিত অন্য কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থের বা ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সম্বন্ধে এতটুকু বলা যাইতে পারে কি না সন্দেহস্থল।

বঙ্গসাহিত্যের সেবা রজনীকান্তের জীবনের মুখ্যতম ব্রত ছিল; তিনি আপন ক্ষমতানুসারে সেই ব্রত যথাসাধ্য পালন করিয়াছেন, এবং সেই ব্রতের পালনেই আপনার সমগ্র শক্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি আর কোন কাজই করেন নাই। তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী লেখক বঙ্গদেশে অনেক জন্মিয়াছেন; বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের স্থান অনেক উচ্চে অবস্থিত; তাঁহাদের কার্য্যের সহিত তৎকৃত কার্য্যের তুলনার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু এক মাত্র বঙ্গসাহিত্যের, অতএব বঙ্গমাতার সেবাব্রতে সমগ্র জীবন উদ্‌যাপনের উদাহরণ অধিক আছে কি না জানি না। এই অনুরক্ত সন্তানের অকালমরণে দরিদ্রা বঙ্গমাতা সন্তাপিত হইবেন সংশয় নাই।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বালক বলেন্দ্রনাথ যখন 'বালক' ও 'ভারতী ও বালক' অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার সহিত বা তাঁহার রচনার সহিত আমার পরিচয় ছিল না। 'সাধনা' বাহির হইলে তাঁহার রচনা আমাকে আকৃষ্ট করে; তার পর হইতে তিনি যখন যাহা লিখিয়াছেন, প্রচুর আনন্দপ্রাপ্তির আশা লইয়া তাহাই আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং কোন বারেই যে সেই আনন্দলাভে বঞ্চিত হইয়াছি, তাহা মনে হয় না। সেই আনন্দের উৎস এত শীঘ্র অন্তর্হিত হইবে এবং বলেন্দ্রনাথের রচনা-সংগ্রহকে পাঠক-সমাজে উপস্থিত করিবার ভার আমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা কখনও ভাবি নাই।

এই কার্য্যে কিন্তু আমার অধিকারও নাই, যোগ্যতাও নাই, তৎসত্ত্বেও যখন তাঁহার স্বজনগণ আমাকে এই ভার দিলেন, তখন অধিক বাক্যব্যয় না করিয়াই ভার লইলাম। কেন লইলাম, ঠিক বলা কঠিন। বোধ করি, বলেন্দ্রনাথের রচনার প্রতি আমার অনুরাগপ্রকাশের এই অবসর আমি ত্যাগ করিতে চাহি নাই।

বলেন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গীই আমাকে এ বিষয়ে আকর্ষণ করিয়াছিল; এমন সযত্নে গাঁথা শব্দের মালা তার পূর্ব্বে আমি দেখি নাই। শুনিয়াছি, বলেন্দ্রের ভাষা তাঁহার সাধনার ফল। শিক্ষানবিসি অবস্থায় কাটিয়া ছাঁটিয়া পালিশ করিয়া তিনি ভাবের উপযোগী ভাষা গড়িয়া লইয়াছিলেন। তিনি অলঙ্কারের বোঝা চাপাইয়া ভাষাকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা দিবার চেষ্টা করিতেন না; কিন্তু শব্দগুলিকে বিশেষ বিবেচনার সহিত বাছিয়া লইয়া কোথায় কোন্‌টি বসিলে ভাল মানাইবে, তাহা স্থির করিয়া ও গাঁথনির দৃঢ়তার দিকে নজর রাখিয়া তিনি যত্নের সহিত শব্দের মালা গাঁথিতেন। কাজেই তাঁহার ভাষা কারিগরের হাতের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি অপেক্ষা সৌষ্ঠবের শ্রীছাঁদ দিবার চেষ্টা করিতেন; তাহার জন্য যে সুরুচির, যে সামঞ্জস্যবুদ্ধির, যে সংযমের প্রয়োজন ছিল, তাহা প্রচুর পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্যে ভাষার প্রতি এইরূপ যত্ন অতি দুর্লভ। অধিকাংশ লেখক

ভাষাকে কেবল ভাবপ্রকাশের যন্ত্র মাত্র দেখেন, উহাকে কারুশিল্পের হিসাবে দেখেন না। কবিতা রচনায় ছন্দের আবশ্যকতা আছে; বলেন্দ্রের গদ্য-রচনাতেও সেই ছন্দের ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়; এই ছন্দ ভাবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া অপরূপ কলাকৌশলের উৎপত্তি করিয়াছে। বলেন্দ্রের ভাষায় যে স্নিগ্ধ-কোমল-প্রশান্ত উজ্জ্বলতা আছে, তাহা চোখ ঝলসাইয়া দেয় না, কেবলই তৃপ্তি উৎপাদন করে। সেই তৃপ্তি কিন্তু কখনও মাত্রা ছাড়াইয়া পরিতৃপ্তিতে দাঁড়ায় না। স্রোতস্বতীর মত ইহা স্থির গতিতে আপন নির্দ্দিষ্ট পথে চলে; ইহার পূর্ণতা কখনও উচ্ছ্বাসে পরিণত হইয়া কূল ভাসাইয়া জলপ্লাবন ঘটায় না। ইহার মধ্যে কোথাও ফেনিল আবর্ত্ত নাই; কোথাও ইহা জলপ্রপাতের কোলাহল উপস্থিত করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের ভাষা তাঁহাদের বশংবদ ভৃত্য; তাঁহারা উহাকে যখন যে কাজে বিনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের আদেশে বা ইঙ্গিত মাত্রে ভাষা তদনুযায়ী পরিচ্ছদ বা অস্ত্র-শস্ত্র বা ঐশ্বর্য্য লইয়া তখনই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাঁহাদের ভাষায় যে বল আছে, যে বেগ আছে, যে তীব্রতা আছে, যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন-মুখতা আছে, এবং প্রয়োজন-মত ঐশ্বর্য্য আছে, বলেন্দ্রের ভাষায় সে সকল না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার স্থিরতা ও দৃঢ়তা ও স্বচ্ছ-প্রাঞ্জলতা ও সরস-কোমলতা তাঁহার রচনাকে কাব্যের সীমামধ্যে রাখিয়া দিয়াছে।

লেখকের ভাবুকতা ও লিপিকৌশল উভয়ের মূলস্থ শক্তি-সামঞ্জস্যবোধ ও সংযম। এই দুইটি না থাকিলে সুরুচি থাকে না। বলেন্দ্রের আলোচ্য বিষয় অনেক ছিল; কাব্য ও কলাবিদ্যা, মানব-সমাজ ও মানব-জীবন, এইরূপ নানাবিধ বিষয়ের তিনি আলোচনা করিয়াছেন। এই বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে কোথায় কি দেখিবার, বুঝিবার, আস্বাদনের ও উপভোগের আছে, তাহা তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছে ও দেখাইতে হইয়াছে। তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন ও বাহিরে দাঁড়াইয়া সমস্তটা দেখিয়াছেন;—ফুলের ভিতর হইতে মধু আহরণ করিতে গিয়া বাহির হইতে ফুলের শোভাটা দেখিয়া লইতে ভুলেন নাই; কোন একটা অবয়বের অস্বাভাবিক স্ফীতি বা হীনতা বা অযথা-সন্নিবেশ যেখানে তাঁহার সামঞ্জস্য-বুদ্ধিকে আহত করিয়াছে, সেখানে মৃদু হাস্য ও শ্লেষের দ্বারা সেই ত্রুটি দেখাইতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তৎকর্ত্তৃক প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের

সমালোচনায় ইহার ভূরি প্রমাণ আছে। কিন্তু কেবল বিশ্লেষণের দ্বারা দোষ দর্শন ও হীনতার আবিষ্কার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; সৌন্দর্য্যের আবিষ্কারই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। যে সৌন্দর্য্য অন্যের চোখে প্রকাশ পাইত না, তিনি তাহা বাহির করিয়া আনিয়া দেখাইয়া দিতেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর অধিকাংশ প্রসঙ্গ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে।

বৈজ্ঞানিকের সহিত সাহিত্যিকের একটি স্থানে মিল আছে। ইতর সাধারণ সকলেই সম্মুখে যাহা পড়ে, তাহাই কুড়াইয়া লইয়া সেই কয়টা জিনিষকে জীবনের কাজে লাগাইয়া যেন-তেন-প্রকারেণ তাড়াতাড়ি জীবন-যাত্রায় দৌড়িয়া চলিতেছে; আশে-পাশে যাহা আছে, তাহার প্রতি মনঃ-সংযোগের অবকাশ পাইতেছে না। কিন্তু কয়েক জন লোক এই আশে-পাশে চাহিয়া, অন্যে যাহা দেখে না, তাহাই দেখেন এবং ইতর সাধারণকে যখন দেখান, তখন তাহারা নূতন কি দেখিলাম বলিয়া চমকিয়া উঠে। বৈজ্ঞানিক বলেন, দেখ, এত বাস্তবিক সত্যটা তুমি এত দিন দেখ নাই; ইহা হইতে জীবনের কত প্রয়োজনসিদ্ধি, জীবনযুদ্ধে কত সাহায্য ঘটিতে পারে। সাহিত্যিক বলেন, দেখ, এত সুন্দর দৃশ্যের প্রতি তুমি এত কাল তাকাও নাই; ইহা হইতে কত আনন্দ মিলিতে পারে, জীবনযুদ্ধের আনুষঙ্গিক দুঃখ কত কমাইতে পারা যায়। এক জন যেখানে সত্যের, অন্য জন সেখানে সুন্দরের আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানের ও সাহিত্যের দৃষ্টি একই দিকে; আবার উভয়েই যখন সেই সত্যকে ও সুন্দরকে শিবরূপে প্রতিপন্ন করেন, তখন বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয়েই তত্ত্ববিদ্যার পরম প্রকোষ্ঠে উপনীত হয়।

এই আবিষ্কারের জন্য যে যোগ চাই, তাহা সকলের নাই; কিন্তু একদেশ-দর্শিতা, দৃষ্টিবিভ্রম ও দৃষ্টিবিকার এখানেও সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক উভয়ের কর্ত্তব্যসাধনের প্রধান অন্তরায়। এই অন্তরায় দূর করিতে সাধনা আবশ্যক ও সংযম আবশ্যক; নহিলে উভয়েরই কর্ম্মে প্রমাদ ঘটে। সমালোচকের পথ যে বৈজ্ঞানিকের পথ হইতে বহু দূরে বা ভিন্ন মুখে, তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

বলেন্দ্রনাথের এই সংযম যে প্রচুর পরিমাণে ছিল, তাহা তাঁহার ভাষাতেও যেমন বুঝা যায়, তাঁহার ভাবগ্রাহিতাতেও তেমনই বুঝা যায়। তিনি ভাবের রাজ্যে বিচরণ করিতেন ও ভাবের বায়ুস্তরে উড়িয়া বেড়াইতেন; অথচ আপনাকে একান্ত পরবশ করিয়া, মেরুদণ্ডহীনের মত ভাবের স্রোতে

আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া, আপনাকে শোচনীয় ও কৃপাপাত্র করিয়া তুলেন নাই। এ বিষয়ে তিনি আধুনিক বাঙ্গালায় বহু সাহিত্যসেবীর ও বহুতর সাহিত্য-জীবীর অনুকরণীয় আদর্শস্থল বা শিক্ষাস্থল।

বাঙ্গালা দেশের আধুনিক সাহিত্যের দূষিত হাওয়ায় থাকিয়াও তিনি অস্বাভাবিক ভাবপ্রবণতার সংক্রামক ব্যাধি হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিলেন; ইহাতে তাঁহার সংযম ও নিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন স্বাস্থ্যের ও বলবত্তার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আপনার উপর তাঁহার প্রভুত্ব ছিল; ভাবের বিকারে তিনি আত্মহারা হইয়া যান নাই।

বয়সের সহিত তাঁহার রচনা যেমন গাঢ়তা পাইতেছিল, তেমনই তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা বিকাশ পাইতেছিল। বয়সে বালকত্ব অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই তিনি প্রৌঢ়ের দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার শেষ দিকের রচনা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বালকের চাঞ্চল্য বালকের রচনাতেও অধিক ছিল না; কিন্তু বিদেশী শিক্ষার মোহ হইতেও এই অল্প-শিক্ষিত বালক অনেক অতিশিক্ষিত বৃদ্ধ অপেক্ষা মুক্ত ছিলেন। 'সাধনা' পত্রে প্রকাশিত 'বারাণসী,' 'কণারক,' 'খণ্ডগিরি' ও 'প্রাচীন উড়িষ্যা' প্রভৃতি প্রবন্ধে স্বদেশী সৌন্দর্য্যে অনুরাগ ও প্রীতি আমাকে বলেন্দ্রনাথের যে পরিণতি দেখিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল, অনতিবিলম্বে প্রকাশিত 'প্রাচ্য প্রসাধন-কলা' ও 'নিমন্ত্রণ সভা' সেই পরিণতির দ্রুতত্বে যে আমাকে চমকাইয়া দেয় নাই, তাহা বলিতে পারিব না। এই শেষোক্ত প্রবন্ধটির মধ্যে আমাদের বাঙ্গালী হিন্দু গৃহস্থের অন্তঃপুরের "শ্রীহস্ত" ও "শুভদৃষ্টি," গৃহিণীর "লক্ষ্মীশ্রী" ও "কল্যাণীমূর্ত্তি," আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানের মূলে "শুভ সঙ্কল্প" প্রভৃতি কয়েকটি নূতন কথা পাইলাম, যাহা ইতঃপূর্ব্বে আর কোন শিক্ষিত স্বদেশীর মুখে এমন ভাবে শুনি নাই। জোড়াসাঁকোর যে বৃহৎ অট্টালিকার দিকে নব্যতন্ত্রের বাঙ্গালী সমাজ এত দিন ধরিয়া সময়োচিত নূতন ভাবের ও নূতন তন্ত্রের, এমন কি, নূতন ফ্যাশনের জন্য উন্মুখ হইয়া চাহিয়াছিল,—মনের কথা গোপন নাই বা করিলাম—সেখান হইতে যে এমন কথাগুলি বাহির হইবে, তাহার জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। বৃদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গুরুগম্ভীর উপদেশে নব্য বঙ্গ কর্ণপাত করা উচিত মনে করে নাই; মনীষী রবীন্দ্রনাথ যে মঙ্গলশঙ্খ মুহুর্মুহুঃ ধ্বনিত করিয়া পথভ্রান্ত সকলকে আপন ঘরের লক্ষ্মী-মন্দিরের কল্যাণপীঠের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আহ্বান করিতেছেন,

অধিক দিনের কথা নহে, সে শঙ্খঘোষও তখন শুনা যায় নাই। কাজেই বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে, বাঙ্গালীর গৃহস্থালীতে, সামাজিক প্রথায় ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম্মে যাহা সত্য আছে, যাহা সুন্দর আছে, যাহা শিব আছে, তাহা সহসা সম্মুখে আনিয়া বলেন্দ্রনাথ অন্ধকে দৃষ্টিদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

বলেন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনে যে বিশিষ্টতা ছিল, সেই বিশিষ্টতার গঠন-কর্ম্মে তাঁহার পিতৃব্যের কতটুকু কৃতিত্ব ছিল, আমরা বাহির হইতে ঠিক তাহা বলিতে পারি না। তবে রবিরশ্মির প্রভাব হইতে আপনাকে আচ্ছন্ন রাখা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। অথবা বাঙ্গালার সাহিত্য-জগতের বহু গ্রহ, উপগ্রহ ও বহুতর উল্কাপিণ্ড যাঁহার নিকট হইতে স্থায়ী বা ক্ষণিক প্রভা সংগ্রহ করিয়া দীপ্তি লাভ করিতেছে, বলেন্দ্রের মত অনুগামী ও অনুচরে তাঁহার জ্যোতির আংশিক প্রতিফলনে ক্ষুণ্ণ হইবার হেতু নাই। বরং এত সন্নিধানে অবস্থান করিয়াও তিনি যে তাঁহার নিজস্ব প্রতিভা প্রচুর পরিমাণে দেখাইতে পারিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার সামর্থ্যের বিশিষ্টতা। গদ্য অপেক্ষা পদ্য রচনায় তাঁহার এই নিজস্ব শক্তির স্পষ্টতর পরিচয় মিলে। তাঁহার রচিত কবিতাগুলির মূল্য তাঁহার গদ্য-রচনার সমান না হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার নৈসর্গিক শক্তির ও স্বাতন্ত্র্যের অধিক স্ফূর্ত্তি আছে। অন্ততঃ আধুনিক বঙ্গের অধিকাংশ কবির মত তিনি রবি-প্রতিভায় অভিভূত হন নাই। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ ছিল, সেই সাহিত্যের প্রভাবে তিনি আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া তিনি আপনার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

বলেন্দ্রনাথের জীবনের স্বল্প কাহিনী লিপিবদ্ধ করা আমার কাজ নহে। তাঁহাকে অন্তরঙ্গ ভাবে চিনিবার সুবিধা বা অবকাশ আমার ঘটে নাই। কয়টা দিনের জন্য আমি তাঁহার সম্পর্কে আসিয়াছিলাম। তাঁহাকে মিতভাষী ও মিষ্টভাষী দেখিতাম। তাঁহার রচনায় যে কোমল, স্নিগ্ধ, প্রশান্ত শ্রী ছিল, তাঁহার মুখে চোখে ও কথাবার্ত্তায় তাহা আরও স্পষ্ট দেখা যাইত। এখানে যেন তাহা সমস্ত তারল্য ও চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া আরও ঘনাইয়া আসিয়াছিল। বালকের মূর্ত্তির ভিতর প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য্য দেখিতে পাইতাম ; তাঁহার পরিমিত স্বল্পাক্ষরবদ্ধ উক্তি-প্রত্যুক্তির ভিতর যেন একটা নির্লিপ্ততার ভাব দেখিতাম। তিনি যেন পর্য্যবেক্ষক মাত্র ; সংসারের চক্রে তাঁহাকে যেন

কেহ বাঁধিয়া দিয়াছে; কিন্তু তিনি তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন মাত্র; উহাতে আগ্রহের সহিত যোগ দিতেছেন না। উহার উন্মত্ত কোলাহলে যোগ দিতে তিনি যেন অক্ষম। সংসারের বিচিত্র সৌন্দর্য্যকলার উপভোগের জন্য হয়ত তিনি উপস্থিত আছেন, কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যকে দৃঢ় স্পর্শে আঁকড়াইয়া ধরিবার তাঁহার ইচ্ছা নাই।

তাঁহার গদ্য-রচনায় তিনি নিজের উপর যতটা কর্ত্তৃত্ব রাখিয়াছিলেন, কবিতাগুলিতে তাহার কিছু অভাব দেখা যায়। ইহাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিকে, বিশেষতঃ মানসিক সৌন্দর্য্যের দিকে একটা ভাবপ্রবণ আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। সৌন্দর্য্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা মাত্র বলিব, তৃষ্ণা বা লালসা বলিব না। কিন্তু তাহার যেন তৃপ্তিতে পর্য্যবসান হইতেছে না। সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই যেন থাকিয়া গেল, যেন মধ্যপথ হইতে সহসা কোন অদৃশ্য হস্ত আসিয়া তাঁহাকে নিঃশব্দে সরাইয়া লইয়া গেল।

বিচিত্র প্রসঙ্গ

প্রথম পর্য্যায়

[১৯১৪ সনে প্রকাশিত]

আমার নিবেদন

দুই বৎসর ধরিয়া আমার দেহ অবসন্ন। আমার মগজের ভিতর যে কথাগুলা প্রকাশ পাইবার জন্য কিলবিল করিতেছিল, অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত সেগুলাকে বাহির করিয়া দিলেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি ঋণী। নতুবা হয়ত উহা কোন কালেই বাহির হইত না।

বাহির না হইলে হয়ত ভালই হইত। অসুস্থ দেহে বিপিন বাবুর সহিত কথা কহিতে কহিতে যা কিছু মনে আসিয়াছে, তাই বলিয়া গিয়াছি। প্রাসঙ্গিক হইল কি না, বিবেচনা করি নাই। কেবল স্মরণশক্তির উপর ভর দিয়াই বলিয়াছি; পুঁথিপত্র দেখিয়া মিলাইতে পারি নাই। সে জন্য যদি ভুলচুক ঘটিয়া থাকে, তাহা থাকিয়াও গেল।

যাহা কিছু বলিয়াছি, উহার অধিকাংশই আমার suggestion মাত্র; সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহাকেও বলি না। সিদ্ধান্ত খাড়া করিতে যে প্রমাণ প্রয়োগ আবশ্যক, তাহা ইহাতে নাই; আমার মনে যাহা আছে, সব কথা বলিতেও পারি নাই। কথাচ্ছলে ইহার অধিক সম্ভবও হয় নাই। যদি আমার উক্তির মধ্যে কিছু পদার্থ থাকে, অন্যে প্রমাণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা ফলাইয়া তুলিবেন; এই আমার আশা।

আমার বিবেচনায় বেদপন্থীর ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ misconception চলিত আছে; এতদ্দ্বারা যদি তা'র কিছু নিরাকরণ হয়, তাহা হইলেই আমার প্রচুর পুরস্কার হইবে। আমি বেদপন্থার ভিত্তি নিরূপণে কতকটা প্রয়াস করিয়াছি; বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় পন্থার সহিত তাহার সম্পর্ক দেখাইবারও কতকটা চেষ্টা করিয়াছি। আমার এই চেষ্টায় যদি কোন আঁধার জায়গায় আলো পড়ে, তাহা হইলেই আমার অভীষ্ট সাধিত হইবে।

এত বড় কথাগুলা এত অল্প চেষ্টায় বুঝান যায় না। আমিও যে বুঝাইতে পারিয়াছি, এমন দুঃসাহস করি না। ভাষার দোষে অনেক জায়গায় হয়ত অসঙ্গতি বাহির হইবে। আমার বন্ধুগণ হয়ত বহু স্থলে আমার মতিভ্রমের আশঙ্কা করিবেন। তবে নিজের পক্ষে এইটুকু বলিতে পারি যে, যে-কথাগুলা বলিয়াছি, আমার মনের মধ্যে তাহার মধ্যে কোন অসঙ্গতি নাই। আমার নাই বলিয়া অন্যকেও মানিয়া লইতে হইবে, এরূপ অন্যায় আবদার করিব না।

ভাষার সম্বন্ধে একটু বলিবার আছে। অনেক ইংরেজী শব্দ কথার মুখে ব্যবহার করিতে হইয়াছে। বিপিন বাবুও তাহার কতক রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা

রুচিবিরুদ্ধ। সাহিত্য-পরিষদের স্থাপনার সময়ে ৺রাজনারায়ণ বসু পরিষদে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন—"বাঙ্গালার মধ্যে যে ব্যক্তি ইংরেজী শব্দের ব্যবহার করে, **he should be hung, drawn, and quartered.**" ঠিক কথা, উহাই উচিত শাস্তি ; তবে রাজনারায়ণ বাবুও বাঙ্গলা চিঠিতে ঐ উপদেশ দিতে গিয়াও ইংরেজী ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে। তিনি যদি এ যাত্রায় নিষ্কৃতি পান, আমিও পাইতে পারি।

কলিকাতা
ভাদ্র ১৩২১

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

শ্রাবণ মাসে এক দিন অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের কক্ষে বসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছিলাম। কবিবর "শ্রাবণে ডেপুটিপনায়" আপত্তি করিয়াছেন, রুদ্ধ কক্ষে আলোচনায় আপত্তি ত করেন নাই। বাহিরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল। রোগশয্যায় শুইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে রামেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"আমার অনেক কথা বলিবার ছিল; বোধ হয় আর বলা হ'ল না। আমাদের দেশের ইতিহাসের কথা, ব্রাহ্মণ্য সমাজের কথা আমার অনেক বলিবার ছিল। যখন সামর্থ্য ছিল, তখন লিখিলাম না; লিখিতে পারিলে হয়ত দুটো নূতন কথা শুনাইতে পারিতাম।"

আমি বলিলাম,—"আজ পর্য্যন্ত একটা ভাল রকম ভারতবর্ষের ইতিহাস রচিত হইল না, ইহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে! মারামারি, কাটাকাটি, বিপ্লব, বিদ্রোহ, হুণ, শক, মোগল, পাঠান, এ সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তবুও যেন যথার্থ ভারতবর্ষের ইতিহাসটাকে সমগ্রভাবে, যথার্থভাবে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। প্রথম প্রথম য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী একরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, এ দেশের প্রাচীন তথ্য আবিষ্কার করিয়া একখানা ইতিহাস খাড়া করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের আগমনের পূর্ব্বে ভারতের ইতিহাস লুপ্ত। ইদানীং দেখিতেছি, কেহ কেহ প্রাচীন খোদিত লিপি ও মুদ্রার সাহায্যে কিছু কিছু নূতন কথা শুনাইতেছেন; কেহ কেহ বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারতের সাহায্যে আমাদের ইতিহাসের ধারা নিরূপণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু আর্টের দিক্ হইতে, ললিত কলার দিক্ হইতে ভারতের সভ্যতার ক্রমবিকাশ কেহ যে আজ পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, এমন ত আমার বোধ হয় না। অথচ নব নব যুগের নবীন ভাবোন্মেষের প্রভাবে সেই যুগের cultural development কতটা হইয়াছিল, তাহা সেই সময়ের সুকুমার কলায় যতটা ধরা পড়ে, এমন আর কিছুতেই ধরা পড়ে না। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক এত দূর বিকৃত হইয়াছে যে, আমরা আমাদের প্রাচ্য সুকুমার কলার

নাম শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চিত করি। ইটালীয় ও গ্রীসীয় আর্টকেই আমরা বরণ করিয়া লইয়াছি। আর আমাদের ভাবুক সাধকের হৃদয়-পদ্মাসনে "কোন দূর অতীতের কোন এক অখ্যাত দিবসে" সমগ্র জনগণপতির কলাবধূ আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, আজ সে কথার আলোচনা করিবার অবসর পর্য্যন্ত কাহারও নাই। আমরা তাঁহাকে বিস্মৃতির অতল জলে বিসর্জ্জন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম; সহসা কোথা হইতে এক জন বিদেশী পূজারী আসিয়া তাঁহার অলক্তকরাগ-রঞ্জিত চরণচিহ্নের প্রতি জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। হ্যাভেল সাহেবের পুস্তক পাঠ করিয়া বিলাতের 'টাইম্‌স্‌' চমকিয়া উঠিয়াছে, প্রয়াগের 'পাইয়োনীয়র' অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলেন, ভারতের কলালক্ষ্মীকে মুসলমান বরণ করিয়া লইয়াছিল। আগ্রার তাজমহল এত দিন Saracenic artএর চরম উৎকর্ষের দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছিল; হ্যাভেল সাহেব জিজ্ঞাসা করেন,—চারি কোণে চারিটি ছোট গম্বুজ আর মধ্যস্থলে বড় গম্বুজ,—জগতের Saracenic artএর এরূপ দৃষ্টান্ত আর আছে কি? অথচ ভারতের পূর্ব্বতন শিল্পশাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়; হিন্দু শিল্পীরা তাজ গড়িয়াছিল হিন্দু শিল্পের আদর্শে, এত বড় কথাটা এত দিন আমরা কেহই ধরিতে পারি নাই। কিন্তু এই শিল্পকলার মধ্যে আর্য্য জাতির ইতিহাস কিরূপ ভাবে প্রচ্ছন্নস্তরবিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, সে কথা ভাবিয়া দেখিবার সময় বোধ হয় আসিয়াছে। এই যে আমাদের বঙ্গদেশের অনতিদূরে জগন্নাথদেবের মন্দির রহিয়াছে, ইহার সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হইয়াছে কি? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের কৌতূহল অল্পেই নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইজিপ্টের স্বপ্নাবিষ্ট Sphinx মূর্ত্তির সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণামূলক আলোচনা পণ্ডিতসমাজে হইয়াছে; কিন্তু উড়িষ্যার জগন্নাথদেবের মন্দিরগাত্রে বীভৎস erotic figuresএর সমাবেশ কেন হইল, এই প্রশ্ন উত্থিত হইবা মাত্রই আমরা তাহাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিয়াছি; অনেকে স্থির করিয়াছেন যে, উহা আর কিছু নহে, কেবল মাত্র হিন্দুর জাতীয় চরিত্রাপকর্ষের নিদর্শনস্বরূপ হিন্দুর দেবমন্দিরে চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি তাই?

রামেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"আপনি আজ যে প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলেন, সে সম্বন্ধে আমি একটু ভাবিয়া দেখিয়াছি। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির-গাত্রে ঐ সকল বীভৎস মূর্ত্তি থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের নরনারী পুত্রকন্যা-

সমভিব্যাহারে সেই মন্দির দর্শন করিতে আসেন ; কখনও কাহারও কোনও দ্বিধাবোধ হয় না। শুধু পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে কেন, ভুবনেশ্বরের শিবমন্দিরে,—কণারকের সূর্য্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষে এই প্রকার বীভৎস মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়।”

আমি বলিলাম,—“তমলুকের বৃহৎ প্রাচীন বর্গভীমাদেবী-মন্দিরের গাত্রে এক স্থানে ঐ প্রকার একটি বীভৎস মূর্ত্তিসমাবেশ ছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।”

রামেন্দ্রবাবু বলিলেন,—“নিশ্চয়ই উড়িষ্যার শিল্পকলার উহা একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। যদি অন্যত্র কোথাও ঐরূপ মূর্ত্তিসমাবেশ দেখা যায়, তাহা হইলে মনে করা যাইতে পারে যে, সে সকল উড়িষ্যার শিল্পকলার অনুকরণের ফলস্বরূপ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি একখানি পুরাতন পুঁথি পাইয়াছেন ; বোধ হয়, খ্রীষ্টীয় দশম, কি একাদশ শতাব্দীর হইবে, তাহাতে শিল্পশাস্ত্রের নিয়মাবলী বিবৃত রহিয়াছে ; মন্দির-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত আছে। মন্দির-গাত্র সুশোভন করিবার জন্য এইরূপ erotic figures-এর আবশ্যকতা লিপিবদ্ধ করা আছে। উড়িষ্যার দেবমন্দিরগুলি যাঁহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই শিল্পশাস্ত্রের নিয়মানুসারে গঠন-কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া দেশী ও বিদেশী কোনও কোনও মনীষী কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার *Antiquities of Orissa* নামক গ্রন্থে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা আমার জানা নাই ; কিন্তু যত দূর স্মরণ হয়, সার্ উইলিয়ম হণ্টার তাঁহার উড়িষ্যার বিবরণীতে এই সকল মূর্ত্তি বৈষ্ণবধর্ম্মসম্পৃক্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, জগন্নাথের মন্দির বৈষ্ণবদের প্রধান মন্দির, প্রধান তীর্থ ; কাজেই সেখানে যে বৈষ্ণবের সাধনা-পদ্ধতির অনুরূপ আদিরসাশ্রিত চিত্র চিত্রিত হইবে, ইহার আর বিচিত্র কি ?

“কিন্তু সার্ উইলিয়ম হণ্টারের এই সিদ্ধান্ত বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। প্রধান আপত্তি এই যে, রাসলীলা, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি বৃন্দাবনলীলার কোনও কিছুরই আভাস এই সকল মূর্ত্তির সমাবেশের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না ; কোনও প্রকারেই এগুলিকে কোনও একটা বিশিষ্ট ধর্ম্মভাবের সহিত সম্বন্ধ বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে না।

এই চিত্রগুলা এতই জঘন্য, এতই অশ্লীল যে, ইতর সাধারণ নরনারীর কুৎসিত পাশবতা ব্যতীত আর কিছু বলিয়া মনে হইতে পারে না। এগুলার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বোধ হয়, কোনও বৈষ্ণবেরও মনে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠিবে না। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যদি ইহা বৈষ্ণবঘটিত ব্যাপারই হইবে, তাহা হইলে ভুবনেশ্বরের শিবমন্দিরের ও কণারকের সূর্য্যমন্দিরের গাত্রে ঐরূপ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল কেন ?

"হণ্টারের কথা ছাড়িয়া দিই ; বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার অনুমান অমূলক। আর একটা মত পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। কেহ কেহ এই মূর্ত্তিগুলির সহিত লিঙ্গপূজার (phallic worship) সম্পর্ক পাতাইতে পারেন।

"লিঙ্গপূজা জগৎব্যাপী, এ কথা সত্য। সভ্যতার আদিম যুগে মানবের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল,—সৃষ্টিতত্ত্ব, এখনও আমরা কি সেই সৃষ্টি-প্রহেলিকা সম্বন্ধে শেষ কথা বলিতে পারিয়াছি! কিন্তু তখন মানুষ সৃজন-প্রক্রিয়ার স্থূল symbolএর পূজা করিয়া সৃজন-রহস্যের সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়াছিল। সর্ব্বত্র লিঙ্গপূজা প্রচলিত হইল।

"প্রাচীন মিশরে লিঙ্গপূজা নানা আকারে প্রবর্ত্তিত ছিল। বিশেষতঃ আইসিস অসাইরিসের পূজায় ভারতবাসীর একটু ভাবিয়া দেখিবার জিনিষ আছে। ঈর্ষাপরবশ দৈত্য অসাইরিসকে বধ করিয়া তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া নীল নদের ধারে ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিল ; স্বামীকে অন্বেষণ করিতে বাহির হইয়া আইসিস একটি একটি করিয়া তাঁহার মৃত স্বামীর দেহখণ্ড খুঁজিয়া বাহির করিলেন ; তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তিনি তাঁহার স্বামীর একটি অঙ্গ কোথাও পাইলেন না। মিসরের অধিবাসী কিন্তু আইসিস অসাইরিসের পূজায় লিঙ্গপূজার ব্যবস্থা করিয়া সে সমস্যা পূরণ করিয়া লইল। আইসিস সব পাইলেন, কিন্তু সৃজন-রহস্যের নিগূঢ় তত্ত্বটিকে আবিষ্কার করিতে পারিলেন না ; যদি পারিতেন, তাহা হইলে জীব হয়ত মুক্তিতত্ত্বও বুঝিতে পারিত। কিন্তু সেই বিপুল রহস্য মিসরবাসীর নিকট চিরকালের হেঁয়ালি রহিয়া গেল। কেবল অসাইরিসের দেহখণ্ড যেখানে যেখানে নিপতিত ছিল, সেই সকল স্থান মিসরের পীঠস্থানরূপে পরিণত হইল।

"ভারতবর্ষের বায়ান্ন পীঠের কথা মনে পড়ে না কি ? কাহিনীটি ভারতে ও মিসরে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। সেখানে স্ত্রী স্বামীর দেহের

খণ্ডাংশগুলির অন্বেষণ করিতেছেন; এখানে ঠিক তাহার বিপরীত। অসাইরিসকে মিসরবাসীরা কখনও মেষ, কখনও বা বৃষরূপে কল্পিত করিয়াছে; আইসিসকে ভগবতী গাভীরূপে পূজা করিয়াছে। আবার এমন এক দিন ছিল, যখন আইসিস দেবী সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন,—সঙ্গিহীনা, কাহাকেও তিনি স্বামিরূপে বরণ করেন নাই; একাকিনী আপন মায়াপ্রভাবে একটি পুত্র প্রসব করিলেন, এবং সেই শিশুটিকে শরবনে স্তন্য পান করাইয়াছিলেন। এক দিন সেই পুত্র তাহার পিতৃহন্তারক টাইফন দৈত্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। আমাদের দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের জন্মকথা মনে পড়িয়া যায় না কি?

"দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞোৎসব উপলক্ষে যখন মহা ধুমধাম হইতেছিল, তখনই সতীর দেহত্যাগ হয়। পিঙ্গলকেশ, শ্বেতচর্ম্ম, টাইফনও আনন্দোৎসবের মধ্যে অসাইরিসকে হত্যা করিয়াছিল; দিগ্বিজয় করিয়া অসাইরিস প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর টাইফন তাঁহাকে একটি বৃহৎ ভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন; বহু রাজকর্ম্মচারীও উপস্থিত ছিল; সেখানে কৌশল করিয়া তাঁহাকে একটি সিন্দুকের মধ্যে পূরিয়া ফেলা হয়। পরে তাঁহার দেহ দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া চারি দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া দিল।

"কিন্তু আসল কথাটি এই যে, অসাইরিস প্রথমে ভগবান্ বৃষরূপে পূজিত হইয়াছিলেন; পরে তাঁহার পূজা লিঙ্গপূজায় পরিণত হইয়া দাঁড়াইল।

"এ ত গেল মিসরের কথা। আসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, প্যালেষ্টাইন, সর্ব্বত্রই কোনও-না-কোনও আকারে লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। গ্রীকদিগের ডাইওনীসিয় উৎসব, রোমানদিগের ব্যাকাস-পূজা, সর্ব্বত্রই ঐ ব্যাপার দৃষ্ট হয়; রোমের গণতন্ত্র রাষ্ট্রের শেষাবস্থায় ও সাম্রাজ্যের প্রথমাবস্থায় ইহার বেশী বাড়াবাড়ি হইয়াছিল।

"ভারতবর্ষের বৈদিক সাহিত্যে লিঙ্গপূজার কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল যতটা স্মরণ হয়, ঋগ্বেদের এক স্থানে একটা শব্দ আছে 'শিশ্নদেবাঃ'। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এই কথাটিকে লিঙ্গপূজক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ইহার অর্থ সায়ণাচার্য্য অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, উহার অর্থ কদাচারী মানুষ; উহার অর্থ লিঙ্গপূজা নহে।"

রামেন্দ্রবাবু একটু চুপ করিলেন। আমি বলিলাম দেখুন, "দাক্ষিণাত্যের *East and West* পত্রিকা যে বৎসর প্রথম প্রকাশিত হইল, সেই বৎসর

Artaxerxes নাম স্বাক্ষর করিয়া এক ব্যক্তি ওঁ শব্দের এক চমৎকার অর্থ বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে উহা আর কিছুই নহে—"সৃষ্টি-রহস্তের আনন্দের পরিচায়ক বৃষের আনন্দধ্বনি মাত্র!" একটু হাসিয়া রামেন্দ্রবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"আমি বলিতেছিলাম যে, বৈদিক-সাহিত্যে লিঙ্গপূজার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না; তবে বৈদিক সময়েও symbol of reproduction ব্যবহৃত হইত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে আছে। যজমান যখন যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহার পুনর্জন্ম হইত। সাহিত্য-পরিষদের জন্য যখন আমি ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুবাদ করিয়াছিলাম, তখন এ বিষয়ে আমার কৌতূহল জাগিয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে সেই পুনর্জন্ম ব্যাপারটিকে যজ্ঞের নানাবিধ অনুষ্ঠানের সঙ্গে স্ত্রীপুরুষ-সংসর্গঘটিত নানা প্রক্রিয়ার বর্ণনার দ্বারা বুঝান হইয়াছে। যদি কাহারও কৌতূহল হয়, তিনি আমার অনুবাদিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রবর্গ্য নামক অনুষ্ঠানের বিবরণ পাঠ করিলেই ব্যাপারটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

"পরবর্ত্তী যুগে সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে যে জগতের উৎপত্তি, এই তত্ত্বটি বৈষ্ণবেরা এক দিকে ও শাক্তেরা অন্য দিকে ফুটাইয়া তুলিলেন। বেদান্তের মায়াও স্ত্রীরূপে কল্পিত হইয়াছেন। বেদান্তের ব্রহ্ম হইলেন সাংখ্যের পুরুষ; বেদান্তের মায়া হইলেন সাংখ্যের প্রকৃতি। বৈষ্ণব ও শাক্ত বিভিন্ন দিক্ হইতে এই ভাবটি পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে, শাক্তেরা ঐ মায়া বা প্রকৃতিকে সৃজনীশক্তি বা বিশ্বজননী ভাবে কল্পনা করিয়া সেই দিক্ হইতে সে তত্ত্বকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন; তাঁহাদের মতে বেদান্তের ব্রহ্ম সাংখ্যের পুরুষের মত মায়া বা প্রকৃতিতে উপগত হইয়া সৃজন করিয়াছেন। বৈষ্ণবেরা কিন্তু ঐ মায়া বা প্রকৃতিকে ব্রহ্মের অথবা পুরুষের হ্লাদিনী শক্তিরূপে কল্পনা করিয়া লীলার দিক্ হইতে, আনন্দের দিক্ হইতে সেই ভাবটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন;—লীলাময় পুরুষ আপনার মায়ার সংযোগে আনন্দ অনুভব করেন; মায়ার সহিত তিনি এইরূপ নিত্য-সম্বন্ধ আছেন বলিয়াই তিনি আনন্দময় পুরুষ। আধুনিক বৈষ্ণব ও শাক্ত—বিশেষতঃ বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি তান্ত্রিক বৈষ্ণব ও বামাচারী, কৌলাচারী প্রভৃতি তান্ত্রিক শাক্ত,—এই ভাবটিকে এত নূতন

রকমে পল্লবিত করিয়া তুলিয়াছেন যে, তাহাতে অনেকের জুগুপ্সার সঞ্চার হয়।

"কেহ কেহ বোধ হয় মনে করিয়া থাকেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মে এই সকল ভাব প্রবেশ করা নিশ্চয়ই অসম্ভব। সেখানে হ্লাদিনী কিংবা বিশ্বজননী শক্তির স্থান কোথায়? কিন্তু একটু স্থির হইয়া পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যাহা অসম্ভব বিবেচিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের স্তরে স্তরে এই সকল ভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

"যাঁহারা বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের শরণ লইতে হইত;—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। কালক্রমে কিন্তু একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল,—'ধর্ম্ম' রূপান্তরিত হইয়া 'প্রজ্ঞা' নামে পরিচিত হইলেন; প্রজ্ঞার স্ত্রীমূর্ত্তি কল্পিত হইল। বুদ্ধও বেদান্তের ব্রহ্ম বা সাংখ্যেব পুরুষ হইয়া দাঁড়াইলেন। ধর্ম্ম প্রজ্ঞা নামে পরিচিত হইয়া বেদান্তের মায়া বা সাংখ্যেব প্রকৃতির তুল্য হইয়া গেলেন। এইরূপে মহাযানী বৌদ্ধমত সৃষ্ট হইল। কণিষ্কের সময়ে এই মহাযানী বৌদ্ধমত যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল।

"এই মহাযানী বৌদ্ধমতেব পরিণাম হইল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম। অল্পে অল্পে ক্রমশঃ এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্মকে জনসাধারণেব গ্রাহ্য করিবার জন্য নানা নূতন তত্ত্ব ও নূতন অনুষ্ঠান দেশ বিদেশ হইতে আনিয়া উহার মধ্যে স্থান দিতে হইল।

"দেখিতে দেখিতে বৌদ্ধ মহাযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিল। সেই সকল দলের মধ্যে নানা প্রকার গোপনীয় তান্ত্রিক অনুষ্ঠান প্রবেশ লাভ করিল। ফলে দাঁড়াইল এই যে, আমাদের এই হিন্দু সমাজের বহু তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সেই সকল বৌদ্ধ অনুষ্ঠানের নামান্তর মাত্র। বৌদ্ধ তন্ত্র ও হিন্দু তন্ত্র, কে কাহার নিকট ঋণী, ইহা লইয়া একটা বিবাদ আছে। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বিস্ময়জনক। এই সকল মতের ও অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেকেরই বৈদিক মূল আবিষ্কার করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু স্বদেশের ও বিদেশের অনেক অনার্য্য অনুষ্ঠানও যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে সংশয় করা কঠিন। হিন্দু সমাজ সেই অনার্য্য অনুষ্ঠানগুলির জন্য বৈদিক আচারের নিকট ঋণী নহে; বরং দেখা যায় যে,

বৈদিক আচারের সহিত এই সকল তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের যেন একটা বিরোধ রহিয়াছে। অন্ততঃ এই সকল হিন্দু তন্ত্র বৌদ্ধ তন্ত্রের নিকট ঋণী মনে করা যাইতে পারে।

"সভ্য জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যেখানেই monastic life, সন্ন্যাসী সঙ্ঘ গঠিত করা হইয়াছে, সেইখানেই গোল বাধিয়া গিয়াছে। বুদ্ধ যখন সন্ন্যাসিসঙ্ঘ গড়িয়া তুলিলেন, তখন স্ত্রীলোকের সংস্রব থাকিবে না, এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ও মাতা সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; অগত্যা তিনি রাজি হইলেন; কিন্তু তিনি তখনই বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম তাঁহার আশানুরূপ স্থায়িত্ব লাভ করিবে না।

"এ বিষয়ে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণসম্প্রদায় অত্যন্ত সাবধান ছিলেন। একটা জিনিষ প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম দলবাঁধা সন্ন্যাসীর প্রশ্রয় দেয় না। আর এই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করা অতি সহজ ব্যাপার ছিল না। সন্ন্যাস আশ্রম দ্বিজাতির শেষ আশ্রম; বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে তবে সন্ন্যাস আশ্রমের সম্ভাবনা হইত; বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর চরিত্রগত দৌর্ব্বল্যের তেমন আশঙ্কা ছিল না। আর একটি সুন্দর অথচ কঠোর ব্যবস্থা ছিল। সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বানপ্রস্থ আশ্রমের ব্যবস্থা ছিল। গৃহস্থ প্রৌঢ় বয়সে উপস্থিত হইলে পৌত্রমুখ দর্শন করিয়া, একাকী কিংবা সস্ত্রীক বনে গমন করিতে পারিতেন। বানপ্রস্থ আশ্রমে তাঁহার ভিক্ষা করিবার অধিকার নাই; লোকালয় ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতে হইত; বনজাত ওষধি ও ফলমূলদ্বারা জীবন ধারণ করিতে হইত; কঠোর তপশ্চর্য্যারও ব্যবস্থা ছিল। আমার মনে হয়, এই সমস্ত কঠোর বিধিব্যবস্থা ছিল বলিয়া যে-সে লোক হঠাৎ বনে যাইতে পারিত না। এই বানপ্রস্থের পর যিনি যখন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতেন, তখন তিনি ভিক্ষার অধিকারী হইতেন; তখন তিনি লোকালয়ে আসিতে পারিতেন; তখন আর তাঁহার যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা, কোনও কিছুরই আবশ্যকতা থাকিত না।

"বেদে কিন্তু একটা ফাঁক ছিল। সেখানে দেখিতে পাই,—যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ। অর্থাৎ যখনই প্রকৃত বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, তখনই প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। এই কথার উপর নির্ভর করিয়া

অনেকেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অথবা গৃহস্থাশ্রম হইতেই একেবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিত। কালক্রমে অনেকগুলি সন্ন্যাসীর দল সৃষ্ট হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বেই আজীবক, নিগ্রন্থ প্রভৃতি কতকগুলি সন্ন্যাসীর দল আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু মোটের উপর আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র যে-কোনও ব্যক্তির যে-কোনও বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুকূল নহে। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অদ্বয়বাদ রক্ষার ও প্রচারের জন্য দেশ জুড়িয়া যে সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় গঠন করেন, তাহা বৌদ্ধগণের অনুকরণ।

"বুদ্ধ কিন্তু গোড়া হইতেই নূতন পন্থা অবলম্বন করিলেন। প্রথমতঃ, জাতিনির্ব্বিশেষে, অধিকারী অনধিকারীর নির্ব্বাচন না করিয়াই তিনি সকলকেই বৌদ্ধ ভিক্ষুসম্প্রদায়ভুক্ত করিলেন ; দ্বিতীয়তঃ, যুবা হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত যে-কোনও বয়সের যে-কোনও ব্যক্তিকে তিনি নিজ সম্প্রদায় মধ্যে টানিয়া আনিলেন ; তৃতীয়তঃ, স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সকলকেই তিনি শিষ্য করিতে লাগিলেন ; চতুর্থতঃ, দলবদ্ধ সন্ন্যাসিসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিল। এই সকল সন্ন্যাসীর দল বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ে নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইত। বর্ষাকালে কয়েক মাস তাহারা একত্রে কোথাও বসবাস করিত। কাজেই ভূসম্পত্তির আবশ্যকতা অনুভূত হইল। অনাথপিণ্ডকের নিকট হইতে স্বয়ং বুদ্ধই ভূমি গ্রহণ করিলেন ; সেই ভূমির উপর সন্ন্যাসীদিগের বাসোপযোগী সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হইল। অনেক ধনী গৃহস্থ উপাসক ও উপাসিকা ঐ সঙ্ঘের জন্য সঙ্ঘারাম, বিহার ইত্যাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। ভূসম্পত্তি, সঙ্ঘারাম, বিহার ইত্যাদি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইল। এমনি করিয়া বৌদ্ধসঙ্ঘ মধ্যে communism প্রবেশ করিল।

"এমন অবস্থায় কঠোর শাসনের ব্যবস্থা না করিলে গোলযোগের যথেষ্ট সম্ভাবনা। য়ুরোপের মঠগুলিতে যেমন abbots, prior প্রভৃতি নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল, এই সকল বিহারেও সেই প্রকার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের মধ্যে বিনয়পিটকে এই সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ করা আছে। অনেকে আমাদের হিন্দুসমাজের ব্রত-নিয়মাদির কঠোরতা দেখিয়া মনে করেন যে, হিন্দুশাস্ত্র মানুষকে অত্যন্ত কড়া শাসনে রাখিতে চাহিয়াছিল ; বৌদ্ধ বিনয়পিটকের শাসনের সহিত হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনের তুলনায় সমালোচনা যদি তাঁহারা করেন, তাহা হইলে ভাবিবার কথা অনেক পাইবেন।

"বিহার ও সঙ্ঘারাম স্থাপিত হইল; শাস্ত্রগ্রন্থও রচিত হইল; কিন্তু সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া সঙ্ঘের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ, তর্ক-বিতর্ক হইতে লাগিল; সঙ্ঘের ছোট বড় যাবতীয় অনুষ্ঠান লইয়াই তর্ক উঠিত; ধর্ম্মের doctrine লইয়াও বাদানুবাদ হইত। ইহার কারণ আর কিছু নহে, বৌদ্ধধর্ম্মের কোনও Revealed Scriptures ছিল না, বুদ্ধের কথার উপর নির্ভর করিতে হইত; কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার বাক্য লিপিবদ্ধ করা হয় নাই, তিরোভাবের পরে হইয়াছিল। এই সকল বাদানুবাদের ফলে অনেকগুলি সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল। গোল মিটাইবার জন্য বৌদ্ধ-সম্রাট্‌গণের আদেশে মহাসভা আহূত হইত। কণিষ্কের আহূত সভার পূর্ব্বেই বৌদ্ধ-সঙ্ঘ বহু সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

"একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে;—বুদ্ধ নিজে একটা নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নূতন কিছু করেন নাই। কোন বেদবিরুদ্ধ আচার প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। হিন্দুসমাজে ধর্ম্মসূত্র, গৃহ্যসূত্র, সাময়াচারিক সূত্র প্রভৃতি বৈদিক সূত্রে বা ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা আছে, মোটামুটি তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম দেশে বিদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল; চীন, তিব্বত, পারস্য, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিল; তখন হইতেই বেদবিরুদ্ধ আচার ভারতের দেশাচারের সহিত মিশ্রিত হইল। বাকৃত্রীয় গ্রীক জাতি বৌদ্ধ হইয়া গেল; শকেরাও বৌদ্ধ হইল। কিন্তু গ্রীকেরা মূর্ত্তিপূজক ছিল; শকেরাও মূর্ত্তিপূজা করিত; কিন্তু যখন তাহারা বৌদ্ধ হইয়া গেল, তখনও মূর্ত্তিপূজা পরিত্যাগ করিতে পারিল না; চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া বুদ্ধের অস্থি পূজা, ভস্ম পূজা এবং পরে বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা আরম্ভ করিয়া দিল। ব্যাবিলন, ফিনিশিয়া, ফ্রিজিয়া, সাইপ্রস প্রভৃতি স্থানে Astarte Cybele প্রভৃতি দেবীর পূজায় নানা বীভৎস অনুষ্ঠান ছিল; এই সূত্রে তাহা ভারতবর্ষে কত দূর প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। এশিয়ার পশ্চিমে ও য়ুরোপের পূর্ব্বাংশে সেকালে এক Mother of the Gods পূজা পাইতেন। তান্ত্রিক শক্তি-পূজার ও মাতৃ-পূজার সহিত ইহার কতটা সম্পর্ক কে জানে? লিঙ্গপূজা মিসরদেশ হইতে আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ লাভ করিল, কি দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়দিগের নিকট হইতে আসিল, ইহারও আলোচনা হয় নাই।

"অশোকের রাজত্বকালে মিসর, কাইরীনি, গ্রীস প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ প্রচারক গিয়াছিল। নানা প্রকারে ভারতবাসী বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসিল। গ্রীক, শক, কুশান, হূণ আর্য্যাবর্ত্তে দেখা দিল; বহু কাল রাজত্ব করিয়া ভারতবাসীর সহিত তাহারা মিশিয়া গেল। ইহাদের সহিত নানাবিধ বৈদেশিক mystery সকল ভারতের ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়াছিল; সে বিষয়ে সংশয় করা কঠিন।

"কিন্তু, সন্ন্যাসধর্ম্মের কথা বলিতেছিলাম;—আর্য্যাবর্ত্তের সন্ন্যাসধর্ম্ম মিসরের ও প্যালেষ্টাইনের ভিতর দিয়া য়ুরোপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, ইহা না মানিলে বোধ হয় উপায় নাই।

"যীশুখ্রীষ্টের জন্মের কিছু পূর্ব্বে প্যালেষ্টাইনে "এসীনি" নামক সন্ন্যাসীর দল ও মিসরে "থেরাপিউট" সন্ন্যাসীর দল আবির্ভূত হইয়াছিল। কয়েকটি নূতন doctrine আমাদের দেশ হইতে য়ুরোপে রপ্তানি হইল, মনে করা যাইতে পারে।

"প্রথমে দেখুন—Doctrine of Regeneration: এটি খাঁটি বৈদিক তত্ত্ব; যজ্ঞে দীক্ষা হইলেই নবজীবন লাভ হইত। যজ্ঞের উদ্দেশ্যও—দেবরূপে নূতন জন্ম লাভ।

"আর একটা দেখুন—Doctrine of Logos: বেদের শব্দব্রহ্ম; শব্দ বা বাক্যই ঈশ্বর; ঋগ্বেদসংহিতায় দশম মণ্ডলে দেবীসূক্তের এইটি স্পষ্ট তাৎপর্য্য।

"পুনশ্চ দেখুন—Doctrine of atonement: বেদে ইহার পূর্ণ পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায়। পশুযজ্ঞে যজমানের প্রতিনিধি বা নিষ্ক্রয়-স্বরূপে পশুকে যজ্ঞে অর্পণ করা হইত (Vicarious sacrifice); ঐতরেয় ব্রাহ্মণের আখ্যায়িকার মতে পশুমাংসের পরিবর্ত্তে পুরোডাশের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সোমযজ্ঞে সোমরসের সহিত পশুমাংস এবং পুরোডাশ (অর্থাৎ চাউল কিংবা যবের পিষ্টক) আহুতি দেওয়া হইত; পরে সোমরসের অবশেষের সহিত সেই মাংসের এবং পুরোডাশের অবশেষটুকু সেবন করিলে যজমানের দেবত্ব লাভ হইত। Roman Catholic Massএর কথা মনে পড়ে না কি?

"আর একটা কথা—Doctrine of Incarnation: অবতারবাদ। দেবতার ঔরসপুত্র মানুষ হইতে পারে, গ্রীক ও রোমানেরা মানিত। দেবতা

স্বয়ং মানুষ হন, এতটা বোধ করি মানিত না। ইহাদিগের পক্ষে এ কল্পনা অসম্ভব। ভারতবর্ষে দেবতায় ও মানুষে বিশেষ ভেদ নাই। মনুষ্য মাত্রই দেবতা ; ঈশ্বরও যখন-তখন মানুষ হইয়া নামিতে পারেন।”

রামেন্দ্রবাবু একটু চুপ করিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া কখন রাত্রে পরিণত হইয়াছে, তাহা এত ক্ষণ লক্ষ্য করা হয় নাই। তখনও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল। ভৃত্য এক পেয়ালা চা আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া দিল। রামেন্দ্রবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—

“রোমান ক্যাথলিক Massএর কথা বলিতেছিলাম,—বৈদিক যজ্ঞের সহিত ইহার যে কত দূর সাদৃশ্য আছে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। দ্বাদশটি শিষ্য লইয়া যীশুখ্রীষ্ট ভোজন করিতে বসিলেন। নিজহস্তে এক খণ্ড রুটি ও কিছু মদ্য তাঁহাদিগকে বণ্টন করিয়া দিয়া বলিলেন—‘আমার কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে ; এই রুটি আমার মাংস, এবং এই মদ্য আমার রক্ত ; তোমরা ইহা সেবন কর। ভবিষ্যতে এই নিয়মটি তোমরা পালন করিবে ; তাহা হইলেই আমার সঙ্গে তোমাদের একীকরণ হইবে।’ এখন দেখিতে হইবে যে, যীশুর দুইটা দিক্ ছিল,—একটা ঐশ্বরিক, আর একটা মানবিক। এক হিসাবে তিনি বলিতেছেন যে, তিনি এবং তাঁহার পিতা এক ; তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর। আর এক হিসাবে তিনি মানুষ ; এবং সেই কারণে সমস্ত মানুষের প্রতিনিধি। পাপমোচনের জন্য যখন Sacrifice বা যজ্ঞ আবশ্যক, যীশু মানুষের প্রতিনিধি বা নিষ্ক্রয়-স্বরূপে আপনাকে যজ্ঞপশুরূপে (Lamb of god) আহুতি দিলেন। তাঁহার আদেশ-মত শিষ্যেরা যে মন্ত্রপূত রুটি ও মদ্য সেবন করিল, তাহা বৈদিক যজ্ঞাবশেষ পুরোডাশের মত ও সোমরসের মত দাঁড়াইল। যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণ করার মত খ্রীষ্টের মাংস ও রক্ত সেবন করিয়া মানব যজমান খ্রীষ্টের সঙ্গে অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইয়া যায়। তদবধি সমস্ত খ্রীষ্টান এই অনুষ্ঠান পালন করিয়া আসিতেছেন ; সমস্ত খ্রীষ্টানের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহারই নাম Sacrifice of the Mass ও Eucharist ভক্ষণ। সকল খ্রীষ্টানই বিশ্বাস করেন যে, এই Eucharistএর দ্বারা যজমান ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া যায় ; সেই জন্যই ইহার নাম Holy Communion। রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক চর্চ্চের খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, যাজক রুটি ও মদ্যকে মন্ত্রপূত করিলে বাস্তবিক উহা যথাক্রমে মাংস ও রক্তে পরিণত হয়। যাঁহারা

প্রকৃত সাধক, তাঁহারা না কি চর্ম্মচক্ষে রক্ত-মাংস দেখিতে পান ; এবং তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এই উৎসর্গক্রিয়ায় খ্রীষ্টের আত্মাহুতিই পুনঃ পুনঃ সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই জন্য ইহার নাম Sacrifice of the Mass। এই Sacrificeএর পদ্ধতি ক্যাথলিক চর্চ্চে যেরূপ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সহিত সোমযজ্ঞের চমৎকার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়ের বাঁধা liturgy তুলনাযোগ্য। ইহুদিদিগের মধ্যে পশুবলি ছিল বটে, কিন্তু vicarious sacrifice নিষ্ক্রয়-আহুতি বোধ হয় ছিল না। একটা অনুষ্ঠান ছিল—Scapegoat, ছাগলের উপর পাপের বোঝা চাপাইয়া দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কিন্তু মানুষের নিষ্ক্রয়স্বরূপে পশু আহুতি দেওয়া তাহাদিগের মধ্যে ছিল কি না সন্দেহ। ঐ যে doctrine of atonement, এবং তদ্দ্বারা ঈশ্বরের সহিত মানুষের একীকরণ, ওটা ইহুদিদিগের মধ্যে আদৌ ছিল না ; তাহাদের স্রষ্টা এত উর্দ্ধে অবস্থিত যে, ওরূপ একীকরণের কল্পনা একটা বিষম sacrilege বলিয়া পরিগণিত হইত। যীশু নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন ; তাই তাঁহার উপর ইহুদির এত আক্রোশ। ইহুদি এক Messiahর পথ চাহিয়া বসিয়া আছে ; কিন্তু সেই Messiah ঈশ্বর নহেন ; তিনি কেবল ইহুদি জাতির উদ্ধারকর্ত্তা। কোনও অনুষ্ঠানের দ্বারা মানুষ যে ঈশ্বরের সহিত এক হইতে পারেন, ইহা তাহার কল্পনাতীত। কিন্তু আমাদের বৈদিক যজ্ঞের গোড়ার কথাটাই এই যে, মানুষ যজ্ঞের দ্বারা একেবারে দেবত্ব প্রাপ্ত হয় ; এবং বেদের শেষ ভাগে, অর্থাৎ উপনিষদের চরম কথা এই—"আমিই ব্রহ্ম"। যীশুর "আমিই ঈশ্বর" ইহুদির কল্পনাতীত ; কিন্তু ঐটিই ভারতবর্ষের ধর্ম্মের মূল কথা। তাই বলিতেছিলাম, অন্যান্য অনেক নূতন doctrineএর সহিত ঐ কথাটা খ্রীষ্টান ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ করিয়াছে, এ কথা বলিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হয় না।

"প্রসঙ্গক্রমে আরও দুইটা কথা বলা যাইতে পারে। তান্ত্রিকদিগের পঞ্চ মকার সাধনার সহিত ইহার সাদৃশ্যও আশ্চর্য্যজনক। মৎস্য ও মাংস—আমাদের বৈদিক যজ্ঞীয় পশুমাংস ও খ্রীষ্টানের খ্রীষ্টের মাংস মনে করা যাইতে পারে। মুদ্রা অর্থাৎ চাল-কলাই ভাজা—বৈদিক পুরোডাশ এবং খ্রীষ্টানের রুটি ; সোমযজ্ঞে পুরোডাশের সহিত যব ভাজা, খই, ছাতু প্রভৃতি আহুতি দেওয়া হইত, এবং যজমানকে তাহার অবশেষ ভক্ষণ করিতে হইত। মদ্য,—বৈদিক সোমরস, খ্রীষ্টানের wine। বৈদিক সোমরসের আর এক

নাম অমৃত। তান্ত্রিক মদ্য মন্ত্রদ্বারা শোধিত হইলে অমৃতে পরিণত হইত। পঞ্চমতত্ত্ব—যজমানের নবজীবন লাভের উপযোগী অনুষ্ঠান, বৈদিক সোম-যাগের পুনর্জন্ম; ক্যাথলিক Massএর যীশুর সঙ্গে এক হইয়া মৃত্যুকে পরাজয় করতঃ অমরত্বলাভ।

"ধর্ম্ম মাত্রেরই দুইটা দিক্ আছে। একটা সমষ্টিগত, communal; আর একটা ব্যক্তিগত, personal। চর্চ্চ ও সঙ্ঘের অনুষ্ঠানগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিকেই পালন করিতে হইবে; এ বিষয়ে কাহারও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নাই। আর একটা দিক্—personal ব্যক্তিগত; এখানে সাধক নিজের মনের মত সাধনা করিতে পারেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তনের পর প্রথম হইতেই church সমষ্টিগত communal হইয়া দাঁড়াইল; মোড়লেরা একত্র হইয়া আপনাদের বিধিব্যবস্থা ঠিক করিয়া লইত, কাহারও মুখাপেক্ষী হইত না; এই দলবাঁধা communal ভাব দেখিয়া রোমের সম্রাট্ রুষ্ট হইতেন। রোম-সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রনীতির একটা বিশিষ্ট কথা ছিল যে, রাষ্ট্রমধ্যে কেহ কোনও অজুহাতে দল বাঁধিতে পারিবে না; রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যতীত দল বাঁধা নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন রোম-সম্রাট্ খ্রীষ্টান হইলে state ও church এক হইয়া গেল, তখনও সম্রাট্ Council ও Synod ডাকিয়া সর্ব্বসাধারণের জন্য বিধিব্যবস্থা ধার্য্য করিয়া দিতেন; এইরূপে পূর্ব্বতন communal ভাব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রহিল। প্রথম দুইটা বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে বৌদ্ধ মোড়লেরা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিত। পরে সম্রাট্ অশোক এবং কণিষ্ক বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করিয়া নেতৃত্ব করিতেন। বৌদ্ধ সঙ্ঘের communal ভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই। খ্রীষ্টানের সেই সকল Universal Church Councilএ যে নিয়মাবলী ধার্য্য করা হইত, কেহ তাহার অন্যথাচরণ করিলে heretic বলিয়া পরিগণিত হইত, খ্রীষ্টান community হইতে বহিষ্কৃত হইত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইত; এই শাস্তিটা সম্পূর্ণ communal। এখনও রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক চর্চ্চের আদেশ তত্তৎমতাবলম্বী লোকে শিরোধার্য্য করিয়া থাকে। প্রটেষ্টাণ্ট্ চর্চ্চ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত; কতকটা যেন স্বাধীন বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সেখানেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই। কোথাও বা State বিসপদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া নিয়মাবলী পরিবর্ত্তিত করে; কোথাও বা মণ্ডলী বা Congregation একত্র হইয়া সেই সকল ব্যবস্থা

করে। আবার দেখুন, খ্রীষ্টানের Mass সাধারণতঃ ব্যক্তিগত নহে; সমস্ত সমাগত ব্যক্তির যীশুর সহিত একীকরণ ব্যাপার। তৎকালে পূর্ণদীক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত কেহই গির্জ্জায় উপস্থিত থাকিতে পায় না। যাজক পূত রুটি যথানিয়মে বিতরণ করিবেন; এক কণিকা অপচয় কিংবা ভূমি স্পর্শ করিতে পাইবে না; খ্রীষ্টান ব্যতীত কাহারও তাহা স্পর্শ করিবার অধিকার নাই।

"ব্রাহ্মণের যজ্ঞানুষ্ঠান হয়ত অতি প্রাচীন কালে communal ছিল; তাহার কতক কতক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বেদের ব্রাহ্মণযুগেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, communal অপেক্ষা personal দিক্‌টাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্যপ্রবণতা আমরা বেদের যুগ হইতেই প্রাপ্ত হই; ধর্ম্ম Stateএর অধীনে নহে। যজ্ঞের ঋত্বিক্ ঠিক ইংরাজী priest নহেন; যজমান যে-কোন ব্যক্তিকে ঋত্বিক্‌রূপে বরণ করিতে পারিতেন। Priestকে যেমন চর্চ্চের কর্ত্তা কিংবা congregation গ্রাহ্য করিয়া লইলে তবে তিনি পৌরোহিত্য করিতে পারিবেন; বৈদিক ঋত্বিকের সে রকম public character কিছুই ছিল না। খ্রীষ্টানের পুরোহিত নির্দ্দিষ্ট ceremonyর ভিতর দিয়া ordained হইয়া থাকেন; এবং সমস্ত চর্চ্চের সহিত তাঁহার একটা স্থায়ী সম্পর্ক দাঁড়াইয়া যায়। তিনি যত দিন পদস্থ থাকেন, তত দিন সেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যাজকরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য; অন্য কাহারও যাজকতা অগ্রাহ্য ও অসিদ্ধ। কিন্তু ঋত্বিক্ যজ্ঞের আহুতির পর আবার সমাজের জনসাধারণের মধ্যে মিশিয়া পূর্ব্বের মত এক জন private individual মাত্র হইতেন। যজ্ঞকালে তাঁহার সহিত যজমানের যে কিছু সম্পর্ক; তৎপরে কোন সম্পর্ক থাকিত না। সমাজের অন্য কাহারও সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক থাকিত না। জনসাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট মন্দির বা যজ্ঞভূমি বেদের আমলে ছিল না। অধিকাংশ যজ্ঞই কাম্য (optional)। যে যজ্ঞ প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় ছিল, তাহাতে ঋত্বিকেরও প্রয়োজন ছিল না। Priest যেমন ঈশ্বর ও জীবের মধ্যস্থ, আমাদের ঋত্বিকের সেরূপ মধ্যস্থ ভাব কিছুই ছিল না।

"খাঁটি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। কোনও পোপ নাই; রাষ্ট্রের আধিপত্য নাই; চর্চ্চের মোড়ল নাই; পুরোহিত সম্প্রদায় Priesthood, hierarchy নাই। ব্রাহ্মণ,—পুরোহিত নহেন, সমাজের বর্ণবিশেষ মাত্র। তিনি যাজক হইতে পারেন, যজমানও হইতে পারেন। যাহাকে

ইচ্ছা যাজকত্বে বরণ করা যাইতে পারে। যিনি যজমান, তিনিও ঋত্বিকের কার্য্য করিতে পারেন।

"বৌদ্ধধর্ম্ম মূলে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, দলবদ্ধ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম; কাজেই এই স্বাতন্ত্র্যপ্রবণতা বৌদ্ধধর্ম্মে ছিল না; সেখানে গোড়া হইতেই communal ভাবটা প্রবল। বুদ্ধের তিরোভাবের পর হইতে সঙ্ঘের প্রধান ব্যক্তিরা সঙ্গীতি আহ্বান করিয়া যে বিধিব্যবস্থা করিতেন, সমস্ত সঙ্ঘই তাহা মানিয়া লইত। সম্রাট্ অশোক ও কণিষ্ক সঙ্গীতি আহ্বান করিয়াছিলেন।

"তান্ত্রিক সাধনার চক্রগত ব্যাপারটাও কতকটা communal। এ সাধনায় সকল বর্ণের সমান অধিকার আছে। ভৈরবীচক্রে বসিলে সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম হইয়া যায়। চক্রে যাঁহারা উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা সর্ব্বাংশে সমান অধিকারী হইয়া থাকেন, এবং গুহ্যতম সাধনাচক্রে বসিয়া সাধনা করিতে পারেন।

"এই সকল তান্ত্রিক গুপ্ত সাধনা বৌদ্ধ বিহারের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করার যথেষ্ট হেতু আছে। তথাগত গুহ্যকাদি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থে স্পষ্টই দেখা যায় যে, ভৈরবীচক্রের অনুরূপ ব্যাপার বৌদ্ধ সঙ্ঘে অনুষ্ঠিত হইত; নেপালে তিব্বতে এখনও হয়। বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি তান্ত্রিক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ও communal; বৈষ্ণব পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় ও ভেকধারী নেড়া-নেড়ীর ভিতরেও communismএর প্রভুত্ব দৃষ্ট হয়।

"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জগন্নাথক্ষেত্রেও সেই communismএর প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাই। সেখানে নিতান্ত অন্ত্যজ ভিন্ন সকল বর্ণের সমান অধিকার। পুরীতে বর্ণবিচার নাই। জগন্নাথের মহাপ্রসাদ চণ্ডাল ব্রাহ্মণের মুখে অর্পণ করিতে পারে। বৈদিক পুরোডাশের সহিত, খ্রীষ্টান Eucharist-এর সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। মহাপ্রসাদ সামান্য অন্ন মাত্র নহে; ইহা পরম দেবতাস্বরূপ, স্বয়ং জগন্নাথ; ইহার কণিকা মাত্র অপচয় করা চলিবে না, সমস্তটুকু গলাধঃকরণ করিতে হইবে। ইহা উচ্ছিষ্ট হয় না; কোনও আসনে বসিয়া খাইতে নাই, ভূমিতে বসিয়া খাইতে হইবে। ভোজনের পর ইহা দেবতার সহিত মানবের একত্ব বিধান করে।"

রামেন্দ্র বাবু চুপ করিলেন। আমি বলিলাম,—"যে প্রসঙ্গে এই আলোচনার সূত্রপাত হইল, সেটি কিন্তু অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"সে কথাটার আলোচনা করিব বৈ কি? কিন্তু

পারিপার্শ্বিক অবস্থাটার আলোচনা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি।” সে দিনকার মত আমরা বিদায় হইলাম।

২

রোগশয্যায় শয়ান শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট এমন গুরুতর প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া অন্যায় করিয়াছি কি না, বুঝিতে পারিতেছি না; আমার কিন্তু নেশা ধরিয়া গিয়াছে; তাই দুই দিন পরে আবার তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলাম। দুই একটি কথার পর তিনি বলিলেন,—“আমার অনেক কথা বলিবার ছিল; অনেক দিন কলেজে আপনার সঙ্গে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, তখন যদি কিছু কিছু লিখিয়া রাখিতেন! এখন সামর্থ্যে কুলাইবে কি না বলিতে পারি না।” কোলের উপর বালিশ সবলে চাপিয়া ধরিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—“পাশ্চাত্য জগৎ ভারতবর্ষের নিকট কত ঋণী, ইতিহাস হিসাবে তাহা বলা কঠিন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী ঋণ স্বীকারে যে কুণ্ঠিত হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। তবে কতকটা স্বীকার না করিয়াও তাঁহারা পারেন না। অশোকের সময় হইতে খুব বেশী মাত্রায় গ্রীস, ইজিপ্ট ও সীরিয়ার সঙ্গে ভাব-বিনিময় হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। আলেকজান্দার সিন্ধুপারে এক নূতন জগৎ আবিষ্কার করিলেন; তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে যে সকল গ্রীক পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য ও শ্রমণধর্ম্মের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র ছিলেন না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য মধ্যবর্ত্তীর কাজ করিত—বাক্‌ত্রীয়া। বাক্‌ত্রীয় গ্রীকগণ বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ভাগবত ধর্ম্মকে যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

“আর একটা কথা ভাবিয়া দেখুন। বিদেশী পরিব্রাজক জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন, এই কথাই ইতিহাস-রচয়িতা খুব বড় করিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই ভারতবর্ষের পরিব্রাজকও এক দিন তিব্বতে, চীনে, জাপানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। যাঁহারা তুষারকিরীট হিমালয় অতিক্রম করিয়া, দুরধিগম্য গোবি মরুভূমি পার হইয়া, বর্ব্বর জাতির মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা যে অপেক্ষাকৃত সুগম পথে

সুসভ্য পারসিক, গ্রীক ও য়ুডীয়দিগের দেশের ভিতর দিয়া য়ুরোপে দলে দলে যান নাই, কিরূপে বিশ্বাস করিব ?

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কয়েকটি doctrine, যথা যজমানের নবজীবন লাভ, দেবতার সহিত সাযুজ্য বা একাত্মতালাভ, যজ্ঞে যজমানের আত্মনিষ্ক্রয় ইত্যাদি ভারতবর্ষের পক্ষে অতি পুরাতন, কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে সে সময়ের পক্ষে অতি নূতন। John the Baptist তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে জলের দ্বারা baptise করার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন ; সেই অবধি ঐ অভিষেক-প্রথা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে উহা অতি পুরাতন বৈদিক প্রথা। Neo-Platonic Philosophy ও Gnostic Christianity,—এই উভয়ের অভ্যন্তরে ভারতবর্ষের ভাব কিরূপ অনুপ্রবিষ্ট, তাহা সকল পণ্ডিতই স্বীকার করিতেছেন। Demiurgus ও Sophiaর মূলে বেদের বিরাট্ পুরুষ ও বাগ্দেবতা এবং বৌদ্ধ প্রজ্ঞা কতটুকু প্রচ্ছন্নভাবে আছে, সে কথা বলা বড়ই কঠিন। Gnostic খ্রীষ্টানেরা ঈশ্বরকে বিশ্লেষণ করিয়া যে সকল কাল্পনিক পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার চরম পরিণতি শেষ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয় Trinityতে দাঁড়াইয়া সমস্ত খ্রীষ্টান কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত ভাগবত বৈষ্ণবদিগের বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, এই চতুর্ব্যূহের ; এবং মহাযান বৌদ্ধদিগের আদিবুদ্ধ হইতে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি, এই পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের ; ও সমন্তভদ্র, বজ্রপাণি, অবলোকিত ও বিশ্বপাণি, এই পঞ্চ বোধিসত্ত্বের ; এবং ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ, শাক্যমুনি ও মৈত্রেয়, এই পঞ্চ মানুষ-বুদ্ধের কল্পনার প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়। আধুনিক বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের ভগবান্‌কে বিশ্লেষণ করিয়া গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠপতি মহাবিষ্ণু, এমন কি, নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি নানা রূপে কল্পিত করিয়াছেন। ভাগবতগণের ও বৌদ্ধগণের বহু পূর্ব্বে বৈদান্তিকেরা তুরীয় ব্রহ্মের সগুণ রূপ বিশ্লেষণ করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টিভেদে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এবং বৈশ্বানর, বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতির কল্পনা করিয়াছিলেন। এই সকল রূপ-কল্পনার মূল ঋগ্বেদসংহিতার মধ্যেই পাওয়া যায়। কাজেই এরূপ বিশ্লেষণ ব্যাপার ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মজ্জাগত। প্রাচীন ইহুদির মধ্যে বা প্রাচীন গ্রীসে এরূপ কল্পনার অনুরূপ কিছু পাওয়া যায় কি না জানি না। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহার খ্রীষ্টীয় ও বৈষ্ণবধর্ম্ম

এতদুভয় তুলনামূলক সন্দর্ভে এ বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন। নারদ ঋষি পশ্চিমে শ্বেতদ্বীপে নারায়ণের ভক্ত একান্তিগণের নিকট হইতে নূতন ধর্ম্ম আনয়ন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মকে নূতন কলেবর দান করিয়াছিলেন, এইরূপ আখ্যায়িকা মহাভারত-মধ্যে ও পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত আছে ; ভাগবত এবং পঞ্চরাত্র-মতের ইহাই মূল বলিয়া গৃহীত হয়। ওয়েবার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই মত প্রচার করেন। বহু বৎসর হইল, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই আখ্যায়িকার মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের নিকট হইতে আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্মের ঋণ গ্রহণ দেখিয়াছিলেন। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ও উক্ত সন্দর্ভে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রয়োগ দ্বারা সেই মত সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্বেতদ্বীপ যে প্যালেষ্টাইন, এবং একান্তিগণ যে প্রথম শতাব্দীর খ্রীষ্টান, ইহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি প্রচুর গবেষণার আশ্রয় লইয়াছেন। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, মহাভারতের যে অংশে এই আখ্যায়িকা আছে, উহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বলিয়া মনে করিতে হয় ; অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনেরও পরে রচিত। কিন্তু খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে গ্রীক কর্ত্তৃক ভাগবত ধর্ম্মের আনুগত্য স্বীকার স্তম্ভলিপিতে আবিষ্কৃত হওয়ার পর এই মতের ভিত্তি অনেকটা টলিয়া গিয়াছে। মহাভারতের বাক্য তুলিয়া তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, উহাতে একটা অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে, তাহা খুব সম্ভবতঃ খ্রীষ্টানদিগের eucharist ভক্ষণ ; উহা যদি eucharist ভক্ষণই হয়, তাহা হইলে মহাভারতের ঐ অংশ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের পর প্রক্ষিপ্ত মনে করিতে হয়। কিন্তু eucharist ভক্ষণ ভারতবর্ষেরই একটা অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। ইহা দেখিবার জন্য নারদের প্যালেষ্টাইন যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না ; বরং আমরাই এখানে উল্টা চাপ দিতে পারি।

"প্রকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপকরণের অভাবে কে কাহার নিকট কতটুকু ঋণ করিয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করা বড়ই দুঃসাহসের কাজ। খ্রীষ্টীয় যাজকেরা ও খ্রীষ্টীয় ইতিহাস-লেখকেরা খ্রীষ্টধর্ম্মের বিকাশে এবং অভিব্যক্তিতে অন্যান্য ধর্ম্মের প্রভাব কতটা আছে, তাহা যথাসাধ্য মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদিগের ধর্ম্মের নিকট হইতে, এমন কি, জার্ম্মাণ heathenদিগের নিকট হইতেও অনেক মত ও অনেক প্রথা খ্রীষ্টধর্ম্ম আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহা অস্বীকারের উপায়

নাই। কিন্তু প্রাচ্য দেশের নিকট ঋণ স্বীকার করিতে এ-কালের বড় বড় পণ্ডিতেও একটু কুণ্ঠাবোধ করেন। পারসীকদিগের মিথ্রপূজা রোম-সাম্রাজ্যের প্রথম অবস্থায় সমস্ত রোম-রাজ্য, এমন কি, সুদূর ব্রিটিশদ্বীপ পর্য্যন্ত অত্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল, ইহা অল্প দিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে সময়ে উহা খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রবল, এবং বোধ হয় প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম এই মিথ্রপূজার অনেক অংশ আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহা অস্বীকারের আর উপায় নাই। ব্যাপারটা খ্রীষ্টীয় ঐতিহাসিকেরা একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছেন। ভারতবর্ষের বোধিসত্ত্ব খ্রীষ্টীয় সমাজে আজ পর্য্যন্ত সেণ্ট্ জোসাফাৎ রূপে canonised হইয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন, ইহাও অধিক দিনের আবিষ্কার নহে। যিনি এ সংবাদ জানেন না, তিনি এ সম্বন্ধে মোক্ষমূলরের আলোচনা পাঠ করিয়া দেখিবেন।”

রামেন্দ্র বাবু চুপ করিলেন। একটু উঠিয়া বসিয়া অর্দ্ধ আউন্স আনারসের রস পান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“কিন্তু খ্রীষ্টীয় সমাজে monasticism-এর উদ্ভব আর একটি অদ্ভুত ঘটনা! প্রাচীন গ্রীসে, রোমে এবং ইহুদিদিগের মধ্যে এই সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের তুলনীয় জিনিষ বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না।

“ভারতবর্ষে কিন্তু এই সন্ন্যাসী ধর্ম্ম অতি পুরাতন ব্যাপার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ প্রশ্রয় না থাকিলেও বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই দলবদ্ধ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রচারিত উপনিষদের মধ্যে কুটীচর, বহূদক, হংস, পরমহংস প্রভৃতি সন্ন্যাসীর দলের উল্লেখ দেখা যায়। পাশ্চাত্য মতের অনুসরণ করিয়া যদি এই উপনিষদ্‌গুলিকে বুদ্ধের পরবর্ত্তী বলিয়াও মনে করা যায়, তথাপি বুদ্ধদেবের সময়ে এবং পূর্ব্বে বর্ত্তমান আজীবক নির্গ্রন্থ প্রভৃতি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়কে ভুলিলে চলিবে না। বুদ্ধদেব স্বয়ং স্বপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসি-সঙ্ঘকে একেবারে যন্ত্রবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; এবং দেশে বিদেশে সদ্ধর্ম্মের প্রচার অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। অশোকের সময় হইতে রাজসাহায্য প্রাপ্ত হইয়া এই প্রচারকার্য্য ভারতবর্ষের বাহিরে মহাসমারোহে আরব্ধ হইয়াছিল। খ্রীষ্টের জন্মকালে বা তাহার অব্যবহিত পরেই, যে সন্ন্যাসীর দল আধুনিক য়ুরোপীয়ের পক্ষে দুরতিক্রম্য মধ্য-এশিয়া পার হইয়া চীনের মধ্যে বিপ্লব ঘটাইয়াছিল, তাহারা যে প্যালেষ্টাইনে এবং মিশরে ততোধিক বিপ্লব ঘটায় নাই, ইহা মনে করা যাইতে পারে না।

খ্রীষ্টের সমকালবর্ত্তী এসীনি ও থেরাপিউটদিগের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; অল্প দিন পরেই মিশর এবং কাইরীনিতে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদিগকে বিজন মরুভূমি ও গুহা আশ্রয় করিতে দেখা যায়। ক্রমশঃ সন্ন্যাসীর দলের অভ্যুদয় হইতে লাগিল। গ্রীক ও রোমান চর্চ্চ-মধ্যে সন্ন্যাসীদের নানা দল যন্ত্রবদ্ধ হইয়া উঠিল। য়ুরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস এই সকল সন্ন্যাসী-দলের ঘটনায় পরিপূর্ণ; ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, এই সকল সন্ন্যাসী-দলের প্রভুত্ব কত দূর বিস্তৃত হইয়াছিল। বৌদ্ধ সঙ্ঘের ন্যায় ইহারাও বিহার ও সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করে; রাজার অনুমতিতে এই সকল বিহার ভূমিসম্পত্তির অধিকারী হইত; এবং য়ুরোপের মধ্যযুগে য়ুরোপের ভূমির বৃহৎ ভগ্নাংশ এই সকল বিহার ও সঙ্ঘারামের অধিকৃত ও করতলগত হয়। এই সকল খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের ভিতরে St. Benedict প্রভৃতি মহাত্মাগণ যে সকল আচার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, বৌদ্ধসঙ্ঘের মধ্যে প্রচলিত আচার নিয়মের সহিত তাহাদের তুলনায় সমালোচনা আবশ্যক। তিব্বতে ও জাপানে বৌদ্ধমন্দিরে যে সমস্ত উপাসনা-প্রণালী প্রচলিত আছে, রোমের অনুগত খ্রীষ্টীয় মন্দিরে তাহার অনুরূপ আচার অনুষ্ঠান দেখিয়া খ্রীষ্টান পর্য্যটকেরা বিস্মিত হইয়া থাকেন, তাহা ভূয়োভূয়ঃ দেখিয়াছি। সে-কালের খ্রীষ্টানেরা এই সাদৃশ্যে শয়তানের কারসাজি দেখিতেন। বৌদ্ধ যাজকদিগের ও লামাদিগের বেশ-ভূষা পরিচ্ছদ; অস্থি, ভস্ম প্রভৃতি relic পূজা; saint সাধু ভক্ত পূজা; মূর্ত্তিপূজা; সাধুগণের আবির্ভাব ও তিরোভাবের উপলক্ষে উৎসবের ও উপবাসের বিধান; মালাজপ; ধূপ-দীপ প্রভৃতি নানা উপচারের প্রয়োগ; যাত্রা (procession); মন্ত্রের দ্বারা উৎসর্গ ও নিবেদন; confessionএর দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত; এই সকল এবং আরও নানাবিধ বিধি-ব্যবস্থার বৌদ্ধ মন্দিরে এবং খ্রীষ্টীয় মন্দিরে সাদৃশ্য আলোচনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই সকল আচারানুষ্ঠান প্রবর্ত্তনের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় সর্ব্বত্র সুসাধ্য না হইলেও একেবারে অসাধ্য নহে। সবই যে শয়তান কারসাজি করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অনুকরণে চীনে, তিব্বতে ও জাপানে আনয়ন করিয়াছে, এমন কথা বলিতে সাহস হয় না।

"এই শয়তানের কথাটাই লওয়া যাক। ইহুদিদিগের প্রাচীন ধর্ম্মে শয়তান ছিল না। যে খল সরীসৃপ আদি মানব-দম্পতিকে প্রতারিত করিয়াছিল, বাইবেলে সে সর্প মাত্র। পরবর্ত্তী কালে সেই সর্পের উপর

শয়তানি আরোপিত হইয়াছে। খ্রীষ্টানেরা শয়তান বলিতে যাহা বুঝেন, প্রাচীন গ্রীসে বা রোমে তাহা ছিল না; প্রাচীন ভারতবর্ষেও ছিল না। শয়তানের প্রধান লক্ষণ এই যে, তিনি অমঙ্গলের, অধর্ম্মের, পাপের প্রেরণাকারী। শয়তান প্রকৃতই পাপপুরুষ। এই পাপের ফল অবশ্য মৃত্যু বটে। কাজেই শয়তানের প্ররোচনাতেই পাপ ও মৃত্যু Sin and Death উভয়েই আসিয়াছে। শয়তান ঈশ্বরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ঈশ্বর যে উদ্দেশ্যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, শয়তান তাহা প্রায় ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। শয়তানকে দমন করিতে বিধাতাকে হিমসিম খাইতে হয়। মানুষকে শয়তানের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্‌কে খ্রীষ্টরূপে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, এবং আপনাকে যজ্ঞীয় পশুরূপে বলি দিতে হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হয় নাই; Kingdom of God স্থাপিত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব। খ্রীষ্টের পুনরাগমন (second advent) কবে হইবে, সে বিষয়ে খ্রীষ্টানেরা বহু কাল হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে। এই শয়তান ও তাঁহার গণের অর্থাৎ অনুচরদিগের ভয়ে তামস যুগ ও মধ্যযুগ ব্যাপিয়া সমস্ত খ্রীষ্টীয় য়ুরোপ সন্ত্রস্ত থাকিত; বহু খ্রীষ্টান খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করিয়া গোপনে শয়তানের শরণ লইত। তাহার ফলে খ্রীষ্টীয় সমাজের বুকের উপর একটি শয়তানতন্ত্র (devil worship), খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী একটা নূতন ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছিল। সে-কালের black magic, witchcraft, necromancy প্রভৃতি তামসিক অনুষ্ঠান এই অপধর্ম্মের অন্তর্গত। বড় বড় পণ্ডিত হইতে গলিতনখদন্ত বৃদ্ধা পর্য্যন্ত ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিত; অন্ততঃ সেই সন্দেহে কত পণ্ডিতকে ও কত বুড়ীকে যে পোড়াইয়া মারা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

"এই যে শয়তান মানুষকে পাপে প্রবর্ত্তিত করিয়া মৃত্যুর অধীন করিয়াছে, মানুষের সর্ব্বনাশ সাধনই যাহার এক মাত্র কর্ম্ম,—এই শয়তান কোথা হইতে আসিল? ইহুদিদিগের ইতিহাসের অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে শয়তানকে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ইহুদিরা পারসীকদিগের সংসর্গে আসিয়াছিল; মহাপ্রতাপ ব্যাবিলনাধিপতি ইহুদি জাতির অধিকাংশ লোককে বন্দী করিয়া তাহাদিগের স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া পারস্যে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন; বহু বৎসর পরে পারস্য-সম্রাটের অনুগ্রহে সেই বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া আসে। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর

নব জীবন লাভ করিয়া, তাহারা নূতন উদ্যমে আপনাদিগের পুরাতন ধর্ম্ম পুনর্গঠিত করিয়া তুলে। তখন মুসা-প্রবর্ত্তিত আচার-নিয়মের বন্ধন খুব শক্ত করা হয়। Prophetদিগের উদার ধর্ম্ম সেই বন্ধন শিথিল করিতে পারে নাই। অনেকে অনুমান করেন, পারস্য হইতে এই শয়তানকে এই সময়ে ইহুদিধর্ম্মশাস্ত্রে আমদানি করা হইয়াছিল। পারস্য দেশের প্রাচীন ধর্ম্মের প্রধান দেবতা—অহুর মজ্‌দ ; ইনি ধর্ম্মের এবং মঙ্গলের দেবতা। অনেকে মনে করেন, ইনি বেদের বরুণ দেবতার সহিত অভিন্ন। অহুর মজ্‌দের প্রবল প্রতিপক্ষ,—অঙ্গ্র্‌মৈন্যু বা আহ্রিমান, অধর্ম্মের বা অমঙ্গলের বিধাতা। অহুর মজ্‌দের সহিত ইঁহার সনাতন বিরোধ ; সেই বিরোধের নিবৃত্তি নাই ; এবং তাহার ফলেই এই বিশ্ব-জগৎ ভালয় মন্দয় মিশিয়া চলিতেছে। এই আহ্রিমানই প্রকৃত শয়তান। মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বরের এত বড় প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোনও জাতি কল্পনা করে নাই। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার প্রচুর প্রতিপত্তি হইল। খ্রীষ্টীয় বিহারগুলির মধ্যে গুপ্তভাবে শয়তানের পূজা খুব প্রসার লাভ করিল। শয়তান-পূজার অনুষ্ঠানগুলি কিরূপ, যাঁহারা শেকস্‌পীয়রের ম্যাকবেথের witchদের কারখানা পড়িয়াছেন, তাঁহারা কতকটা বুঝিবেন। কিন্তু ব্যাপারটা বেশী দিন চাপা রাখা গেল না। য়ুরোপের এই সমস্ত মঠগুলি এক দিকে পোপ এবং অন্য দিকে রাজার সম্পূর্ণ অধীন ছিল ; ভারতবর্ষের বিহারের মত তাহারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ছিল না। কাজেই যখন লোকে কাণাঘুষা করিতে লাগিল যে, এই সকল মঠে গোপনে শয়তান-পূজা চলিতেছে, তখন রাজবিধি দ্বারা কঠোর উপায়ে তাহা বন্ধ করা হইল। এই কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা য়ুরোপের ইতিহাসকে চিরদিনের জন্য মসীলিপ্ত করিয়াছে। যাহাকে ডাইন বলিয়া সন্দেহ করা হইত, তাহাকেই নানা যাতনা দিয়া শেষে দগ্ধিয়া পোড়াইয়া মারা হইত। তথাপি নানা স্থানে নানা রূপে শয়তান-পূজা চলিতে লাগিল। Knights Templars এবং Knights Hospitallers গোপনে শয়তান-পূজা করিত। তাহাদের অনুষ্ঠানের সহিত আমাদের তন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানের অনেক সাদৃশ্য আছে। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, কিরূপে কঠোর উপায়ে ইহার উচ্ছেদ সাধন ঘটে।

"আমাদের দেশে প্রাচীন কালে শয়তানের অনুরূপ কিছু ছিল না। য়ুরোপীয়েরা শ্মশানচারী ভূতপ্রেতগণপরিবৃত মহাদেবকে Devil মনে

করিয়াছেন; হিন্দু তাহা শুনিয়া হাসেন। খ্রীষ্টান জানে না যে, হিন্দুর মহাদেব মানুষকে পাপে প্রবৃত্তি দেন না। তিনি শিব, শঙ্কর, আশুতোষ; পাপের প্রেরণাদ্বারা মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করা কি তাঁহার কাজ? বেদের রুদ্রদেবকে উপাসকেরা ভয় করিত। তাঁহার পিণাক ও তাঁহার বাণ ত যথেষ্ট ভয়জনক ছিল; তাহার উপর আবার প্রত্যেক গৃহস্থ তাঁহার কোপদৃষ্টি হইতে পালিত পশুগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট ছিল। এই ভয়ঙ্কর দেবতার নাম স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিবার সাহস কাহারও হইত না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই যে, কোনও মন্ত্রে রুদ্র নাম স্পষ্ট উচ্চারিত হইতে পারিবে না; তৎপরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত মোলায়েম ভাষায় "রুদ্রিয়" বলিতে হইবে। কি জানি, যদি স্পষ্ট নামের উল্লেখে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়! তাঁহার দৃষ্টিপাতকেই লোকে ভয় করিত। রুদ্রের উদ্দেশে কোনও যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান করিলে জল স্পর্শ করিতে হইত। অসুর, রাক্ষস এবং পিতৃগণের উদ্দেশেও কোনও অনুষ্ঠান করিতে হইলে ঐরূপ জল স্পর্শ করিতে হয়। বহু স্থলে রুদ্র দেবের স্তবস্তুতির তাৎপর্য্য তাঁহার রোষ নিবারণ করা। এই উগ্র দেবতাটির মধ্যে খ্রীষ্টানের শয়তানি ভাব কিন্তু দেখিতে পাই না। তিনি কুপিত হইলে মানুষের অনিষ্ট করিতে পারেন; কিন্তু মানুষকে ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিবার প্রয়াস আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। প্রথম প্রথম তাঁহাকে খুশী রাখিবার জন্যই তাঁহাকে শঙ্কর বলা হইত বটে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের কল্পনা এই উগ্র ভীম কপর্দ্দী দেবতাকে আশুতোষ শিবে পরিণত করিয়াছিল। অসুর ও রাক্ষস devil নহে; কিন্তু মনে হয় যে, এই ভুল ইংরাজী অনুবাদ বহু স্থলে দেখিয়াছি। যজ্ঞের ভাগ লইয়া দেবতার সহিত অসুর ঝগড়া করিত; মানুষের সম্পাদিত যজ্ঞকার্য্যে রাক্ষস বিঘ্ন উৎপাদন করিত; কিন্তু এ রকম কল্পনা বৈদিক সাহিত্যে নাই যে, তাহারা মানুষকে পাপপথে লইয়া যায়। বেদে আর একটি দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়, নির্ঋতি; তাঁহাকেও কতকটা ভয় করিয়া চলা হইত। নির্ঋতির পাশ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যাকুলতা দেখা যায়; কিন্তু তাঁহাকে শয়তান বলা যায় না; পাপপ্রবর্ত্তনার সহিত তাঁহার কিছু মাত্র সম্পর্ক নাই। আর যে যমদেবতা পরবর্ত্তী কালে মৃত্যুর সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন, তাঁহাকে হিন্দু ভয় করেন বটে, কিন্তু তিনিও খ্রীষ্টানের শয়তানের মত নহেন; তিনি এক জন দেবতা; তিনি পিতৃগণের অধিপতি, বিচারকর্ত্তা; তিনি

ধর্ম্মরাজ। আধুনিক ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যেও শয়তান আধিপত্য লাভ করেন নাই; এমন কি, তন্ত্রশাস্ত্রেও শয়তান প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। স্কন্দ ও তাঁহার অনুচর গ্রহগণ, মাতৃকাগণ, ভূত প্রেত পিশাচ প্রভৃতি উপদেবতাগণকে লোকে ভয় করিত বটে, কিন্তু তাহাদিগকেও শয়তানের অনুচর বলা যায় না; পাপে প্রবর্ত্তনা তাহাদের কার্য্য নহে। মহাভারতের বনপর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকায় অগ্নিপুত্র স্কন্দে যেন একটু শয়তানী ভাব দেখা যায়, কিন্তু সন্দেহ হয়, এই স্কন্দও যেন বাহির হইতে আসিয়া ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন; এবং দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও, তৎকর্ত্তৃক দেবসেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হইয়া এবং পার্ব্বতী কর্ত্তৃক পুত্রত্বে গৃহীত হইয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা স্কন্দঘটিত এই ব্যাপারটুকু জানেন না, তাঁহাদিগকে বলিয়া রাখি, স্কন্দের অনুচরেরা আঁতুড়ঘরে ছেলে খাইত, এবং স্কন্দ নিজে সিঁদচোরদিগের আশ্রয় ছিলেন; সাক্ষী মৃচ্ছকটিক নাটক। তন্ত্রে অনেক ডাকিনী যোগিনীর উল্লেখ আছে; তাহারা হয়ত মানুষের অনিষ্ট করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে পাপে প্রবর্ত্তিত করে না। শয়তানের বা Devilএর প্রধান লক্ষণ,—পাপে প্রবর্ত্তনা। মানুষের ছল ধরিয়া তাহাকে প্রলোভিত করিয়া কুপথে লইয়া যাইবার জন্য সে বসিয়া আছে। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে অনেক উগ্র ভয়ানক দেবতার ও অপদেবতার উল্লেখ আছে; তাহারা অনিষ্ট করে, কিন্তু পাপে প্রবর্ত্তিত করে না। আমাদের প্রাত্যহিক তান্ত্রিক সন্ধ্যোপাসনায় ও পূজায় এক পাপপুরুষের কল্পনা দেখা যায়; এই পাপপুরুষকে কতকটা শয়তানের স্থলাভিষিক্ত বলা যাইতে পারে। তাহার একটা রূপবর্ণনাও আছে;—ব্রহ্মহত্যা তাহার শির, চৌর্য্যবৃত্তি তাহার বাহু, ব্যভিচার তাহার কটিদ্বয়, ইত্যাদি। উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে উপাসকের শরীর হইতে এই পাপপুরুষকে দহন করিতে হয়। ভূতশুদ্ধি অনুষ্ঠানে ইহা নিষ্পন্ন হয়। এই পাপপুরুষ শয়তান হইলেও খ্রীষ্টানের শয়তানের মত প্রভুত্ব বা ভয়ানকত্ব লাভ করে নাই। হিন্দু কখনও পাপ-পুরুষের পূজা করে নাই, তাহার শরণাপন্ন হয় নাই। বেদে মৃত্যু-দেবতার উল্লেখ আছে; মৃত্যুর ভয় চিরকালই আছে। নির্ঋতি নামক দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। নির্ঋতির পাশ হইতে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা দেখা যায়; ইহাকেও লোকে ভয় করিত। এই নির্ঋতি হইতে নৈর্ঋতগণের উৎপত্তি; ইহারা কতকটা রাক্ষসের মত। কিন্তু মৃত্যু বা নির্ঋতি, কেহই

শয়তানের মত পাপে প্রবর্ত্তক নহে। বেদে মন্যু নামক দেবতাকে ঋক্-সংহিতার দশম মণ্ডলে পাওয়া যায়। আমাদের আহ্নিক সন্ধ্যোপাসনায় "মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যঃ" মুক্তি প্রার্থনা করিতে হয়। যুধিষ্ঠিরকে যখন "ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ" এবং দুর্য্যোধনকে "মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ" বলা হইয়াছে, তখন ইহার সহিত পাপের ও অধর্ম্মের সম্পর্ক আছে বলিতে হইবে। কিন্তু গোড়ায় ইহাকেও দেবতারূপেই পাওয়া যায়; এমন কি, ইনি বৃত্রেরও শত্রু। এই বৃত্র ইন্দ্রের প্রধান শত্রু, অতএব দেবগণেরও শত্রু। ইহার বিশেষণ অহি বা সর্প। এই সর্পের সহিত শয়তানরূপ সর্পের কোনও সম্পর্ক আছে কি না বিবেচ্য। যাহাই হউক, বৃত্র যে মানুষের শত্রু, এবং মনুষ্যকে পাপে প্রবর্ত্তনা করেন, এইরূপ খুলিয়া বলা হয় নাই। আধুনিক সাহিত্যে কলির দর্শন পাওয়া যায়। এই কলিযুগে তাঁহার যথেষ্ট প্রভুত্ব। পাপের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু তাঁহার পূজাপদ্ধতি নাই। হিন্দু-শাস্ত্রে খ্রীষ্টানের শয়তানের মত তিনি একাকী ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ান নাই; কেবল পাপের ছিদ্র অন্বেষণ করেন মাত্র। সম্ভবতঃ কলির আবির্ভাবও বৌদ্ধ বিপ্লবের পরবর্ত্তী। য়ুরোপের শয়তানপন্থীদের Black Magicএর মত অনুষ্ঠান আমাদের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখা যায় বটে; সাধন দ্বারা, মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক প্রয়োগ দ্বারা, তাল বেতাল, ডাকিনী যোগিনীকে বশ করিয়া মারণ, উচাটন, বশীকরণ,—সংক্ষেপে নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও অন্যের অনিষ্টচেষ্টা—এ সকল এ দেশেও আছে। অবহিত হইয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, এই সকল অনুষ্ঠানের অধিকাংশই দেশী ও বিদেশী অনার্য্যসংস্রব হইতে আসিয়াছে। এই সকল অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তনের জন্য বৌদ্ধগণই অনেকটা দায়ী; ভবভূতি যে ইহা বুঝিতেন, তাহা মালতীমাধবে প্রকাশ। তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা করিলেও ইহা বুঝা যায়। সম্প্রতি মধ্য-এশিয়ার খোটান প্রভৃতি স্থানে যে বৌদ্ধ সাহিত্য আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাও এই অনুমানের সমর্থক। বৈদিক কালে খাঁটি আর্য্যগণের মধ্যে যে এ সব ছিল না, তাহা বলিতেছি না। অথর্ব্ব বেদে মন্ত্রবলে, অনুষ্ঠানবলে শান্তি পুষ্টি অভিচারাদি কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। অনেকের মতে ইহার কোনও কোনও অংশ ঋগ্বেদ অপেক্ষাও প্রাচীন। এই শ্রেণীর বিশ্বাস সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বভৌমিক,—সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই আছে। ইহা যে সম্পূর্ণ অমূলক, তাহা বৈজ্ঞানিকেরাও বলিতে পারেন নাই। Hypnotism

অর্থাৎ আধুনিক বশীকরণ-বিদ্যার আলোচনার পর তাহা বলা চলে না। সে যাহা হউক, অথর্ব্ববেদেই হউক, আর আধুনিক হিন্দু তন্ত্রেই হউক, শয়তানের পূজা এক জন Tempter অর্থাৎ পাপে প্রণোদকের পূজা, আবিষ্কার করা চলিবে না।

"কিন্তু প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের পরবর্ত্তী এবং আধুনিক ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যে বৌদ্ধ-সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিল, তাহাতে শয়তানকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। **মার** ষোলো আনা শয়তান, Tempter। বুদ্ধদেবের জন্মকালে মারের আসন টলিল; নানা উপায়ে তাঁহার বুদ্ধত্বলাভে বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য সে বদ্ধপরিকর হইল; তাঁহার মহাভিনিষ্ক্রমণকালে কত প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার প্রয়াস পাইল; বোধিদ্রুমতলে তাঁহার সম্বোধিলাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বয়ং মারের, মার-সেনার, মার-বধূগণের কত ঐশ্বর্য্য প্রলোভন, কত ভয় প্রদর্শন, কত হাব ভাব বিলাস বিভ্রম! যীশুর Temptation in the Wildernessএর কথা মনে পড়ে না কি? এই মার-পরাজয়ের কথায় বৌদ্ধ-সাহিত্য পূর্ণ। পরবর্ত্তী বৌদ্ধপন্থীদিগের কল্পনা এই পরাজয় ব্যাপারটিকে কাব্যে, সাহিত্যে, চিত্রে, শিল্পকলায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে। খ্রীষ্টানের মত বৌদ্ধও মারের ভয়ে সন্ত্রস্ত; বিশেষতঃ তিব্বতে ও চীনে মারের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। তিব্বতীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে যে Eucharist ভক্ষণ প্রচলিত আছে, তাহাতে মারের অনুচরদের দূরীকরণ প্রথমেই অনুষ্ঠেয়। অমিতায়ু নামক বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া লামা একটি কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা অমিতায়ুর হস্তস্থিত একটি পাত্রের মুখ আচ্ছাদিত করেন। এই কাষ্ঠখণ্ডটিকে "বজ্র" নামে অভিহিত করা হয়; বজ্রের এক প্রান্ত পাত্রটির উপর স্থাপিত; অপর প্রান্তটি লামা নিজের বক্ষের সহিত সংলগ্ন করেন। এই প্রক্রিয়ায় সেই যাজক লামার দেহে অমিতায়ুর প্রভাব সঞ্চারিত হইল; তখন তিনি মন্ত্রের দ্বারা মারকে বিদূরিত করেন; পরে পাত্রস্থিত জল, নরকপালস্থিত মদ্য, অপর পাত্রস্থিত পিষ্টক ও ময়দার বটিকা মন্ত্রের দ্বারা শোধিত করিয়া অমৃতে পরিণত করা হয়; সকলেই তাহা সেবন করিয়া অমরত্ব লাভ করে। বৌদ্ধদিগের নরকের নিকট খ্রীষ্টানের নরক হার মানে; মারের অনুচরেরা পাপীকে কত কঠোর শাস্তি দেয়, তাহাই প্রধানতঃ তিব্বতীয় শিল্পকলায় প্রকটিত হইয়াছে। যে বৌদ্ধগণের নিকট সকলই অনিত্য ও ক্ষণিক,

তাঁহারাও যে অমৃতের বা অমরত্বের প্রয়াসী হইবেন, ইহা বিস্ময়ের কথা বটে। মার পাপে প্রবর্ত্তক; তাঁহার নামেই প্রকাশ যে, মৃত্যুও তাঁহারই খেলা।

"ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে মার প্রবেশ লাভ করিলেন। সেখানে তিনি পাপ-প্রবর্ত্তক ও শাস্তি-বিধাতার মূর্ত্তিতে দেখা দেন না; সেখানে তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র কন্দর্পরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার পুষ্পবাণে দেবতার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়, যোগী ঋষির ধ্যানভঙ্গ হয়, কিন্তু তিনি কখনও কাহাকেও পাপে প্রণোদিত করেন না। কখনও কখনও কাহারও স্বর্গগমন রোধ করিবার জন্য দেবরাজ তাঁহার সাহায্য লইতেন; কিন্তু নরকে পাঠাইবার জন্য নহে। মহাদেবের কন্দর্পধ্বংস ব্যাপারটি বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক মার-জয় ব্যতীত আর কিছু নহে, এইরূপ অনেকে অনুমান করেন। কে বলিতে পারে, বৌদ্ধ ও হিন্দুর মধ্যে এ বিষয়ে কে কাহার নিকট ঋণী ?

"প্রাচীন বা আধুনিক ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে শয়তানরূপী মারের উপদ্রব দেখিতে পাই না; অথচ মার বৌদ্ধ-সাহিত্যে ও বৌদ্ধ-শিল্পে খুব বেশী জায়গা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন; বেশ বুঝা যায় যে, এই শয়তানী ভাব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ধাতের সঙ্গে খাপ খাইল না। এখন প্রশ্ন উঠে এই যে, এই শয়তান বা মার কোথা হইতে আসিলেন ?

"বুদ্ধদেবের সময়ে ও কিছু পরে পারস্য-সাম্রাজ্যের পূর্ণ গৌরব; তথায় জরথুস্ত্রের ধর্ম্ম পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত; পশ্চিম-ভারতের কিয়দংশ দরিয়াবুশের (Darius) অধীন ছিল, ইহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। এমন অবস্থায় পারসীকদিগের সহিত ভারতবাসীর ভাবের আদান-প্রদান হইবার সম্ভাবনা ছিল। যে শাক্যকুলে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত বটে; কিন্তু তাহার আচার-ব্যবহার এবং রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে উক্ত বংশ খাঁটি দেশীয় ক্ষত্রিয় ছিল কি না সন্দেহ জন্মে। এমন কি, শাক্য নামটা শাকদ্বীপ বা Scythiaকে স্মরণ করাইয়া দেয়। শাকদ্বীপবাসী-বিজেতা পারসীকের সংস্রবে আসিল। বিজেতার শয়তানরূপী আহ্রিমান শাকদ্বীপের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করিয়া শাক্যবংশীয় বুদ্ধদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী মার-রূপ পরিগ্রহ করিল, এমন কথা মনে আসিতে পারে। ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে নিশ্চিত-কোনও কথাই বলা যায় না। সে যাহা হউক, খ্রীষ্টানের শয়তান

যেমন বিদেশ হইতে আমদানি, বৌদ্ধের মারও তেমনি বিদেশ হইতে আমদানি, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।

"ভাল, তাহাই যেন হইল; কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠে এই যে, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানধর্ম্মে এই শয়তানের এত প্রভুত্ব হইল কেন? অথচ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে হইল না কেন?

"প্রথমে খ্রীষ্টানের কথা ধরা যাউক। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মূল সূত্র এই যে, মানুষ আজন্মপাপী; আদিম পিতামাতার স্খলনজনিত পাপের বোঝা ঘাড়ে করিয়া সে জন্মগ্রহণ করে; সেই গোড়ার পাপের ফলে পৃথিবীতে পাপ ও মৃত্যু (Sin and Death) আবির্ভূত। ইহাই হইল খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মূল সূত্র। মনুষ্য মাত্রই পাপী, sinner, মানবজীবন পাপময় (sinful), ইহা স্বীকার করিয়া খ্রীষ্টান জীবনযাত্রা আরম্ভ করেন। এই পাপের বোঝা দুর্ব্বহ; ঈশ্বরের কৃপা (grace) ব্যতীত এই বোঝা মানুষ নিজের শক্তিতে নামাইতে পারিবে না। এই পাপ ও তাহার আনুষঙ্গিক মৃত্যু হইতে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য পরিত্রাতা (Saviour) আবশ্যক; ভগবান্ দয়া করিয়া অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যজাতির পাপের বোঝা নিজের ঘাড়ে লইয়া আপনাকে বলিরূপে অর্পণ করিয়াছেন ও আপনার রক্ত দিয়া মানুষের মুক্তি-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। খ্রীষ্টান সমস্ত জগৎকে মলিন, অপবিত্র, কুৎসিত মনে করেন। সমস্ত জগৎটা একটা অশুদ্ধ আবর্জ্জনা। তাই খ্রীষ্টীয় প্রথম যুগে খ্রীষ্টানের ভাবনা ছিল, কেমন করিয়া এই fleshরূপ ক্লেদ বর্জ্জন করা যায়। আদিম মানব-জননীর স্খলনের পর হইতে সমস্ত নারীজাতির প্রতি খ্রীষ্টানের অবজ্ঞা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল; নারী যে নরকস্য দ্বারং, temptress, এই ভাবটাই তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। বহু শত বৎসর পরে এই ভাব সমাজের এক স্তরে পরিবর্ত্তিত হইল; তখন য়ুরোপে একটা ক্ষত্রসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে; সেই chivalryর দিনে নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তখনও সমগ্র খ্রীষ্টান-সমাজ আপনাকে পাপভারপীড়িত মনে করিত—ইহ জগৎকে কদর্য্য ও হেয় মনে করিত। জ্ঞানমার্গের (science) প্রতি খ্রীষ্টানের বিদ্বেষের মূলও এইখানে; খ্রীষ্টানধর্ম্ম যখন রোমান সাম্রাজ্যের ধর্ম্ম হইল, তখন হইতে সম্রাট্‌দের প্রধান চেষ্টা দাঁড়াইল, কেমন করিয়া গ্রীক-সভ্যতাকে, গ্রীসীয় বিদ্যাকে সমূলে বিনষ্ট করা যায়। য়ুরোপের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল; Dark Age, তামস-

যুগের অন্ধকারে য়ুরোপ নিমজ্জিত হইল। কত শত বৎসর পরে গ্রীক-সভ্যতার পুনরুত্থানে য়ুরোপ নব জীবন, Renaissance লাভ করিল! চর্চ্চ কিন্তু স্থির করিয়াছিল যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে শয়তানের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে; তাই জ্ঞানমার্গাবলম্বী ব্যক্তি মাত্রই শয়তানের উপাসক বলিয়া পরিগণিত হইত; বিজ্ঞান হইল Black Art, তামস বিদ্যা। রজার বেকন, ব্রূনো, গ্যালিলিও প্রভৃতির প্রতি আচরণই ইহার পরিচয়। আজিও খ্রীষ্টান জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের বিরোধভাব সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারে নাই। Lyall ও Darwin তাহার সাক্ষী। এইটুকু না বুঝিলে খ্রীষ্টান-সাহিত্য বুঝা যায় না; ডাণ্টে ও মিল্টনকে বুঝা যাইবে না; গয়টের ফাউষ্ট্‌ও বুঝা যাইবে না। সংসারের, সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থা খ্রীষ্টানের প্রাণে বিভীষিকা উৎপাদন করে; মানুষের সমাজ-ব্যবস্থার অন্তস্তলে এমন কিছু আছে, যাহা হইতে অপার দৈন্যের, অসীম বেদনার, অনন্ত দুঃখের সৃষ্টি হইয়াছে। সেক্ষপীয়রের উপর চর্চ্চের আধিপত্য যে বড় বেশী ছিল, এমন বোধ হয় না; কিন্তু তিনিও যেন মানব-জীবনের এই গোড়ায় গলদটার বিভীষিকা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই; তাঁহার হ্যামলেট্, ওথেলো, লীয়র, ম্যাক্‌বেথে এই প্রকাণ্ড জীবনরহস্যের বিভীষিকা প্রকট হইয়া রহিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, এইটাই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মূল সূত্র। পাপের পূর্ণ অবতার, মঙ্গলময় পরমেশ্বরের এক মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী শয়তান যে খ্রীষ্টীয় সমাজের উপর ছায়া বিস্তার করিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে জগতের সহিত মানবের সম্পর্ক ইউরোপীয়ের পক্ষে কতকটা অন্যরূপ হইয়াছে; ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি কবির কাব্যে তাহার নমুনা পাওয়া যায়। কিন্তু উহা ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ফল; তখন বিদ্রোহী মানব আপন মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছে।

"কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে শয়তান নাই। বরং স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, আনন্দ হইতেই সমস্ত চরাচর, সর্ব্ব ভূত জন্মগ্রহণ করিয়াছে; আনন্দেই ভূত-সকল জীবিত আছে; সংহার বা লয়কালে তাহারা আনন্দেই প্রবেশ করিবে। যাঁহারা এ কথা বলিতে পারেন, তাঁহারা মৃত্যুকে ভয় করেন না; যেখানে আনন্দে জন্ম, আনন্দে জীবন, আনন্দে লয়, সেখানে শয়তানের প্রভুত্ব থাকিতেই পারে না। বেদপন্থীর নিকট ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ; তাঁহার কোনও

রূপ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিতে পারে না, এবং নাই। ব্যাবহারিক জগতে যে অমঙ্গল বা দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও স্বরূপতঃ আনন্দস্বরূপ। যে মায়া হইতে তাহার উৎপত্তি, সেই মায়া অর্থাৎ বিশ্বজননী শক্তিও আনন্দরূপিণী; এই মায়া কখনও বিভীষিকাময়ী কল্পিত হয় নাই। অনার্য্যপূজিতা ভয়ঙ্করী বিন্ধ্যবাসিনী এবং চামুণ্ডাও ব্রাহ্মণের হস্তে আনন্দময়ী শিবশক্তিতে পরিণত হইয়াছেন। ঈশোপনিষদের একটি কথাতে বেদপন্থীর জগত্তত্ত্ব অল্পের মধ্যে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

অর্থাৎ সমস্ত ভূতই আত্মায় বর্ত্তমান, এবং আত্মা সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান, সুতরাং এই জগৎকে ঘৃণা করিবার প্রয়োজন নাই। এইটি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গোড়ার কথা। এ কথাটি স্মরণ করিয়া রাখিলে ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস, এবং অন্য দেশের সামাজিক ইতিহাসের সহিত ইহার পার্থক্য বুঝা যাইবে। এইটুকুই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ইতিহাসের গোড়ার কথা। ঈশোপনিষদের অনেক পূর্ব্বে ঋগ্বেদসংহিতায় আমরা দেখিতে পাই যে, নাসদাসীয় সূক্তে জগৎসৃষ্টি বর্ণনে বলা হইয়াছে

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ,

"বিশ্ব-জগৎটা কামনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এই কামনা বা কাম সৃষ্টিকর্ত্তার মন হইতে উৎপন্ন; এই যে কামনা, ইহা মায়া হইতে অভিন্ন; বৈষ্ণবের ভাষায় ইহা—লীলা। এ-কালে শোপেনহৌয়ার জগৎকে যখন একটা Will ও একটা Idea বলিয়াছেন, তখন সেই পুরাতন কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। উত্তর কালে কামকে ব্রহ্মার মানস পুত্র বলা হইয়াছে। এই জন্য তাঁহার নাম মনসিজ। তিনি আদিদেবতা; মার বা মৃত্যু বা শয়তান নহেন। বৈদিক ঋষি জগৎকে মধুময় বিবেচনা করিতেন; জগৎকে ভয় করিতেন না। মধু বাতা ঋতায়তে প্রভৃতি যে কয়টি মন্ত্র প্রত্যেক হিন্দুর মুখস্থ আছে, তাহা বৈদিক ঋষির একেবারে মনের কথা; তিনি জগৎকে মধুময়, আনন্দময়, দ্যুতিময় দেখিতেন। বেদের দেবতাতত্ত্বের মূলও এইখানে পাওয়া যায়।

"বেদের দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন; প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন। বৈদিক ধর্ম্ম বহুদেববাদী বা একদেববাদী; শুধু Theism না polytheism না pantheism না Henotheism; ইহা লইয়া বিস্তর বিচার-বিতর্ক হইয়াছে। অতি প্রাচীন কালে নিরুক্তকারগণ ও মীমাংসাদর্শনের আচার্য্যগণ এই বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। কাহারও মতে ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু ও ব্যাবহারিক জগতের যাবতীয় পদার্থের এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকিতেন; বেদে তাঁহারই পূজা হইত। কাহারও মতে এই দেবতা ভিন্ন ভিন্ন নহেন; একই ঈশ্বর সর্ব্বত্র অধিষ্ঠাতা। আধুনিক পাশ্চাত্য মত এই যে, এক কালে বৈদিক ঋষিগণের বহু দেবতায় বিশ্বাস হইয়াছিল; ক্রমে তাঁহারা বহির্জগৎ হইতে বহির্জগতের স্রষ্টার সমীপে from Nature to Nature's Godএ পৌঁছিয়াছেন। প্রাচীন নিরুক্তকারেরা এই সকল দেবতাকে প্রাকৃতিক শক্তি স্বীকার করিতেন; এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিয়া, কোন্ দেবতা কোন্ শক্তির পরিচয় দেন, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাহারও মতে দেবতারা এক কালে প্রসিদ্ধ ক্ষমতাবান্ মনুষ্য ছিলেন (heroes), মৃত্যুর পরে দেবত্ব পাইয়াছেন। বেদের মধ্যেই সাধ্যদেব বলিয়া এক শ্রেণী দেবতার উল্লেখ আছে; পূর্ব্বে তাঁহারা মানুষ ছিলেন; পরে তপস্যাদ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। সাংখ্যদর্শন ঈশ্বর মানে না, কিন্তু দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে; তবে সেই দেবগণ সিদ্ধ পুরুষ মাত্র। মীমাংসাদর্শনের আচার্য্যগণ বেদের যে ব্যাখ্যা করেন, সমস্ত হিন্দুসমাজ তাহা গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু তাঁহারা নিজে ঈশ্বর ও দেবতা কিছুই মানিতেন না। নৈয়ায়িকগণ এবং ঈশ্বরকারণিকগণ স্বতন্ত্র ঈশ্বর মানিতেন,—প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা একেশ্বরবাদী ছিলেন,—অথচ দেবতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন না। বৌদ্ধগণ ঈশ্বর মানিতেন না, কিন্তু সমুদয় বৈদিক দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন; এমন কি, মহাযানী বৌদ্ধগণ ম্লেচ্ছজাতি হইতেও বহু দেবতা গ্রহণ করিয়াছিলেন; নিজেরাও নানা কাল্পনিক দেব-দেবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

"নানা মুনির নানা মত দেখিয়া বেদের দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুষ্কর। সমুদয় বৈদিক সাহিত্যের এবং বেদের কর্ম্মকাণ্ডের সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিলে একটা জিনিষ স্পষ্ট দেখা যায় যে, যাজ্ঞিকদিগের মতে যে মন্ত্র যাহাকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চারণ করা হয়, সেই মন্ত্রের মধ্যে

যাহার নামোল্লেখ আছে, তাহাই সেই মন্ত্রের দেবতা। কোনও কোনও মন্ত্রে ইন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নির কথা বলা হইয়াছে; তাঁহারা সেই সেই মন্ত্রের দেবতা। কোনও মন্ত্রে যজ্ঞের যূপকাষ্ঠের কথা বলা হইতেছে; যূপকাষ্ঠ সেই মন্ত্রের দেবতা। মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা পিতৃগণ হইতে পারেন; অশ্বমেধের ঘোড়া হইতে পারেন; ধনুর্ব্বাণ, শিলাখণ্ড হইতে পারেন; অরণ্য, নদী বা মণ্ডূক হইতে পারেন; বনস্পতি ওষধি হইতে পারেন; জ্ঞান শ্রদ্ধা বা বাগ্‌দেবতা হইতে পারেন; সংবৎসর, ঋতুগণ বা পূর্ণিমা অমাবস্যা হইতে পারেন; বিরাট্ পুরুষ হইতে পারেন; "ক" নামক অনির্দ্দেশ্য দেবতা হইতে পারেন। পরবর্ত্তী কালে দেখা যায় যে, হ্রী, শ্রী, ধৃতি, শুচি, মেধা, স্বাহা, স্বধা, ওঁকার, বষট্‌কার (অগ্নিতে আহুতি দিবার সময়ে মন্ত্র—বৌষট্), ইত্যাদি দেবতা হইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ জগতের মধ্যে যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর, অনুমানগোচর বা কল্পনাগোচর হইতে পারে, সমস্তই বৈদিক মতে দেবতারূপে পরিগণিত হইতে পারে।

"দেব শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ,—যাহা দীপ্তিমান্, দ্যুতিমান্। বৈদিক ঋষি সমস্ত জগৎটা দ্যুতিমান্ দীপ্তিমান্ দেখিতেন। সুতরাং সমস্ত জগৎ এবং তাহার খণ্ডাংশ—যাহা কিছু প্রত্যক্ষগোচর বা কল্পনাগোচর আছে বা হইতে পারে, সমস্তই তাঁহাদিগের কাছে দেবতা। এই ভাবটি বেদান্তে পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে;—আত্মা বা ব্রহ্ম যখন সকল ভূতেই বর্ত্তমান, এবং সকল ভূতই যখন আত্মাতে বর্ত্তমান, তখন সমস্ত জগৎ এবং সমস্ত জাগতিক দ্রব্য যে দেবতা হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? এবং সবই যখন আনন্দময়, দীপ্তিমান্ এবং সুন্দর, তখন ঋষি যে সকল দ্রব্যকেই স্তুতি করিবেন, তাহাতেই বা বিচিত্র কি? দীপ্তি, দ্যুতি বা প্রকাশ যাহার আছে, তাহাই দেবতা। আত্মার নিকট যাহা কিছু জ্ঞানগম্য হইয়া প্রকাশ পায়, তাহাই দেবতা। জ্ঞানে এই প্রকাশ স্বরূপতঃ আত্মারই প্রকাশ; আত্মা আপনার দীপ্তিতে সকল পদার্থকেই দীপ্ত করেন। ঋগ্বেদসংহিতার মধ্যে বেদান্তবাদকে আমরা পরিণতাবস্থায় দেখিতে পাই। দশম মণ্ডলের অন্তর্গত নাসদাসীয় সূক্ত ও দেবীসূক্ত ইহার প্রমাণ। ঐ দুই সূক্তে যাহা আছে, সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র তাহার উপরে নূতন কথা বলে নাই। ঐ দুই সূক্তের অর্থ না বুঝিয়া কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত বলেন যে, বেদান্ততত্ত্ব অনেক পরে উদ্ভূত। এই মতকে যদি কেহ Pantheism বলিয়া গালি

দিতে চাহেন, তাহাতে বৈদিক ঋষির কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বেদানুমোদিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে যখন সমস্ত জগৎটাই দেবতা,—আনন্দময়, দ্যুতিময়, সুন্দর, তখন সেখানে দুঃখের, অমঙ্গলের বা শয়তানের স্থান হইতে পারে না। ব্যবহারজগতে দুঃখ, কুৎসিত, শয়তানি যাহা দেখা যায়, ব্রাহ্মণের হাতে পড়িলে তাহাও দেবত্ব প্রাপ্ত হয়।

"Edward Tylor এবং Andrew Lang হয়ত বলিবেন—ইহা ত savage philosophy। পৃথিবীর যাবতীয় savageই জাগতিক দ্রব্য মাত্রকেই জীবন্ত মনে করে, অথবা প্রত্যেক জিনিষের অধিষ্ঠাতা দেবতা আছে, ইহা কল্পনা করে। ইহার নাম Animism। সাঁওতাল ও Hottentotএর সহিত এ বিষয়ে বৈদিক ঋষির কোনও পার্থক্য নাই। এ কথা আমি অস্বীকার করি না। Primitive animism ও প্রেতপূজা হইতেই সভ্য জগতের যাবতীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি ও পরিণতি অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। Shakespeare বা Newtonএর পূর্ব্বপুরুষ বনমানুষ ছিলেন, ইহা স্বীকারেও তাঁহাদের মাহাত্ম্য যেমন কোনও রূপে খর্ব্ব হয় না; কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত বা বৈদিক ঋষির মত জগৎকে জীবন্ত দেখিলে, এই দৃষ্টির সূত্রপাত savageএর মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা অঙ্গীকারে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বা বৈদিক ঋষির কোনও লজ্জার কথা নাই।

"সাংখ্যদর্শন, প্রথমে দুঃখকে খুব বড় করিয়া দেখিয়াছেন, এবং দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভকেই মুক্তি বলিয়াছেন। বেদান্ত দুঃখকেই মানে না, উড়াইয়া দেয়; কাজেই তাহার কাছে দুঃখ নিবৃত্তির কোনও অর্থই হয় না। কিন্তু সাংখ্যদর্শন দুঃখকে পুরুষ ও প্রকৃতির অমূলক সম্মিলন হইতে উৎপন্ন বলেন। পুরুষ যে প্রকৃতির স্পর্শে বস্তুতঃ আসিতে পারে না, এই তত্ত্বটুকু জানিতে পারিলে সাংখ্যমতে দুঃখ অলীক হইয়া যায়, এবং উহার অত্যন্ত নিবৃত্তি ঘটে।

"বুদ্ধদেব অতি স্পষ্টভাবে জগৎকে দুঃখাত্মক স্বীকার করিয়া দুঃখটাকেই খুব বড় করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি বোধিদ্রুমতলে সম্বোধি লাভের সময়ে যে চারিটি আর্য্যসত্য আবিষ্কার করেন, তন্মধ্যে প্রথমটি হইতেছে **জগৎ দুঃখময়।** এই দুঃখের অস্তিত্বে সমস্ত জগৎ পীড়িত; জগতের সেই পীড়া দেখিয়া তিনি নিজে পীড়িত হইয়াছিলেন। পিতা শুদ্ধোদন তাঁহাকে সকল দুঃখ হইতে দূরে রাখিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; দৈবগত্যা রাজপথে

পরিভ্রমণকালে জরা, ব্যাধি, এবং মৃত্যু, এই তিনরূপে দুঃখ তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিল। তদবধি তিনি আর শান্তি পাইলেন না; জগৎকে কি প্রকারে দুঃখভার হইতে মুক্ত করিবেন, সেই চেষ্টাতেই রাজ্য সম্পদ্ ত্যাগ করিয়া প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বোধিদ্রুমতলে দ্বিতীয় আর্য্যসত্য আবিষ্কার করিলেন, **দুঃখের হেতু আছে।** তৃতীয় ও চতুর্থ সত্যে তিনি সেই দুঃখনিবারণের উপায় আবিষ্কার করিলেন। ব্যাধির নিদান না জানিলে যেমন চিকিৎসা হয় না, সেইরূপ দুঃখের নিদান না জানিলে চিকিৎসা হয় না। তাই বৈদ্যরাজ তথাগত দুঃখের হেতু অর্থাৎ নিদান আবিষ্কার করিয়া পরের দুঃখ নিরোধের উপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার আবিষ্কৃত এই নিদানতত্ত্বের নাম,—প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব। আমার 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই তত্ত্বই বৌদ্ধগণের সৃষ্টিতত্ত্ব; সাংখ্যের ও বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে ইহার খুব বেশী প্রভেদ নাই। মূলে অবিদ্যা হইতে দুঃখ উৎপন্ন; অবিদ্যা হইতে দুঃখে পৌঁছিতে বারটা ধাপ আছে। প্রসঙ্গতঃ এইখানে এই তত্ত্বের বর্ণনা একটু আবশ্যক।

"এ-কালের sensationalist ও phenomenalist প্রভৃতি empirical philosopherগণ জগৎকে কতকগুলা sensationএর সমষ্টি বলিয়া জানেন। এই মতটা হিউমই স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করেন। বুদ্ধের মতেও প্রতীয়মান জগৎটা কতকগুলা রূপ-রস-স্পর্শাদির, সুখদুঃখ হর্ষবিবাদ প্রভৃতির সমষ্টি মাত্র। এইগুলার বৌদ্ধ পারিভাষিক নাম—"সংস্কার," হিউমের Idea। এই সংস্কারের মধ্যে সমস্ত Sensations, Emotions, Cognitions, Volitions রহিয়া গেল। ইহাদিগের মূল কোথায়, জিজ্ঞাসা করিলে বৌদ্ধ বলিবেন,—অবিদ্যায় বা অজ্ঞানে; মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা বলিবেন,—'শূন্যে'; হিউম ও হক্সলি বলিবেন,—জানি না; এই জন্য হিউম skeptic, হক্সলি agnostic। এখন এইগুলোর মধ্য হইতে কোনও রকমে "বিজ্ঞান" বা consciousness উৎপন্ন হয়। সেই বিজ্ঞানের ফলে জগৎটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়।—প্রথম, অন্তর্জগৎ Psychical world (পারিভাষিক সংজ্ঞা—নাম); দ্বিতীয়, বাহ্য জগৎ Physical world (পারিভাষিক সংজ্ঞা—রূপ); Psychical ও Physical world না বলিয়া world of concepts (নাম) ও world of percepts (রূপ) বলিলে বোধ করি ঠিক হয়। এই ভাগক্রিয়ার সঙ্গে "ষড়ায়তন" বা ছয়টি ইন্দ্রিয়দ্বারা ঐ

উভয় জগতের মধ্যে 'স্পর্শ' ঘটে। সেই স্পর্শের ফলে 'বেদনা' অর্থাৎ বাহ্য জগতের অনুভূতি হয়। এই বেদনার ফল 'তৃষ্ণা' অর্থাৎ বাহ্য জগৎকে ভোগ করিবার প্রবৃত্তি। তৃষ্ণার ফল,—'উপাদান' অর্থাৎ উপ—সমীপে, আদান গ্রহণ—সমীপে গ্রহণ, বাহ্য জগৎকে নিকটে টানিয়া আনা। এই ভোগকালে জীবের 'ভব' অর্থাৎ অস্তিত্বটা পূর্ণ হয়। সেই সঙ্গে তাহার 'জাতি' আসে; অর্থাৎ জীব তখন মনে করে যে, সে জন্ম লাভ করিয়া এক জন person ব্যক্তিবিশেষ হইয়াছে। এই 'জাতি'র অর্থাৎ মনুষ্যত্ব লাভের এক মাত্র ফল—'দুঃখ,' দৌর্মনস্য; জরা, মরণ। এই প্রতীত্য-সমুৎপাদতত্ত্বের আবিষ্কারের পর বুদ্ধদেব সম্বোধি লাভ করেন।

"পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ এই তত্ত্ব নানা উপায়ে জনসমাজে প্রচারিত করেন। ভবচক্রের উদ্ভাবনা তাহার মধ্যে অন্যতম। নিদানগুলিকে একখানা চক্রের নেমিতে চিত্রিত করা হয়। এই চিত্রের নাম "ভবচক্র"। চক্রের কেন্দ্রে রাগ, দ্বেষ ও মোহ; সেই কেন্দ্র ও পরিধির মাঝখানে সমস্ত নর-লোক, দেবলোক, অসুরলোক ইত্যাদি ভবচক্রের অধীনে কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে; সমস্ত চক্রটাকে আঁকড়াইয়া জড়াইয়া কামড়াইয়া ধরিয়া আছেন—শয়তান। তাৎপর্য্য এই যে, রাগ দ্বেষ ও মোহকে কেন্দ্র করিয়া শয়তানের নিপীড়িত ভবচক্র ঘুরিতেছে। কেন্দ্রস্থ রাগ অর্থাৎ আসক্তি কপোতরূপে, দ্বেষ সর্পরূপে ও মোহ শূকররূপে চিত্রিত হইয়াছে; ইহারা তিন জনে পরস্পরকে জড়াজড়ি করিয়া আছে। দ্বাদশটি নিদানের মধ্যে "তৃষ্ণা"র প্রতিকৃতি—সুরাপানরত মনুষ্যমূর্ত্তি; "স্পর্শে"র—আলিঙ্গনবদ্ধ দম্পতি, উপাদানের চিত্রে বৃক্ষ হইতে এক জন ফল পাড়িতেছে; "অন্তিম নিদানে"র চিত্রে—বাঁশের দোলায় চড়া শবমূর্ত্তি। প্রসিদ্ধি আছে যে, নাগার্জ্জুন এই ভবচক্রের উদ্ভাবয়িতা; ডাক্তার ওয়াডেল অজন্তা গুহা হইতে ইহার প্রতিলিপি প্রকাশিত করেন। তিব্বতের মঠে এই ছবি অনেক আছে।

"প্রথম নিদান কয়টি বাদ দিলে দেখা যায় যে, তৃষ্ণা হইতে দুঃখ, কাজেই এই তৃষ্ণাকে দমন করিবার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের আগ্রহ। বাহ্য জগৎকে কোনও রূপে হেয়, কদর্য্য, বর্জ্জনীয় প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইতে পারে, তৃষ্ণাকে দমন করা যাইতে পারে। খ্রীষ্টানের মত বৌদ্ধও বাহ্য জগৎটাকে Evil অশিব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন; বৌদ্ধদিগের সমস্ত বিনয়ের (discipline) উদ্দেশ্য এই।

"এইখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। ব্যাবহারিক জগতে কদর্য্য কুৎসিত আছে, এ কথা ব্রাহ্মণ অস্বীকার করেন না; কিন্তু তিনি কদর্য্যকে বিনাশ করিতে, কুৎসিতকে সুন্দর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের practical disciplineএর উদ্দেশ্য ইহাই। কুৎসিতের ভিতর হইতে সৌন্দর্য্যকে টানিয়া বাহির করিতে না পারিলে, তিনি সেই কুৎসিতকে চাপা দিতে চেষ্টা করেন। বিশ্লেষণ করিয়া কদর্য্যকে বাহির করিয়া দেখান ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নহে। বৌদ্ধ কদর্য্যকে দেখাইতে চায়; গাঢ় রং ফলাইয়া বীভৎস করিয়া তুলে। এইখানে খ্রীষ্টানের সহিত বৌদ্ধের মিল দেখিতে পাই।

"শ্রীমতী রিস ডেভিড্‌স সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সহিত বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, সমস্ত চেতন জগতের দুঃখের বেদনায় বৌদ্ধ-ভারতবর্ষের হৃদয় ও দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল; বেদান্তের সুখময়, তৃপ্তিময় স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে; হিম ঊষালোক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে। অন্যত্র তিনি বলিতেছেন যে, ধর্ম্ম হিসাবে বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী দেহটাকে অত্যন্ত কদর্য্য বলিয়া গণ্য করিত; ইন্দ্রিয়-গুলাই বিপদ্‌ ও বেদনা আনয়ন করে; গলিত ন্যক্কারজনক দ্রব্য সম্মুখে ধরিয়া রূপজ মোহ জয় করিতে হইবে।

"এই ভাবগত বিরোধ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাহিত্যে বেশ ধরা পড়ে। স্মৃতি-শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের বার্দ্ধক্যে গৃহ হইতে বিদায় গ্রহণের বা ছুটি লইবার ব্যবস্থা আছে বটে; কিন্তু জগৎকে হেয় জ্ঞান করিয়া বনে পলাইবার ব্যবস্থা কোনও কালেই ছিল না। গৃহস্থ-আশ্রমকে এই জন্য শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হইয়াছে; এবং বিবিধ সংস্কার, সদাচার, ব্রত, অনুষ্ঠান প্রভৃতি দ্বারা মনুষ্যের বাহ্য ও আভ্যন্তর দেহকে সমর্থ, সুন্দর ও বিশুদ্ধ করিবার বিধান হইয়াছে। দেশ কাল ভেদে সেই সকল নিয়ম পরিবর্ত্তনীয় কি না, সে বিচারের এ স্থল নহে। রামায়ণ, মহাভারতে অপরিসীম দুঃখের কথা আছে; দুঃখকে দূরে পরিহার করিয়া পলায়নের ব্যবস্থা নাই। সমস্ত ভগবদ্গীতায় মানুষকে গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য পালনে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের মধ্যে কাব্য-সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। জাতকগ্রন্থে বা অবদানগ্রন্থে বুদ্ধদেবের অসাধারণ ত্যাগের প্রচুর উদাহরণ আছে; কিন্তু উহাতেও এমন একটা morbidness আছে যে, দেশের সাধারণের মন ভিজে নাই। সে আখ্যায়িকাগুলি প্রায় লুপ্ত ও বিস্মৃত; পক্ষান্তরে জগৎকে ও মানবকে

সুন্দর, উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ দেখাইবার জন্যই যেন কালিদাস ও ভবভূতি জন্মিয়াছিলেন।

"নারীজাতির প্রতি ব্যবহারেও যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সীতা সাবিত্রীর ত কথাই নাই; ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে নারীর মহিমা যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, এমন আর কোনও সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। কাব্য-সাহিত্যে স্থান পান নাই, এমন অনেক নারী আছেন, সামান্য ইঙ্গিতে আভাসে যাঁহাদের রেখাচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে; অথচ কোনও দেশের কোনও সাহিত্যে তাঁহাদের তুলনা মিলে না। আদর্শ পুরন্ধ্রী অরুন্ধতী, অনসূয়া ও লোপামুদ্রা ব্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষের বাহিরে দেখা যায় কি? তাঁহাদের পুণ্য চরিতে এমন একটা গভীরতা, গাম্ভীর্য্য, মর্য্যাদা—dignity আছে, তাহা পৃথিবীর সাহিত্যে অতুল্য। সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্যে ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে অনেক বিশুদ্ধচরিত্র মহাভাগ স্ত্রীলোক ছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু মোটের উপরে বৌদ্ধেরা নারীজাতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রথম যুগে নারীর প্রতি খ্রীষ্টানের ভাবও এইরূপ ছিল। সেই জন্যই উভয়ত্র চিরকৌমার্য্যের মাহাত্ম্য এত বেশী। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মশাস্ত্রে কিন্তু পুরুষ ও নারীর বিবাহসংস্কার একান্ত আবশ্যক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

"সুন্দর ও কুৎসিতের কথা বলিতেছিলাম,—আধুনিক সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবধর্ম্মে ও শাক্তধর্ম্মে বৌদ্ধপ্রভাব খুব বেশী; কিন্তু তাহারাও সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধ দুঃখবাদ গ্রহণ করিতে পারে নাই; জগৎকে কদর্য্য ও কুৎসিত দেখিতে পারে নাই। বৈষ্ণবের ভগবানের মূর্ত্তি—মদনমোহন; তাঁহার লীলাভূমি বৃন্দাবন, অর্থাৎ বিশ্ব-জগৎ সৌন্দর্য্যময়। শাক্ত তাঁহার জগন্মাতাকে আনন্দময়ী বলিয়া জানেন, এমন কি, ঘোররূপা কালীমূর্ত্তিতে পরম সৌন্দর্য্য দেখিতে পান। রামপ্রসাদ সংসারের দুঃখে অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার গানে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহার মনে সম্পূর্ণ জোর ছিল যে, তিনি তাঁহার মায়ের চরণ ধরিয়া যমকে ফাঁকি দিতে পারিবেন; শমনের ভয় তাঁহার ছিল না।

"আধুনিক হিন্দুত্বের মধ্যে বোধ হয়, মোটামুটি একটা সূত্র বাহির করা যাইতে পারে। যেখানে সংসারটাকে হেয় ও কদর্য্য করিবার চেষ্টা দেখা যায়, সেটা বৌদ্ধভাবপ্রণোদিত; যেখানে সুন্দর দেখাইবার চেষ্টা, সেখানে

ব্রাহ্মণ্য ভাব প্রবল। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ভর্ত্তৃহরির বৈরাগ্যশতকের মধ্যে এই শ্লোকটি আছে :—

স্তনৌ মাংসগ্রন্থী কনককলসাবিত্যুপমিতৌ
মুখং শ্লেষ্মাগারং তদপি চ শশাঙ্কেন তুলিতং।
স্রবন্মূত্রক্লিন্নং করিবরকরস্পর্দ্ধি জঘনং
মুহুর্নিন্দ্যং রূপং কবিবরবিশেষৈর্গুরুকৃতম্।

"বোধ হয়, মেডিক্যাল কলেজের ছেলেরাও নারীদেহ চিরিয়া এমন করিয়া অন্ত্র বাহির করিয়া দেখাইতে সঙ্কোচ বোধ করিবে। ব্রাহ্মণ ভবভূতির বোধ হয়, এ শ্লোকে হৃৎকম্প হইত। এবং যে প্রকৃত বৈষ্ণব নারীতে হ্লাদিনী শক্তি দেখেন, কিংবা যে প্রকৃত শাক্ত নারীতে জগজ্জননীর অংশ কল্পনা করেন, তাঁহারা এ শ্লোক শুনিলে কানে অঙ্গুলি দিবেন। ভর্ত্তৃহরি আপন ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সম্ভবতঃ তিনি শৈব সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু বৈরাগ্যশতকের এই নারীর প্রতি জুগুপ্সা বৌদ্ধভাবপ্রণোদিত মনে করা যাইতে পারে। তাঁহার উদ্দেশ্য খুব মহৎ। ভোগের পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু বেদপন্থী ব্রাহ্মণ ভোগনিবৃত্তির জন্য নিশ্চয়ই অন্য উপায় অবলম্বন করিতেন। ব্রাহ্মণের পুরাণেতিহাসাদি শাস্ত্রেও যেখানে এইরূপে জগৎকে কদর্য্য, নারীকে অপবিত্র করিয়া বর্ণনা হইয়াছে, সেখানে মূল অনুসন্ধান করিলে বৌদ্ধ ভাব পাওয়া যাইবে, ইহা আমার বিশ্বাস।

"বাহ্য জগতের প্রতি এই অবজ্ঞার দরুন বৌদ্ধেরা Physical Scienceএ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এখানেও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বভূতে হিতসাধন বৌদ্ধের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ছিল; সেই জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রে এবং তৎসম্পৃক্ত Alchemy ও Chemistryতে সে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুস্তকে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু যে বিদ্যার উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ জ্ঞানের উন্নতি; মানব-হিতের সহিত যাহার সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই,—যেমন গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি,—সে বিদ্যায় বৌদ্ধ কালক্ষেপ করে নাই।"

৩

একটু চুপ করিয়া রামেন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন,—"আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে অনেকে ঘাড় নাড়িবেন, তাহা আমি জানি। এ-কালের হিন্দুসমাজে এরূপ বৈরাগীর দল আছেন, যাঁহারা জগৎকে হেয় ও মানব-দেহকে জঘন্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। অনিত্য বস্তুর প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। তাঁহাদের উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারি; কিন্তু তাঁহাদের মতটাকে আমি খাঁটি ব্রাহ্মণ্যের অনুমোদিত বলিতে পারি না। এ-কালের সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ও সাম্প্রদায়িক শাক্তদিগের মধ্যেই এই মতের প্রবলতা দেখা যায়; কিন্তু সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ও শাক্ত যে অনেকটা বৌদ্ধ ভাবে অভিভূত হইয়াছেন, তাহা ইতিহাসের কথা। বিশুদ্ধ বৈষ্ণব বা বিশুদ্ধ শাক্ত এই মত ঘাড় পাতিয়া লইবেন, ইহা আমার বিশ্বাস নহে। যে বৈষ্ণব জগৎকে কুৎসিত ও হেয় বলিয়া মনে করেন, তিনি বৃন্দাবন-লীলার তত্ত্ব সম্যক্ বুঝেন নাই। যিনি দেহটাকে কুৎসিত ও অপবিত্র বলিয়া জানেন, তিনি সেই দেহকে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অর্পণ করিতে অধিকারী নহেন। আর তান্ত্রিক শাক্ত ত সেরূপ ভাবিতেই পারেন না। যে দেহের নিম্নে কুণ্ডলিনী-বেষ্টিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গ ও উর্দ্ধে সহস্রদলপদ্মস্থিত পরমশিব, সেই দেহ তাঁহার নিকট অশুদ্ধ হইতে পারেই না। তান্ত্রিক পূজায় বসিতে হইলে দেহটাকে বাগ্‌দেবতার দেহ হইতে অভিন্ন মনে করিতে হয়; উহা কি কখনও অপবিত্র হইতে পারে?

"কথাটা যখন উঠিল, তখন আমাদের পূজার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে দুইটা কথা বলিয়া লই। ইতর সাধারণে জানে যে, পূজার অর্থ ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, ঘণ্টা বাজাইয়া, ধূপ দীপ নৈবেদ্য উপহার দিয়া দেবতাকে খুশী করিয়া দেবতার নিকট ইহলোকের বা পরকালের জন্য কিছু আদায় করা। উহা কতকটা ঠিক বটে, কিন্তু ষোল আনা ঠিক নহে। শাস্ত্রকারেরা দেবপূজা সম্বন্ধে যে থিয়োরি খাড়া করিয়াছেন, তাহা আমরা লইতে বাধ্য; কেন না, পূজার পদ্ধতিটাও সেই theory অনুসারে রচিত। বৈদিক যুগে পূজা ছিল না, যজ্ঞ ছিল। যজ্ঞের তাৎপর্য্য পূর্ব্বে কতক বলিয়াছি। যজমান যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবতার সহিত একত্ব লাভ করিতেন; আপনাকে বা আপনার নিষ্ক্রয়-রূপে অন্য কোনও দ্রব্য আহুতি দিয়া ও হবিঃশেষ ভক্ষণ করিয়া দেবতার

সহিত এক হইতেন। এই দেবতা যিনিই হউন, তিনি আত্মারই প্রকাশ; কেন না, আত্মা সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান। অতএব শেষ পর্য্যন্ত theoryটা দাঁড়াইল এই যে, যজ্ঞের উদ্দেশ্য আত্মাকে লাভ। বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থে এই মত তত স্পষ্ট না হউক, আরণ্যকে ও উপনিষদে (যাহা ব্রাহ্মণেরই অংশ) ইহা প্রায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়, পরমায়ু লাভ হয়, ইত্যাদি প্রলোভন ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রচুর আছে বটে, কিন্তু সেগুলা মীমাংসা-দর্শনের মতে অর্থবাদ মাত্র বা ছেলে-ভুলানো কথা মাত্র। মীমাংসা-দর্শন বেদের যে ব্যাখ্যা দিবেন, সামাজিক হিন্দু তাহাই গ্রহণ করিতে বাধ্য।

"এ-কালের অধিকাংশ পূজা তান্ত্রিক পূজা; সকল বর্ণের ইহাতে সমান অধিকার। শূদ্র আপন ঘরে কালীপূজা করিতে পারে; ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকা আবশ্যক নহে। বেদের যেটা শেষ কথা, তন্ত্র সেটা গোড়ায় মানিয়া লইয়াছেন। সেই কথাটা—সোঽহং—আমিই সেই ব্রহ্ম, আমা ছাড়া অন্য ব্রহ্ম কল্পনার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মের নামান্তর আত্মা বা আমি। এই তত্ত্বটুকু লোকে জানে না; জানিলেই মুক্তিলাভ। তান্ত্রিক পূজার তাৎপর্য্য—এই মুক্তি লাভের চেষ্টা; আপনাকেই ব্রহ্ম বা আত্মারূপে জানিবার চেষ্টা। যিনি পূজায় বসেন, তিনি আপনাকে ব্রহ্মরূপে সাব্যস্ত করেন। ইহাকে যজমানের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য সাধন মনে করা যাইতে পারে। তাহা হইলে বৈদিক যজ্ঞের ও তান্ত্রিক পূজার উদ্দেশ্য একরূপই হয়। তান্ত্রিক পূজার পদ্ধতি আলোচনা করিলেই ইহা দেখা যাইবে। তান্ত্রিক পূজার প্রধান ও সাধারণ মন্ত্র "হংসঃ সোঽহম্"—আমিই সেই হংস। অনেকের ধারণা যে, বেদের সোঽহং-এর অক্ষর উল্টাইয়া তন্ত্র হংস করিয়া লইয়াছেন। তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। এই হংস মন্ত্রের পিছনে একটু ইতিহাস আছে। ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলে ৪০ সূক্তের শেষ ঋক্ "হংসঃ শুচিষৎ বসুরন্তরিক্ষসৎ হোতা বেদিষৎ" ইত্যাদি। ইহার নাম হংসবতী ঋক্, এবং ইহার ঋষি বামদেব, ইহার দেবতা সূর্য্য। হন্তি গচ্ছতি, এই অর্থে সর্ব্বত্র গতিশীল বলিয়া সূর্য্যকে হংস বলা হইয়াছে। মন্ত্রটি মোটের উপর বুঝায় যে, ঐ যে হংস বা সূর্য্য, উহা ভূলোকে দ্যুলোকে অন্তরীক্ষে জলে পর্ব্বতে ব্যোমে মনুষ্যমধ্যে সত্যমধ্যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। বৎসরব্যাপী গবাময়ণ সত্রের মধ্য দিনে দ্বাদশাহ যাগের ষষ্ঠাহে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হইত। আমার অনুবাদিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিবেন, ঐ প্রসঙ্গে ঐ মন্ত্রের সূর্য্যপক্ষে ব্যাখ্যা দেওয়া

আছে। শুক্লযজুঃসংহিতায় দেখিবেন, রাজসূয় যজ্ঞেও ইহার ব্যবহার হইত। মহীধর সেখানে সূর্য্যপক্ষে ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ঋগ্বেদ-সংহিতার ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য সূর্য্যপক্ষে ও ব্রহ্মপক্ষে দ্বিবিধ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আত্মার জ্ঞানগম্য বলিয়াই দেবগণের দেবত্ব; এই অর্থে ব্রহ্মরূপী আত্মার প্রকাশেই দেবগণের প্রকাশ। এই জন্য ব্রহ্মকে স্বয়ংপ্রকাশ ও অন্য দেবতাকে ব্রহ্মের দ্যুতিতে প্রকাশমান বলা হয়। ব্রহ্মই সকল দেবতাকে কর্ম্মে প্রেরণ করেন। স্থূল জগতে সূর্য্য স্বয়ংপ্রকাশ; জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের দীপ্তিতে অন্য সমস্ত দীপ্তিমান্ হয়; সূর্য্য সর্ব্বপ্রাণীকে কর্ম্মে প্রেরণ করেন; ইত্যাদি কারণে সূর্য্যকে ব্রহ্মের সহিত উপমিত করা যায়। গায়ত্রীমন্ত্র ইহার প্রমাণ। উপনিষদেও আদিত্যমধ্যে যে হিরণ্ময় পুরুষের উল্লেখ আছে, তিনি আত্মা। প্রচলিত নারায়ণের ধ্যানে সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী হিরণ্ময়বপু পুরুষের কথাও স্মরণ করুন। হংসবতী ঋকের হংস শব্দ সর্ব্বত্র গতিশীল, সর্ব্বত্র বর্ত্তমান ব্রহ্মপক্ষে প্রযুক্ত হওয়া বিস্ময়ের কথা নহে। যাজ্ঞিকী উপনিষদে ও কঠোপনিষদের পঞ্চম বল্লীতে ঐ হংসবতী ঋকের হংস শব্দ স্পষ্ট ভাবে ব্রহ্ম অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রও হংস শব্দে আত্মা বা ব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়াছেন। "হংসঃ সোঽহম্" এই তান্ত্রিক মন্ত্রের তাৎপর্য্য দাঁড়াইল—আমিই সেই হংস বা ব্রহ্ম। দেহমধ্যে কল্পিত ষট্চক্রের ঊর্দ্ধতম চক্রে, অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়মধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রে ইঁহার অবস্থান কল্পিত হইয়াছে। সেই স্থানে শিবরূপী হংস বিদ্যমান। তান্ত্রিকেরা সুরাশোধনের জন্য এই হংসবতী ঋক্ প্রয়োগ করেন; ইহা দ্বারা মদ্য অমৃতে পরিণত হয়।

"তান্ত্রিক পূজার কথা বলিতেছিলাম। এই পূজার মুখ্য অঙ্গ,—ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস। এই দুই ক্রিয়ার পর দেবতাপূজার অধিকার জন্মে। ভূতশুদ্ধির তাৎপর্য্য এই :—মানবদেহ ক্ষিত্যাদি পাঁচটা স্থূল ভূতে নির্ম্মিত। সর্ব্বসাধারণে মনে করে, এই স্থূল দেহটাই আমি। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। স্থূল ভূতগুলি বিশ্লেষণ করিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটি তন্মাত্র পাওয়া যায়। শব্দ-স্পর্শাদি প্রত্যয়গুলির সমষ্টিতেই স্থূল ভূত নির্ম্মিত। এই শব্দ-স্পর্শাদি আবার বিজ্ঞানের বা অহঙ্কারের বা Self-consciousnessএর আনুষঙ্গিক ফল। এই বিজ্ঞান বা অহঙ্কার শেষ পর্য্যন্ত সাংখ্যের ভাষায় পুরুষযোগে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়; বেদান্তের ভাষায় আনন্দস্বরূপ আত্মা কর্ত্তৃক মায়াযোগে উৎপন্ন হয়। ইহা খাঁটি Idealism। সাংখ্যের ও

বেদান্তের এই সৃষ্টিতত্ত্ব প্রায় একরূপ ; বেদান্তের আত্মা বা আমি,—সাংখ্যের পুরুষ। বেদান্তের আত্মা আমি এক মাত্র পুরুষ ; তুমি, তিনি, রাম, শ্যাম, ইঁহাদের অস্তিত্ব কল্পিত। সাংখ্যে আমি, তুমি, সে, সকলেই পুরুষ,—বহু পুরুষ। সাংখ্যের প্রকৃতিকে বেদান্ত মানিতে চাহেন না। যাঁহারা উভয় মত মিলাইতে চাহেন, তাঁহারা প্রকৃতিকে আত্মার মায়াজাত কাল্পনিক পদার্থ বলিয়া মিলাইয়া দেন। বৌদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্বের সহিতও এই দুই সৃষ্টিতত্ত্বের বড় ভেদ নাই। তবে বেদান্ত যেখানে আত্মাকে এবং সাংখ্য পুরুষকে বসান, বৌদ্ধ সেখানে একটা শূন্য বসাইয়া দেন। পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা আদিবুদ্ধকে বসাইয়া বেদান্তের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে চাহেন। যাহা হউক, মানুষের স্থূল দেহটা একটা কাল্পনিক পদার্থ, এ বিষয়ে তিনেরই এক মত। আসল জিনিষটা, the thing-in-itselfটা—আত্মা ; এইটা বুঝিলেই মুক্তিলাভ ঘটিল। তান্ত্রিক পূজার ভূতশুদ্ধি-প্রক্রিয়াটা ইহাই ;—স্থূল দেহটাকে বিশ্লেষণ করিয়া ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া শেষ পর্য্যন্ত আত্মাকে বাহির করিতে হইবে। ভূতশুদ্ধি-ক্রিয়াতে সাংখ্যের ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে ; কিন্তু কাণ্ডটা বেদান্তঘটিত। যিনি পূজায় বসিয়াছেন, তিনি মনে করিবেন, আমি আত্মাস্বরূপ,—অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম। আর জন্মমৃত্যু, ইহকাল পরকাল, সুখ দুঃখ, জগৎ সংসার, সবই আমার কল্পিত। স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত ব্যাবহারিক জগৎটাই কল্পনাতে পর্য্যবসিত হয়। এই ভূতশুদ্ধির পর দেহের মধ্যস্থিত পাপপুরুষটা স্বভাবতঃই পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। এই পাপপুরুষের কথা আগে বলিয়াছি।

"ভূতশুদ্ধির পর ন্যাস। নানাবিধ ন্যাসের মধ্যে মাতৃকান্যাস প্রধান। পুরোহিত ঠাকুর পূজায় বসিয়া কং খং গং ঘং করিয়া সমস্ত alphabetটা পুনঃ পুনঃ আওড়ান ও দেহের নানা স্থান স্পর্শ করেন। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা মনে করেন, না জানি কি একটা কারখানা হইতেছে ; যাঁহারা আমাদের মত mocker, তাঁহারা মনে মনে হাসেন। কিন্তু ব্যাপারটার যাহা হউক, একটা তাৎপর্য্য আছে, তাহার খোঁজ কেহই বোধ করি রাখেন না। পূজক পূজায় বসিয়া ভূতশুদ্ধি দ্বারা ঠিক করিয়া লইয়াছেন, আমিই ত ব্রহ্ম ; আমার পূজা আবার আমি কি করিব ? এইখানে হিন্দুর ধর্ম্মের একটু বিশিষ্ট কথা, একটু মজার কথা আছে। খ্রীষ্টান মুসলমান প্রভৃতি একেশ্বরবাদিগণ কেবল এক ঈশ্বরেরই পূজা করেন, অন্য কাহারও পূজা

sacrilege বা অধর্ম্ম ভাবেন। বেদপন্থী হিন্দু এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পূজা করেন না; তৎপরিবর্ত্তে বহু দেবতার, বহু দ্রব্যের পূজা করেন। তিনি বলেন—ব্রহ্ম ত আমিই; আমি আবার আমার পূজা করিব কিরূপে? হিন্দুস্থানী বেদান্তী নিশ্চল দাস না কি তাঁহার গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে প্রণাম করিবার দেবতাই খুঁজিয়া পান নাই। যাঁহাকে পূজা, প্রার্থনা, স্তুতি করিতে হইবে, তাঁহার উপর কোনও-না-কোনও একটা গুণের বা উপাধির আরোপ করিতে হইবে; কিন্তু তাহা হইলে তিনি খাটো হইয়া গেলেন। যাঁহাকে পূজা করিব, তিনি যখন স্তুতির বা প্রার্থনার বিষয় বা বস্তু, তখন তিনি সগুণ হইয়া গেলেন। তিনি আর সাক্ষী নিরুপাধিক আত্মা থাকিলেন না; তিনি আর খাঁটি Subject থাকিলেন না, খাটো হইয়া Object হইয়া গেলেন। হউন না কেন তিনি Object of worship, তথাপি তিনি আমার পক্ষে object; Object হইলেও তিনি যখন আমার বা আত্মার object, আত্মার ধ্যান-ধারণার বিষয়, তখন নিম্নাধিকারীর পক্ষে আত্মারই প্রকাশ বলিয়া পূজার যোগ্য হইতে পারেন। যে নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিয়াছে, সে মুক্ত; সে কাহাকে পূজা করিবে? যিনি কোনও দেবতার পূজায় বসিয়াছেন, তিনি যে মুক্ত নহেন, তাহা স্বীকার করিয়াই বসিয়াছেন। নতুবা পূজার কোন অর্থ ই হয় না। ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি তাঁহার আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা মাত্র; তিনি আত্মায় কোনও-না-কোনও গুণ আরোপ করিয়া তাহাকে পূজাযোগ্য—object of worship করিয়া লউন।

"মাতৃকান্যাসের অর্থ আত্মাকে পূজাযোগ্য করিয়া লওয়া, আত্মার একটা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহার পূজায় বসা। ভূতশুদ্ধির দ্বারা স্থির হইয়াছে—আমিই পরম দেবতা। আচ্ছা, পূজার জন্য তাহার একটা মূর্ত্তি গড়িয়া লওয়া যাউক। মাতৃকা শব্দের অর্থ বাগ্‌দেবতা। বাক্ (বা বাক্য) শব্দরূপা। শব্দব্রহ্মের কথা শুনিয়াছেন; শব্দে ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ। ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের দেবীসূক্তের কথা আগে বলিয়াছি। সেখানে বাক্ দেবী অম্ভৃণ ঋষির কন্যারূপে কল্পিতা হইয়াছেন। উত্তর কালে শঙ্করাচার্য্যের সহিত বিবাদকালে মণ্ডনমিশ্রের পত্নী উভয়ভারতী সরস্বতীর অবতাররূপে কল্পিতা হইয়াছিলেন। এও কতকটা সেইরূপ। ঐ সূক্তের ঋষি বাগ্দেবী, দেবতাও বাগ্দেবী। বাগ্‌দেবী বলিতেছেন—আমিই ইন্দ্রাদি দেবতাকে কর্ম্মে প্রেরণ করিয়াছি; আমিই পৃথিব্যাদি জগতের সৃষ্টি করিয়াছি,

ইত্যাদি। অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম। কাজেই যিনি ঋষি, তিনিই দেবতা। এই বাগ্‌দেবী ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ; ইনিই শব্দরূপা। বাগ্‌দেবী Gnosticদের Sophia বা wisdom, প্রজ্ঞা; আর শব্দ বাইবেলের logos, word or Christ। বেদের ব্রাহ্মণে আমরা এই বাগ্দেবতাকে পুনঃ পুনঃ পাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আখ্যায়িকা আছে, ইনিই দেবগণের জন্য সোম আনিয়াছিলেন। আবার অন্য দিকে আছে যে, গায়ত্রী সোম আনিয়াছিলেন। অতএব গায়ত্রী বাগ্‌দেবীর অন্য রূপ; উভয়েই শব্দরূপিণী বা ব্রহ্মরূপিণী। শব্দ বর্ণাত্মক; অ আ হইতে হ ক্ষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশটা বর্ণ পরস্পর মিলিত হইয়া সকল শব্দের সৃষ্টি করে। তান্ত্রিকেরা এই বাগ্‌দেবীকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। তন্ত্রমতে তিনি "পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্য-বক্ষঃস্থলা"—পঞ্চাশটা বর্ণে বাগ্‌দেবতার মুখ, হাত, পা, মাঝা, বুক নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। তিনি "সুধাঢ্য কলস" ধরিয়া আছেন,—তাঁহার হাতে অমৃতপূর্ণ কলসী। এই অমৃত বেদের সোম ও তন্ত্রের সুরা। বৈদিক বিশ্বামিত্র বলিতেন, সোমপানে আমি অমৃত পান করিয়াছি, "অপাম সোমমমৃতা অভূম।" তান্ত্রিক রামপ্রসাদ বলিতেন—'সুরাপান করি নে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে।'

"এখন মাতৃকান্যাসের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। ভূতশুদ্ধির দ্বারা পূজক আপনার স্থূল দেহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া আত্মাকে সৎ পদার্থ স্থির করিয়াছেন। এখন পূজার জন্য এই আত্মার মূর্ত্তির কল্পনার আবশ্যক। বাগ্‌দেবতা সেই মূর্ত্তি; পঞ্চাশটা বর্ণে সেই মূর্ত্তি গঠিত। আচ্ছা, মোটামুটি যে-মানবদেহকে আত্মার অধিষ্ঠান মনে করা যায়, সেই দেহটাকেই সেই মূর্ত্তি মনে করুন। তাহার নানা স্থানে, মুখে বুকে হাতে পায়ে অ আ হইতে হ ক্ষ পর্য্যন্ত বসান যাউক। বাহিরের শরীরটা বড় মোটা, অন্তঃশরীরটা আরও সূক্ষ্ম; সেখানে কল্পিত ছয়টা চক্রেও সেই পঞ্চাশটা বর্ণ বসান যাউক। আন্তর ও বাহ্য মাতৃকান্যাস অর্থাৎ ভিতরে ও বাহিরে অক্ষরগুলির এইরূপে ন্যাস বা স্থাপনা দ্বারা বাগ্‌দেবীর বা ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইল। এখন তাঁহার পূজায় বসা যায়। এই পূজাটা মানসপূজা হিসাবে ঠিক; কাজেই আগে মানসপূজাই করিতে হয়। পূজা সেই আত্মরূপা দেবতারই। সম্মুখে যে প্রতিমা বা যন্ত্র থাকে, সে উপলক্ষ মাত্র; নিত্যপূজায় তাহা আবশ্যকও নহে। মানসপূজাটাই পূজা; উহা personal। বাহ্য পূজাটার জন্য ধূপ

দীপ নৈবেদ্যের আড়ম্বর করা হয়; উহা personal নহে। উহার তাৎপর্য্য communal; বাড়ীর ছেলে পিলে, বৌ ঝি, পাড়াপড়সী, সমাজের পাঁচটা লোককে দেখাইয়া ভুলাইয়া একত্রে বাঁধিবার জন্য উহার প্রয়োজন থাকিতে পারে; উহার উদ্দেশ্য লোকরঞ্জন, লোকসংগ্রহ, লোকস্থিতি। আত্মার লাভে ইচ্ছুক সাধকের পক্ষে উহা আবশ্যক নহে। প্রতিমা গড়িয়া পূজা করিতে কেহ বাধ্য নহে; না করিলে কোনও প্রত্যবায় নাই; সমাজের অধিকাংশ লোকই করে না বা করিতে পারে না। উহাকে পুতুল-পূজা বলিয়া গালি দিলেও কাহারও কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; তাহার পাল্‌টা জবাব দেওয়া আবশ্যক বোধ করি না।

"কথাটা এই যে, আমরা যাঁহাকে ব্রহ্ম বলি, তাঁহার পূজার কোনও অর্থ নাই; দেবতার পূজার অর্থ আছে; এবং আমরা দেবতারই পূজা করি। আমাদের মধ্যে যে নব্য সম্প্রদায় সমাজবদ্ধ হইয়া নির্দ্দিষ্ট মন্দিরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ধ্যান, স্তুতি ও প্রার্থনা দ্বারা ব্রহ্ম উপাসনা করেন, তাঁহারা বস্তুতঃ দেবতা পূজা করেন, এবং ঐ পূজাতেই communal ভাবটাই অধিক স্পষ্ট দেখা যায়। উহার সহিত বৈদিক বা তান্ত্রিক পূজার কোনও বিরোধ নাই।

"এক কথা বলিতে গিয়া অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। স্থুল-ভূত-নির্ম্মিত মানবদেহটা আমাদের নিকট অলীক কাল্পনিক পদার্থ হইতে পারে, কিন্তু কদর্য্য হেয় আবর্জ্জনা হইতে পারে না। হিন্দুর তান্ত্রিক ধর্ম্ম বৌদ্ধ মঠে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতেছি; কিন্তু বেদের সহিত গোড়ায় মিল না থাকিলে উহা বেদপন্থী সমাজে স্থান পাইত না।"

রামেন্দ্র বাবু একটু চুপ করিলেন। ভৃত্য এক পেয়ালা চা আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া দিল। আধ আউন্স আঙুরের রস সেবন করিয়া ত্রিবেদী মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—"এইবার জগন্নাথের মন্দিরের কথা বলিব। কথাটা প্রায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে, এই রকম মনে হইতে পারে। প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু এত কথা বলিলাম, মনে করিবেন না যে, বড় বেশী অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। জগন্নাথের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসটা জানা আবশ্যক; সমস্ত ভারতবর্ষ যেন ঘনীভূত হইয়া জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। অনার্য্য, আর্য্য, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম, সকল ভাবের মিশ্রণ আমরা এখানে দেখিতে পাই। হণ্টর সাহেব

এ কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পৌরাণিক উপাখ্যান মতে মধ্য-ভারতবর্ষের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের অনুচরগণ সমুদ্রতীরে নীলাদ্রির নিকট অরণ্যমধ্যে নীলমাধবের আবিষ্কার করেন। তাঁহার মাহাত্ম্যে সেই অরণ্য পূর্ণ ছিল। অরণ্যবাসী শবরেরা তাঁহার পূজা করিত। তাঁহার আকৃতি মণিময়। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কিন্তু সদলবলে বাহির হইয়া দেখিলেন যে, অরণ্য হইতে দেবতা অন্তর্হিত। বহু যুগব্যাপী তপস্যার পর তিনি বর পাইলেন যে, দেবতা দারুরূপে সমুদ্রে ভাসিয়া আসিবেন, এবং সেই দারু হইতে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাজা তাঁহার পূজা করিবেন। যথাকালে দারু সমুদ্রতটে আসিলে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাসমারোহে সেইটিকে তুলিয়া আনিয়া বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে তিন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই তিন মূর্ত্তি—জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। ইঁহাদের সঙ্গে সুদর্শন চক্রের একটি প্রতিকৃতি পূজিত হয়। প্রসিদ্ধি আছে যে, জগন্নাথের এই দারুমূর্ত্তির ভিতরে বিষ্ণুপঞ্জর বা শ্রীকৃষ্ণের অস্থি গুপ্ত আছে।

"এই যে বটতলার ছাপা 'নারদসংবাদ' নামে একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ রহিয়াছে, উহা হইতে খানিকটা তুলিয়া লইতে পারেন। পৌরাণিক ইন্দ্রদ্যুম্নের উপাখ্যান অল্প রূপান্তরিত হইয়া বুদ্ধ-অবতারের বিবরণ দাঁড়াইয়াছে।

"শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

এই যে আমার বংশ কিছু না রহিবে।
আত্মবন্ধু যুদ্ধ করি সকলি মরিবে॥
একা আমি নিম্ববৃক্ষে রহিব যখন।
বালির নন্দন ব্যাধ বধিবে তখন॥
অবশেষে অস্থি মম কিছু না রহিবে।
ব্যাধগণে সব অস্থি লইয়া যাইবে॥
নীলগিরি মধ্যে মম করিবে স্থাপন।
নাম নীলমাধব কহিবে সর্ব্ব জন॥
এক দিন ব্রহ্মা যাবেন কৈলাসশিখরে।
কহিবেন এই কথা দেব দিগম্বরে॥
শুনহ পার্ব্বতীকান্ত বচন আমার।
কেমনে হবেন প্রভু বুদ্ধ অবতার॥

ব্যাধগণ রাখিয়াছে করিয়া গোপন।
দরশন তাহার না পায় কোন জন ॥

"তাহার পর মহাদেবের উপদেশে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সদলবলে বাহির হইলেন,—

বহু যত্নে রাজা সব পাইবে সন্ধান ॥
যত্ন করি আমারে আনিবে তথা হৈতে।
স্থাপন করিবে জলনিধির কূলেতে ॥
তদন্তরে শুনহ নারদ মহামুনি।
এই নিম্বকাষ্ঠ ভাসি আসিবে আপনি ॥
সেই কাঠে চারি মূর্ত্তি হইবে গঠন।
জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, সুদর্শন ॥

*　　*　　*

হেন মতে নীলাচলে বুদ্ধ অবতার।
হইবে কহিলাম মুনি প্রকার তাহার ॥
কৃষ্ণদাস কহে এই অবতার সার।
যে দেখে তাহার জন্ম নাহি হয় আর ॥

"গ্রন্থশেষে জগন্নাথের স্তোত্রমধ্যে দেখুন,—

সিন্ধুতট নীলগিরির মধ্যে স্থাপনং।
ধন্য কীর্ত্তি, ধন্য, ধন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজনং ॥
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শনং।
নমস্তে শ্রীবুদ্ধরূপ দেহি পদশরণং ॥

"এই কৃষ্ণদাস যিনিই হউন, তিনি ইংরাজীনবিস ছিলেন না। অতএব জগন্নাথে বুদ্ধত্ব আরোপ কেবল ইংরাজীনবিসের খেয়াল নহে। কিন্তু তিনি স্বীকার করিতেছেন, জগন্নাথই বুদ্ধ-অবতার, এবং আদিতে তিনি ব্যাধগণের দেবতা ছিলেন।

"দেখা যাইতেছে যে, জগন্নাথদেব প্রথমে অনার্য্য শবরদিগের দেবতা ছিলেন; পরে তিনি আর্য্যদিগের পূজা লাভ করিয়াছেন। এখন পর্য্যন্ত জগন্নাথের যাত্রা প্রভৃতিতে শবরদিগের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। রথযাত্রায় রজ্জু টানিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট শবর-বংশ আছে; তাহারা রজ্জুতে হাত দিলে পর অন্য লোকে হাত দিতে পারিবে। এই তিন মূর্ত্তির সঙ্গে হিন্দুমন্দিরের আর কোনও দেবতাবিগ্রহের সাদৃশ্য নাই। জগন্নাথের পূজা এখনও

communal,—ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও অনেক অন্ত্যজ জাতির মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার সমান। মহাপ্রসাদভক্ষণে জাতিবিচার বা বর্ণবিচার নাই। পূজাপদ্ধতির ও যাত্রাদির সঙ্গে অন্যান্য হিন্দুবিগ্রহের পূজাপদ্ধতির তেমন মিল নাই। এই সকল অনুষ্ঠানে এমন কতকগুলা বিশিষ্ট ভাব আছে, যাহাতে হিন্দুবিগ্রহের চেয়ে বৌদ্ধবিগ্রহের পূজার সাদৃশ্য দেখা যায়। মৃতের অস্থিপূজা বৌদ্ধদিগের প্রধান অনুষ্ঠান; সম্ভবতঃ তাঁহারাই ইহার প্রবর্ত্তক। এই সকল কারণে অনেকে মনে করেন যে, ইহারা প্রথমে বৌদ্ধ বিগ্রহই ছিলেন; আদিতে এই তিন মূর্ত্তি বৌদ্ধ ত্রিরত্নের মূর্ত্তি ছিল। জগন্নাথ—বুদ্ধ, বলরাম—সঙ্ঘ, সুভদ্রা—ধর্ম্ম।

"ধর্ম্ম কিরূপে স্ত্রীমূর্ত্তি পাইলেন? পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, বৌদ্ধগণ ধর্ম্মকে প্রজ্ঞায় পরিণত করিয়া তাঁহার এই স্ত্রীরূপ কল্পনা করিয়াছিল। ঐ যে চক্রকে সুদর্শন চক্র বলা হয়, উহা এই মত অনুসারে বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মচক্র। বৌদ্ধ চৈত্যে ও মন্দিরে এই ত্রিরত্নের ও ধর্ম্মচক্রের পূজা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ত্রিরত্নের মূর্ত্তি—মানবী মূর্ত্তি; কিন্তু বহু স্থলে যন্ত্রে পূজা প্রচলিত আছে। এই তিনটি রত্নের প্রত্যেকের অনুযায়ী যন্ত্র কল্পিত হইয়াছিল। হিন্দুদেরও যন্ত্রপূজা আছে। বৌদ্ধ রত্নত্রয়ের যন্ত্র কেমন করিয়া রূপান্তরিত হইয়া জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রায় পরিণত হইয়াছে, কানিংহাম সাহেব তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র দ্বিতীয় ভাগেও ইহার বর্ণনা আছে। জগন্নাথের পূজা যে আদিতে বৌদ্ধপূজা ছিল, তাহা কানিংহাম সাহেব এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সাহেবী মত বলিয়া উহা উপেক্ষা কিংবা অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, জগন্নাথই বুদ্ধ-অবতার। জগন্নাথ যে বুদ্ধদেব, তাহা অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থেও দেখিয়াছি। উড়িষ্যায় এখনও আপামর সাধারণে জগন্নাথকেই বুদ্ধ-অবতার বলিয়া গ্রহণ করে। উড়িয়া-সাহিত্য হইতে তাহার প্রচুর প্রমাণ সম্প্রতি নগেন্দ্র বাবু তাঁহার Modern Buddhism নামক গ্রন্থে স্তূপীকৃত করিয়াছেন। কাজেই মনে হয় যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানকালে এই ত্রিমূর্ত্তি হিন্দুর দেবতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন, এবং ইহাদিগের নূতন নামকরণ হইয়াছে। সমস্ত হিন্দুজাতি ইহাদিগকে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু জগন্নাথক্ষেত্র শুধু বৈষ্ণবের পুণ্যক্ষেত্র নহে;

শাক্তের বাহান্ন পীঠের মধ্যে একটা মহাপীঠ। মন্দির-প্রাচীরের ভিতরেই বিমলা দেবীর মন্দির। সেখানে পশুবলি হয়; স্বয়ং জগন্নাথ তাঁহার ভৈরব, আর কোনও ভৈরব নাই। এই প্রাচীরের মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি, সূর্য্যমূর্ত্তি, নানা সম্প্রদায়ের নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষে যে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, পুরীর মঠ তাহাদিগের অন্যতম। এখনও সেই মঠের অধ্যক্ষ শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত। পুরীতে চৈতন্য-পন্থীর ও অন্যান্য পন্থীর (কবীরপন্থী, নানকপন্থী) মঠও আছে। প্রকৃতপক্ষে এই জগন্নাথক্ষেত্র ভারতবর্ষের সর্ব্বজাতির ও সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়ক্ষেত্র। এই জন্যই জগন্নাথক্ষেত্রের এত মাহাত্ম্য। সকল সম্প্রদায়ের লোকই ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই পুণ্যক্ষেত্রে আগমন করেন। বিশেষতঃ চৈতন্যদেবের সময় হইতে বাঙ্গালী বৈষ্ণবের পক্ষে বৃন্দাবন ব্যতীত আর কোনও স্থানের মাহাত্ম্য জগন্নাথক্ষেত্রের সমতুল্য নহে।

"সম্প্রতি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় জগন্নাথদেবের রথযাত্রার মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া লেখক নানা স্থানের নানা ধর্ম্মের উক্তরূপ অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুষ্কর। প্রচলিত মত এই যে, জগন্নাথের রথযাত্রা শ্রীকৃষ্ণের রথে চড়িয়া বৃন্দাবন হইতে মথুরা-যাত্রার অনুবৃত্তি মাত্র। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধ-লেখক দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে ফিরেন নাই। কিন্তু রথের পুনর্যাত্রা আছে। অনেকের মতে এই রথযাত্রা বুদ্ধদেবের মহাভিনিষ্ক্রমণ। বুদ্ধদেব রথে চড়িয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু যখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের পর কপিলাবস্তুতে এক বার ফিরিয়া আসেন, তখন ত আর রথে চড়িয়া আসেন নাই; পদব্রজে আসিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজকেরা মধ্য-এশিয়ায় এইরূপ অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। সমারোহসহকারে যাত্রা বৌদ্ধ উৎসবের প্রধান অঙ্গ বটে; কিন্তু বেদপন্থী হিন্দুর যাগযজ্ঞে কিংবা পূজায় সেরূপ procession বা যাত্রার প্রাধান্য বা সার্থকতা নাই। আধুনিক কালে হিন্দুর দেবতা-পূজায় যে সকল যাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা বৌদ্ধ যাত্রার অনুকরণে প্রবর্ত্তিত মনে করা যাইতে পারে। তথাপি এই যাত্রার এবং পুনর্যাত্রার মূল বুঝা গেল না। অনুমান করা যাইতে পারে, রথযাত্রা মূলে সৌর অনুষ্ঠান; সূর্য্যদেবের রথযাত্রা। সূর্য্যদেবের সঙ্গে রথযাত্রার যেমন সম্পর্ক, এমন আর কিছুর সঙ্গে দেখা যায় না। প্রত্যহ

রথে চড়িয়া সূর্য্যদেব পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যান, এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে ফিরিয়া আসেন। এই অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে রথযাত্রার বৈদিক মূল আবিষ্কার করা যাইতে পারে। সূর্য্যের রথের হরিদশ্ব বাহন, অরুণ সারথি, জ্যোতির্ম্ময় কেতু, অতি পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ। সূর্য্য রথে চড়িয়াই বৎসরের পর বৎসর পৃথিবী পরিক্রমণ করিতেছেন। আমাদের প্রাত্যহিক স্নানকালে মৃত্তিকা-শোধনের যে বৈদিক মন্ত্র আছে (অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে), তাহাও ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বিষ্ণু অশ্ববাহিত রথে চড়িয়া বসুন্ধরা পরিক্রমণ করেন, এই অতি প্রাচীন বৈদিক উপাখ্যানই নিশ্চয় ঐ মন্ত্রের লক্ষ্য। এই জন্য বসুন্ধরার মাটিও বিশুদ্ধ ও পাপনাশক। তান্ত্রিক মতেও ভারতভূমিকে অশ্বক্রান্তা রথক্রান্তা বিষ্ণুক্রান্তা, এই তিন ভূমিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। বিষ্ণু আদিত্যগণের মধ্যে অন্যতম আদিত্য। তিনি ত্রিপাদ দ্বারা জগৎ আক্রমণ করেন। ঔর্ণবাভ, শাকপূণি প্রভৃতি অতি প্রাচীন নিরুক্তকারদিগের মতেও বিষ্ণুর এই জগৎ আক্রমণের তাৎপর্য্য সূর্য্যদেবের জগৎ পরিক্রমণ। বেদের ঐ উল্লেখ হইতেই বিষ্ণুর বামন অবতারে ত্রিপাদ দ্বারা ত্রিভুবন আক্রমণের আখ্যায়িকার উৎপত্তি। রথস্থিত জগন্নাথের মূর্ত্তি বিষ্ণুমূর্ত্তি ত বটেই, বিশেষতঃ উহা বামনমূর্ত্তি। "রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" এই শ্লোকার্দ্ধ সকলেই জানেন। অতএব জগন্নাথ = বামন = বিষ্ণু = সূর্য্য ; এই equation অনুসারে জগন্নাথের সাংবৎসরিক রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা সূর্য্যেরই রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা। আষাঢ় মাসে সূর্য্য যখন উত্তরায়ণ শেষ করিয়া দক্ষিণ মুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, প্রায় সেই সময়েই জগন্নাথদেবের রথযাত্রা হয়। ইহাতেও উক্ত অনুমান কতকটা সমর্থিত হয়। নিকটে কণার্ক মন্দিরে সূর্য্যদেবের রথযাত্রা এক কালে অনুষ্ঠিত হইত। জগন্নাথের রথযাত্রাতে সম্ভবতঃ তাহার প্রভাব আছে। ভুবনেশ্বরের মহাদেবের রথযাত্রায়ও সম্ভবতঃ ঐ প্রভাব আছে।

"বৈদিক যাগযজ্ঞের জন্য কোনওরূপ মন্দিরের আবশ্যকতা ছিল না। গৃহস্থের নিত্য-যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য গৃহসংলগ্ন অগ্ন্যাগার ছিল; তাহাতে অগ্নি রক্ষিত থাকিত। অগ্নিষ্টোমাদি কাম্য কর্ম্মের জন্য খোলা ময়দানে অস্থায়ী ভাবে যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ করিয়া লওয়া হইত। রামায়ণ মহাভারতের মধ্যেই দেবায়তনপ্রসঙ্গ আছে ; কিন্তু ঐ সকল প্রসঙ্গ প্রক্ষিপ্ত কি না, তাহা স্থির করা কঠিন। প্রচলিত রামায়ণে রামের সহিত জাবালির কথোপকথনে

যখন বুদ্ধ তথাগতের নাম দেখা যায়, এবং মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে সমাগত জনগণের মধ্যে রোমক নাম দেখা যায়; এবং উভয় গ্রন্থে যখন শক, যবন প্রভৃতি জাতির উল্লেখ দেখা যায়, তখন ঐ দুই গ্রন্থের কোন্ কোন্ অংশ বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। গৃহ্যসূত্রাদির মধ্যে দেবমূর্ত্তির দেবায়তনের প্রসঙ্গ থাকিলেও সেখানেও এই সমস্যা আসিয়া পড়ে। বৌদ্ধগণও প্রথমে মন্দির নির্ম্মাণ করেন নাই। নিরেট স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার গর্ভমধ্যে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ (ধাতু) রক্ষা করিতেন। এই সকল স্তূপ ক্রমশঃ বৃহদায়তন এবং নানা অলঙ্কারে শোভিত হইতে লাগিল। সম্ভবতঃ এই স্তূপের পরিণতিতে চৈত্যশালা বা মন্দির নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। ঐ মন্দিরের প্রাচীরের বাহিরে এবং ভিতরে নানাবিধ চিত্র এবং ভাস্কর্য্য খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জগন্নাথদেবের মন্দিরের গায়ে যেমন বীভৎস চিত্র আছে, তেমন চিত্র আছে কি না ঠিক জানি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জগন্নাথ-মন্দিরে এই সকল উৎকীর্ণ চিত্রে বৈষ্ণবের বৃন্দাবনলীলা, পরকীয়া সাধন, প্রকৃতিসাধন, গোপীভাবে সাধন, কোনও সাধনেরই চিহ্ন নাই। শাক্তের শক্তিসাধনা ও পঞ্চতত্ত্ব সাধনার কোনও সম্পর্ক নাই; শৈবের লিঙ্গপূজার আভাস মাত্র নাই। যাহা আছে, তাহাকে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস ব্যর্থ হইবে। মূর্ত্তিগুলা নিরতিশয় কদর্য্য, হেয়, বীভৎস। ইহার কি কোনও অর্থ নাই?

"আছে বৈ কি। নহিলে এত কথা বলিতাম না। আট নয় শত বৎসরের পূর্ব্বেকার য়ুরোপের কথা স্মরণ করুন। য়ুরোপের মধ্যযুগে চারি দিকে cathedral ও গির্জ্জাঘর বিচিত্র কারুকার্য্য সহকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। গির্জ্জার মধ্যে বেদি; তদুপরি বলি নিবেদন করা হইত। দেওয়ালগুলি নানা চিত্রে শোভিত;—বেথলহেমে কুমারী-গর্ভে নর-নারায়ণের জন্ম হইয়াছে; তারকার আলোকে প্রাচ্য ঋষিগণ অর্ঘ্যহস্তে পূজা করিতে যাইতেছেন। দুরাত্মা হেরডের আজ্ঞাকারী অনুচরগণ তাঁহার অন্বেষণে শিশুহত্যায় নিযুক্ত। মিশর দেশে তিনি গুপ্ত রহিলেন। শয়তান তাঁহাকে একাকী পাইয়া প্রলোভিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে; শয়তান তাঁহাকে ভুলাইতে পারিল না। সরীসৃপরূপে শয়তান এত দিন মানবের পদে দংশন করিতেছিল; মানবরূপী নারায়ণ এখন তাহার মস্তকে পদাঘাত করিলেন।

করুণাময় পরমপিতার পার্শ্বে প্রেমের আধার পুত্র উপবিষ্ট ; পাপী মানবাত্মার উদ্ধারকল্পে পিতার করুণা ভিক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের উভয়কে ঘিরিয়া সমস্ত দেবযোনি, angels, seraphim, cherubim জয়গান করিতেছেন। খ্রীষ্টানের স্বর্গপুরের সমস্ত আনন্দ সেই বেদিকে ঘিরিয়া স্তম্ভ হইতে, প্রাচীর হইতে ছাদ পর্য্যন্ত বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিত। এই ত স্বর্গ ; চর্চ্চের ভিতরই ত মানবের সমস্ত দুঃখের, সমস্ত কর্ম্মের অবসান। তাপক্লিষ্ট শয়তান-ভয়ভীত মানবাত্মা মানবসখা নরনারায়ণের নিমন্ত্রণে আহূত হইয়া তাঁহার চর্চ্চের ভিতরে অমৃতের ভোজে বসিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "Come unto me, and thou shalt be saved" ; তিনি স্বয়ং সেই অমৃত বণ্টন করিয়া দিতেছেন ; মহিমামণ্ডিত তাঁহার সেই শ্রীমূর্ত্তি হয়ত আমার নয়নগোচর হইতেছে না ; কিন্তু আমি যে চর্চ্চের ভিতরে আসিয়াছি, আমার ভয় কি ? তাঁহার প্রেমের নিগূঢ় স্পন্দন অনুভব করিতেছি, আমার ভয় কি ? পাপ শয়তান ত এখানে আসিতে পারিবে না, আমার ভয় কি ? আমার অমৃতভাণ্ড সে ত কাড়িয়া লইতে পারিবে না। আমি এই চর্চ্চের ভিতরে অমৃতের আস্বাদ পাইয়া মানবের মহাসখার প্রসাদে অভয় অমরত্ব লাভ করিয়াছি। পাপ ও মৃত্যু চিরদিনই এই চর্চ্চের বাহিরে থাকিয়া মানবের মনে বিভীষিকা উৎপাদন করুক ; কিন্তু তাহারা চর্চ্চের ভিতরে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না, চর্চ্চের দ্বার অহোরাত্র উন্মুক্ত থাকিলেও তাহারা প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না।

"এমনই করিয়া খ্রীষ্টান তাহার চর্চ্চের ভিতর অংশটিকে স্বর্গে পরিণত করিয়াছিল। মানব যখন খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘভুক্ত হয়, তখন সে পাপ শয়তানের হাত এড়াইয়া অভয় স্বর্গের অধিকারী ; অখ্রীষ্টান মানব নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে। তাই ভাবুক সাধক খ্রীষ্টান ভাস্করের হাতে সঙ্ঘরূপ চর্চ্চ যখন গির্জ্জারূপে প্রকটিত হইল, গির্জ্জার ভিতরটি অভয়, সুন্দর স্বর্গের বিবিধ চিত্রে সুশোভিত করা হইল ; আর প্রাচীরের বহিরংশে শয়তানের অনুচরবর্গের হস্তে পাপীদিগের নিষ্ঠুর নিপীড়নের বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করা হইল।

"এখন বুঝিতে হইবে, চর্চ্চ শব্দটির দুই অর্থ—উহাতে খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘ বা Christian community বুঝায়, আবার উপাসনা-মন্দির বা গির্জ্জাঘরও বুঝায়। এই মন্দির খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘেরই প্রতিকৃতি। মন্দিরের ভিতর ও

বাহির উভয়ের তাৎপর্য্য স্বতন্ত্র। যাহারা inside the Church অর্থাৎ সঙ্ঘের ভিতর আসিয়াছে, তাহারা saved; স্বর্গরাজ্য Kingdom of Heaven তাহাদেরই; তাহারাই অন্তিমে ভগবানের সিংহাসনের সম্মুখে বসিতে পাইবে। স্বয়ং খ্রীষ্ট তাহাদের নেতা হইবেন। আর যাহারা Churchএর বাহিরে, তাহারা খ্রীষ্টীয় সমাজের বাহিরে; তাহারা damned; তাহারা শয়তানের রাজ্যে Hell-মধ্যে স্থান পাইবে; শয়তানের অনুচরেরা তাহাদের মাথা চিবাইবে, তাহাদিগকে গন্ধকের আগুনে পোড়াইবে। য়ুরোপের মধ্যযুগের গির্জ্জাঘরের দেওয়াল ও বাহিরের দেওয়াল সেই জন্য ভিন্নরূপে চিত্রিত। ভিতরে খ্রীষ্টীয় লীলা ও অবদানের চিত্র, angels, সাধু saint, martyrদের চিত্র; তাহারা প্রভুর জয়গানে তৎপর। বাহিরের দেওয়ালে নরকের চিত্র, শয়তান ও তাহার অনুচরদের হাতে পাপীরা নানা নরকের যাতনা সহিতেছে। Churchএর ভিতর ও বাহির, এই দুইটি প্রভেদ মনে রাখিতে হইবে;—ভিতর স্বর্গ ও বাহির নরক, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

"এখন জগন্নাথদেবের মন্দিরেও ঠিক এইরূপ ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবতারা ত্রিমূর্ত্তির স্তব করিতেছেন;—অনন্ত-শয্যায় শয়ান নারায়ণ, ঐরাবতারূঢ় ইন্দ্র, দেবাদিদেব মহাদেব জগন্নাথদেবের অর্চ্চনা করিতেছেন। অভ্যন্তরে কোনও কদর্য্য চিত্র নাই। মন্দিরের বহির্ভাগে ঐ সকল বীভৎস মূর্ত্তি চিত্রিত রহিয়াছে। হয়ত এ মন্দির প্রথমে বৌদ্ধ মন্দিরই ছিল; কিন্তু হিন্দুর দেবমন্দিরে পরিণত হইলে মার বা শয়তান বড়-একটা আমল পাইলেন না। এখন মনে রাখিতে হইবে যে, বৌদ্ধেরা জগৎকে তিন লোকে বিভক্ত করিয়াছিল,—কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক। যাহা কিছু প্রত্যক্ষগোচর, যাহার সঙ্গে কোনওরূপ সংস্পর্শে আমাদিগকে আসিতে হয়, সেটা কামলোক। এই কামলোকে অবস্থিত জীব মাত্রই তৃষ্ণার বা কামের অধীন, এই জন্য দুঃখভোগী। স্বর্গের দেবতা হইতে নরকের পাপী পর্য্যন্ত সকলেই এই কামলোকের অন্তর্গত। স্বর্গলোক বা দেবলোক, তির্য্যক্-লোক, এমন কি, নরলোক পর্য্যন্ত সকলই এই কামলোকের অন্তর্গত। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব বিশেষতঃ তাহাদেরই জন্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। রূপ-লোকের অধিবাসীর কেবল রূপ মাত্র আছে; তাহারা সর্ব্বদা ধ্যানাবস্থিত, সর্ব্বথা কামবর্জ্জিত; বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহার নামান্তর ব্রহ্মলোক। বলা উচিত,

এই ব্রহ্ম বেদান্তের ব্রহ্ম নহেন, বরং পুরাণের ব্রহ্মা হইলেও হইতে পারেন। অরূপলোকবাসীদিগের রূপ পর্য্যন্ত নাই। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের দুইটি তত্ত্ব স্মরণ করুন,—তৃষ্ণা ও উপাদান, ভোগ্য বস্তুর প্রতি প্রবল আসক্তি ও ভোগ্যকে নিবিড় আলিঙ্গনে আঁকড়িয়া ধরিবার বাসনা। এই তৃষ্ণা ও উপাদান—এই দুইটি ত কামলোকের অধিবাসীর সর্ব্বনাশের মূল; কামলোকের জীব মাত্রই এই তৃষ্ণা ও উপাদানের বশ ও তদধীন হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। এই দুইটাকে বর্জ্জন করিতে না পারিলে রক্ষা নাই; অতএব এই দুইটাকে হেয়, জঘন্য, বীভৎস করা চাই; ন্যক্কারজনক চিত্রে ইহাদিগকে চিত্রিত করা হউক, যাহাতে তৃষ্ণা ও উপাদানের প্রতি মানুষের নিরতিশয় ঘৃণা হয়। মন্দিরের বাহিরের গায়ে কামলোকের অন্যান্য চিত্রও থাকিতে পারে; সকল চিত্রই যে বীভৎস হইবে, তাহার হেতু নাই। নরলোক, সুরলোক, অসুরলোক, সকলই কামলোকের অন্তর্গত। জীব মাত্রই কামনাধীন হইয়া যে সকল লীলাখেলা করে, সবই মন্দিরের বহিঃপৃষ্ঠে চিত্রিত হইতে পারে। বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরসমূহে ঘটিয়াছেও তাহাই। এই দুইটার পরবর্ত্তী তত্ত্ব "ভব"। কাম ও তৃষ্ণা হইতে অব্যাহতি পাইলে তবে ভববন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইবে।

"অনেক স্থানে রথযাত্রার রথের গায়ে এইরূপ জঘন্য চিত্র অঙ্কিত থাকে। জগন্নাথের মন্দিরের গঠনে রথযাত্রার রথ গঠিত হয়; ভ্রমণের পক্ষে বা যুদ্ধকার্য্যে এই রথ সম্পূর্ণ অনুপযোগী। জগন্নাথের রথ জগন্নাথের মন্দিরেরই অনুকরণ; এবং উভয়ের তাৎপর্য্যও এক। বাহিরের তৃষ্ণা ও উপাদানের চিত্রকে উপেক্ষা করিয়া রথারূঢ় বামনকে দেখিতে পাইলে আর "ভব" অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হইবে না; জীবের কামলোক হইতে মুক্তি হইবে। বেদান্তের "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু" ইত্যাদি স্মরণ করুন; মানবদেহ-রূপ রথে আরোহণ করিয়া আত্মারূপ রথী ভগবান্ বসুন্ধরায় বিচরণ করিতেছেন। বৈদান্তিকের চোখে ভগবানের রথস্বরূপ এই মানবদেহ অবিশুদ্ধ বা হেয় না হইতে পারে; কিন্তু বৌদ্ধের নিকটে ও বৌদ্ধপ্রভাবে অভিভূত হিন্দুর নিকটে, এই দেহটা দুঃখভাগী ও হেয়; কারণ, ইহা কামলোকে বিচরণ করে। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের স্থান এই জগন্নাথক্ষেত্রে যে বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক মিলিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

"আমার এই ব্যাখ্যা গ্রাহ্য হইবে কি না জানি না। এমন কি, ইহাতে কোনও নূতনত্ব আছে কি না, তাহাও জানি না। আমি অনধিকারী; নানা কথা সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র। এই ধরণের ব্যাখ্যা কোথাও দেখিয়াছি মনে হয় না; হয়ত কেহ না কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়া থাকিবেন। এই ব্যাখ্যার মূল কথা এই কয়টি; প্রথমতঃ—উপাসনা-মন্দির কেবল মন্দির মাত্র নহে; উহা সমুদয় সঙ্ঘের বা communityর প্রতিকৃতি; উহা আবার মানবের জড় দেহেরও প্রতিকৃতি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ উহার ভিতর ও বাহির, দুইটা দিক্ আছে। ভিতরটা শুদ্ধ,—শয়তানের সেখানে প্রবেশ নাই। বাহিরটা অশুদ্ধ; সেটা শয়তানের রাজ্য। Community সম্বন্ধে এ কথা খাটে; মানবদেহ সম্বন্ধেও খাটে। Communityর শরণ লইলে, সঙ্ঘের শরণ লইলে পরিত্রাণ, নতুবা নহে। বৌদ্ধধর্ম্মে যে কেহ দীক্ষিত হইত, তাহাকে বুদ্ধ ও ধর্ম্মের সহিত সঙ্ঘেরও শরণ লইতে হইত। খ্রীষ্টানের পক্ষেও সেই কথা। কাজেই মন্দিরের ভিতর একরূপ, বাহির অন্যরূপ। ভিতরে ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তগণ; বাহিরে শয়তান ও তাহার অনুচরগণ। খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ, ইঁহারা কেহ কাহারও অনুকরণ করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা বলিতে চাহি না। গোড়ায় যখন উভয়ের মিল আছে, তখন স্বাধীনভাবে গঠিত হইলেও সেই সাদৃশ্য শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইবে। উভয় স্থানেই মন্দিরের ভিতরের ও বাহিরের দৃশ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। জগন্নাথ-মন্দিরের বাহিরের চিত্রগুলির সহিত প্রকৃতিসাধনা বা লিঙ্গপূজার কোনও সম্পর্ক থাকিলে মন্দিরের ভিতরেও ঐরূপ চিত্র থাকিতে পারিত। চিত্রগুলি এতটা জঘন্য, এতটা বীভৎস করিবারও প্রয়োজন থাকিত না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বেদান্ত বলেন—"ততো ন বিজুগুপ্সতে," সংসার হইতে ভয়ও নাই, লজ্জাও নাই, জুগুপ্সার কোনও কারণই নাই। বৌদ্ধ বলেন,—সংসার হেয়, ইহা হইতে জুগুপ্সার হেতু আছে। শয়তান বা মার ভয় দেখাইয়া থাকেন, আবার বিষয়াসক্তি দ্বারা প্রলোভিত করেন। তাঁহার অনুচরেরা বুদ্ধকে ও খ্রীষ্টকে ভীষণ মূর্ত্তি দেখাইয়া লড়াই করিতে আসিয়াছিল, আবার ভোগের সামগ্রী দেখাইয়া প্রলোভিত করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় গির্জ্জায় সেই ভয়ের দিক্‌টা খুব ভয়ানকরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। বৌদ্ধভাবাভিভূত হিন্দুর মন্দিরে বিষয়াসক্তির যে মূর্ত্তি অতি জঘন্য, অতি হেয়, তাহাই দেখান হইয়াছে। ভবচক্রের চিত্রে তৃষ্ণার পরবর্ত্তী "স্পর্শ" বা বিষয়ভোগ নামে

নিদানের চিত্রে আলিঙ্গনবদ্ধ নরমিথুনের যে ছবি পাওয়া যায়, তাহাকেই ফলাইয়া শেষ পর্য্যন্ত এই অশ্লীল মূর্ত্তিতে পরিণত করা গিয়াছে, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এক মূল হইতে, এক কাণ্ড হইতে দুই দিকে দুই শাখা বাহির হইয়াছে মাত্র, ইহাই আমার বক্তব্য।

"আর একটা কথা। যাঁহারা কারুকার্য্যখচিত এত বড় মন্দির গঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভিতরে আলো প্রবেশের সুব্যবস্থা করেন নাই কেন? রত্নবেদির উপরে যেখানে দেবতা আছেন, সে স্থান অপেক্ষাকৃত দুর্গম; অতি সাবধানে সোপান অতিক্রম করিয়া দীপের সাহায্যে দেবতাকে কতকটা দেখা যায়। অন্যান্য দেবমন্দিরের ভিতরও অন্ধকার; নিকটে সাক্ষী কালীঘাটের মন্দির। জগতের অধিকাংশ লোকই বাহিরের দেহটাকেই সার বস্তু বলিয়া জানেন; দেহের ভিতরে যে আত্মা বা ভগবান্ আছেন, তিনি অধিকাংশেরই অলক্ষ্য। উপনিষদেই বলা হইয়াছে যে, তিনি গুহার মধ্যে বাস করেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিশেষ সাধনা করিয়া যোগীরা তাঁহাকে দেহের মধ্যে হৃৎপুণ্ডরীকে বা শিরস্থিত সহস্রদল কমলে কিংবা আরও নিগূঢ় প্রদেশে দেখিতে পান। জ্ঞানের বা ভক্তির প্রদীপ না জ্বালিলে তাঁহার দেখা পাওয়া যাইবে না। অথবা তিনি কৃপা করিয়া হয়ত আপনার অনুগৃহীতকে দেখা দেন। বস্তুতঃ এ রকম প্রসিদ্ধি আছে যে, লক্ষ যাত্রীর মধ্যে দু-এক জন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পান। সাহেবদের বর্ণিত hideous মূর্ত্তি তাঁহাদের নয়নগোচর হয় না। সুন্দর মদনমোহন-মূর্ত্তি তাঁহারা দেখেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বেদির নিকটে যাইতেন না; বেদি হইতে অনেক দূরে একটি ছোট পাষাণস্তম্ভ আছে, সেই স্তম্ভে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া সেই মদনমোহন-মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন ও দেখিতে দেখিতে তাঁহার স্বেদ পুলক কম্পন ও মূর্চ্ছা হইত। ইতর সাধারণ লোকে কিন্তু সে স্থান হইতে দেবতাকে দেখিতে পায় না বলিলেই হয়। আমাদের মত লোকের এই জন্যই জগন্নাথ দর্শনে যাওয়া বৃথা। ভক্তির চক্ষু বা জ্ঞানের চক্ষু জগতে বড় দুর্লভ সামগ্রী। অন্ততঃ ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের চক্ষু না লইয়া গেলে জগন্নাথের মহিমা কাহারও বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। যে কথাগুলি বলিলাম, তাহাতে সেই বিজ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনে যদি কিছু মাত্র সাহায্য হয়, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইব।"

আলোচনা

১৬ই কার্ত্তিক, ১৩২০।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয়ের সমভিব্যাহারে রোগশয্যায় শয়ান শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আমরা তাঁহার শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিলাম; তিনি উঠিয়া বসিয়া অত্যন্ত মৃদু স্বরে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

কয়েকটি কথার পর আমরা "বিচিত্র প্রসঙ্গ"র কথা তুলিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মন্দির-গাত্রস্থ চিত্রগুলির সম্বন্ধে আপনার theory কি?" তিনি বলিলেন,—"আমি কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই; ও সম্বন্ধে আমার কোনও theory নাই।" গৌরহরিবাবু বলিলেন—"বিচিত্র প্রসঙ্গর theoryটা ভুল হইল, কি ঠিক হইল, সে সম্বন্ধে আপনার বক্তব্যটা শুনিতে ইচ্ছা হয়।" মৈত্রেয় মহাশয় উত্তর করিলেন—"ও সম্বন্ধে আমার নিজের কিছুই বলিবার নাই। আর ভুল যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষতি কি? বরং যিনি সেই ভুল দেখাইয়া দিতে পারিবেন, তিনি বাঙ্গালার সাহিত্যের ও ইতিহাসের মহদুপকার সাধিত করিবেন। রামেন্দ্রবাবুর এই প্রসঙ্গের ফলে যদি এ বিষয়ে প্রকৃত ঐতিহাসিক গবেষণার চেষ্টা আরও পাঁচ জনে করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইল।" একটু পরে তিনি বলিলেন—"আমার নিজের কোনও theory নাই; কিন্তু আমি এ কথা লইয়া উড়িষ্যার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সদাশিব শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি। তাঁহার একটি theory আছে; সেটি খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটু গলদ আছে।

"ঔপরিষ্ট কার্য্যের চিত্রই উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রে বেশী মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। কবিরাজি নিদানশাস্ত্রে দেখিতে পাইবেন যে, মানব-দন্তের দংশন কোনও একটা রোগবিশেষের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এবং উহা কলিঙ্গ দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। আরও একটা মজার বিষয় এই যে, চিত্রিত পুরুষগুলা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রতিকৃতি। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বৌদ্ধ যুগের শেষাশেষি নিশ্চয়ই এমন একটা সময় আসিয়াছিল, যখন বৌদ্ধধর্ম্মটাকে হেয়, জঘন্য, কদর্য্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা

হইয়াছিল ; তখন সাহিত্যে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্য্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু-সম্প্রদায়কে কামপরবশ পশুত্বে পরিণত করিয়া জনসাধারণের মনে ঘৃণার সঞ্চার করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এ চিত্রগুলা আর কিছু নহে—preaching in sculpture ; মিস্ত্রীরা বাটালি লইয়া খোদাই করিয়া জগৎ-সমক্ষে প্রচার করিতে চাহে যে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর জীবন অত্যন্ত জঘন্য ও কদর্য্য। মন্দির-গাত্রে হইল কেন ? কারণ, এখানে প্রত্যহই বহুসংখ্যক নরনারী সমবেত হইয়া থাকে। প্রচারকের পক্ষে এমন সুযোগ অন্যত্র নাই।

"ব্যাখ্যাটি মন্দ নহে, কিন্তু একটু গলদ আছে। মন্দিরের দ্বারদেশে মিথুন-চিত্র অঙ্কিত করিবার নিয়ম অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এ দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ যথেষ্ট রহিয়াছে। বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতার ৫৫ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই,—

শেষং মঙ্গল্যবিহগৈঃ শ্রীবৃক্ষৈঃ স্বস্তিকৈর্ঘটৈঃ।
মিথুনৈঃ পত্রবল্লীভিঃ প্রমথৈশ্চোপশোভয়েৎ॥

"মন্দিরের অভ্যন্তরে অন্ধকার হওয়ার সম্বন্ধে পাকাপাকি নিয়ম লিপিবদ্ধ করা আছে। সর্ব্বসমেত কুড়ি প্রকার মন্দির নির্ম্মিত হইতে পারে ; তন্মধ্যে বৃত্ত, চতুষ্কোণ, অষ্টকোণ ও ষোড়শকোণ মন্দিরের অভ্যন্তর অন্ধকার হওয়া চাই।"

৫ই মাঘ, ১৩২০।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সহিত "বিচিত্র প্রসঙ্গ" সম্বন্ধে আলাপ করিয়া যাহা লাভ করিয়াছি, তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

তিনি বলিলেন, "উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রের চিত্র সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার মতভেদ আছে। ঐ যে ভিতর ও বাহির, স্বর্গ ও নরক, উহা ঠিক ঐ ভাবে দেখা যায় কি না, তাহা এক বার বিবেচনা করিয়া দেখুন। নরক বলিলে যে বিভীষিকার ভাব মনে স্বতঃই উদিত হয়, ঐ চিত্রগুলি দেখিয়া তাহা হয় কি ? হইতে পারে যে, বিশুদ্ধচিত্ত সাধু-সজ্জনের চিত্তে ঘৃণার উদ্রেক হয় ; কিন্তু আপামর সাধারণ বোধ হয় নেহাৎ ঘৃণার চক্ষে দেখেন না ; মানুষের মধ্যে যে পশুটি সুপ্ত হইয়া আছে, সে যে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠে না, এমন কথা বলা যায় না। য়ুরোপের cathedralগুলির সম্বন্ধে কিন্তু ঐ স্বর্গ ও নরকের theory খাটে। সে সকল মন্দিরগাত্রে শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপার চিত্রিত

হইয়াছে; তাহা দেখিলে খ্রীষ্টানের মনে ভীতি উৎপাদন করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; সে চিত্রগুলা বাস্তবিকই বীভৎস। এখন মনে রাখিতে হইবে যে, নরক সম্বন্ধে য়ুরোপের মধ্যযুগে যে সকল tradition ছিল, তাহার অনুরূপ হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বত্রই ঐ শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের কথা। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বহু পূর্ব্বে উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি common tradition ছিল; য়ুরোপের মধ্যযুগে তাহার সাহিত্যিক বিকাশ হইল ডাণ্টের Inferno ও Purgatoryতে। এই traditionগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না; বোধ হয়, retaliatory ideas of law হইতে এগুলি উৎপন্ন হয়। যে কারণেই হউক, নরক সম্বন্ধে কতকগুলা সাধারণ জনশ্রুতি ছিল; হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানের মধ্যে সেগুলি প্রচারিত; এই সমাজত্রয়বেষ্টনীর মধ্যে তাহারা সাহিত্যে ও শিল্পে নানারূপে ব্যক্ত হইয়াছিল। Tradition সম্বন্ধে এই যে বেষ্টনীর (zone) কথা বলিলাম, এ রকম (zone) অনেক বিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,—Beast fables, architectural motifs or masonic tradition, Ethnic Customs। যাঁহারা বলেন যে, অশোকের রাজধানী পারস্যের পার্সিপলিসের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহারা ভুল করেন; তাঁহারা এই Zone of Masonic traditionsএর কথা জানেন না; Free masonryর মত এই masonic রহস্য একটা Zoneএর মধ্যে রক্ষিত ছিল। পশু পক্ষী সম্বন্ধে গল্পের কথা ত অনেকেই জানেন। আবার ঐ এক-একটা Ethnic Custom ধরুন; সেখানেও ঐ Zone স্পষ্ট দেখা যায়। ধরুন, ঐ Eucharist ভক্ষণ; এটি সর্ব্বত্রই আদিম কৌলিক যুগের (Primitive tribal life) একটি সাধারণ ব্যাপার। নরবলিতে ইহার আরম্ভ; আমাদের পুরুষযজ্ঞের traditionএ ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; এই সকল tribeগুলার মধ্যে একটা বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের রক্তমাংস খাইলে তাহার গুণ পাওয়া যায়; পশুর রক্তমাংস সম্বন্ধেও তাহাদের ঐ ধারণা ছিল। ক্রমে একটা ধর্ম্মভাব ইহার সহিত জড়িত হইল; এ অবস্থাকে sacramental stage বলা যায়। বলির পশু তখন sacrosanct; দেবতাকে অর্পণ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিতে হইবে। ক্রমে এই ভাবের আরও একটু পরিবর্ত্তন হয়; বলির পশুর মধ্যে দেবতা আসিয়া পড়েন; পশুমাংস খাইলেই

দেবতার সহিত একত্ব সম্পাদিত হয়; ইহাই আর্য্যদিগের যজ্ঞ। সেমিটিক জাতিদিগের মধ্যে কোনও-না-কোন আকারে ইহা দেখা যায়। পৃথিবীময় ইহা ব্যাপ্ত হইয়া আছে; তবে কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাহা সেই স্থানের সভ্যতার অবস্থার উপর নির্ভর করে।

"সে যাহা হউক, নরক সম্বন্ধে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ জনশ্রুতি ছিল; কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্যের দরুন সেই traditionগুলি বিভিন্ন আকারে প্রকটিত হইল: বৌদ্ধ পৌরাণিক নরক একরূপ, খ্রীষ্টানের নরক অন্যরূপ হইল। উভয়ত্রই শাস্তির কথা খুব বড় করিয়া বলা হইল; কিন্তু শয়তানের তাড়নায় ও যমদূতের তাড়নায় যথেষ্ট প্রভেদ আছে। তাহা বুঝিতে হইলে য়ুরোপের mediævalism ও ভারতবর্ষের mediævalism বুঝিতে হইবে; উভয়ের মধ্যে ভাবগত প্রভেদ রহিয়াছে। মধ্যযুগের য়ুরোপ মানুষের ইহ কালের চেয়ে পরকালটাকে খুব বড় করিয়া দেখিয়াছে; secular life এবং future life দুইটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই যে দ্বৈতভাব (dualism), এইটাই য়ুরোপের মধ্যযুগের সব চেয়ে বড় কথা। চর্চ্চের প্রধান চেষ্টা ছিল, যেমন করিয়া হউক temporal lifeকে দমন করিয়া (Life Eternal)এর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আসল কথাটা এই যে, এই সংসার, এই রক্তমাংসের শরীর রহিল এক দিকে; আর অনন্ত জীবন future life রহিল আর এক দিকে। কিন্তু ভারতবর্ষের mediævalismএ ঐ দুইটার মধ্যে অতটা ব্যবধান নাই; মোটেই কোনও ব্যবধান নাই বলিলেও চলে। এইখানেই স্বর্গ, এইখানেই নরক; ইহ কালেই রক্তমাংসকে দমন করিয়া ভূমানন্দে পঁহুছিতে হইবে। য়ুরোপ দ্বৈত (dualistic); ভারতবর্ষ অদ্বৈত (monistic)। উভয়ের নরকের typeও এইরূপ স্বতন্ত্র। শয়তানের শাস্তি ও যমদূতের শাস্তির মধ্যে একটা লক্ষ্য করিতে হইবে। খ্রীষ্টানের নরকে (Hell) যাহারা শাস্তি পায়, তাহারা চিরকালই শাস্তি পাইতে থাকিবে; তাহাদের উদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা নাই; শয়তানের নরকে তাহারা চিরদিনের জন্য বন্দী। যমদূত কিন্তু ধর্ম্মরাজের অনুচর; তাহার শাস্তির ফলে মানবাত্মা Redemptionএর ভিতর দিয়া স্বর্গে পঁহুছিতে পারে। এখানেও খ্রীষ্টান দ্বৈতবাদী (dualistic), হিন্দু অদ্বৈতবাদী (monistic)।

"খ্রীষ্টানের নরকের ও Purgatoryর চিত্র তাহার গির্জ্জাঘরের গাত্রে খোদিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে ইহা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সে সকল চিত্রে বিভীষিকার দিক্‌টা ফুটিয়া উঠিয়াছে; কারিগরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমি জগন্নাথের মন্দির সম্বন্ধে বলিতে চাহি যে, উহার তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

"শিল্পী নানা প্রকার চিত্রে প্রাচীর অলঙ্কৃত করিত। হয়ত বা স্বর্গ নরকের চিত্র থাকিত; বুদ্ধের জাতক গল্পের বা খ্রীষ্টের লীলাপ্রসঙ্গ খোদাই করা হইত; সাংসারিক ধর্ম্মভাববিবর্জ্জিত চিত্রও থাকিত (naturalistic, secular, positive),—যেমন যুদ্ধ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি; গ্রীক ও রোমান পাত্রে এইরূপ চিত্র দেখা যায়। কিন্তু জগন্নাথের চিত্র সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। ইহার কারণ কি? উড়িষ্যা অঞ্চলেই বা ইহার বাহুল্য দেখা যায় কেন?

"বৌদ্ধ মঠে সাধনার যে সকল পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে একটা তান্ত্রিক রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিতে পারা যায়। ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইবার জন্য সন্ন্যাসীদিগকে এই প্রকার জঘন্য পাশব ব্যাপার চিন্তা করিতে হইত। মধ্যযুগে য়ুরোপের মঠগুলিতেও সন্ন্যাসীদিগের এইরূপ সাধনার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। গৃহীর জন্য এ সাধনার ব্যবস্থা হয় নাই; সন্ন্যাসীর জন্য হইয়াছিল। এখন মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল বৌদ্ধ মঠে রাজমিস্ত্রী ও অন্যান্য শিল্পী পুরুষানুক্রমে কাজ করিত। য়ুরোপের মধ্যযুগে মঠগুলিতে সন্ন্যাসীরা নানা প্রকার শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিত। মন্দির-গাত্রের অধিকাংশ চিত্রই তাহারা স্বহস্তে অঙ্কিত করিয়াছিল; স্বহস্তে illuminate করিয়া পুঁথি রচনা করিত; অনেকে মন্দির নির্ম্মাণে রাজমিস্ত্রীর কাজ করিত। বৌদ্ধ মঠে সন্ন্যাসীরা স্বহস্তে শিল্পকার্য্য করিত না বটে, কিন্তু তাহারা design করিত; মিস্ত্রী তদনুযায়ী খোদাই করিত। মিস্ত্রীরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের এই তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতি তাঁহাদেরই অনুজ্ঞাক্রমে খোদাই করিয়া মন্দিরগাত্রে প্রকটিত করিল। তদবধি সমস্ত mural decorationএ ঐ চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির ধারা রহিয়া গেল। হিন্দু সভ্যতার প্রধান লক্ষণ এই যে, সে বাহির হইতে সহজে কোনও একটা নূতন ভাব গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু এক বার গ্রহণ করিলে আর বর্জ্জন করিতে পারে না। এ স্থলে অবশ্যই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, বর্জ্জন করাইবার machinery য়ুরোপে

যেরূপ ছিল, আমাদের দেশে সেরূপ ছিল না; প্রতাপান্বিত পোপ ছিল না, Inquisition ছিল না, প্রবল State ছিল না। সে যাহা হউক, এই বর্জ্জন করিবার ক্ষমতা না থাকার দরুন অনেক দোষ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দেশের মধ্যে এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি একবার গৃহীত হইলে আর তাহাকে বর্জ্জন করা দুঃসাধ্য হইল।

"কিন্তু দেশের লোকে আপত্তি করিল না কেন? দ্রাবিড় জাতির মধ্যে যৌন সম্পর্ক অনেকটা উচ্ছৃঙ্খল (promiscuous) ছিল। তাহাদের চোখে এরূপ চিত্র জঘন্য বা হেয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখনও যে দ্রাবিড়দিগের দেবমন্দিরে দেবদাসী আছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে।

"দ্রাবিড় জাতি যখন আর্য্যসভ্যতার মধ্যে আসিয়া পড়িল, তখন হইতে আর্য্যদিগের একটা প্রধান চেষ্টা দাঁড়াইল, যেমন করিয়া হউক, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইবে। যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে এই উচ্ছৃঙ্খল ভাব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আর্য্যজাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত হইল। ঋগ্বেদের সময়ে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না; কিন্তু মনুর সময়ে বাল্যবিবাহ সমাজে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। ইহার অন্য কারণও থাকিতে পারে। ঋগ্বেদের আর্য্যেরা হয়ত শীতপ্রধান দেশে ছিলেন: সেখানে যৌবনোদ্গম কিছু দেরিতে হইয়া থাকে; বিবাহও একটু বয়সে হইত। গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে বহু কাল অবস্থানের ফলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য দেহ-যন্ত্রের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। যখন যৌবনোদ্গম অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে হইতে আরম্ভ হইল, বিবাহের বয়সও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এ সমস্তই অনুমান করিয়া লইতে হয়।

"দ্রাবিড় জাতির সংস্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া বাল্যবিবাহ প্রচলিত করিয়া আর্য্যজাতি একটা বড় ভুল করিয়া গিয়াছেন, ইহাই আমার ধারণা। স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অন্য কোনও উপায় ছিল কি না, বলা যায় না; কিন্তু যে উপায়টি অবলম্বিত হইল, তদ্দ্বারা সমাজের পরিণাম শুভ হইয়াছে বলা যায় না। সে দিন ইউনিভার্সিটির বক্তৃতায় আমি য়ুরোপীয় সভ্যতার wrong directionএর ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। আমার মনে হয়, আর্য্যজাতির এই বাল্যবিবাহ-প্রথার প্রচলনও আর্য্যসভ্যতাকে একটা wrong direction দিয়াছে।"

আচার্য্য ডাক্তার শীল একটু চুপ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার উল্লিখিত ঐতিহাসিক ও biologic কারণ ধরিলে আর্য্যসভ্যতার প্রতিষ্ঠাতৃদিগকে কি দোষ দেওয়া যায়?" তিনি বলিলেন—"আমি দোষ দিতেছি না; কিন্তু যে পন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল, সেটা সমাজকে কোথায় আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে, তাহা এক বার বিবেচনা করিয়া দেখুন। আরও একটু ভাবিয়া দেখিবার বিষয় আছে। আর্য্যদিগের ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্ত্রী সহধর্ম্মিণী; অল্প বয়সে তাঁহাকে বিদ্যাচর্চ্চা হইতে সরাইয়া আনিয়া গৃহিণীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে ব্রাহ্মণের জীবন কি বৈদিক যুগের মত উচ্চ আদর্শে গড়িয়া তুলিবার সম্ভাবনা ছিল? স্বীকার করা গেল, যেন আর্য্যেরা দ্রাবিড়ীয় আচারানুষ্ঠান হইতে সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র থাকিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তখন বাল্যবিবাহ প্রচলিত হইল। কিন্তু এমন সময় আসিল, যখন দ্রাবিড় জাতির মধ্যে আর্য্যসভ্যতা প্রসারিত হইল, ব্রাহ্মণের সমাজতন্ত্র তাহাদিগের মধ্যে অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হইল; তখন ত আর ভয়ের বিশেষ কোনও কারণ রহিল না; স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য তখনও যে বাল্যবিবাহ আবশ্যক ছিল, এ কথা কি মনে করা যায়? কিন্তু যে প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা আর বর্জ্জন করা গেল না।" আমি বলিলাম—"ক্ষমা করিবেন; কথাটা যখন উঠিল, তখন খোলসা করিয়া একটা বিষয়ে আপনার অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি। পাশ্চাত্য দেশের সেন্সসের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ স্থানে জারজ সন্তানের সংখ্যা খুব বেশী। সরকারী রিপোর্টেই দেখা যায় যে, শতকরা চল্লিশ হইতে ষাট জন জারজ। ইংলণ্ডে গ্রামগুলি অপেক্ষা শহরগুলিতে জারজ সন্তানের সংখ্যা বেশী; কিন্তু অন্যান্য দেশের অনুপাতে অনেক কম। বেশী বয়সে বিবাহের সহিত এই সামাজিক সমস্যার কিছু সম্পর্ক আছে কি?" তিনি বলিলেন—"আমার ত বোধ হয় কোনও সম্পর্ক নাই। মানবজাতির এক-একটা বিভাগের (stock) এক এক প্রকার স্বতন্ত্র জাতিগত প্রবণতা (racial characteristic) আছে; সেই দিক্ দিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশে যৌন ব্যভিচারকে দোষের মধ্যে প্রায়ই গণ্য করে না; তবে বিবাহের পর ব্যভিচারটা দোষ বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু আজকাল ফ্রান্সে তাহাও হয় না; যেমন অন্যান্য চুক্তির সম্পর্ক সহজেই ভাঙ্গা যায়, বিবাহও তাই; বিবাহিত অবস্থায়ও ব্যভিচার বিশেষ দূষণীয় বলিয়া গণ্য করা হইতেছে

না। কিন্তু মধ্যযুগে যখন ক্যাথলিক চর্চ্চের প্রাধান্য ছিল, তখন বিবাহ একটা sacramentএর মত ছিল; মানবের পাশব প্রবৃত্তি দমন করিবার অনেক উপায় ছিল। এখন চর্চ্চ নির্বীর্য্য; সুতরাং racial characteristic প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের racial characteristic সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রবৃত্তিকে দমন করিবার চেষ্টা ভারতবর্ষের স্বাভাবিক।" আমি বলিলাম—"কিন্তু ভারতবর্ষে অল্প বয়সে যৌবনোদ্গমরূপ biologic সত্যটাকে মানিয়া লইলেও কি বিচলিত হইবার কোনও কারণ নাই?" তিনি বলিলেন—"বিশেষ কোনও কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রবৃত্তির তাড়না হইতে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা ভারতবর্ষের যেন instinct; বহিঃশত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার প্রয়াস যেমন জীবজগতে instinctive, কাম-রিপুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টাও তেমনই ভারতবাসীর পক্ষে instinctive; এ স্থলে অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে বিবাহ হইলে চরিত্রদোষের আশঙ্কা অমূলক।

"ভারতবর্ষের আর্য্যজাতি যেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে, এমন আর কেহ পারে নাই। সে আত্মাকে গোড়া হইতে ধরিয়া আছে বলিয়া বাঁচিয়া গেছে; আত্মদ্রোহী হয় নাই বলিয়া তাহার আত্মবিনাশ হয় নাই। তাই সে দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাপ্রসঙ্গে (King George V Chair of Philosophy) আমি বলিয়াছিলাম—If the knowledge of the Self confers immortality, then this undying Indian civilization which has made that knowledge the breath of its life has found an exceeding great reward."

৪

রামেন্দ্রবাবু বলিলেন—"আপনি যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে "বিচিত্র প্রসঙ্গ"র আলোচনায় প্রবৃত্ত করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে আমার বড়ই আহ্লাদ হইয়াছে। ডাক্তার শীল এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে ধরা দেন নাই। পৃথিবীর যাবতীয় বিদ্যা হজম করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত আছেন; তাঁহার নিকট আমাদের যে পাওনা আছে, তাহা দেন নাই। এই উপলক্ষে আপনি যাহা কিছু তাঁহার নিকট আদায় করিতে পারেন, তাহাই লাভ। বোধ হয়, আমার কথা আমি ভাল করিয়া বুঝাইয়া উঠিতে পারি নাই। ভিতর স্বর্গ ও বাহির নরক, জগন্নাথের মন্দির সম্বন্ধে এ কথা বলা আমার আদৌ উদ্দেশ্য নহে; জগৎটাকে হেয় করাই যে মুখ্য উদ্দেশ্য, এ কথাও আমি বলিতে চাহি না। বলিতে চাহি যে, এই যে মন্দির, ইহা সঙ্ঘের প্রতিকৃতি মাত্র। মন্দিরের ভিতর ও বাহির বলিলে বুঝিতে হইবে সঙ্ঘের ভিতর ও বাহির। বুদ্ধসঙ্ঘের বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির আশা নাই, তাহারা মারের অধীন হইয়া রহিয়াছে; খ্রীষ্টান-সঙ্ঘের বাহিরে যাহারা আছে, তাহারা শয়তানের অধীন হইয়া রহিয়াছে। খ্রীষ্টানের শয়তান নরকের রাজা; সুতরাং গির্জ্জার বহিরংশে নরকের ছবি; গির্জ্জার ভিতরে ধর্ম্মরাজ্য, ভগবানের রাজ্য। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ মন্দির সম্বন্ধে ঠিক এই স্বর্গ-নরক theory খাটে না। খ্রীষ্টানের স্বর্গ ও নরকে যে contrast, ব্রাহ্মণের সেরূপ নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক; তাহা পাঠ করিয়া আমার খুব আনন্দ হইয়াছে; এ পর্য্যন্ত এ কথাটা আর কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া বলিতে শুনি নাই। এক দিন এই কথা লইয়া আমি একটা প্রবন্ধ লিখিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। চন্দ্রনাথবাবু-প্রমুখ লেখকেরা জোর করিয়া বলিতেন,—"আমরা হিন্দু; আমাদের লক্ষ্য কেবলই পরকালের দিকে; আর পাশ্চাত্যদিগের এক মাত্র লক্ষ্য ইহ কালে সুখস্বচ্ছন্দতা"; এ কথা আমি সম্পূর্ণভাবে বলিতে প্রস্তুত নহি। 'পাশ্চাত্য' বলিলে যদি আজকালকার বিজ্ঞানসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য বুঝায়, তাহা হইলে কথাটা কতকটা সত্য হইতে পারে। অতি প্রাচীন কালের গ্রীক্ বা রোমানকে যদি ধরা যায়, তাহা

হইলেও বা কতকটা সত্য হইতে পারে। কিন্তু যদি খাঁটি গ্রীষ্টান মত ধরেন, তাহা হইলে এ কথাটা ঠিক নহে। মৃত্যুর পরে যে সুখ নাই, এ ধারণা প্রাচীন গ্রীকের অস্থিমজ্জায় ছিল, সাধু অসাধু সকলকেই নিরানন্দ দেশ Hadesএ যাইতে হইবে। Odysseyতে এই পরকালের বিবরণ দেখিতে পাই ; পরবর্ত্তী গ্রীক-সাহিত্যে এই morbid ভাব উৎকটরূপে দেখা দেয়। মৃত্যুকে জয় করিয়া আনন্দের মধ্যে অমরত্ব লাভের ধারণা গ্রীকের আদৌ ছিল না। তাহার নিকট পরকাল অত্যন্ত ফাঁকা, নিরানন্দ ; তাই সে স্থির করিয়াছিল যে, ইহ জীবনকে যত দূর সাধ্য সুন্দর করিতে হইবে।

"গ্রীকগণ ট্রয় নগরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলে পর মহাবীর আকিলিসের ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল ; বৃদ্ধ রাজা প্রায়ামের পুত্র Lycaon আকিলিসের নিকটে প্রাণভিক্ষা করিল। আকিলিস বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—'বাঁচিতে চাস ? কেহই বাঁচে না ; আর তুই চাস বাঁচিতে ? প্যাট্রোক্লস্ মরিয়াছে : এই আকিলিসকেও মরিতে হইবে' ;—এই বলিয়া আকিলিস তাহাকে হত্যা করিলেন ও লাথি মারিয়া তাহার দেহ জলে ফেলিয়া দিলেন। ভয় করিবে না ত কি ? পরলোক আছে, কিন্তু সে যে অত্যন্ত নিরানন্দ, অত্যন্ত gloomy। যদি কিছু দিন এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে পারা যায়, তাহা হইলে জীবনটাকে সুন্দর ও সার্থক করিতে পারা যায়। গ্রীকের নাট্য-সাহিত্যে মানুষকে নির্ম্মম অদৃষ্ট-বিধাতার (Fate) অধীন বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। তাহার রাষ্ট্রনীতির চরম উদ্দেশ্য ছিল—যেমন করিয়াই হউক, ইহ কালেই মানুষকে সম্পূর্ণতা লাভের অধিকারী করিতে হইবে। চন্দ্রনাথবাবুর কথা গ্রীকের সম্বন্ধে খাটে। গ্রীকের দর্শনশাস্ত্রের মূল তত্ত্বটি আলোচনা করিয়া দেখিলে একই উত্তর পাওয়া যাইবে। Stoic বলিতেন, সংসারের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া যাও ; সুখে অধীর হইও না, দুঃখে চঞ্চল হইও না ; মৃত্যু যখন আসিবে, তাহাও সহ্য করিতে হইবে ; ইহাই প্রকৃত বীরত্ব। কিন্তু মৃত্যু জয় করিবার কল্পনা Stoicএর আদৌ ছিল না। Epicurean বলিতেন, ইহ কাল হইতেই যত পার আনন্দ আদায় কর। রোমানদিগের নিজের কোনও দর্শনশাস্ত্র ছিল না ; তাহারা গ্রীক দার্শনিক ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সেনেকা হইতে মার্কস অরেলিয়স্ পর্য্যন্ত সকলেই ষ্টোইক্ ; সকলের মধ্যে সেই একই সুর। জীবন দুর্ব্বহ হইলে রোমান বীর আত্মহত্যা

করিতে সঙ্কোচ বোধ করিত না। তাহার যত দিন সুখ-স্বচ্ছন্দের আশা ছিল, তত দিন তাহার জীবন স্পৃহণীয় ছিল। যখন দুঃখের বোঝা খুব বাড়িয়া উঠিত, তখন মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইত। তাহার যতটা সামর্থ্য ছিল, ততটা সে সহ্য করিয়াছিল; তাহার পর সে মৃত্যু কামনা করিত। সাধারণতঃ কেহই পরকালের বিষয় চিন্তা করিত না। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মানুষ Fateএর অধীন।

"এই যে ইহ জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করিবার চেষ্টায় গ্রীকের কলাবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র ও সাহিত্য এবং রোমানের Law ও রাষ্ট্রনীতি ব্যাপৃত ছিল, ইহারই ভিতরকার ভাবটিকে খ্রীষ্টানেরা paganism আখ্যা দিয়া থাকে। খ্রীষ্টান পরকালকেই বড় করিয়া দেখিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হিব্রু জাতি পরকালের কথা প্রথমে কল্পনা করে নাই; মুসার ধর্ম্মনীতি ইহ জীবনের জন্যই আদিষ্ট ছিল; জিহোভার অনুজ্ঞা মানিয়া চলিলে ইহ জীবনে মানুষ সফলকাম হইবে। ব্যাবিলন হইতে প্রত্যাগমনের পরে পরকালের কথা তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়; এই ভাবটি মিশর কিংবা পারস্য হইতে আমদানি, তাহা ঠিক বলা যায় না; কিন্তু ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, এই নবাগত পরকাল সম্বন্ধে ভাবনা ইহুদির ইহ জীবন সম্বন্ধে ধারণাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য জগতে খ্রীষ্টান এই পরকালের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে। খ্রীষ্টানের মতে মর্ত্ত্যলোকে মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করিল, তখন সে কালের (Timeএর) বশীভূত হইয়া পড়িল; তখন হইতে তাহার আত্মার (Soulএর) যাত্রারম্ভ মনে করা যাইতে পারে; সেই যাত্রার আদি আছে, অন্ত নাই; মর্ত্ত্য জীবনের বর্ত্তমান আছে, ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু অতীত নাই। মৃত্যুর পরে প্রত্যেক মনুষ্য Day of Judgmentএর অপেক্ষা করিয়া রহিল; সেই দিন তাহাদের ডাক পড়িবে, বিচার হইবে; সেই বিচারের ফলে কেহ বা স্বর্গে, কেহ বা নরকে যাইবে, তৃতীয় পন্থা নাই। পার্থিব জীবন যেমন কালের মধ্যে, Timeএর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ; স্বর্গবাস বা নরকভোগ তেমনই অনন্ত কালের জন্য আদিষ্ট। ইহ কাল স্বল্পপরিসর, Timeএর দ্বারা পরিমিত; পরকাল (স্বর্গই হউক, আর নরকই হউক) Eternal। খ্রীষ্টানের হিসাবে Time মর্ত্ত্য জগতের,—Eternityর কিয়দংশ মাত্র নহে; দুইটা ঠিক উল্টা; উভয়ের মধ্যেই বিরোধের সম্বন্ধ। এই মতটা বুঝা সাধারণের পক্ষে কঠিন,

বুঝানও কঠিন। মর্ত্ত্যবাসের আদি আছে, অন্ত আছে; কিন্তু স্বর্গবাসের ও নরকভোগের আদি আছে, অন্ত নাই। যখন মর্ত্ত্য ছিল না, তখন Timeও ছিল না। মর্ত্ত্য ধ্বংস হইয়া গেলে Time থাকিবে না; থাকিবে শুধু অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরক। সুতরাং স্বর্গ ও নরক এক হিসাবে খ্রীষ্টানের চোখে এক পর্য্যায়ের জিনিষ। এখানে contrast হইল মর্ত্ত্যের সহিত স্বর্গ ও নরকের। আবার দেখুন, মর্ত্ত্য রহিল মাঝখানে; সেখানে মানুষের পরীক্ষা হইল; মৃত্যুর পরে মানুষের ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম বিচার করিয়া কাহাকেও স্বর্গে প্রেরণ করা হয়, কাহাকেও বা নরকে পাঠান হয়। স্বর্গে অক্ষয় আনন্দ (Eternal bliss); নরকে অনন্ত ক্লেশ। স্বর্গ ভগবানের রাজ্য (Kingdom of God); নরক শয়তানের রাজ্য। এখানে contrast হইল স্বর্গের সহিত নরকের। য়ুরোপের ইতিহাসের মধ্যযুগে এই ভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। অতএব মানুষের পক্ষে ইহ কাল কিছুই নহে, কেবল মাত্র Soulএর একটা ক্ষণিক অবস্থাবিশেষ; এখানে আনন্দ মিথ্যা, কলা-নৈপুণ্য মিথ্যা, সাহিত্য মিথ্যা, রাষ্ট্র মিথ্যা,—ইহ জীবনটাই মিথ্যা। এইখানে গ্রীক ও রোমানের সহিত খ্রীষ্টানের আকাশ পাতাল ব্যবধান। খ্রীষ্টানের নিকট ইহ কালের কোনও মূল্যই নাই, পরকালই সব। যাহা কিছু মূল্য, তাহা পরকালের জন্য প্রস্তুত হইবার ক্ষেত্র বলিয়া। কাজেই যাঁহারা বলেন যে, খ্রীষ্টান পরকালের কথা ভাবে না, তাঁহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা য়ুরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস বুঝিতে পারিবেন না। যদি সময় পাই ত সে ইতিহাস আলোচনা করিব। Renaissanceএর সময় হইতে সেই প্রাচীন pagan ভাবটিকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা য়ুরোপে হইতেছে; সে দিক্ দিয়া দেখিলে আধুনিক য়ুরোপ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ-বাবুর উক্তি কতকটা খাটে। ভারতবর্ষে ইহ কালের সহিত পরকালের, স্বর্গ নরকের সহিত মর্ত্ত্যলোকের সেরূপ contrast নাই; ইহ লোক পরলোক এক পর্য্যায়ের, এক শ্রেণীর জিনিষ। স্বর্গে মর্ত্ত্যে বিশেষ ভেদ নাই। এই বিষয় ভাল করিয়া বুঝান দরকার। কিন্তু অনেক কথা বলিতে হইবে। ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে কি?

"ভারতবর্ষে ইহ কাল পরকাল, স্বর্গ নরক আছে; কিন্তু তাহার ব্যবস্থা অন্যরূপ। ঋগ্বেদের সময়ে এ দেশের লোকের পরকালে কিরূপ বিশ্বাস ছিল, সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। অনেকে

বলেন যে, সে সময়ে পরকালের idea খুব পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এখন মনে রাখিতে হইবে যে, ঋগ্বেদের অধিকাংশ মন্ত্র যজ্ঞবিষয়ক; কোনও প্রকার theory বা দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করা তাহার উদ্দেশ্য নহে; পরকাল সম্বন্ধে যেখানে কথা উঠিয়াছে, সে কেবল প্রসঙ্গক্রমে; তাহাকে অবলম্বন করিয়া জোর করিয়া বলা যায় না যে, বিশ্বাস ছিল, কি ছিল না। কিন্তু ঋক্‌সংহিতার প্রথম, নবম ও দশম মণ্ডলে এমন অনেকগুলি সূক্ত আছে, যাহাতে পরকালের অনেক কথা স্পষ্টভাবে লেখা আছে; তাহাতে এটুকু বুঝা যায় যে, তাঁহাদের পরকাল সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট বিশ্বাস ছিল। সাধারণতঃ লোকের একটা ধারণা আছে যে, স্বর্গ দেবলোক, আনন্দের স্থান; নরক যমলোক, সেখানে মানবাত্মা শাস্তি ভোগ করে। ঠিক এ রকম ভাবটা বেদের মধ্যে পাই না; তবে মৃত্যুর পরে মানুষকে কর্ম্ম অনুসারে দুইটা স্বতন্ত্র স্থানে যাইতে হয়, আলোর দেশে এবং অন্ধকারের দেশে। আলোর দেশ সদানন্দ; অন্ধকারের দেশ নিরানন্দ। পরবর্ত্তী বৈদিক সাহিত্যে এই ভাব পুষ্টি লাভ করিয়াছে। ক্রমশঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ম্মের চেয়ে জ্ঞানকে বড় করা হইয়াছে; কাজেই অসৎ কর্ম্মের কর্ম্মীর কথা না তুলিয়া অজ্ঞানী এই অন্ধকার লোকে প্রবিষ্ট হয়, ইহাই জোর করিয়া বলা হইতেছে। বেদান্তে এই ভাব আরও স্ফুটতর করা হইল, সেখানে দেবযান ও পিতৃযান আরও ফুটাইয়া তোলা হইল। যে প্রকৃত জ্ঞানী, মুক্ত পুরুষ, তাহার পক্ষে ইহ কাল পরকালের প্রশ্ন উঠে না। যে অজ্ঞানী, প্রকৃত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত, সে মৃত্যুর পরে হয় দেবযান অবলম্বন করে, না হয় পিতৃযান অবলম্বন করে। দেবযানের পথ আলোকের পথ, পিতৃযানের পথ অন্ধকার। দেবযান-পথের প্রথমেই যজ্ঞীয় অগ্নির অর্চ্চিঃ (আলো), পরে দিবাভাগ, পরে শুক্লপক্ষ, পরে উত্তরায়ণ ভাগ (যে ভাগে দিন বড়), পরে সূর্য্য; এই পথ ধরিয়া যাইতে হইবে; দেবযানের পথ হইতে আর সে ফিরিবে না। এই যে ফিরিতে হয় না, ইহাই দেবযানের বিশিষ্টতা। পিতৃযানের পথে যজ্ঞীয় অগ্নির ধূম, রাত্রিভাগ, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন অতিক্রম করিয়া চন্দ্রে পৌঁছিতে হয়। চন্দ্রলোকে কিছু দিন বাস করিয়া আবার ফিরিয়া আসিতে হয়। দেবযানের ও পিতৃযানের সম্পর্ক আলো ও আঁধারের সম্পর্ক। যাহারা ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান পায় নাই, মুক্ত হইতে পারে নাই, কেবল মাত্র সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছে, তাহারা সেই

উপাসনারূপ কর্ম্মফলে দেবযানে গমন করে। আর যাহারা সাধারণতঃ শ্রুত্যুক্ত বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা পিতৃযানে যায়। যাহারা নিষিদ্ধ অসৎ কর্ম্ম করে, তাহারা যে কোথায় যায়, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট জানা গেল না। এ দুটা ধরিয়া স্বর্গ নরকের contrast পাওয়া গেল না। অথচ Transmigration of Souls আছে; কর্ম্মী চন্দ্রলোকে গেল, কিছু দিন পরে ফিরিয়া আসিল; আবার কর্ম্ম, আবার হয়ত তাহার ফলে চন্দ্রলোকে গমন, আবার প্রত্যাগমন।

"বেদে গোড়া হইতে নানা দেবতা রহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের স্থান কোথায়? খ্রীষ্টানের স্বর্গে angel প্রভৃতি দেবযোনি আছেন, নরকে demon আছে। কিন্তু বৈদিক দেবতাগণ থাকেন কোথায়? দেবতার অর্থ দ্যুতিমান্; মনে হইতে পারে, তিনি যেখানে বাস করেন, সেটা দ্যুলোক। বেদে দ্যুলোকের উল্লেখ প্রচুর আছে; কিন্তু সে দ্যুলোক কোথায়? নিরুক্তকারেরা এই বিষয়টা systematise করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহারা দেবতাদের জন্য তিনটা বিভিন্ন স্থান কল্পনা করিয়াছেন। আদিত্য-প্রমুখ কতকগুলি দেবতা দ্যুলোকের অধিবাসী, (স্বর্গ কথাটা ব্যবহৃত হয় নাই); ইন্দ্র-প্রমুখ কতিপয় দেবতা অন্তরীক্ষের অধিবাসী,—স্বতন্ত্র অমরাবতী তখনও বোধ করি ইন্দ্রের জন্য হয় নাই; অগ্নি-প্রমুখ কতিপয় দেবতা পৃথিবীস্থানাঃ,—পৃথিবীর অধিবাসী। এখানে দ্যুলোক নিশ্চয় আকাশ। বিভিন্ন স্থানে উচ্চে নীচে বাস করার দরুন যে কেহ অন্যের চেয়ে খাটো হইয়া গেল, এ কথা তাঁহাদের মনেই হয় নাই। যাঁহাদের নিকট যজ্ঞের কাঠ ও অশ্বমেধের ঘোড়া দেবতা, অর্থাৎ যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর বা কল্পনাগোচর, সে সমস্তই দেবতা, তাঁহাদের এ কথা মনেই হইতে পারে না। জনসাধারণের মধ্যে হয়ত উচ্চ, নীচ, ছোট, বড়, এই রকম ধারণা ছিল।

"ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, এই তিনটি নাম আমরা অতি প্রাচীন কাল হইতে বৈদিক সাহিত্যে পাই। এই তিনটি নাম ব্যাহৃতি। সাধারণতঃ এই তিনটি তিন লোকের সূচক, এই অর্থ দেওয়া হইয়া থাকে, ভূঃ = ভূমি বা পৃথিবী; ভুবঃ = অন্তরীক্ষ; স্বঃ = দ্যুলোক বা আকাশ। পরবর্ত্তী কালে আরও চারিটি লোক কল্পনা করা হইয়াছিল,—তপোলোক, জনলোক, মহর্লোক, সত্যলোক। এমনি করিয়া সপ্ত লোকের কল্পনা করা হইল; সমস্ত চরাচরকে এই সাতটা Conceptual spheres-এ ভাগ করা

হইয়াছিল। কাজেই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, এই তিন লোকের physical reality মনে করা নিতান্ত আবশ্যক নহে।

"বেদের ব্রাহ্মণে স্বর্গের উল্লেখ আছে। স্বর্গকামী অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিবে, ইত্যাদি বিধি ব্রাহ্মণের মধ্যে পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়। ঐ সকল যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যজমান দেবতার সহিত এক হইয়া যায়। ইহাতে অনুমান হয় যে, স্বর্গ দেবতার স্থান; কিন্তু এমন কোথাও খোলসা করিয়া বলা হয় নাই যে, দেবগণ স্বর্গে বাস করেন, তাঁহাদের স্থান আর কোথাও নাই। সকল দেবতার জন্য একটা পৃথক্ লোক, একটা Olympus-গোছের দেশ তখনও সৃষ্ট হয় নাই। ব্রাহ্মণগ্রন্থ নিরুক্তের বহু পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। তবে এক-একটা দেবতার প্রিয় ধাম ছিল, ইহা বলা হইয়াছে। অমুক ঋষি মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রের বা অশ্বিদ্বয়ের বা অগ্নির প্রিয় ধামে গিয়াছিলেন এবং সেই সেই দেবতার সালোক্য (এক লোকে বাস) ও সামীপ্য পাইয়াছিলেন,—ইহাও পাওয়া যায়। বড় বড় দেবতার প্রত্যেকের এক-একটা নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ঠিক করিয়া দিবার এই বোধ হয় প্রথম চেষ্টা; পরে আরও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বেদে চারি জন দেবতার রাজা উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়,—রাজা বরুণ, রাজা সোম, রাজা ইন্দ্র, রাজা যম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ঐন্দ্র মহাভিষেকানুষ্ঠানে ইন্দ্র সমস্ত দেবতা কর্ত্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় রাজারা যখন রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া অভিষিক্ত হইতেন, তাহাও এই ঐন্দ্র মহাভিষেকের অনুকরণে। পরবর্ত্তী কালে এই চারি জন দেবতাকে চারি দিকের অধিপতি বা দিক্পালরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; ইন্দ্র পূর্ব্ব দিকের, বরুণ পশ্চিমের, সোম উত্তরের, যম দক্ষিণের। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে।

"অতিপূর্ব্বে পারসীকেরা ও আমরা এক জাতি ছিলাম। তখন এই চারি দেবতা সকলের দেবতা ছিল। ক্রমে একটা schismএর সূত্রপাত হইল। এক দল অসুরদিগকে বড় করিয়া দিল; বরুণ হইলেন অসুরশ্রেষ্ঠ। আর এক দল দেবতাদিগকে বড় করিয়া দিল; ইন্দ্র হইলেন দেবরাজ। এই দলাদলির ফলে এক দল ভারতবর্ষে চলিয়া আসিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই মত প্রবর্ত্তন করেন; এই মত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে আমাদের দুঃখিত হইবার হেতুই বা কি আছে, তাহা বুঝি না। ভারতবর্ষের অভিমুখে যাওয়া হইল, এই জন্য প্রাক্ (অর্থাৎ সম্মুখে গমন) শব্দ

ভারতবর্ষের আর্য্যের প্রতি প্রযুক্ত হইল। দেবাসুরে দ্বন্দ্ব এই হইতে আরম্ভ। পূর্ব্ব দিকের নাম হইল প্রাচী। তাঁহাদের পশ্চাতে যাহারা রহিল, তাহারা পশ্চিমে—প্রতীচ্যে রহিল। পশ্চিমের নাম হইল প্রতীচ্য। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক দিন পূর্ব্বে এই ব্যাখ্যাটি দিয়াছেন। আমার কিন্তু আরও কিছু বলিবার আছে। আর্য্যদের 'পূর্ব্বে' অর্থাৎ সম্মুখে রহিল ভারতবর্ষ; পশ্চিমে অর্থাৎ পশ্চাতে পারস্য সাম্রাজ্য; তাঁহাদের ডাহিনে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে যমের স্থান আগে হইতেই নির্দ্দিষ্ট ছিল; তাঁহাদের বামে, উত্তর দিকে অর্থাৎ উচ্চতর পার্ব্বত্য প্রদেশে সোমের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, কারণ, সোম হিমালয়ের উত্তরে মূজবান পর্ব্বতে পাওয়া যাইত। আমাদিগের দেবতা ইন্দ্র হইলেন ভারতের অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকের অধিপতি; তাঁহাদের পশ্চাতে বরুণ (অহুরামজদ্) পারসীকদের অর্থাৎ পশ্চিমের অধিপতি হইলেন। ঋগ্বেদে 'অসুর' শব্দ বহু স্থলে আছে। অসুর শব্দ দেবতা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,—মহৎ দেবানাং অসুরত্বং একং। বরুণ দেবতাকে বিশেষতঃ অসুর বলা হয়। সোম উত্তর দিক্‌পতি ছিলেন। যমও আগে হইতেই দক্ষিণ দিক্‌পতি ছিলেন। কেন, বলিতেছি। যম ভারতবর্ষের ও পারস্য দেশের আর্য্যদিগের সাধারণ দেবতা; সম্ভবতঃ তিনি আদি-মানব। যম ও যমী, ভ্রাতা ও ভগিনী। যম প্রথমে পরলোকবাসী হইলেন; তাঁহার পরে যাঁহারা পরলোকবাসী হইলেন, তাঁহারা পিতৃগণ; যম হইলেন পিতৃগণের অধিপতি। যম যখন দক্ষিণ দিকের অধিপতি, তখন যমলোক ও পিতৃলোক দক্ষিণে হইল। দেবযান ও পিতৃযানের কথা আগে বলিয়াছি। দেবগণের ও পিতৃগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করা হইত। দেবগণকে আহুতি দেওয়া হইত স্বাহান্ত মন্ত্রে; পিতৃগণকে আহুতি দিতে হইত স্বধান্ত মন্ত্রে। উভয়ের জন্য অগ্নিও স্বতন্ত্র ছিল। দেবগণকে যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইত, তাহার নাম আহবনীয়; বেদির পূর্ব্ব দিকে তাহার স্থান। পিতৃগণের উদ্দেশে যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইত, তাহার নাম দক্ষিণাগ্নি; বেদির দক্ষিণে তাহার স্থান। আজ পর্য্যন্ত দেবতার উদ্দেশে দেবপূজাদি কর্ম্ম পূর্ব্বাস্য হইয়া করিতে হয়; পিতৃগণের উদ্দেশে সকল কর্ম্ম দক্ষিণাস্য হইয়া করিতে হয়। এখনও পিতা জীবিত থাকিলে পুত্রের দক্ষিণাস্য হইয়া আহার করিতে নাই; আশঙ্কা যে, যদি হাত হইতে ভাত পড়িয়া যায়, তাহা হইলে পিতৃগণের পিণ্ড দেওয়া হইবে। দেবপূজা উত্তরাস্য হইয়াও চলে। ইহার কারণও বুঝা

যায়। পরবর্ত্তী কালে দেবগণের, পিতৃগণের, দেবযানের ও পিতৃযানের মধ্যে contrast যখন খুব বাড়িয়া গেল ; পিতৃগণ আগে হইতেই দক্ষিণের অধিবাসী ছিলেন ; দেবগণও সেইরূপ contrastএর ফলে উত্তরের অধিবাসী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। পিতৃযান হইল দক্ষিণে, দেবযান হইল উত্তরে। এই contrast আবার আর এক দিকে ফলাইয়া তোলা হইয়াছে। দেবযানের ও পিতৃযানের সম্পর্ক আলো আঁধারের তুল্য। আমরা Equatorএর উত্তরবাসী, আমাদের পক্ষে উত্তর দিক্ আলোর দিক্, এবং দক্ষিণ দিক্ আঁধারের দিক্। ইহা জ্যোতিষের কথা। আজকাল নক্ষত্রের সংখ্যা সাতাশটি ; কিন্তু বেদের সময়ে নক্ষত্রের সংখ্যা ছিল আটাশ। এই আটাশটি নক্ষত্রের মধ্য হইতে অভিজিৎকে বাদ দিয়া এখন ২৭টা করা হইয়াছে। আকাশের মধ্যে Equator অর্থাৎ বিষুববৃত্ত ও Ecliptic অর্থাৎ রবিমার্গ পরস্পরকে দুইটা বিন্দুতে ছেদ করিতেছে ; সেই দুই ছেদবিন্দুর নাম ক্রান্তিপাত ; সূর্য্য সেই দুই ক্রান্তিপাত বিন্দুতে উপস্থিত হইলে দিন রাত্রি সমান হয় ; আশ্বিনে ও চৈত্রে বিষুবসংক্রমণ ঘটে,—জলবিষুব ও মহাবিষুব। ঐ আটাশটি নক্ষত্র রবিমার্গে সাজান রহিয়াছে। রবিমার্গের অর্দ্ধেক Equatorএর উত্তরে ; সেইখানে চৌদ্দটি নক্ষত্র সাজান রহিয়াছে ; সেই কয়টি দেবনক্ষত্র। আর যে চৌদ্দটি নক্ষত্র Equatorএর দক্ষিণে অবস্থিত, সেই কয়টি পিতৃনক্ষত্র। সূর্য্য ছয় মাস কাল Equatorএর উত্তরে দেবনক্ষত্রের কাছে থাকেন ; তখন দিন বড়, রাত ছোট ; উত্তরায়ণ। আর যে ছয় মাস কাল Equatorএর দক্ষিণে পিতৃনক্ষত্রের কাছে থাকেন, তখন রাত বড়, দিন ছোট,—দক্ষিণায়ন। দক্ষিণায়নের সময় দেবগণ নিদ্রিত থাকেন ; সে সময়ে সমস্ত দেবকার্য্য নিষিদ্ধ। এই জন্য শ্রীরামচন্দ্রের দক্ষিণায়নে দেবীর অকালবোধন করিয়া পূজা করিতে হইয়াছিল। দেবযানের ও পিতৃযানের সঙ্গে উত্তরায়ণের ও দক্ষিণায়নের সম্পর্ক এখন ঠিক পাওয়া গেল। দেবযানে আলো বেশী ; পিতৃযানে আঁধার বেশী।

"ঐ যে ক্রান্তিপাত বিন্দুর কথা বলিয়াছি, উহা এক স্থানে স্থির নহে ; ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে ; এই ঘটনার ইংরাজী নাম—precession of the equinoxes, সংস্কৃত নাম—অয়নচলন। প্রায় ১৫০০ বৎসর আগে পহেলা বৈশাখে সূর্য্য অন্যতর ক্রান্তিবিন্দুতে উপস্থিত হইত ; সেই দিন মহাবিষুব-সংক্রান্তি হইত। সেই দিন, দিন ও রাত সমান হইত ; আজিও পঞ্জিকাতে

সেই দিন মহাবিষুব-সংক্রান্তি ধরা হয়, এবং মহাবিষুব-সংক্রান্তির ক্রিয়াকর্ম্ম সেই দিন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অয়নচলনের দরুন মহাবিষুব-সংক্রান্তি এই ৯ই চৈত্রে ঘটিয়া থাকে; এই কয় শত বৎসরের মধ্যে ক্রান্তিপাত বিন্দু এতটা সরিয়া গিয়াছে। আরও পূর্ব্বে আরও দূরবর্ত্তী স্থানে বিষুব-সংক্রমণ হইত। আজকাল সূর্য্য মীন রাশিতে থাকিতে বিষুবসংক্রমণ হইতেছে; ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মেষে প্রবেশের সময় হইত; তাহারও বহু পূর্ব্বে এক সময়ে বৃষে, এমন কি, মিথুনেও বিষুবসংক্রমণ হইত। আকাশে দেখিতে পাইবেন, বৃষ রাশির পূর্ব্বাংশে মৃগশিরা নক্ষত্র; এই মৃগশিরার অপর নাম প্রজাপতি; চলিত ভাষায় ইনি কালপুরুষ; ইংরাজীতে Orion। এই মৃগশিরার নিকট দিয়া ছায়াপথ বা Milky Way চলিয়া গিয়াছে; এই ছায়াপথ সমস্ত আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া আছে; নদীরূপে কল্পিত হইয়া ইহার অপর নাম হইয়াছে আকাশগঙ্গা বা মন্দাকিনী। মৃগশিরার নিকটে আকাশগঙ্গার উভয় পার্শ্বে দুইটি অত্যুজ্জ্বল তারা (Stars of the first magnitude) দেখিতে পাওয়া যায়। একটির ইংরাজী নাম Sirius or Dogstar, সংস্কৃত নাম লুব্ধক বা মৃগব্যাধ; এই তারাটি Canis Major (বড় কুকুর) Constellationএর অন্তর্গত।' আর একটি তারার নাম Procyon; উহা Canis Minor, বা ছোট কুকুর Constellationএর অন্তর্গত; cyon ও শ্বন্ (কুকুর) একই শব্দ। বিস্ময় এই যে, বেদেও এই দুইটাকে 'শ্বানৌ'—দুইটা কুকুর বলা হইয়াছে। তাহা হইলেই দেখা গেল যে, ঐখানে ছায়াপথরূপিণী নদীর দুই পার্শ্বে দুইটা কুকুর রহিয়াছে। বহু পূর্ব্বে এমন এক সময় ছিল, যখন সূর্য্য এই স্থানটায় উপস্থিত হইলে বিষুবসংক্রমণ ঘটিত; সে কোন্ সময়, মোটামুটি হিসাব করিয়া বলা যায়। ক্রান্তিপাত যখন ছায়াপথের সেইখানে ছিল, তখন রবিমার্গের একার্দ্ধ তাহার দক্ষিণে পড়িত, অপরার্দ্ধ ছায়াপথের উত্তরার্দ্ধে; কাজেই এই স্থানটায় দেবযানের ও পিতৃযানের junction (যোগ) স্থল; দেবযান হইতে পিতৃযানে যাইতে হইলে সেই junction অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে; কাজেই উহা উক্ত নদীর উপর সেতুরূপে কল্পিত হইল; পিতৃলোকে প্রবেশ করিতে হইলে এই সেতু পার হইতে হয়। উহাই পারসীকদের চিন্নৎ সেতু; হিন্দুদিগের উহাই যমদ্বার; ঐ ছায়াপথরূপিণী নদী যমদ্বারস্থিত বৈতরণী। ঋগ্বেদে যমের দুই কুকুরের কথা শুনা যায়,

যৌ শ্বানৌ শ্যামশবলৌ ; ঐ পূর্ব্বোক্ত দুইটি Dogstar সেই দুই কুকুর। গ্রীকদিগের Hades বা যমলোকের প্রবেশদ্বারে যে ত্রিশির Cerberus নামক কুকুরের কথা পাওয়া যায়, সেও ঐ কুকুর। রবিমার্গের দক্ষিণাংশের সহিত পিতৃগণের ও যমলোকের সম্পর্ক, আর উত্তরাংশের সহিত দেবগণের ও দেবলোকের সম্পর্ক ইহা হইতে কতকটা বুঝা গেল। অতি পূর্ব্বে, যখন আর্য্যেরা দুই ভাগে বিভক্ত হয় নাই, সেই সময়ে যমের সহিত দক্ষিণ দিকের সম্পর্ক দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যম দক্ষিণ-দিক্‌পাল। যমলোক দক্ষিণ দিকে। অতএব পিতৃলোকও দক্ষিণে। আর তাহার সহিত contrast দেখাইবার জন্য দেবলোক উত্তরে ; দেবযানও উত্তরে। শ্রীযুক্ত তিলক তাঁহার Orion গ্রন্থে ইহার সবিশেষ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। উহা অতি সঙ্গত ব্যাখ্যা বলিয়া আমার বিশ্বাস।

"বৈদিক সাহিত্যে গ্রহদিগের সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা কিছু পাওয়া যায় না। এক মাত্র বৃহস্পতির নাম পাওয়া যায়, তাঁহার নামান্তর ব্রহ্মণস্পতিঃ ; তিনি যে planet Jupiter, এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন ; সাহেবেরা এই জন্য অনুমান করিয়াছেন যে, বৈদিক কালে গ্রহগুলা আবিষ্কৃত হয় নাই ; এ একটা মস্ত হেঁয়ালি। যাঁহারা আটাশটা নক্ষত্র স্থির করিয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি আবার অপেক্ষাকৃত ক্ষীণপ্রভ (Stars of the second and third magnitude) ; তাঁহারা যে বড় বড় গ্রহের অস্তিত্ব জানিতেন না, এ অনুমান বড়ই অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। যে কোনও ব্যক্তি বৃহস্পতি, শুক্র ও মঙ্গলকে দেখিতে পাইবেই। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তিলক এ বিষয়েও আলোচনা করিয়াছেন।

"বৈদিক সাহিত্যে প্রধানতঃ যজ্ঞের কথা আছে ; তদ্ব্যতীত যাহা আছে, তাহা কতকটা অপ্রাসঙ্গিক ; কাজেই তাহাতে কোনও কিছুর উল্লেখ না থাকিলে বলা যায় না যে, বেদের সময়ে আর্য্যেরা তাহা জানিতেন না ; এ কথা বলিলে বড়ই অন্যায় হইবে। স্থির নক্ষত্রচক্রের মধ্যে চন্দ্রের গতিবিধি দেখিয়া যজ্ঞের কাল নির্ণয় করা হইত ; কাজেই নক্ষত্রের নামোল্লেখ বেদের মধ্যে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অস্থির গ্রহদিগের গতির স্থিরতা নাই ; কাজেই যজ্ঞের কাল নির্ণয়ে তাহারা সাহায্য করে না ; তাই গ্রহগণের স্পষ্ট উল্লেখে কোনও প্রসঙ্গই বৈদিক সাহিত্যে উত্থাপিত হয় নাই। বৃহস্পতির অর্থ যাহাই হউক, তিনি বেদে এক জন প্রধান দেবতা ; তাঁহার

নামোল্লেখ পদে পদে দেখিতে পাই। শুক্র শব্দেরও বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখ আছে; প্রায় সর্ব্বত্রই শুক্র শব্দের অর্থ—উজ্জ্বল। শুক্রগ্রহ বা Planet Venus ঔজ্জ্বল্যে সকল গ্রহের শ্রেষ্ঠ; এত উজ্জ্বল যে, Morning ও Evening Starরূপে অতি নিরক্ষর লোকের নিকটও পরিচিত। বৈদিক কালে যে শুক্র গ্রহ অনাবিষ্কৃত ছিল, ইহা কিছুতেই মনে করা যায় না। আর একটু কথা আছে। অগ্নিষ্টোমাদি সোমযজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশে সোমলতার রস আহুতি দেওয়া হইত। যে পাত্রে সেই রস গ্রহণ করা হইত, এবং তৎপরে আহুতি দেওয়া হইত, সেই পাত্রের নাম গ্রহ,—ইংরাজী তর্জ্জমা করা হয় Soma-Cup; রসের যে অংশটুকু একটা পাত্রে লইয়া কোনও দেবতাকে আহুতি দেওয়া হইত, সেই অংশটুকুর নামও গ্রহ,—আশ্বিনগ্রহ (অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে), মৈত্রবরুণগ্রহ, ঐন্দ্রমারুতগ্রহ ইত্যাদি। সোমযাগে এইরূপ দুইটি গ্রহের বা সোমপাত্রের নাম ছিল—শুক্র ও মন্থি; সোমযাগ মাত্রেরই প্রাতঃসবনে ও মাধ্যন্দিনসবনে বড় বড় দেবতাকে সোমাহুতি দিবার পূর্ব্বে এই শুক্র ও মন্থি আহুতি দিতে হইত। অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ শুক্রগ্রহ হাতে লইতেন; তাহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা নামক ঋত্বিক্ মন্থিগ্রহ হাতে লইতেন; দুই জনে একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আহবনীয়াগ্নিতে আহুতি দিতেন। আহুতির মন্ত্র আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, শণ্ড ও মর্ক নামক অসুরদ্বয়কে ঠাণ্ডা করাই এই আহুতির উদ্দেশ্য। এই শণ্ড ও মর্ক উত্তর কালে শুক্রাচার্য্যের পুত্র শণ্ডামার্ক নামে কল্পিত হইয়াছেন। পৌরাণিক কালে বৃহস্পতি যেমন দেবগণের গুরু হইয়াছেন, শুক্রও তেমনই অসুরদের গুরু। শুক্র ও মন্থির যেরূপ সহযোগিতা দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় এক জনেরই দুই নাম; খুব সম্ভব শুক্র Evening Star, মন্থি Morning Star। গ্রহ শব্দের আদিম অর্থ সোম-পাত্র। এখন প্রশ্ন উঠে যে, Planet অর্থ আসিল কি করিয়া? বেদে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, দেবগৃহাণি বৈ নক্ষত্রাণি, নক্ষত্রগুলি দেবতাদের ঘর; দেবগণ আপন আপন ঘরে বসিয়া সোমপান করিয়া থাকেন। কোন্ নক্ষত্রে কোন্ দেবতা আছেন, এখনও পঞ্জিকায় তাহার তালিকা পাইবেন। সোমের অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ সোমের 'ইন্দু' নাম ঋগ্বেদের মন্ত্রেই পাওয়া যায়; সোম এবং চন্দ্র যে এক, পরবর্ত্তী বৈদিক সাহিত্যে তাহা নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত; আজ পর্য্যন্ত আমরা সোমকে চন্দ্র বলিয়া জানি; কিন্তু প্রথমে সোম শব্দে চন্দ্র

বুঝাইত কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এক মাসের মধ্যে এই সোম বা চন্দ্র নক্ষত্রচক্রে ভ্রমণ করেন; এক-এক দিন এক-এক নক্ষত্রে থাকিয়া ২৮ দিনে ২৮টি নক্ষত্রে ঘুরিয়া আসেন। দেবতারাও সে সকল নক্ষত্রে আপন আপন ঘরে বসিয়া সেই চন্দ্ররূপী সোমকে পান করেন; তাই চৌদ্দ দিন ধরিয়া সোম ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হন; পরের চৌদ্দ দিনে এই সোমের ক্রমশঃ আপ্যায়ন অর্থাৎ ক্রমশঃ পূর্ণতাসাধন ঘটে। সোমের এই আপ্যায়ন বা পূরণ সোমযজ্ঞের একটা বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। এখন আমরা যে সকল সচল জ্যোতিষ্ককে planet বলি, তাহারাও নক্ষত্রচক্রে ভ্রমণ করে; ঐ planetগুলাই পর্য্যায়ক্রমে দেবতাদের কাছে উপস্থিত হয়; সেইগুলাই হইল দেবতাদের সোমপাত্র; দেবতারা ঐ পাত্র পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই জন্য উহাদের সাধারণ নাম হইল গ্রহ। ঐরূপ গ্রহের সংখ্যা আগে পাঁচটির বেশী ছিল না। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি। ইহারা যেমন নক্ষত্রে নক্ষত্রে ভ্রমণ করে, সূর্য্য ও চন্দ্র সেইরূপ নক্ষত্রে নক্ষত্রে ভ্রমণ করে। ইহা দেখিয়া পরবর্ত্তী কালে জ্যোতিষীরা এই দুইটিকেও গ্রহপর্য্যায়ভুক্ত করিলেন; তখন সর্ব্বসুদ্ধ গ্রহ হইল সাতটি। তখন গ্রহ শব্দের অর্থ দাঁড়াইল অন্যরূপ; যে নক্ষত্রচক্রে ভ্রমণ করে, সেই গ্রহ। আগে অর্থ ছিল, দেবতারা আপন ঘরে বা নক্ষত্রে বসিয়া যে পাত্র দ্বারা সোমকে বা চন্দ্রস্থিত অমৃতকে পান করেন, তাহাই গ্রহ। এখনও সাধারণে চন্দ্রকে সুধাভাণ্ড বলিয়া জানে। উহা অমৃতের ভাণ্ড; আর মঙ্গলাদি গ্রহ ছোট ছোট পাত্র; উহা দ্বারা সেই ভাণ্ড হইতে অমৃত লইয়া দেবতারা পান করেন। চন্দ্রের 'সুধাংশু' 'অমৃতাংশু' নামের তাৎপর্য্যও এই। অংশু শব্দে কিরণ বুঝায়। উহার আরও একটু সূক্ষ্ম অর্থ আছে। সোমযজ্ঞে সোমলতা পিষিয়া রস বাহির করা হইত। ঐ সোমলতার অংশ বা টুকরাগুলিকেও অংশু বলা হইত। 'সোমখণ্ড' অর্থে অংশু শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার আছে। সোমরসের বিশিষ্ট গুণ উহার উজ্জ্বলতা। সোমলতার রসই চন্দ্রের কিরণ।

"এই সোমপানে অধিকার লইয়া দেবতাদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটিত। সোমপানে অমরত্ব লাভ হয়, এই জন্য ইহার নাম অমৃত। দেবতারা অসুরদিগকে এই সোমরসে অধিকার দিতে চাহিতেন না; দেবাসুরের চিরন্তন বিরোধের ইহা একটা প্রধান কারণ। পিতৃগণও সকলে এ অধিকার পান নাই। এক শ্রেণীর পিতৃপুরুষ আছেন, তাঁহাদের নাম সৌম্য বা সোমপ।

উত্তর কালে চন্দ্রের বা সোমের সহিত পিতৃগণের সম্পর্ক ক্রমশঃ বেশী হইয়াছিল; পিতৃগণ চন্দ্র হইতে অন্তত: কিছু দিনের জন্য সোম পান করিতে পাইতেন। মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা সৎকর্ম্মের ফলে পিতৃযান অবলম্বন করিয়া চন্দ্রলোকে উপস্থিত হন, তাঁহারা কিছু দিনের জন্য সোম পান করিতে পান। কিন্তু সেও কিছু দিনের জন্য। আবার তাঁহারা ফিরিয়া আইসেন। সৎকর্ম্ম করিয়া অমরত্বলাভের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় না।

"সোমের সঙ্গে যখন পিতৃগণের ও পিতৃযানের, অতএব দক্ষিণ দিকের এই রকম একটা সম্পর্ক দাঁড়াইয়া গেল, তখন সোমকে আর উত্তর দিকের অধিপতি করিয়া রাখা চলে না; এক জন নূতন উত্তর-দিক্‌পাল কল্পনা করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। এই নবকল্পিত দিক্‌পালের নাম কুবের। হিমালয়ের উত্তর দিকে যক্ষদিগের দেশ কল্পিত হইয়াছিল; তাহাদের অধিপতি কুবের স্বভাবতঃই উত্তর-দিক্‌পালরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সোমের তুলনায় কুবের সম্ভবতঃ নূতন দেবতা।

"সোম-পানের অধিকার লইয়া এক দিকে দেবগণের ও অসুরগণের বিরোধ, আর অন্য দিকে দেবযানের ও পিতৃযানের বৈপরীত্য অনেক আখ্যায়িকায় দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের মধ্যেই উপাখ্যান আছে, ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ ত্রিশিরা সোম পান করিতে উদ্যত হওয়ায় ইন্দ্র তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। ইহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য ত্বষ্টা বৃত্রাসুরকে ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্রের সহিত বৃত্রের বিরোধ-কাহিনীতে সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পরিপূর্ণ। দেখা যায় যে, পৃথিবীর ও আকাশের উত্তরার্দ্ধ দেবগণের ও দক্ষিণার্দ্ধ অসুরগণের ভাগে পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা পৌরাণিকের নিকট হইতে এই idea গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পৃথিবীর উত্তর দিকে অর্থাৎ সুমেরুতে অসুরগণের বাস। বৎসরের অর্দ্ধেক কাল, উত্তরায়ণের সময় সুমেরুতে দিন; কুমেরুতে তখন রাত্রি। দেবতারা তখন জাগ্রত, অসুরগণ নিদ্রিত। দক্ষিণায়নের ছয় মাস অসুরদিগের দিন, দেবতাদিগের রাত্রি। ভাস্করাচার্য্য পর্য্যন্ত এই মত চলিয়া আসিয়াছে। গ্রহদের মধ্যে বৃহস্পতি ও শুক্র সব চেয়ে উজ্জ্বল। বৃহস্পতি যেমন পৌরাণিক মতে দেবগণের আচার্য্য, শুক্র তেমনই অসুরগণের আচার্য্য। শুক্রের নামান্তর উশনা। বেদে উশনার 'কাব্য' বা কবিপুত্র বিশেষণ দেখা যায়। কাব্য নামে এক শ্রেণীর পিতৃগণও

আছেন ; শুক্রের সঙ্গে এক দিকে অসুরের ও অন্য দিকে পিতৃগণের সম্পর্ক রহিল। শুক্র অসুরদিগকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের দ্বারা বাঁচাইয়া দিতেন ; এই মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা সেই অমৃত সোম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই বিদ্যা শিখিবার জন্য বৃহস্পতি নিজপুত্র কচকে পাঠাইয়াছিলেন। বৃহস্পতি ও শুক্র, এই দুই উজ্জ্বলতম গ্রহকে যথাক্রমে দেবগণের ও অসুরগণের গুরুরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। উভয়েই আপন আপন শিষ্যদিগকে অমৃত দ্বারা বাঁচাইতেন। বৃহস্পতির নামান্তর ব্রহ্মণস্পতিঃ। ব্রহ্মই বেদ, এবং শব্দ এবং অমৃত। সোমের শুক্র বিশেষণ পুনঃ পুনঃ দেখা যায়। শুক্র অর্থে উজ্জ্বল। এই সোম বা অমৃত উদ্ধার করিবার জন্যই সমুদ্রমন্থন ঘটিয়াছিল। এই সমুদ্র আর কিছু নহে, ইহা সেই নাসদাসীয় সূক্তের অম্ভঃ অপ্রকেতঃ, সাধারণতঃ যাহাকে কারণবারি বলে ; বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যাইতে পারে, ইহা মহাকাশব্যাপী সেই fluid, যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি এবং যাহাতে জগৎ লীন হইয়া যাইবে। এই সমুদ্র হইতেই অমৃত তুলিবার জন্য দেবাসুর মিলিয়া চেষ্টা করিয়াছিল ; মন্থনরজ্জু অনন্ত নাগ বা শেষ নাগ হয়ত Ecliptic অর্থাৎ আকাশব্যাপী রবিমার্গ, হয়ত বা আকাশব্যাপী ছায়াপথকেই কল্পনা করা হইয়াছিল। Eclipticই হউক, বা ছায়াপথই হউক, তাহার একার্দ্ধ দেবগণ আকর্ষণ করিতেছেন, অপরার্দ্ধ অসুরগণ আকর্ষণ করিতেছেন। মন্দর পর্ব্বত বোধ হয় রবিমার্গের মধ্যস্থিত Pole of the Ecliptic। অমৃত উত্থিত হইলে স্বয়ং নারায়ণ তাহা দেবগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন ; অসুরেরা বঞ্চিত হইলেন ; রাহু ও কেতু দেবতার দলে মিশিয়া সেই অমৃত পান করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। চন্দ্র ও সূর্য্য তাহাদিগকে ধরাইয়া দেন। তদবধি রাহু ও কেতুর সহিত চন্দ্র-সূর্য্যের শত্রুতা জন্মিয়াছে ; তাহারা সময়ে সময়ে চন্দ্র-সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া ফেলে। রবিমার্গ ও বিষুববৃত্ত যেমন পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে, সেইরূপ রবিমার্গ ও চন্দ্রমার্গ দুইটা বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে। ঐ দুইটা ছেদবিন্দুই রাহু ও কেতু। সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়ের পথই ঐ দুই বিন্দুর দিকে converge করিতেছে ; কাজেই উহারা যেন দুই বিন্দুকে নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে, দেখাইয়া দিতেছে। এই দুই বিন্দু আবার আকাশে স্থির নহে ; ইহারাও নক্ষত্রচক্রের মধ্যে ভ্রমণশীল। দেখা গিয়াছে যে, নক্ষত্রচক্রের মধ্যে যাহা কিছু ভ্রমণ করে, তাহাকেই গ্রহ বলিয়া পরিগণিত করা হয়।

সুতরাং আগেকার সাতটি গ্রহের উপর রাহু ও কেতুকে চড়াইয়া নব গ্রহ দাঁড় করান হইল। সূর্য্য ও চন্দ্র এই দুই বিন্দুতে উপস্থিত না হইলে গ্রহণ হয় না; কাজেই গ্রহণের সময় রাহু ও কেতু আসিয়া সূর্য্য-চন্দ্রকে গ্রাস করে। সূর্য্য চন্দ্র দেবতা; রাহু কেতু ঐ বিরোধের জন্য অসুর। অথবা রাহু কেতু নক্ষত্রচক্রে উল্টা পথে চলে, সেই জন্যই হয়ত উহারা অসুর।

"দেবগণের সঙ্গে অসুরদের যেমন চিরবিরোধ, দেবগণের ও পিতৃগণের মধ্যে ততটা নাই, কিছু আছে। উত্তরায়ণ ও শুক্লপক্ষ দেবকার্য্যের জন্য প্রশস্ত; শুভ কর্ম্ম ও দেবপূজা ঐ সময়ে হইয়া থাকে। দক্ষিণায়ন ও কৃষ্ণপক্ষ পিতৃকর্ম্মের পক্ষে প্রশস্ত; এই সময়ে আমরা এক পক্ষ ধরিয়া পিতৃতর্পণ করি; শ্রাদ্ধক্রিয়া অমাবস্যায় সম্পন্ন হয়; একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ পতিত হইলে কৃষ্ণপক্ষের একাদশী বা অমাবস্যায় করিতে হয়। পিতৃগণের উদ্দেশে আহুতি বা পিণ্ড দিলে জল স্পর্শ করিয়া শুচি হইতে হয়; অসুরের উদ্দেশেও জল স্পর্শ করিতে হয়; এইখানে উভয়ের মধ্যে একটু মিল পাওয়া যায়।

"দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত দেবতাদিগের জন্য একটি মাত্র স্বর্গ কল্পিত হয় নাই; কয়েক জন বড় বড় দেবতাকে স্থান দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বেদের তিনটি দেবতা পরবর্ত্তী কালে অন্য দেবগণকে ছাড়াইয়া অনেক উচ্চ আসন পাইলেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব; ইঁহাদের স্থান অনেক উচ্চে নির্দ্দিষ্ট হইল; ইঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র লোক কল্পিত হইল। সত্ত্বগুণাত্মক ব্রহ্মা person হিসাবে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠেন নাই; সেইরূপ ব্রহ্মালোকও ভাল করিয়া ফুটে নাই। মানস-সরোবরে তাঁহার আবাসস্থান; ঋগ্বেদ-সংহিতার নাসদাসীয় সূক্তে ইহার অর্থ পাওয়া যায়। এই সূক্তে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার বর্ণনায় দেখিতে পাই যে, কামনা হইতে জগৎ সৃষ্ট; প্রজাপতি কামনা করিলেন, আর জগৎ সৃষ্ট হইল। এই কামনার নাম—কাম; ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন, মনসিজ; 'কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।' তৎপরে সৃষ্ট 'অম্ভঃ অপ্রকেতঃ'—primal waters, কারণবারি—ইহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সৃষ্টিকর্ত্তার মন হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই সলিলরাশি মানস-সরোবর; ব্রহ্মা ইহার তীরে বসিয়া জগৎ পর্য্যালোচনা করিতেছেন। মানস-সরোবর জিনিষটা conceptual; তিব্বতের মানস-সরোবরটা উহার পার্থিব প্রতিরূপ মাত্র। শিবের আবাসভূমি—কৈলাস। বেদের রুদ্রদেব ক্রমশঃ মহাদেবে রূপান্তরিত

হইলেন। গোড়াতেই দেখা যায়, রুদ্রের সঙ্গে পর্ব্বতের সম্বন্ধ; তিনি গিরিশ; বেদে রুদ্রকে গিরিশন্ত বলা হইয়াছে। বেদের মধ্যেই রুদ্রের নানা বিশেষণ—কপর্দ্দী, বভ্রু, পিনাকী ইত্যাদি; এই সকল বিশেষণের আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা রুদ্রকে পাহাড়ের দেবতা Mountain-god) স্থির করিয়াছেন! মরুদগণ রুদ্রের পুত্র; তাহারা mountain-storms; রুদ্রের সহিত এই পাহাড়ের সম্পর্ক শিবের বেলায় হিমালয় ও কৈলাসের সম্পর্ক দাঁড়াইল। সে দিন 'শাশ্বতী' পত্রে পণ্ডিত সাতকড়ি অধিকারী মহাশয় বেদের মন্ত্র তুলিয়া দেখাইয়াছেন, মহাদেবের নিবাস ছিল উত্তরে মূজবান পর্ব্বতে। এই মূজবান পর্ব্বতে সোম পাওয়া যাইত। এই মূজবানই কি তবে কৈলাস? রুদ্রের সহিত ভূতগণের সম্পর্ক বেদে পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতি-রোহিণী-ঘটিত উপাখ্যানে ভূতমানের কথা পাওয়া যায়। এই ভূতমান্ রুদ্র হইতে অভিন্ন, এবং ইনিই পরবর্ত্তী কালে ভূতপতি। আবার এই ভূতগণকে দেবযোনি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি অন্যান্য দেবযোনির সহিত এক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদিগের বাস উত্তর দিকে বলিয়া লোকের ধারণা। সন্নিকটে ভূতগণপরিবেষ্টিত মহাদেব কৈলাস পর্ব্বতে বাস করিতেন; গন্ধর্ব্ব কিন্নর গান শুনাইত। মহাদেবের বা রুদ্রের সহিত গিরির সম্পর্ক হইতে উত্তরে শিবলোক দাঁড়াইয়া গেল। তিব্বতের কৈলাস পর্ব্বতের সহিত শিবের সম্পর্ক দেখা গেল; কিন্তু এই শিবলোকের একটা conceptual ব্যাখ্যা নিশ্চয় ছিল। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, এই তিন ঘটনার মধ্যে বেদের ভীম রুদ্র মহাদেবের সহিত লয় অর্থাৎ সংহার-কার্য্যের বিশেষ সম্পর্ক পাতান হয়। এই জন্য তিনি সংহারকর্ত্তা ও শ্মশানচারী। শিব শ্মশানচারী; তাঁহার দেহ যে-চিতাভস্মে মণ্ডিত, সেই ভস্ম জগতের মহাপ্রলয়সম্ভূত, ইহা শিবপুরাণের বচনে বলা হইয়াছে। এই শ্মশানই শিবলোক। এই conceptionএর একটা astronomic মূল আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আকাশস্থিত Sirius বা Dogstar নামক তারকার বৈদিক নাম মৃগব্যাধ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রজাপতির কন্যাগমন উপাখ্যান অনুসারে ঐ মৃগব্যাধই 'ভূতমান্ রুদ্র'। এক সময়ে ঐ স্থানের নিকট বিষুবসংক্রমণ হইত, অর্থাৎ Equator ও eclipticএর ছেদবিন্দু ঐখানে ছিল। ঐ ছেদবিন্দুই যমদ্বার। উহা অতিক্রম করিয়া দেবলোক হইতে

পিতৃলোক যাইতে হইত। দেবযান ও পিতৃযানের মধ্যে উহা অবস্থিত। উহার দক্ষিণেই পিতৃলোক। মৃগব্যাধ রুদ্রের নিকটে যখন ঐ যমদ্বার অবস্থিত ছিল, তখনই হয়ত রুদ্রের সহিত শ্মশানের সম্পর্ক স্থির হয়। কালিদাসের ভাষায় 'ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্য্যতে'—এই স্থানে পিতৃসদ্মগোচরঃ বিশেষণ এই অর্থে সার্থক হয়। এই যমদ্বারের পার্শ্বস্থিত দুইটা কুকুর (Canis major ও Canis minor, বেদের দ্বৌ শ্বানৌ শ্যামশবলৌ) এই জন্য শ্মশানকুক্কুর। ভৈরব-মূর্ত্তিতে শিবের সঙ্গে কুকুর থাকে; ভৈরব কুক্কুরবাহন। এখনও ভৈরবপন্থী শৈব সন্ন্যাসী আছে; তাহাদের সঙ্গে কুকুর থাকে। আকাশগঙ্গা ঐ মৃগব্যাধরূপী রুদ্রের পাশ দিয়া গিয়াছে; গঙ্গা বিষ্ণুপদ (pole of the ecliptic)-এর নিকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মহাদেবের মস্তকে পতিত হইয়াছেন, এই কল্পনার মূলও এইখানে হইতে পারে। এই মৃগব্যাধ রুদ্রের ভূতমান্ বিশেষণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উপাখ্যানেই পাওয়া যায় বলিয়াছি। 'ভূতমান্' পরবর্ত্তী কালে ভূতপতি। শ্মশানচারী শিবের অনুচর ভূতগণ কালে প্রমথগণে পরিণত হইয়াছেন। কালক্রমে দার্শনিক আচার্য্যগণের হাতে অন্যরূপে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রে যাবতীয় স্থূল দ্রব্যের নাম ভূত, বিশেষতঃ ক্ষিত্যাদি পাঁচটি elementকে ভূত বলা হইয়াছে। মহাদেব জগৎপতিরূপে ভূতের পতি। বিশেষতঃ ঐ পাঁচ ভূতকে তাঁহার মূর্ত্তিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। শিবের অষ্ট মূর্ত্তির কল্পনা সকলেই জানেন। শিবপূজা করিতে হইলে ঐ অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিতে হয়। কালিদাস ঐ অষ্ট মূর্ত্তির বন্দনা করিয়াই শকুন্তলা আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ আটটি মূর্ত্তি কি কি? ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, এই পাঁচটি ভূত, এবং সূর্য্য সোম (চন্দ্র) ও সোমযাজী যজমান। পাঁচ ভূতে সমস্ত জগৎকে বুঝাইল। সঙ্কীর্ণ অর্থে সূর্য্য দেবলোক; দেবযান-পথে সূর্য্যে যাইতে হয়। চন্দ্র বা সোম পিতৃলোক; পিতৃযানের পথ মনে করুন। অতএব সূর্য্য ও সোম এই দুই মূর্ত্তি, স্থূল জগতের পরপারে যে সূক্ষ্মতর লোক আছে, যেখানে মৃত্যুর পরে সকলকেই যাইতে হয়, এই দুই লোককে বুঝাইল। তাহার পর অষ্টম মূর্ত্তি, সোমযাজী যজমান স্বয়ং; যিনি জীবরূপে সংসারে কর্ম্ম করেন, এবং তাহার ফলে দেবযানে বা পিতৃযানে, স্থূল জগৎ হইতে সূক্ষ্ম জগতে প্রয়াণ করেন। ফলে জীব ও জীবের কর্ম্মক্ষেত্র সমুদয়ই ঈশ্বরের

প্রকাশ। অষ্ট মূর্ত্তি বলিলে যাহা কিছু আছে, সকলই তাহার অন্তর্গত। এখন শিবলোকের আধ্যাত্মিক অর্থ পাওয়া গেল। আমি বলিতে চাহি যে—ব্রহ্মার মানস-সরোবর, বিষ্ণুর ক্ষীরোদধি ও শিবলোক, এই তিনেরই conceptual significance একই। শিব অষ্ট মূর্ত্তিতে যাহা ব্যাপিয়া আছেন, সেই সমস্ত জগৎটা শিবলোক; জাগতিক দ্রব্য মাত্রই তাঁহার অনুচর ভূতগণ। অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অর্থে নিত্যপরিবর্ত্তনশীল, নিত্যধ্বংসশীল জগৎকে শ্মশান বলা হইয়াছে। সেই জন্য তিনি শ্মশানচারী ও শশ্মানস্থিত ভূতগণের অধিপতি। আরও সঙ্কীর্ণ করিয়া লইলে জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা অনুসারে পিতৃলোকে প্রবেশের দ্বারে আকাশের অংশ-বিশেষে মৃগটায় পৌঁছিতে হয়। লৌকিক ভাষায় তিব্বতের কৈলাস পর্ব্বতটা—যেখানে গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নরাদির পার্শ্বে ভূতযোনিরা বাস করে—সেই কৈলাস পর্ব্বতটাই শিবলোকের পার্থিব প্রতিরূপ। হিমালয়ের উত্তরে পার্ব্বত্য প্রদেশে যেখানে সোম পাওয়া যাইত, সেই দুর্গম অথচ প্রার্থনীয় প্রদেশে অবস্থিত পর্ব্বত মহাদেবের বাসের পার্থিব প্রতিরূপ হইল। ঐ কৈলাস পর্ব্বতের নিকটেই না কি মানস-সরোবর। ব্রহ্মার মানস-সরোবরও ঐরূপে তিব্বতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

"মহাদেবকে বৃষবাহন কেন বলা হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন। শাস্ত্রে ধর্ম্মকে চতুষ্পাদ বৃষ বলা হইয়াছে। ধর্ম্মের এই নাম প্রসিদ্ধ। পিতৃপতি যমের এই নাম প্রসিদ্ধ। তিনিই পৌরাণিক কালে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারকর্ত্তা দাঁড়াইয়াছেন। যমদ্বারের ও পিতৃলোকের পার্শ্বে থাকায় মহাদেবও বৃষবাহন, বৃষধ্বজ অর্থাৎ ধর্ম্মবাহন ধর্ম্মচিহ্নিত হইয়াছেন কি? অথবা আকশমণ্ডলে বৃষ রাশির (Taurus নামক constellation) পূর্ব্বাংশে মৃগব্যাধের স্থান কল্পিত হওয়ায় তিনি বৃষবাহন হইয়াছেন? রাশিচক্রের কল্পনা বৈদিক সাহিত্যে নাই; শুনা যায়, উহা গ্রীকদিগের নিকট হইতে আমরা লইয়াছি। গ্রীক-সমাগমের পরবর্ত্তী ভারতীয় সাহিত্যে না কি মেষ-বৃষাদি রাশির কল্পনা আছে, তাহার পূর্ব্বে ছিল না। তাহা হইলেও ক্যালডিয়াতে গ্রীকের ও ভারতবর্ষের রাশিচক্রের মূল অনুসন্ধান চলে না কি? ব্রহ্মার ও বিষ্ণুর বাহনকে বেদেই পাওয়া যায়। ব্রহ্মার বাহন হংস; ইনি ঋকের সেই সর্ব্বব্যাপী জগদ্ব্যাপী হংস ভিন্ন আর কেহ নহেন। মানস-সরোবরেই ইঁহার স্থিতি; কেন না, সৃষ্ট জগৎটাই মানস-সরোবর। আর গরুড় পক্ষী,—ইনি

বেদের সুপর্ণ গরুত্মান্; ইনি এক দিকে সূর্য্য অন্য দিকে ব্রহ্ম; ইহার ভ্রাতা অরুণ, সূর্য্যের সারথি। অতএব ইনিও সেই হংস। কেন না, হংসও এক দিকে সূর্য্য, অন্য দিকে ব্রহ্ম। পূর্ব্বে ইহাদের কথা উঠিয়াছিল। এখানে পুনরুক্তির দরকার নাই।

"ঋগ্বেদের মধ্যেই পরমপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি তিন পদের দ্বারা জগৎ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি আদিত্যগণের মধ্যে অন্যতম। নিরুক্তকারেরা তাঁহাকে সূর্য্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, ঐ তিন পদ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক। কাহারও মতে ঐ তিন পদ আর কিছু নহে, সূর্য্যের উদয়স্থান, মধ্যাকাশ ও অস্তগমন-স্থান; বিষ্ণুর পরমপদ আকাশের মধ্যস্থলকে (zenith) বুঝায়। আমার মনে হয় যে, পরমপদ আকাশের অন্য স্থানকেও বুঝাইত, সম্ভবতঃ উহা Pole of the Ecliptic; বিষ্ণুপদ হইতে গঙ্গার উদ্ভব,—ঐ Poleএর নিকট দিয়া আকাশগঙ্গা (Milky Way) চলিয়াছেন। ধ্রুব, অর্থাৎ Pole of the Equator, বিষ্ণুর পরমপদে স্থান পান নাই, কিন্তু পরমপদের নিকটে স্থান পাইয়াছেন। পরমপদের আধিভৌতিক অর্থ যাহাই হউক, উহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য বেদের সময়ে চলিত ছিল, সন্দেহ নাই। ইন্দ্রিয়ের অতীত কোনও একটা স্থান, যাহা কেবল জ্ঞানিগণেরই জ্ঞানগম্য;—'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ' এই মন্ত্রে সেই আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্যেরই আভাস দেওয়া হয়। নাসদাসীয় সূক্তে ও অন্যান্য নানা স্থানে পরমব্যোমের কথা শুনা যায়। এই পরমব্যোম সম্ভবতঃ বিষ্ণুর সেই পরমপদ হইতে অভিন্ন। ঐ সূক্তে সৃষ্টি-ব্যাপারের বিবরণ দিয়া বলা হইয়াছে যে, এই সৃষ্টির কথা যিনি পরমব্যোমে আছেন, তিনিই জানেন, হয়ত তিনিই জানেন না। পুরাণ-কথায় বিষ্ণুর নানা স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং প্রলয়ের পরে তিনি ক্ষীরোদধির উপর অনন্ত-শয্যায় শায়িত থাকেন। এই ক্ষীরসমুদ্র Infinite space, সেই পূর্ব্বোক্ত অম্ভঃ গহনং গভীরং বা অপ্রকেতং সলিলং, যাহা সৃষ্টিকর্ত্তার মন হইতে সৃষ্ট বা projected। সাম্প্রদায়িক ভাগবত-বৈষ্ণবেরা শ্বেতদ্বীপবাসী নারায়ণের কল্পনা করেন। নারদ শ্বেতদ্বীপ হইতে তাঁহার উপাসনাপ্রণালী দেখিয়া আসিয়াছিলেন। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে এবং মহাভারতে তাহার উল্লেখ আছে। এই ভাগবতধর্ম্ম পঞ্চরাত্রে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। শ্বেতদ্বীপ যদি ক্ষীরোদধির পার্শ্বে হয়, তাহা হইলে

উহারও conceptual তাৎপর্য্য বাহির করা চলিতে পারে। ব্রহ্মার আবাস মানস-সরোবর ও নারায়ণের ক্ষীরোদধি একই conceptএর নাম দাঁড়ায়। এবং উহার পার্থিব প্রতিরূপ ভূমধ্যসাগর, না বালকাশ হ্রদ (Lake Balkash), তাহা লইয়া অধিক মাথা ব্যথার প্রয়োজন হয় না। জনসাধারণের ধারণায় বৈকুণ্ঠই বিষ্ণুলোক। বৈদিক যুগের পরমপদ পৌরাণিক বৈকুণ্ঠে দাঁড়াইল। সেখানে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত সলক্ষ্মীক মহাবিষ্ণুর স্থান।

"বৈষ্ণবেরা গোলোক কল্পনা করিলেন। ভগবানের ঐশ্বর্য্য তাঁহাদের ভক্তি আকর্ষণ করে না, মাধুর্য্যাদি রসের তাঁহারা পক্ষপাতী। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের উপাস্যরূপে গ্রহণ করিলেন; ইঁহার স্থান গোলোকে। বৈকুণ্ঠ এবং বিষ্ণু যথাক্রমে গোলোকের এবং শ্রীকৃষ্ণের নিম্নে। বেদান্তের ব্রহ্মের রসময় এবং আনন্দময় মূর্ত্তি লইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কল্পনা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মতে বেদান্তের পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতি মাত্র। বেদান্তের মুক্তি বৈষ্ণব চাহেন না; শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে থাকিয়া যুগলমূর্ত্তির সেবা উপাসনাই সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। এই গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত নিত্যমিলিত। গো, গোপ ও গোপী গোলোকের অধিবাসী। এই শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠবাসী বা সবিতৃমণ্ডলবর্ত্তী ধৃতশঙ্খচক্র হিরণ্ময় পুরুষ নহেন। ইনি দ্বিভুজ মুরলীধর, মদনমোহন; গো-গোপসঙ্ঘাবৃত; গো-গোপ-গোপিকাকান্ত; গোপীগণের নয়নোৎপলে তাঁহার তনু অর্চ্চিত হইতেছে। লীলার জন্য তিনি নরদেহ ধারণ করিয়া কিছু দিনের জন্য মর্ত্ত্য বৃন্দাবনে বিহার করিয়াছিলেন; এবং পরে মথুরায় ও দ্বারকায় লীলা করিয়া মর্ত্ত্যলীলা শেষ করেন। কিন্তু তাঁহার মথুরালীলা এবং দ্বারকালীলা বৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হয় নাই। গোলোকের অনুকরণে বৃন্দাবনে তিনি গো-গোপ-গোপিকাকান্তরূপে যে লীলা করিয়াছিলেন, সেই লীলাই বৈষ্ণবের প্রীতির জিনিষ। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে অনেকেই বিষ্ণুর অবতার বলিয়া জানেন; কিন্তু খাঁটি বৈষ্ণব সে কথায় আপত্তি করিবেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার নহেন; দশাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম নাই; সেখানে বলরাম আছেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন; তিনি স্বয়ং ভগবান্; লীলামানববিগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন মাত্র। বরং বিষ্ণু প্রভৃতি অন্যান্য মূর্ত্তি নারায়ণের মূর্ত্তিভেদ মাত্র। মর্ত্ত্যলীলায় বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরাযাত্রা

আছে, গোপীগণের সহিত বিরহ আছে ; কিন্তু গোলোকে বিরহ থাকিতে পারে না, তিনি সেই আপন ধাম ছাড়িয়া এক পাও চলিয়া যান না। লোকে মনে করে যে, তিনি গোলোক ছাড়িয়া মর্ত্ত্য বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন ; সেটা আর কিছুই নহে, ইন্দ্রজালের মত একটা ব্যাপার ; গোলোকই নিত্য-বৃন্দাবন। এই গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের কোনওরূপ ঐশ্বর্য্যের প্রভাব নাই। সেখানে তিনি স্বয়ং গোপাল, নন্দাদি গোপালের স্নেহভাজন পুত্র, শ্রীদামাদি গোপের নিত্য-সখা, গোপীগণের প্রিয়তম বল্লভ, প্রধানা গোপী রাধিকার সহিত নিত্য-মিলিত ; স্নেহবাৎসল্য সখ্যমাধুর্য্যাদি রসের পূর্ণ বিকাশ। বৈষ্ণব ভজনার উদ্দেশ্য এই যে, বৈষ্ণব গোপীভাবে থাকিয়া সেখানে সেই যুগলমূর্ত্তিকে সেবা করিবার, অন্ততঃ চোখে দেখিবার অধিকার পাইবেন ; অন্য কোনওরূপ মুক্তি বৈষ্ণব একেবারেই চাহেন না।

"বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সাদৃশ্য লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। জগতের যাবতীয় ধর্ম্মকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়,—Religion of Law এবং Religion of Redemption ; স্থূলতঃ আমরা একটাকে কর্ম্মপথ, অন্যটাকে ভক্তিপথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। ঈশ্বর কোনও ঋষির বা prophetএর মুখ দিয়া মানব-জাতিকে কতিপয় আদেশ বা অনুজ্ঞা জানাইয়াছেন ; মানুষ আপনা হইতে সেই কর্ত্তব্যগুলি জানিতে পারে না। ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত সেই আদেশের অনুযায়ী বিধিবিহিত আচরণ করিলে মানুষের সদগতি হয়। ইহা কর্ম্মের পথ। মোটামুটি ইহাকে সাধনা বলা যাইতে পারে। অনেকের মতে আমাদের বেদের কর্ম্ম-কাণ্ডের ধর্ম্ম ও Old Testamentএর ধর্ম্ম এই 'Religion of Law'র অন্তর্গত। Religion of Redemption ইহা হইতে ভিন্ন। ইহাকে ভজনার পথ বলা যাইতে পারে। এখানে ধরিয়া লওয়া হয় যে, মানুষ স্বভাবতঃই দুর্ব্বল, দীন ও পাপী। কোনওরূপে কোনও কর্ম্ম বা সাধনা দ্বারা সে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। কিন্তু ভগবানের অসীম দয়া ; তিনি তাঁহার দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া এক দিন তাহাকে উদ্ধার করিবেন। যত দিন সে ঘটনা না ঘটিবে, তত দিন সর্ব্বতোভাবে তাঁহার দয়ার উপরে আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদন করাই জীবের কর্ত্তব্য। এই আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের ব্যাপারটাই ভজনা। বৈষ্ণব ও খ্রীষ্টান উভয়েই জানেন যে, ভগবান্ স্বয়ং দয়া করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবেনই। উভয়েই নিজেকে অতি দীন ও

অতি পাপী বলিয়া জানেন। ভগবান্ স্বয়ং Redeemer; আর কোনও Redeemer নাই। খ্রীষ্টরূপী ভগবানের দীনভাবে শরণ লইলে খ্রীষ্টানের salvation হইবে; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনুগত সেবককে এক দিন টানিয়া লইবেন। খ্রীষ্টানের মত বৈষ্ণবও বলেন, আমি অতি পাপী, নিজগুণে বা নিজের চেষ্টায় কখনও রক্ষা পাইব না; এমন কি, উদ্ধারের দিকে আমার মতিগতি পর্য্যন্তও নাই; কৃপাসিন্ধু তুমি আমার কেশে ধরিয়া আমাকে জোর করিয়া উদ্ধার কর। অনেকের ধারণা আছে যে, বেদান্ত-নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানের পথের সঙ্গে এই কর্ম্মপথের ও ভক্তিপথের বিরোধ আছে। বিরোধ নাই, এমন কথা বলি না; কিন্তু বেদান্তের মধ্যেই তাহার সমন্বয় দেখিতে পাই, এবং সেই সমন্বয়-চেষ্টা যে নিতান্ত নিষ্ফল হইয়াছে, এমন ত বোধ হয় না।

"বেদান্তে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। বেদান্ত এক জায়গায় বলেন,—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ; ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে, যে-ব্যক্তি বলহীন অথবা আপনাকে বলহীন মনে করিয়া বল অর্জ্জন করিতেও চায় না, যে একেবারে নিশ্চেষ্ট, সে কখনই আত্মাকে লাভ করিবে না; বিনা প্রযত্নে মুক্তি হইবে না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলা হইতেছে—কেবল প্রযত্ন দ্বারা আত্মলাভ হয় না, ন কর্ম্মণা ন বহুনা শ্রুতেন, এমন কি, বেদবিহিত সমস্ত কর্ম্ম করিলেও আত্মলাভ ঘটিবে না; যমেব এষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ, তিনি যাহাকে বরণ করেন, সে-ই আত্মলাভ করে। এই 'বরণ' কথাটার অর্থ—স্বেচ্ছাক্রমে বাছিয়া লওয়া, Election; ইহা সম্পূর্ণ free choiceএর ব্যাপার। খ্রীষ্টানের Doctrine of Grace ও বৈষ্ণবের কৃপাবাদ এখানে স্পষ্টভাবে সূচিত হইয়াছে। আত্মা সম্পূর্ণভাবে free agent; কোনও-রূপ বাধ্যবাধকতা তাঁহাকে স্পর্শিতে পারে না। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে বরণ দ্বারা জীবকে উদ্ধার করেন; করিবেনই, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কৃপাপূর্ব্বক করিবেন। যাঁহারা বেদান্তের মুক্তির তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন, তাঁহারা বেদান্তের মধ্যে এই দ্বিবিধ উক্তির কোনওরূপ বিরোধ দেখিবেন না। এই যে আত্মাকে লাভ করার কথা বলা হইল, সেই আত্মা শব্দের অর্থ—'আমি'; আত্মাকে লাভ করার অর্থ আমার স্বরূপ দেখা। বেদান্ত-মতে আমি সর্ব্বতোভাবে মুক্ত ও স্বাধীন। আমি একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া বা কল্পনা করিয়া আপনাকে সেই স্বকল্পিত জগতের অধীন এবং

বাধ্য মনে করিতেছি; এইরূপে আমি বদ্ধ জীব সাজিয়াছি। বস্তুতঃ এই জগৎ-সৃষ্টিটা একটা কল্পনা মাত্র, এবং জগতের অধীনতাও একটা কল্পনা মাত্র। এই কল্পিত বন্ধনটাকে সত্য মনে করাই বন্ধন; ইহাকে কল্পিত বলিয়া জানাই মুক্তি। এই কল্পিত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা আমি; এ সৃষ্টিকার্য্যে আমার কোনও বাধ্যবাধকতা নাই; আমি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমে একটা ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়া আপনাকে মুগ্ধ করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে আমি সর্ব্বদাই মুক্ত, এইটুকু জানাই মুক্তি। ইহা আমার লীলা, ইহা জানাই মুক্তি। স্বেচ্ছাকৃত এই বদ্ধ অবস্থায় আমি চেষ্টার অভিনয় করিয়া থাকি। আপনাকে বদ্ধ জানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চিরকাল বদ্ধ ভ্রম থাকিবে। অথচ দেখা যায়, সহস্র চেষ্টাতেও এই ভ্রান্তি যায় না। হঠাৎ এক দিন চমক ভাঙ্গিয়া যায়। যাহার কোনও হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, যাহা নিজের চেষ্টালব্ধ নহে, তাহাকেই বলা হয় 'বরণ'; তাহাই আত্মার 'কৃপা'। কি একটা খেয়ালের বশে আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বদ্ধ সাজিয়া মজা করিতেছিলাম; হঠাৎ আবার খেয়ালের বশেই ইন্দ্রজালের মোহটা সরাইয়া ফেলিলাম। গাছের শাখাপল্লবের অন্তরালে ছায়ার মধ্যে পাখী বসিয়া থাকে; সে যেন ডালের সঙ্গে মিশাইয়া থাকে; আমার সহস্র চেষ্টাতেও সে আমার চক্ষুগোচর হয় না; হঠাৎ সে যখন চোখে পড়িয়া গেল, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তখন আর কোনও দ্বিধা থাকে না। এ ব্যাপারটাও যেন কতকটা সেইরূপ। সহস্র চেষ্টাতেও মুক্তি ঘটে না; আবার অকস্মাৎ ঘটিয়া যায়। কাজেই চেষ্টাটা মুক্তির immediate কারণ নহে; চোখে পড়াটাই তাহার immediate কারণ। সেইরূপ আমি বদ্ধ নহি; আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটা মজা করিতেছি; আমার স্বরূপদর্শন সেই বদ্ধাবস্থার সহস্র চেষ্টাতেও ঘটে না, আবার অকস্মাৎ ঘটিয়া যায়। এই ঘটিয়া যাওয়ার ব্যাপারটারই নাম—বরণ। এই বরণও আমার স্বেচ্ছাকৃত; আত্মারই অর্থাৎ আমারই free choice ঘটিত ব্যাপার। ইচ্ছামতে আমি বদ্ধ থাকি, আবার ইচ্ছামতেই হঠাৎ মোহের আবরণটা, অবিদ্যাটা সরাইয়া দিই। কোনও হেতু নির্দ্দেশ করা যায় না। ইহার ভিতর এই element of incalculability আছে; কাজেই ইহাকে বরণ—election নাম দেওয়া হইয়াছে। যত ক্ষণ বদ্ধ থাকি, তত ক্ষণ জানিতে পারি না, কবে কিরূপে মুক্তি ঘটিবে,—মুক্তির আকাজ্ক্ষায় সাধনার পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই

মাত্র ; অকস্মাৎ আমারই—চিরমুক্ত পুরুষেরই খেয়ালে বন্ধন-দশা কাটিয়া দিই। বন্ধের ভাষায় ইহাকে বলা হয় আত্মারই কৃপা, বরণ, grace, election।"

৫

রামেন্দ্র বাবু বলিতে লাগিলেন :—

"কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি ; স্বর্গ নরক দুই ছাড়িয়া বহু দূরে পড়িয়াছি ; ফিরিবার চেষ্টা করা যাক।

"বলা বাহুল্য যে, খ্রীষ্টান বা বৈষ্ণব বেদান্তের মুক্তি বাঞ্ছা করেন না ; এ কথা তাঁহারা স্পষ্টই বলেন। 'আমি ভগবান্'—এ কথা খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ খ্রীষ্টান বা বৈষ্ণব এ কথা বলিতে সাহস করেন না ; অন্যে বলিলে চমকিয়া উঠেন। বৈদান্তিক একজীববাদী ; খ্রীষ্টান বা বৈষ্ণব বহুজীববাদী। বৈদান্তিক বলেন—আমিই এক মাত্র জীব, আর কোনও জীব নাই ; এবং আমিই এক মাত্র ঈশ্বর, আর কোনও ঈশ্বর নাই ; অন্য জীবের বা অন্য ঈশ্বরের কল্পনাই ভ্রান্তি ; ঐ কল্পনা না করাই মুক্তি। কিন্তু খ্রীষ্টান ও বৈষ্ণব মনে করেন যে, আমা ছাড়া আমার মত আরও অনেক জীব আছে, এবং সকল জীব হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর আছেন ; সেই ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা সেব্যসেবকরূপ সম্পর্কে থাকিব বা অন্য কোনও-রূপ সম্পর্কে থাকিব ; সে সম্পর্ক লুপ্ত হইবার নহে ; তাঁহার কৃপায় সেই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠরূপে স্থাপিত হইলেই আমাদের উদ্ধার হইবে। ইহাকে উদ্ধার-লাভ বা salvation বলা যাইতে পারে ; ইহা বেদান্তের মুক্তি নহে ; বেদান্তের মুক্তি ইহাদের অগ্রাহ্য। খ্রীষ্টান এবং বৈষ্ণব বলেন—বেদান্তের অদ্বয়বাদের সঙ্গে আমাদের সনাতন বিরোধ। কিন্তু বেদান্ত বলিবেন,—আমার কাহারও সঙ্গে বিরোধ নাই ; কোনও কল্পিত জীব যদি কোনও ঈশ্বর কল্পনা করিয়া, তাঁহার সেবা করিয়া বা তৎপ্রতি প্রীতি অর্পণ করিয়া আনন্দ পায়, আমার তাহাতে চঞ্চল হইবার কোনও প্রয়োজন নাই।

"খ্রীষ্টান এবং বৈষ্ণবের মধ্যে এই সাদৃশ্য ত আছেই, উভয়ের উপাসনা-পদ্ধতিতেও যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। এমন কি, শ্রীকৃষ্ণের এবং খ্রীষ্টের বাল্য-লীলাতেও নানা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কে কাহার নিকট ঋণী, এই

প্রশ্ন উঠে। খ্রীষ্টানের পক্ষে ইহা বলাই স্বাভাবিক যে, বৈষ্ণবেরাই ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গে যাহা কিছু খ্রীষ্টের সাদৃশ্য তাঁহারা দেখিতে পান, সবই তাঁহারা post-Christian বলিয়া ধরিয়া লয়েন। গীতা এবং বাইবেলের বহু উক্তি পাশাপাশি রাখিয়া বলা হইয়াছে যে, গীতা এই সকল জিনিষ বাইবেল হইতে লইয়াছেন ; অতএব গীতার রচনাকালও বাইবেলের পরে। মহাভারতের যে অংশে নারদের শ্বেতদ্বীপ গমনের বর্ণনা আছে, উহা post-Christian বলা হয়। বৌদ্ধ কিংবা অন্য কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া একটা common source আবিষ্কার করিতে পারা যায় কি না বলা হয় না। খ্রীষ্টানের নিকট হইতে বৈষ্ণব কিছুই গ্রহণ করে নাই, এ রকম negative proposition প্রমাণ করাই কঠিন ; আমি সে কথা বলিতে প্রস্তুত নহি। বাক্‌ত্রীয় গ্রীকদিগের মধ্যে না কি গণ্ডোফারিস প্রভৃতি নরপতি খ্রীষ্টান ছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বাক্‌ত্রীয়ায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল ; সেখান হইতে খ্রীষ্টধর্ম্মের ভারতবর্ষে প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহারও বহু পূর্ব্বে যে এ দেশে ভাগবত ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তৎকালের ভাগবত ধর্ম্মের স্বরূপ কি রকম ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। কিন্তু উহা নিঃসন্দেহ religion of redemption ছিল। অতি প্রাচীন কালে দক্ষিণে দ্রাবিড় দেশে St. Thomas খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন, এ রকম একটা কিংবদন্তী আছে ; এবং সেই সময় হইতে সে অঞ্চলে একটা খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় ছিল, ইহাও অনেকে অনুমান করেন। বহু শত বর্ষ পরে রামানুজাদি আচার্য্য দক্ষিণাপথে প্রাদুর্ভূত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটা নূতন গঠন দিয়াছিলেন ; তাঁহারাও প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, এ রকম একটা পাশ্চাত্য মত আছে। ডাক্তার শীলও তদ্রূপ মতের উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্টানের নিকট বৈষ্ণবের এই ঋণ গ্রহণের প্রমাণ কত দূর বলবৎ, তাহা আমি বিশেষ কিছুই জানি না। বোধ করি, এ সম্বন্ধে কোনও চরম সিদ্ধান্ত প্রচারের এখনও সময় আসে নাই।

"কৃষ্ণ ও খ্রীষ্ট-বিষয়ক সাদৃশ্যের মধ্যে একটা কথা আছে, সে বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কাহাকেও আলোচনা করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না ;— সেটা শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব লইয়া। গো, গোপ, গোপী বাদ দিলে বৈষ্ণবের

শ্রীকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভাব বড় কিছু থাকে না। এখন প্রশ্ন উঠে, কৃষ্ণের গোপালত্বের মূল কোথায়? কালিদাস মেঘদূতে নারায়ণের গোপাল-বেশের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনিই খ্রীষ্টের পূর্ব্বে, কি পরে ছিলেন, তাহা লইয়া যখন বিবাদ চলিয়াছে, তখন এ সম্বন্ধে কোনও কথা বলা চলে না। মহাভারতে শিশুপালবধ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনের যে নিন্দাবাদ আছে, সে উক্তিকেও যদি কেহ প্রক্ষিপ্ত বলেন, তাঁহাকেও নিরস্ত করা কঠিন। বৃন্দাবনেই হউক, আর গোলোকেই হউক, গাভী ছাড়া কৃষ্ণ থাকিতে পারেন না। এখন আশ্চর্য্য এই যে, খ্রীষ্টানেরা খ্রীষ্টকেও shepherd বিশেষণ দেন। এখন পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘকে খ্রীষ্টের flock বলা হয়। কৃষ্ণের ভয়ে কংস দেবকীর সন্তানদিগকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজা হেরডও সেইরূপ ভবিষ্যতে King of the Jews তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবেন, এই আশঙ্কায় শিশুহত্যা করিয়াছিলেন। অন্ধকার রাত্রে কারাগৃহে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম; বসুদেব কংসের ভয়ে সেই শিশুকে স্থানান্তরিত করিয়া গোকুলে গোপ-গৃহে লুকাইয়া রাখেন; সেখানেই তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। হঠাৎ এক দিন তিনি মথুরায় আত্মপ্রকাশ করিয়া যাদবগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। খ্রীষ্টের সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, হেরডের ভয়ে সসত্ত্বা মেরীকে লইয়া জোসেফ দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছিলেন। বিদেশে গুহামধ্যে খ্রীষ্টের জন্ম হয়। আর কেহ সে ঘটনা জানিত না। কতকগুলি মেষপালক সে প্রদেশে উপস্থিত ছিল; তাহারাই সে সংবাদ প্রথমে জানিতে পারে। বহু দিন পরে এক দিন হঠাৎ খ্রীষ্ট ইহুদিদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহাদের নেতৃত্ব করিতে চাহিলেন; অনেকে তাঁহাকে King of the Jews বলিয়া গ্রহণ করিল। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যেখানে গো এবং গোপ, খ্রীষ্টের পক্ষে সেখানে মেষ এবং মেষপালক। এই সাদৃশ্যেরই বা তাৎপর্য্য কি?

"উভয় আখ্যায়িকার মধ্যে এই সাদৃশ্য বিস্ময়জনক। মজা এই, খ্রীষ্টানেরা যেরূপ Old Testament-মধ্যে খ্রীষ্টের অবতার সম্বন্ধে বহু ভবিষ্যদুক্তি দেখিতে পান, বৈষ্ণবেরাও সেইরূপ বেদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধে নানা উক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহুদি বাইবেলের prophet বা নবিগণ,—যাঁহারা ইহুদি জাতির ইতিহাসে ঋষিস্থানীয়,—তাঁহারা না কি যীশুখ্রীষ্ট অবতীর্ণ হইয়া যে সকল লীলা করিবেন, তাহার অনেক কথাই

পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের পরিশিষ্টরূপে গণ্য হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাবর্ণন প্রসঙ্গে দেখিবেন, হরিবংশের টীকাকার নীলকণ্ঠ ঋগ্বেদ-সংহিতার বহু মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ও তাহার ব্যাখ্যা দিয়া দেখাইতেছেন যে, ঐ বেদের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার অনেক কথা প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। এমন কি, পুতনা-বধ, যমলার্জ্জুনভঙ্গ, তৃণাবর্ত্ত-বধ, কালিয়দমন, গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি ঘটনার কথাও ঋগ্বেদের সংহিতার মধ্যে পাওয়া যায়। তাহা বেদের মন্ত্র তুলিয়া দেখান হইয়াছে। সে যাহাই হউক, শ্রীকৃষ্ণের সহিত গো ও গোপের যে সম্পর্ক, খ্রীষ্টের সহিত মেষ ও মেষপালকের কতকটা সেইরূপ সম্পর্ক দেখা যায়। খ্রীষ্টের তিরোধানের পরেই সে সম্পর্ক আবিষ্কৃত দেখা যায়। Apostle Peter তাঁহার প্রথম Epistle-মধ্যে খ্রীষ্টকে Lamb ও Shepherd দুই বিশেষণ দিয়াছেন। এই সাদৃশ্যেরই বা তাৎপর্য্য কি?

"ভারতবর্ষে গাভীর যে স্থান, ইহুদির মধ্যে মেষের হয়ত সেই স্থান ছিল; ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের সঙ্গে গরুর ও ভেড়ার সম্পর্কের তাৎপর্য্য কি? সাদৃশ্য সত্ত্বেও প্রভেদ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় গরু যতটা স্থান অধিকার করিয়া আছে, খ্রীষ্টের লীলায় মেষকে ততটা স্থান অধিকার করিতে দেখা যায় না। বৃন্দাবনে ধেনু চরানই তাঁহার দৈনন্দিন কাজ। কখনও তিনি কালিয়দমন করিয়া সেই ধেনু রক্ষা করিতেছেন, কখনও রাক্ষসাদির আক্রমণ হইতে ধেনু রক্ষা করিতেছেন, কখনও গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া তাহাদিগকে দেবতার কোপ হইতে রক্ষা করিতেছেন। তিনি প্রকৃত পক্ষে গোপালক বা গোপাল। গোপ এবং গোপী ভিন্ন আর কাহারও সঙ্গে তাঁহার কারবার নাই। বৈষ্ণবেরা এই গোপালকেই তাঁহাদের উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহারা যে নিত্য-বৃন্দাবনের কল্পনা করিয়াছেন, সে স্থানটার নামও গোলোক, এবং সেখানে তিনি গোপাল। কিংবদন্তী অনুসারে খ্রীষ্টের বাল্যজীবনে যে মেষ এবং মেষপালকের সম্পর্ক দেখা যায়, খ্রীষ্টানেরা তাহা একেবারেই ফুটাইয়া তুলেন নাই। তৎসম্বন্ধে পরস্পরবিরুদ্ধ কতকগুলি apocryphal কিংবদন্তী আছে মাত্র। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ভিত্তিগঠনে তাহা তেমন আবশ্যক নহে। খ্রীষ্টের অন্ত্যলীলা অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টান তাঁহার ধর্ম্ম রচনা করিয়াছেন; সেখানে খ্রীষ্ট Lamb of God বটে, কিন্তু ইহার অর্থ এই

যে, তিনি বিধাতার কাছে আপনাকে মেষরূপে বলি দিয়াছেন। ইহুদিদের ধর্ম্মানুসারে জাভের মন্দিরে মেষবলি হইত। এও সেই বলিদানের ব্যাপার। এখানে তিনি আপনাকে মানবজাতির নিষ্ক্রয়স্বরূপে বলি দিলেন, এবং তজ্জন্য তিনি মেষরূপী। এখানে তিনি মেষপালক নহেন, স্বয়ং মেষ। Apostle Peterএর ভাষায় খ্রীষ্ট নির্দ্দোষ ও নিষ্পাপ মেষরূপী; তাঁহার পবিত্র শোণিতে মানবের নিষ্ক্রয় হইয়াছে; পাপ হইতে ত্রাণ হইয়াছে। জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে এইরূপ ব্যবস্থা আছে—fore-ordained before the foundation of the world। খ্রীষ্টের এই মেষত্বের সহিত বেদের যজ্ঞের theoryর সম্পর্ক থাকিতে পারে; সেই যজ্ঞের theory আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। বৃন্দাবন-লীলার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। পীটার খ্রীষ্টের অন্ত্যলীলা প্রসঙ্গেই তাঁহাকে Shepherd বলিয়াছেন; মানবরূপী sheep বা মেষগণ দিগ্‌ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হইয়াছিল। খ্রীষ্ট shepherd-রূপে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিলেন। এই shepherd অর্থে পরক্ষণেই বলা হইয়াছে, তিনি Shepherd and Bishop of your souls; এই বিশপের অর্থ overseer বা অধ্যক্ষ; অতএব পালক। খ্রীষ্টকে যে এইরূপে মেষপালক বলা হইল, ইহুদি জাতির প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া তাহার কোনও তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না। গ্রীক-দর্শন হইতেও ইহার মূল তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না। এই ideaটি উহাদের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। এখন প্রশ্ন উঠে, শ্রীকৃষ্ণে গোপালত্ব অর্পণেরই বা তাৎপর্য্য কি?

"একালের প্রত্নতত্ত্ববিশারদ কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান করেন যে, পুরাণে আভীর-জাতীয় রাজার উল্লেখ আছে; যবন, শক, হূণ, পহ্লব, গুর্জ্জরাদি জাতির মত ইহারাও ভারতবর্ষে আগন্তুক জাতি,—বাহির হইতে কোনও সময়ে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ হয়ত ইহাদিগের tribal god কুলদেবতা ছিলেন। ইহারাই এ দেশে ইহাদের দেবতাকে হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে চালাইয়া দিয়াছে। এ theoryর একটা চটক আছে বটে; কিন্তু কোনও নবাগত গোপজাতির নিকট হইতে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ তাহার সর্ব্বপ্রধান দেবতাকে গ্রহণ করিয়াছে, ইহা মনে করাই কঠিন। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্বের প্রাচীনতা যতই হউক, শ্রীকৃষ্ণের প্রাচীনতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। মহাভারতের বর্ত্তমান সংস্করণকে আধুনিক বলিলেও, মূল মহাভারতের প্রাচীনতা সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করেন না;

কৃষ্ণবর্জিত মহাভারত কল্পনারই অগোচর। পাণিনি-সূত্রমধ্যে যখন কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে যখন দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, সে কৃষ্ণের প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে না। ছান্দোগ্য উপনিষদের কৃষ্ণ ঘোর আঙ্গিরস নামক ঋষির নিকট পুরুষযজ্ঞ সম্বন্ধে উপদেশ পাইয়াছিলেন। সেখানে এই যজ্ঞের যে বিবরণ পাওয়া যায়, ভগবদ্গীতার অনেকটা অংশ তাহারই commentary বা ভাষ্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ঐ যজ্ঞ ব্যাপারে মানুষের সমুদয় জীবনটাকে দেবোদ্দিষ্ট যজ্ঞরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। জীবনের কোন্ অংশ প্রাতঃসবন, কোন্ অংশ মাধ্যন্দিন সবন, কোন্ অংশ তৃতীয় সবন, তাহা খুলিয়া বলা হইয়াছে। সমস্ত জীবনটাকে, জীবনের যাবতীয় কর্ম্মকে ত্যাগে পরিণত করিয়া গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ··· তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং—জীবনে যাহা কিছু কর্ম্ম করিবে, আমাকেই অর্পণ করিবে। গীতায় এই তত্ত্ব খুব ফলাইয়া তোলা হইয়াছে; কিন্তু উহা সেই পুরুষযজ্ঞ ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইহাই কৃষ্ণ ঘোর আঙ্গিরস ঋষির নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তান্ত্রিকেরা এ কথাটা গ্রহণ করিয়াছেন,—যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্। 'বোধসার' নামক খাঁটি বৈদান্তিক গ্রন্থের শেষ ভাগে সুখই পরা পূজা, দুঃখই পরা পূজা, রোগ পরা পূজা ইত্যাদি যে কয়টি অপূর্ব্ব বাক্য আছে, তাহার মূল এইখানেই পাওয়া যায়। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বৈষ্ণব ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের তুলনামূলক তাঁহার বহু গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থের শেষ ভাগে 'বোধসারে'র এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন,—বোধ করি, কোনও ধর্ম্মসাহিত্যে ইহার তুলনা নাই। বস্তুতঃ ইহার তুলনা পাওয়া কঠিন। তিনি ইহাকে খাঁটি বৈষ্ণব আদর্শ বলিয়াছেন। কিন্তু গীতার উক্তি সত্ত্বেও একালের সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা ইহাকে চরম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; কেন না, ইহাতে কর্ম্মকে পূজা বলিয়া গ্রহণ করিবার কথা আছে। বৈষ্ণবের চোখে এই পূজাকর্ম্মটা সেবাকর্ম্মের ও প্রীতির তুলনায় অনেকটা হীন। পূজাকর্ম্মে পূজ্য-পূজকের মধ্যে যে ব্যবধান আসে, মধুররসাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণব সে ব্যবধান স্বীকারে কুণ্ঠিত। বস্তুতঃ 'বোধসার' বৈষ্ণবের গ্রন্থ নহে; উহা খাঁটি বেদান্তের গ্রন্থ। সাধারণ গৃহস্থ হিন্দু কিন্তু ইহাকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। গৃহস্থের প্রত্যেক অনুষ্ঠানই এই আদর্শ মনে রাখিয়া সম্পাদন করিতে হয়, এবং

প্রত্যেক ceremonial অনুষ্ঠানই 'এতৎ কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণায় অর্পিতমস্তু' বলিয়া সমাপ্ত করিতে হয়। প্রাতে উঠিয়াই বলিতে হয়, আমি 'ভবদাজ্ঞয়া' এবং 'তব প্রিয়ার্থং' সংসারযাত্রা অনুবর্ত্তন করিতে চাহি।

"ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রে বিষ্ণুর গোপা বিশেষণ রহিয়াছে। এই গোপা শব্দের অর্থ গোপনকর্ত্তা বা রক্ষাকর্ত্তা, এইরূপ বলা হইয়া থাকে। সেই অর্থ ঠিক হইলেও ইহার মধ্যে কোনও রকম pun আছে কি না—অর্থাৎ গোপা অর্থে গোপাল বা গোরক্ষক বুঝায় কি না, ইহা এত কাল পরে বলাই কঠিন। গোপার অর্থ যাহাই হউক, বেদে গো শব্দের অর্থে কোনও গোল নাই। বেদের অর্থ বুঝিতে নিরুক্তকারগণই আমাদের এক মাত্র অবলম্বন। সে-কালে অনেক নিরুক্তকার ছিলেন; কিন্তু আমরা কেবল যাস্কের নিরুক্ত পাইয়াছি, আর সব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাস্কের নিরুক্তের প্রারম্ভে নৈঘণ্টুককাণ্ডে অনেকগুলি বৈদিক শব্দের synonyms দেওয়া আছে। ঐ তালিকার প্রারম্ভেই গো শব্দের একুশটি প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। নিরুক্তের একেবারে আরম্ভেই গো শব্দটি স্থান পাইয়াছে; ইহাতেই বুঝা যায়, বৈদিক সাহিত্যে গো শব্দটি কত উচ্চ স্থান অধিকার করিত। দেখিতে পাই যে, গো শব্দের অর্থে ধেনু, শব্দ, বাণী, বাক্, ভারতী, সরস্বতী, ইড়া, ইত্যাদি একুশটি নাম দিয়া বলা হইতেছে, ইতি একবিংশতি বাঙ্‌নামানি অর্থাৎ এই একুশটি নামের অর্থ বাক্। অতএব গো, এমন কি, ধেনু শব্দের অর্থ যে বাক্ বা শব্দ, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নাই। এই বাক্ বৈদিক ঋষির কল্পনাকে অভিভূত করিয়াছিল। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটি সূক্তের ঋষি বৃহস্পতি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন,—চিত্তের গুহার ভিতরে লুক্কায়িত শরীরহীন ভাবগুলি কিরূপে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বাক্ অর্থাৎ শব্দরূপে প্রকাশ পাইতেছে! এ সূক্তটির তাৎপর্য্য বুঝিলে বেদবিদ্যার অনেক কথা বুঝা যায়।

"এই বাগ্‌দেবতার কথা আমি পূর্ব্বেও আপনাকে অনেক বার বলিয়াছি। দেবীসূক্তে এই বাক্ অম্ভৃণ ঋষির কন্যারূপে কল্পিতা হইয়াছেন; এই বাক্‌ই যে ব্রহ্ম, সেখানে সে কথা স্পষ্টভাবে প্রচারিত হইয়াছে। শব্দ-ব্রহ্মবাদের গোড়া এখানেই ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম এই বাক্‌রূপেই আত্মপ্রকাশ করেন, এবং এই বাক্‌কে অবলম্বন করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করেন। ইহারই নামান্তর গো বা ধেনু। ব্রহ্ম অমৃতস্বরূপ; এই জন্যই বাগ্‌দেবতার

সহিত অমরতার সম্পর্ক। দৃষ্টান্তবাহুল্যের দরকার নাই। বাক্ এবং গো উভয়েই এক। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে উভয়ের স্থান কি?

"শ্রৌত কর্ম্মের মধ্যে দ্বাদশাহযজ্ঞ নামে একটা বড় সোমযজ্ঞ ছিল। প্রজাপতি না কি এই যজ্ঞ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞ বার দিনে সম্পন্ন হইত। ঐ বার দিনের মধ্যে নয় দিনে তিনটি অনুষ্ঠান ছিল; প্রত্যেকটির নাম ত্র্যহ; পর পর তিন দিনে অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া ইহার এই নাম। সংবৎসরসাধ্য সত্রের মধ্যেও এইরূপ ত্র্যহের অনুষ্ঠান অনেক ছিল। এই ত্র্যহ অনুষ্ঠানের মধ্যে দুই দিনের দেবতা যথাক্রমে বাক্ এবং গো; বাক্ এবং গো, একই দেবতার দুই নাম, আরও বহু স্থলে দেখা যায়। আর একটি আখ্যায়িকা উল্লেখযোগ্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গল্প আছে,—সোম এক কালে গন্ধর্ব্বদিগের নিকটে ছিল; দেবতারা সেখান হইতে সোম আনিবার জন্য কুমারী বাগ্‌দেবতাকে প্রেরণ করিলেন। গন্ধর্ব্বেরা অত্যন্ত স্ত্রীকামী। তাহারা বাগ্‌দেবতাকে দেখিয়া তাঁহার হাতে সোম দিল। বাগ্‌দেবতা তাহাদিগকে ভুলাইয়া সোম আনিয়া দেবতাদিগকে দিলেন, এবং নিজেও পলাইয়া আসিলেন। এই ঘটনার অনুকরণে প্রত্যেক সোমযজ্ঞের একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান হইত। এই অনুষ্ঠানের নাম সোমক্রয়। একটা লোক সোমলতা লইয়া যজ্ঞভূমির বাহিরে বসিয়া থাকিত। যজমান ঋত্বিক্‌দের সহিত একটি গাভী লইয়া তাহার কাছে গিয়া বলিতেন,—'এই গাইটি লইয়া তোমরা সোম বিক্রয় কর।' সেই সোম-বিক্রেতা দাম লইয়া খানিকটা দোকানদারি করিত; অবশেষে গাইটি লইয়া সোম দিত। তখন যজমান ও তাহার অনুচরেরা ঠ্যাঙ্গা বাহির করিয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়া ও প্রহার করিয়া গাভীটিকেও ফিরাইয়া আনিত। ঐ সোম-বিক্রেতা গন্ধর্ব্ব; গাভীটি বাগ্‌দেবতা; এবং যজমান দেবগণের স্থানীয়। অতএব গাভীটি বাগ্‌দেবতারই পার্থিব মূর্ত্তি। গন্ধর্ব্ব ঠকিয়া গেল; বাগ্‌দেবতা সোম লইয়া দেবতার কাছে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে ক্রীত সোমলতার রসে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইত। আহুতির পর সেই সোমের শেষ পান করিয়া যজমান ও ঋত্বিক্‌গণ অমর হইতেন। এই বাক্ই শব্দ, শব্দই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই বেদ, ব্রহ্মজ্ঞানের বা বেদের যিনি রক্ষক, তিনি ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; আবার শব্দ বা বেদ হইতে জগৎ সৃষ্ট। আমরা যখন নারায়ণকে প্রণাম করি, তখন বলিয়া থাকি—নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়, ইনি

ব্রহ্মণ্যের দেবতা। পরে বলিয়া থাকি গোব্রাহ্মণহিতায় চ ;—এখানে গো শব্দে গরু এবং ব্রাহ্মণ শব্দে জাতিবাচক ব্রাহ্মণ, এই সঙ্কীর্ণ অর্থে আবদ্ধ থাকার দরকার নাই। এখানে গো=বাক্=বেদ ; এবং ব্রাহ্মণ বেদের বক্তা, ব্যাখ্যাতা এবং রক্ষক। এখানে গো সমুদয় জগতের প্রতিনিধিস্বরূপ, এবং ব্রাহ্মণ সমুদয় জীবের প্রতিনিধিস্বরূপ, এইরূপ ব্যাপক অর্থ গ্রহণে ক্ষতি দেখি না। গো শব্দের নামান্তর পৃথিবী, ইহাও এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে। যাস্কের নিরুক্তে পৃথিবীর নাম গো, ইহাও পাইবেন। শব্দ হইতেই জগতের বা পৃথিবীর সৃষ্টি, ইহা স্মরণ রাখিবেন। জগৎ materialised শব্দ মাত্র। গো-ব্রাহ্মণহিতায় বলিয়া পরক্ষণেই খোলসা করিয়া বলা হইতেছে—জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় ; এদেশে গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা কিরূপে সকল পাতকের উপর স্থান পায়, ইহাও কতক বুঝা যাইবে। আরও দেখিবেন, গোহত্যা আগে ; ব্রহ্মহত্যা পরে।

"গাভী আমাদের দেবতা, ভগবতী। ঋগ্বেদের মন্ত্রেও তাঁহার অঘ্ন্যা অর্থাৎ অহন্তব্যা, এই বিশেষণ দেখিতে পাই। Totemism হইতে এ দেশে গাভীর মাহাত্ম্য বুঝা যায় কি না, সন্দেহ। যে সকল অসভ্য জাতি কোনও একটা জন্তুকে totem বলিয়া গ্রহণ করে, তাহারা সেই জন্তুকে আপনাদের আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকার করে ; আপনাদিগকে তাহার বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয় ; সেই জন্তুকে দেবতা বলিয়া জানে ; সেই জন্তুর অনুকরণে বেশভূষা, আচার পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত করে ; ভক্ষ্য-মধ্যে সেই জন্তুর মাংসকেই বর্জ্জন করে। কেহ বা দেবতার সহিত একত্বপ্রাপ্তির আশায় সেই জন্তুর মাংসই খায়। কিন্তু সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত এই সব আচারের তাৎপর্য্য লোকে ভুলিয়া যায় ; ক্রমে আচারও পরিবর্ত্তিত ও লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে গাভীর ইতিহাস অন্যরূপ। অঘ্ন্যা বিশেষণ থাকিলেও যজ্ঞকার্য্যে বা অতিথিসৎকারে গবালম্ভ নিষিদ্ধ ছিল না। সে দিন পর্য্যন্ত ভবভূতি তাঁহার নাটকের মধ্যে,—যে নাটক জনসাধারণের সমক্ষে অভিনীত হইত, সেই দৃশ্যকাব্যে—বশিষ্ঠ ঋষি বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া বাছুর খাইয়াছিলেন, এই বাক্য বলাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। এখনকার কোনও নাটককার বা অভিনেতা কোনও ঋষির মুখে এমন কথা বসাইলে বিপন্ন হইবেন। বাড়ীতে বর আসিলে তাঁহাকে মধুপর্কের দ্বারা সম্মান করিতে হইত। এই মধুপর্কে গোমাংসের ব্যবস্থা ছিল। নাপিত গাভী আনিয়া এই কার্য্যটা সম্পন্ন

করিত। কালক্রমে এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল। নাপিত বরকে গাই দেখাইয়া ছাড়িয়া দিত, এই প্রথা দাঁড়াইয়া গেল। এখন বিবাহে বর আসিলে নাপিত কেবল গৌর্গৌঃ শব্দ উচ্চারণ করে। তাহার পর বর গাভীটিকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা দেন। গাভীর মাহাত্ম্য এ দেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অসভ্য জাতির মধ্যে যে সকল অনুষ্ঠান totemistic, তাহা সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত এত বিকৃতি ও পরিণতি লাভ করে যে, তাহার মূল আবিষ্কার কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। গাভী কোনও কালে totem ছিল না, ইহা প্রতিপন্ন করিতে কেহ পারিবেন না। তবে আর্য্যজাতির যে শাখার মধ্যে গাভী সম্মান পাইয়া আসিতেছেন, সেই শাখা আপনাকে গাভীর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ সাহিত্য-মধ্যে আছে কি না জানি না। আর্য্যজাতির অন্যান্য শাখা গাভীকে এইরূপ সম্মান দেন নাই। আমরা গাভীকে মাতা ভগবতী বলিয়া থাকি : কিন্তু সেখানে মাতা অর্থে জগন্মাতা, —কেবল আর্য্যজাতির বা বেদপন্থী আর্য্যজাতির মাতা নহেন। আমাদের গো-দেবতা যদিও totemismএর survival হয়, তাহার মূল আবিষ্কার এখন দুঃসাধ্য। বৌদ্ধ ও জৈন কর্তৃক অহিংসাধর্ম্ম প্রচারের পর হইতে যজ্ঞে গোহত্যা নিরাকৃত হইয়াছে, ইহা অনেকটা সত্য ; কিন্তু যজ্ঞে হিংসা এখনও অন্য পশুর পক্ষে রহিয়াছে। পূর্ব্বের মত না থাকিলেও একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই ; বরং বৌদ্ধধর্ম্ম অনার্য্য অনুষ্ঠানগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া অনার্য্য-জাতিদিগকে তুলিতে গিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও পশুহিংসার প্রশ্রয় দিয়া ফেলিয়াছেন। মনে রাখিবেন, একালে বৈদিক ক্রিয়ায় পশুহত্যা নাই বলিলেই হয় ; যাহা আছে, তাহা তান্ত্রিক শক্তি-পূজায় ; এবং নানা public shrine বা পীঠস্থানে। বৈদিক যজ্ঞে পশুর বলিদান হইত,—পশুকে নিজের নিষ্ক্রয়স্বরূপ অর্পণ করিয়া দেবতার সহিত একাত্মতা লাভের উদ্দেশে। তান্ত্রিক ক্রিয়ায় শক্তি-পূজায় পশুর বলিদান হয়—দেবতা প্রসাদনের উদ্দেশে। বৈদিক যজ্ঞের আহুতিতে পশুর রুধির সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয় ; উহা কোনও দেবতাকে দিতে নাই ; উহা রাক্ষসের ভাগ। তান্ত্রিক বলিদানে সমাংস রুধির নিবেদন করিতে হয়। কেন না, দেবী রক্তমাংসবলিপ্রিয়া। হিন্দু তান্ত্রিকতা বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার নিকট কতটা ঋণী, তাহা এখনও সম্যক্ মীমাংসিত হয় নাই। হিন্দুর public shrineগুলির বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক কত নিকট ছিল, তাহার শেষ মীমাংসা হয় নাই। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম

এইরূপ public worship কোনও কালেই সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করিত না; আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলেই উহা বুঝা যায়; বৌদ্ধ বিপ্লবের সময় অগত্যা যেন উহাদিগকে recognise করিতে হইয়াছে। যে সকল অনুষ্ঠানের জন্য আজকাল হিন্দুসমাজ গালি খান, তাহার কতকগুলির জন্য অনুদার হিন্দু দায়ী, আর কতকগুলির জন্য উদারপ্রকৃতি বৌদ্ধ দায়ী, তাহার ঐতিহাসিক বিচারের সময় আসিয়াছে।

"ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে গাভীর মাহাত্ম্য অধিক হইবে এবং গাভী অহন্তব্যা বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা স্বাভাবিক। কৃষিকার্য্যের আনুকূল্যের জন্য গাভী এবং বৃষ উভয়ই এ দেশে এত সম্মান লাভ করিয়াছে, তাহাতে সংশয়ের হেতু নাই। শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য কার্য্য উপলক্ষে বৃষোৎসর্গের যে ব্যবস্থা আছে, তাহার মূল উদ্দেশ্য যে গোজাতির বংশ রক্ষা—breed রক্ষা, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। বৃষোৎসর্গের পদ্ধতির আলোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ঐ কর্ম্মে চারিটি বৎসতরীর সহিত একটি বৃষকে চিহ্নিত করিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। যে মন্ত্রে উৎসর্গ করা হয়, তাহাতে বলা হয়,—ওহে বৃষ, তুমি চতুষ্পাদ ধর্ম্মরূপী। এই চারিটি বৎসতরীর সহিত তোমাকে লোকহিতার্থ আমি ত্যাগ করিলাম; তুমি স্বচ্ছন্দভোজন করিয়া ইহাদের সহিত খেলা করিয়া বেড়াও; তোমাদের উপর আমার আর কোনও স্বত্বাধিকার থাকিল না; দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ ও ভূতগণের পোষণের জন্য তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। কর্ম্মান্তে উপস্থিত জনসাধারণকে অনুরোধ করা হয়,—আমি যে এই বৃষকে ও গাভীগুলিকে ছাড়িয়া দিলাম, কেহ ইহাদের উপর কোনও স্বত্বার্জ্জনের চেষ্টা করিও না, বৃষকে চাষে খাটাইও না; গাভীদিগের দুগ্ধ পান করিও না।—এই বৃষোৎসর্গ বৈদিক ক্রিয়া; বৈদিক কর্ম্মকে ইষ্ট ও পূর্ত্ত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ইহা পূর্ত্তকর্ম্মের অন্তর্গত—public worksএর সামিল; লোকহিত ইহার উদ্দেশ্য; সঙ্গে সঙ্গে নিজের বা পিতৃপুরুষের পারলৌকিক হিতের প্রলোভন থাকে। এই কৃষিপ্রধান দেশে বহু শত বা বহু সহস্র বৎসর হইতে scientific cattle breeding জন্য কোনরূপ ব্যবসায় বা profession না থাকিলেও বিনা আয়োজনে এইরূপ গোবংশ রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। অতি সামান্য গৃহস্থও এখনও বৃষোৎসর্গকে পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করে, এবং ধর্ম্মের ষাঁড়ের গায়ে হাত দিতে কোনও হিন্দু সাহস করে না।

"বৃষকে এখানে চতুষ্পাদ ধর্ম্মরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাহাকে গোপতি, ব্রহ্মণ্যদেব প্রভৃতি জমকাল বিশেষণে সম্বোধন করা হয়। মন্ত্রগুলির আলোচনায় দেখা যায় যে, রুদ্র দেবতার সহিত তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক। বৃষোৎসর্গ অনুষ্ঠানে যজুর্ব্বেদান্তর্গত শতরুদ্রিয় নামক মন্ত্রাবলি পাঠ করিতে হয়; ঐ মন্ত্রসমূহে রুদ্রের স্তুতি ও মাহাত্ম্যকীর্ত্তন আছে। বৃষোৎসর্গে যে হোম হয়, তাহার প্রধান দেবতা রুদ্র; রুদ্রের উদ্দেশে চরু পাক করিয়া আহুতি দেওয়া হয়। কতক চরু পূষা নামক দেবতাকেও দিতে হয়। বেদে রুদ্র ও পূষা, এই দুই দেবতার সহিতই পশুগণের বিশিষ্ট সম্পর্ক দেখা যায়। যাহা হউক, বৃষের সহিত রুদ্রের বা মহাদেবের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। শিবলিঙ্গের পার্শ্বস্থ বৃষকে প্রণাম করিবার সময় বৃষকে ধর্ম্মরূপী বলিয়া এবং অষ্ট মূর্ত্তির অধিষ্ঠান বলিয়া প্রণাম করার রীতি আছে। এই অষ্ট মূর্ত্তি মহাদেবের বিশ্বরূপ বা জগৎরূপ। বিশ্বজগৎ ধর্ম্মকর্ত্তৃক ধৃত আছে বা ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত আছে, ইহা অতি প্রাচীন কল্পনা। মহাদেবের বৃষবাহনত্ব, বৃষধ্বজত্ব বা বৃষ-চিহ্ন সম্বন্ধে যে astronomic মূলের অনুমান করিয়াছি, তাহার সহিত এইরূপ ব্যাখ্যার বিরোধ কল্পনা অনাবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন মূল হইতে যে সকল mythএর কল্পনার উদ্ভব হইয়াছে, পৌরাণিকেরা তাহার সমন্বয় বা synthesis করিয়া একটা নূতন রূপ দিয়াছেন। পুরাণের নানা আখ্যায়িকাতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। আকাশমণ্ডলে Taurus বা বৃষ রাশির পার্শ্বেই মৃগব্যাধ বা রুদ্র তারকার অস্তিত্ব দেখিয়া এইরূপ কল্পনার hint আসিয়াছিল, ইহা অসম্ভব নহে। ঐতিহাসিক মূল যাহাই হউক, ঐরূপ কল্পনা আমাকে অনেকটা অভিভূত করে। কত দিন রাত্রিকালে নীল আকাশের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ঐ কল্পনায় আমি আনন্দ লাভ করিয়াছি। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি, উত্তরে বিষ্ণুপদ বা Poleএর নিকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া Milky Way বা আকাশগঙ্গা Cepheus এবং Cygnus নামক constellation বা তারকামণ্ডল অতিক্রম করিয়া দুই ধারায় বিভক্ত হইয়াছেন; অন্য দিকে Cepheus হইতে Cassiopeia এবং Perseus পার হইয়া Aurega মণ্ডলে পতিত হইতেছেন; সেখানে Capella নামক উজ্জ্বল তারা জ্বলন্ত অগ্নিখণ্ডের মত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে জ্বলিতেছে। আমার মনে হয়, এই Capella তারাই হয়ত এক সময়ে অগ্নিতারা নামে পরিচিত ছিল; এখন অন্য তারার নাম অগ্নি; সম্ভবতঃ আধুনিক জ্যোতিষীরা সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে স্থান সংশোধন করিয়া

নিকটের আর একটি ছোট তারাকে অগ্নি নাম দিয়াছেন। এই গঙ্গাপ্রবাহেই অগ্নির তেজ নিক্ষিপ্ত হইয়া স্কন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল। অদূরে কৃত্তিকাগণ (Pleiades) সেই স্কন্দকে পালন করিয়াছিলেন; মৃগব্যাধ রুদ্র (Sirius) তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার অত্যন্ত সন্দেহ হয় যে, এই স্কন্দদেবতা মঙ্গলগ্রহ ভিন্ন আর কেহই নহেন। আজি পর্য্যন্ত স্কন্দদেবতা মঙ্গলগ্রহের অধিপতি বলিয়া গৃহীত। স্কন্দের ও মঙ্গলের ধ্যানে উভয়ের বিশেষণ প্রায় সমান; পুরাণে মঙ্গল গ্রহের জন্মকথা প্রায় স্কন্দের জন্মকথার অনুরূপ। এই অনুমানে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে আমার মতে স্কন্দোৎপত্তির আখ্যায়িকা মঙ্গল গ্রহের আবিষ্কারবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে; মহাভারতের বনপর্ব্বের অন্তর্গত স্কন্দকথা পড়িয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে। সে কথা যাক। সেখান হইতে আকাশগঙ্গাকে অধোমুখে প্রবহমাণ দেখিতে পাই; প্রজাপতি Orion সেই গঙ্গাবারি কমণ্ডলুমধ্যে গ্রহণ করিতেছেন; ব্রহ্মকমণ্ডলু হইতে বাহির হইলে শুভ্রকান্তি রুদ্র Sirius তাহা জটামধ্যে ধারণ করিতেছেন। হরজটাভ্রষ্ট গঙ্গা সেখান হইতে দক্ষিণে যমলোকে বা পাতালপুরে গিয়া অন্তর্হিত হইতেছেন। এই কল্পনার প্রলোভন সংবরণ দুঃসাধ্য। উজ্জ্বল বৃষ রাশিতে আরোহণ করিয়া রুদ্র Siriusকে যখন আকাশমণ্ডল দীপ্ত করিয়া চলিতে দেখি, অগ্রে পশ্চাতে দেবগণ তারকামূর্ত্তিতে সারি দিয়া চলিতেছেন দেখিতে পাই, তখন কুমারসম্ভবে বর্ণিত "খে খেলগামী তমুবাহ বাহঃ" ইত্যাদি মহাদেবের বরযাত্রা-বিবরণ মনে আসিয়া আমি স্তব্ধ হই। আমাদের নিত্য-পাঠ্য মহিম্নঃস্তোত্রের 'বিয়দ্ব্যাপী তারাগণগুণিতফেনোদ্গমরুচিঃ প্রবাহো বারাং যঃ পৃষতলঘুদৃষ্টঃ শিরসি তে' মহাদেবের এই দিব্যরূপ-বর্ণনাও তখন আমাকে অভিভূত করে।

"গাভীর কথা হইতে বহু দূরে সরিয়া আসিয়াছি। কৃষিপ্রধান দেশে গোজাতির পূজা হইবে, ইহা স্বাভাবিক বটে; গো-মাহাত্ম্যের ইহা প্রধান একটা কারণ হইতে পারে, ইহা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই theory হইতে সমস্ত বুঝা যায় না। মহিষও ত কৃষিকার্য্যে সহায়; মহিষের সাহায্য ত ফেলিবার নহে; তবে মহিষের সে সম্মান নাই কেন? মহিষের প্রতি এত অবিচার ও নিষ্ঠুরতা কেন? মহিষমর্দ্দিনী মহিষের রক্তে প্রসন্না হন কেন? বলা হইবে, মহিষহত্যা অনার্য্য অনুষ্ঠান; উহা কোনরূপে

বেদপন্থী সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। হইতে পারে; কিন্তু কৃষির খাতিরে নিষিদ্ধ হয় নাই কেন?

"মহিষের কথাটা যখন উঠিলই, তখন আরও দু-কথা বলি। মহিষ-বলি কত কালের অনুষ্ঠান বলা কঠিন। পাষাণ-নির্ম্মিত প্রাচীন মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তি বহু স্থানে পাওয়া গিয়াছে। যবদ্বীপেও না কি পাওয়া গিয়াছে। বাণভট্ট-কৃত হর্ষচরিতে (কোন্ স্থানে ঠিক মনে আসিতেছে না,—বোধ করি, বিন্ধ্যাটবীতে প্রবিষ্ট হর্ষ রাজার সম্মুখে উপস্থিত) শবরের বর্ণনায়—'মহিষাণাং মহানবমী-মহোৎসবমিব' এইরূপ একটা বিশেষণ আছে। সুবন্ধুর বাসবদত্তা কাব্যে কুসুমপুর (পাটলীপুত্র) নগরের কাত্যায়নী দেবীর বিশেষণ 'শুম্ভনিশুম্ভ-মহাবনদাবজ্বালা' ও 'মহিষমহাসুরগিরিবজ্রসারধারা' দেখিয়াছি মনে হইতেছে। মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণের চণ্ডীমাহাত্ম্য অবশ্যই ইহার মূল। চণ্ডীতে যে দেবী মহিষ বধ করিয়াছিলেন, তিনি যাবতীয় দেবতার তেজঃসমষ্টিরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তিনি ভগবতী দুর্গা, ইহাই ধরা হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতের বনপর্ব্বে স্কন্দোৎপত্তির কথা খুলিয়া দেখুন। স্কন্দ কোন্ অসুরকে বধ করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে সকলেই বলিবে—তারকাসুর। কিন্তু মহাভারতের উপাখ্যানে তারকাসুরের নাম নাই, মহিষাসুর আছে। এবং তাহাকে বধ করিলেন স্কন্দ; ভগবতী বধ করেন নাই। এ কি ব্যাপার? স্কন্দ কর্ত্তৃক মহিষবধের আখ্যান এক কালে চলিত ছিল সন্দেহ নাই। এই মহিষও কি রাশিচক্রের Taurus বা বৃষ রাশি? স্কন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল আকাশগঙ্গার তীরে কৃত্তিকা নক্ষত্রের নিকটে; সে ত বৃষ রাশিরই অন্তর্গত। আমার পূর্ব্ব অনুমানে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে বলিব, মঙ্গল গ্রহের আবিষ্কারকালে দেখা গিয়াছিল, তিনি আবির্ভূত হইয়াই বৃষকে আক্রমণ করিলেন। দুইটা জ্যোতিষ্কের একত্র অবস্থানকে জ্যোতিষের পরিভাষায় যুদ্ধ বলে; দুইটা Planetএর conjunctionএর নাম গ্রহযুদ্ধ। এও কি সেই যুদ্ধ ব্যাপার? মহিষাসুর ও তারকাসুর হয়ত অভিন্ন; তারক ও তারকা একই শব্দ—কিঞ্চিৎ লিঙ্গভেদ আছে মাত্র। তাহা হইলে মহিষ তারকা মাত্র, বা একটা constellationএর নাম। মহিষকে Taurus ধরিলে যমের মহিষবাহনত্বও কতকটা বুঝা যাইতে পারে। বৃষ রাশিতে যখন বিষুবসংক্রমণ হইত, তখন এই বৃষের পরেই যমলোক বা পিতৃলোক অর্থাৎ রবিমার্গের দক্ষিণার্দ্ধ আরম্ভ হইত।

"এই অনুমানে প্রধান আপত্তি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে, অতি প্রাচীন সাহিত্যে মেষ বৃষাদি রাশিগণের নাম নাই; নক্ষত্রচক্র আছে, রাশিচক্র নাই। যে সকল জ্যোতিষ গ্রন্থে রাশিচক্রের উল্লেখ আছে, তাহাতে যবনের অর্থাৎ গ্রীকের প্রভাব স্পষ্ট বিদ্যমান। রামায়ণাদিতে যেখানে রাশির নাম আছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিলে উত্তর দেওয়া কঠিন হয়। উত্তর দিতে গেলে একটা common source খুঁজিতে হয়, কিন্তু তাহাও foreign source হইয়া দাঁড়ায়। বিস্ময় এই, মহাভারতের উপাখ্যান পড়িলে যেন বোধ হয়, এই স্কন্দ দেবতাটি কোনও বহির্দেশ হইতে আসিয়া জোর করিয়া আমাদের pantheonএ আসন লইয়াছেন; ইঁহার আবির্ভাবে ইন্দ্র ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বজ্রপ্রহারে স্কন্দকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; বজ্র ব্যর্থ হইলে শেষে সন্ধি করিয়া তাঁহাকে দেবসেনাপতি করিয়া লইলেন। দেবতাদের প্রার্থনামতে হরগৌরীর বিবাহফলে এই সেনাপতির জন্ম হইল,—এই সর্ব্বজনবিদিত কাহিনী মহাভারতে নাই। স্কন্দ বড় ক্রুর দেবতা; তাঁহার অনুচর-অনুচরীরা কেবলই উৎপাত করিত, ব্যাধি জন্মাইত, ছেলে খাইত। স্কন্দ যে গ্রহের অধিষ্ঠাতা, সেই মঙ্গল গ্রহ আজিও ক্রুর গ্রহ। আবিষ্কারকালে তিনি হয়ত সূর্য্যের উল্টা দিকে oppositionএ ছিলেন, এবং সেই জন্য অতি উজ্জ্বল ছিলেন; সেই সময়ে তিনি বক্রগতিতে উল্টা পথে চলিতেন বলিয়া কি তাঁহার ক্রুরত্ব? পারসীকদের মিথ্র দেবতার কথা অনেক বার বলিয়াছি; য়ুরোপে বহু স্থানে তাঁহার যে মূর্ত্তি আবিষ্কৃত করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, কোনও দেব বা দেবী বৃষহত্যা করিতেছেন। অনেকে অনুমান করেন, মিথ্র কর্ত্তৃক এই বৃষহত্যা সূর্য্যের বৃষ রাশিতে সংক্রমণজ্ঞাপক। মিথ্রের সহিত স্কন্দের, এবং শেষ পর্য্যন্ত স্কন্দের নূতন মাতা মহিষমর্দ্দিনীর কোনও সম্পর্ক আছে কি? দেবগণের সমবেত শক্তি স্কন্দকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিলেন, এবং সেই শক্তিরূপিণী দেবী স্কন্দের পালিকা মাতারূপে অবশেষে স্কন্দের প্রধান কীর্ত্তিও আত্মসাৎ করিলেন না কি?

"গাভীতে ফিরিয়া আসা যাক। হিন্দুয়ানির লক্ষণ কি, কাহাকে হিন্দু বলিব না বলিব, এই প্রশ্ন লইয়া কিছু দিন পূর্ব্বে আলোচনা হইয়াছিল। কোনও doctrine ধরিয়া হিন্দুর একতা নাই; এ বিষয়ে হিন্দু একেবারে

স্বাধীন। Practice বা আচার-অনুষ্ঠান লইয়া যাহা কিছু ঐক্য আছে, তাহাও দেশভেদে ও কালভেদে এত বিভিন্ন যে, এমন একটা আচার-অনুষ্ঠান বাহির করা কঠিন, যাহা সকল হিন্দু মানিয়া চলিতেছে। যদি এরূপ কোনও লক্ষণ বাহির করিতে হয়, তাহা গো-সম্পর্কে। গরুর প্রতি সম্মানে সকল হিন্দু এক; গোহত্যা ও গোমাংস-ভোজনে হিন্দু যতটা আঘাত পায়, দেবমন্দির ধ্বংসে ও দেবমূর্ত্তির ধ্বংসেও ততটা পায় না। এ বিষয়ে শাক্ত শৈব বৈষ্ণব, এমন কি, শিখ জৈন বৌদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই এক। বাঙ্গালী পাঞ্জাবী তেলাঙ্গীতে কোনও ভেদ নাই। বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত সমাজ এইটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। বরং উত্তরোত্তর এই ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। বেদের গাভী রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্য-গণের স্বসা; পুরাণে তিনি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী, মহাদেবের গৌরী। বেদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে ভগবতী। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গো—বাগ্‌দেবতা, অতএব ব্রহ্মস্বরূপিণী; কেন না, বাক্ = ব্রহ্ম। বাক্ = ব্রহ্ম, এই তত্ত্বের উপর বেদপন্থী সমাজের ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীতে এত জীবজন্তু থাকিতে গরুকেই বাগ্‌দেবতার symbolরূপে গ্রহণ করা হইল কেন? উত্তরে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—ইহা আরও পুরাতন কালের totemismএর survival, অথবা Max Mullerএর mythology সম্বন্ধে theory আশ্রয় করিয়া বলিতে পারেন, ইহা confusion of meaning of words হইতে উৎপন্ন;—অর্থাৎ ঘটনা-ক্রমে গো শব্দে বাক্য বুঝাইত, গরুও বুঝাইত, এই accident হইতে গাভী বাগ্‌দেবতার symbol হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মীমাংসা করিতে পারিব না।

"বেদ-মধ্যেই পাইবেন, গাভীকে ইড়া, সরস্বতী, ভারতী বলিয়া সম্বোধন করা হইতেছে; ভারতী এবং সরস্বতী আজ পর্য্যন্ত বাগ্‌দেবতার নামান্তররূপে স্বীকৃত হয়েন। ইড়া দেবতাকে এ-কালের হিন্দুরা ভুলিয়া গিয়াছেন। ইড়া নামে যে এক জন দেবতা ছিলেন, এ-কালের পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরাও তাহা বলিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। ইড়া,—ভারতী ও সরস্বতীর নামান্তর; অতএব ইনিও বাগ্‌দেবতা। ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যে কতকগুলি সূক্তের নাম আপ্রীসূক্ত; সমস্ত সংহিতার মধ্যে এই সূক্তগুলি ছড়াইয়া আছে। প্রত্যেক মণ্ডলেই এক বা একাধিক আপ্রীসূক্ত রহিয়াছে; বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বামদেব প্রভৃতি বড় বড় ঋষিরা সকলেই এক-একটি আপ্রীসূক্ত প্রচার করিয়া

গিয়াছেন। যজমান যজ্ঞকালে আপন আপন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষির আপ্রীসূক্ত ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেন। অন্যান্য মন্ত্রের বিনিয়োগে এ রকম বাঁধাবাঁধি ছিল না। আপ্রীমন্ত্রগুলির বিশিষ্টতা ইহাতেই বুঝা যাইতেছে। আপ্রীয়ন্তে অনয়া ঋচা দেবাঃ,—দেবগণকে এতদ্দ্বারা প্রীত করা হয়, এই অর্থে ঋক্ মন্ত্রের নাম আপ্রীমন্ত্র ; প্রত্যেক আপ্রীসূক্তে এগারটি করিয়া মন্ত্র আছে। প্রধান যাগের পূর্ব্বে এগার জন দেবতাকে এই আপ্রীমন্ত্র দ্বারা আহুতি দিয়া প্রীত করা হইত। এই এগার জনের অধিকাংশকেই আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। ইঁহাদের নাম নরাশংস, তনূনপাৎ, দ্বুরঃ, উষাসানক্তা ইত্যাদি। এই এগার জনের মধ্যে এক জনের তিন নাম,—ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী ; ইঁহারা একে তিন, তিনে এক। একই আপ্রীমন্ত্রে উদ্দিষ্ট হইলেও ইঁহাদিগকে তিস্রঃ দেব্যঃ বলা হয়। ঋগ্বেদে ইঁহারা অত্যন্ত পরিচিত দেবতা। ইঁহারা বাগ্‌দেবতা হইতে অভিন্ন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, সরস্বতী নদী কালে দেবত্ব পাইয়া এই সরস্বতী দেবতায় পরিণত হইয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব নহে। সরস্বতী-তীরেই বৈদিক সমাজতন্ত্র ও কর্ম্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই নদীই বাগ্‌দেবতার বা বেদের মূর্ত্তিরূপে গৃহীত হইয়া থাকিতে পারেন। কুরুপাঞ্চালগণ সে-কালে এবং তাহার পরবর্ত্তী কালে বেদপন্থী সমাজের প্রধান পুরুষ ছিলেন। কুরু-বংশীয় ভরত রাজা দিগ্বিজয় করিয়া কৌরবদের আধিপত্য বহু দূর বিস্তার করেন, ইহার প্রমাণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই রহিয়াছে। এই ভরতের সহিত আমাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ; এই ভরত হইতেই ভারতবর্ষ এবং মহাভারত নাম হইয়াছে। এই ভরত-বংশের কুলদেবতাই হয়ত ভারতী নামে গৃহীতা হইয়া থাকিবেন। বাকী থাকেন ইড়া। ভরত-বংশের আদি অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা ইড়াকে পাই। এই ইড়ার পুত্র পুরূরবাকে (বেদে যিনি ঐড় পুরূরবা) ভরত-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ধরা হয়। হইতে পারে, ইড়া mythical figure ; তিনিও ভরত-বংশের কুলদেবতারূপে ভারতীর সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পিতা হইয়া থাকিতে পারেন। ঐতিহাসিক মূল যাহাই হউক, পরবর্ত্তী কালে এই তিন দেবতা বাগ্‌দেবতারই মূর্ত্তিভেদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। আরও দেখা যায় যে, গো তাঁহাদের সকলেরই symbol। যে গাভী দিয়া -সোম ক্রয় করা হইত, সোম ক্রয়ের পর সেই গাভীর পায়ের খুর-চিহ্নে এক খণ্ড সোনা রাখিয়া একটা আহুতি দেওয়া হইত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিবেন, যে ঋক্‌মন্ত্রে

আহুতি দেওয়া হইত, তাহাতে গাভীর ঐ পা ইড়ায়াঃ পদম্ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। অতএব ইড়া = বাক্ = গো।

"আপ্রীসূক্তের উল্লিখিত সরস্বতী ইড়া ভারতীর মধ্যে, সরস্বতীর ও ভারতীর নাম এখনও বজায় আছে; কিন্তু ইড়াকে কেহ চেনে না। অথচ বেদের মধ্যে ইঁহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাওয়া যায়। সোমযজ্ঞে যে গাভী দিয়া সোম ক্রয় করিতে হইত, সেই গাভীর নাম ইড়া। বাগ্‌দেবতা সোম আনয়ন করিয়া দেবগণকে অমরত্ব দিয়াছিলেন; অতএব ইড়াও অমরত্ব-দায়িনী। সে-কালে যজ্ঞ মাত্রেই ইড়াভক্ষণ নামে একটা অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইত। হবিঃশেষ ভক্ষণ না করিলে কোনও যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দেবতাকে আহুতি দেওয়ার পর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, যজমান সেটুকু ভক্ষণ করিলে দেবতার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়েন। সে-কালে প্রত্যেক পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় দর্শ ও পূর্ণমাস নামে দুইটি যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে হইত। যজমানকে ইহা যাবজ্জীবন অনুষ্ঠান করিতে হইত, নহিলে প্রত্যবায় হইত। এই দুই যজ্ঞে যে দ্রব্য আহুতি দেওয়া হইত, তাহার নাম পুরোডাশ। অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ জুহূ নামক কাঠের হাতাতে ঐ পুরোডাশ একখানা লইতেন; তাহাকে ঘৃতসিক্ত করিয়া এবং কাটিয়া তাহার এক খণ্ড আহবনীয় নামক অগ্নিতে দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিতেন; অবশিষ্ট যেটুকু থাকিত, তাহা কয়েক খণ্ডে টুকরা টুকরা করা হইত। সেই অংশগুলি হবিঃশেষ। উহার মধ্যে যেটুকু প্রধান খণ্ড, সেই খণ্ডের নাম ইড়া। এই খণ্ড ভক্ষণের সময় একটু অনুষ্ঠানবাহুল্য ছিল। বেদীর উপরে কতকগুলি যজ্ঞপাত্র সাজান থাকিত; তাহার মধ্যে একটার নাম ছিল ইড়াপাত্র। পুরোডাশের ইড়া নামক খণ্ডটুকু সেই পাত্রে অধ্বর্য্যু গ্রহণ করিতেন। হোতা নামক ঋত্বিক্ কতকগুলা ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইড়া নামক দেবতাকে আহ্বান করিতেন। এই আহ্বানকর্ম্মের নাম ইড়োপাহ্বান। এই ক্রিয়ার পর অধ্বর্য্যু, হোতা, অগ্নীৎ এবং ব্রহ্মা, এই চারি জন ঋত্বিকের সঙ্গে একত্র মিলিয়া যজমান ঐ ইড়া ভক্ষণ করিতেন। এই ইড়া ভক্ষণে যজমানের সহিত দেবতার একত্ব সাধিত হইত। দর্শ ও পূর্ণমাস ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় যজ্ঞে ইড়া ভক্ষণ না করিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইত না। অতএব ইড়াই দেবত্বদায়িনী বা অমরত্বদায়িনী। যে কোনও দেবতার উদ্দেশেই আহুতি হউক না, অন্তে ইড়া ভক্ষণ করিতেই হইত। কেন

না, দেবতা মাত্রই ইড়ার মূর্ত্তিভেদ ; দেবতা মাত্রই শব্দরূপী ; দৈবতা মাত্রই বাগ্‌দেবতার প্রকাশ। ইড়া ভক্ষণে সকল দেবতার সহিতই একাত্মতা ঘটিত।

"খ্রীষ্টানের Eucharistএর কথা আগে বলিয়াছি। এই Eucharist এবং ইড়া একই জিনিষ। খ্রীষ্ট আপনাকে যজ্ঞীয় পশুরূপে আহুতি দিয়াছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের সকল খ্রীষ্টান যাজক সেই যজ্ঞানুষ্ঠানে বাধ্য। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের ইহাই সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান ও holiest mystery। মন্ত্রপূত রুটি খ্রীষ্টের মাংসে পরিণত হয় ; যজমানেরা সেই রুটিখণ্ড, অর্থাৎ খ্রীষ্টের মাংস ভক্ষণ করিলে খ্রীষ্টের সহিত—অতএব ঈশ্বরের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়েন, এবং অমরতা অর্থাৎ immortality লাভ করেন। ঐ রুটির নাম Eucharist। ইহা বেদের ইড়া হইতে অভিন্ন। Eucharist রুটি bread or water ; ইড়া বা পুরোডাশ-খণ্ডও যবের বা চাউলের রুটি। উভয়ই যজমানের নিজের দেহের পরিবর্ত্তে দেওয়া হয় ; উভয়েরই এক তাৎপর্য্য। খ্রীষ্টানেরা মনে করেন, এই Eucharist ভক্ষণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। আজকাল মানবতত্ত্ববিদেরা দেখিয়াছেন যে, এ রকম অনুষ্ঠান অন্যান্য জাতির মধ্যেও আছে। খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের সমকালে পারসীকদের মিথ্রপূজায় এইরূপ হবিঃশেষ ভক্ষণ প্রধান অঙ্গ ছিল। রোমক সাম্রাজ্যের প্রথম অবস্থায় সমস্ত Empireএ, এমন কি, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত মিথ্রপূজা প্রসার লাভ করিয়াছিল। সে-কালের খ্রীষ্টান আচার্য্যেরা মিথ্রপূজার মধ্যে এই অনুষ্ঠানের প্রাধান্য দেখিয়া বলিতেন যে, নিশ্চয়ই ইহা শয়তানের কারসাজি ; শয়তান কেবল লোককে ঠকাইবার জন্য খ্রীষ্টীয় সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান এইরূপে অনুকরণ করিয়া মিথ্রপূজার মধ্যে ঢুকাইয়াছে। মিথ্রপূজা খ্রীষ্টের জন্মের বহু শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই পারস্য-সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল। ইহুদিদিগের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের যখন কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তখন ঋণগ্রহণের কথা তুলিলে খ্রীষ্টানেরা মিথ্রপূজার নিকট ঋণী বলিতে হয়। আবেস্তাপন্থী পারসীক ও বেদপন্থী আর্য্য অতি প্রাচীন কালে এক জাতি কিংবা এক জাতির দুই শাখা ছিল। অগ্নিতে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং সেই যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণ ইঁহাদের উভয়েরই সাধারণ অনুষ্ঠান ছিল। পারসীকদের মিথ্র ও বেদের মিত্র যে এক দেবতা, সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ করেন না। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, খ্রীষ্টের জন্মের বহু শত, হয়ত বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইড়াভক্ষণ অনুষ্ঠান আর্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

"সম্প্রতি আমাদের দেশে অধিকাংশ শ্রৌত যজ্ঞ প্রায়ই লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু বহু স্মার্ত্ত যজ্ঞ এখনও ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। ইড়াভক্ষণ নামটা এখন হয়ত অনেকে জানেন না ; কিন্তু হবিঃশেষ ভক্ষণ স্মার্ত্ত যজ্ঞেও করিতে হয়, ইহা সকলেই জানেন। এই ইড়াভক্ষণ বা Eucharist ভক্ষণ আবিষ্কারের জন্য কাহারও প্যালেষ্টাইনে যাওয়া আবশ্যক ছিল বোধ হয় না।

"এই যে বাগ্‌দেবতা, যাঁহার নামান্তর শব্দ অথবা ইড়া অথবা গো, ইনি এক হিসাবে বেদপন্থীর সর্ব্বপ্রধান দেবতা। ইন্দ্রাদি দেবতার ত কথাই নাই ; বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাকেও যেন অনেক সময়ে ইহার নিকট খাটো বলিয়া মনে হয়। এই দেবতাটির তত্ত্ব অনুসন্ধান না করিলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গোড়ার ও শেষের কথা, ঋগ্বেদের সময় হইতে পুরাণ ও তন্ত্রের সময় পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সমস্ত ইতিহাসটা একেবারে বুঝা যাইবে না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড সমস্তই এই দেবতাকে অবলম্বন করিয়া, এবং এই দেবতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি কখনও দিন পাই ত সে কথা স্পষ্ট করিয়া ভবিষ্যতে বলিব। গো নামক পশু সেই বাগ্‌দেবতার প্রতিরূপ বা symbol। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেদের মধ্যে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে ; বেদের মধ্যেই ইহার অঘ্ন্যা বিশেষণ পাওয়া যায়, ঋগ্বেদের মন্ত্রের মধ্যেই ইহার ভগবতী বিশেষণও পাইয়াছি। যাস্কের নিরুক্তে বাগ্‌দেবতার যে একুশটি নাম আছে, তাহার মধ্যে ইহার অন্যতম নাম 'গৌরী' দেওয়া হইয়াছে ; এই গৌরী যে উত্তর কালে উপনিষদের উমা হৈমবতীর সহিত মিলিত হইয়া আমাদের ভগবতী গৌরীতে পরিণত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহের কারণ দেখি না। উপনিষদের সেই উমা হৈমবতী ইন্দ্রাদি দেবতাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়াছিলেন। ইনি স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যা। সেখানে হৈমবতী অর্থ কেহ কেহ করেন, হেমালঙ্কার-ভূষিতা ; এখন সকলেই বলিবেন, হিমবানের কন্যা। কেবল গৌরী কেন, গৌরীর মাতা মেনা বা মেনকার নামও নিরুক্ত-মধ্যে একই স্থানে পাইবেন।

"এখন শ্রীকৃষ্ণকে কেন গোগোপগোপিকাকান্ত বলা হয়, কেন তাঁহার স্থানকে গোলোক বলা হয়, তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই গোলোক বাঙ্ময় লোক ; বেদমতে এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাক্ অর্থাৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন। বিশ্বজগৎ-মধ্যে যাহা কিছু আছে, অর্থাৎ যাহা কিছু প্রত্যক্ষ-গোচর বা perceptionএর বিষয়, এমন কি, যাহা কিছু কল্পনাগোচর বা

conceptionএর বিষয়, সে সমস্তই শব্দ হইতে জন্মিয়াছে। এই শব্দই বেদ, এবং এই শব্দই বেদের মন্ত্র। বেদপন্থীরা বলেন—দেবতা মাত্রই শব্দাত্মক বা মন্ত্রাত্মক; অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু আছে, যে কিছু দ্রব্য একটা 'রূপ' লইয়া ইন্দ্রিয়গোচর হয় বা হইতে পারে, যে কোনও দ্রব্যের 'নাম' দেওয়া যাইতে পারে, সে সমস্তই বেদপন্থীর দেবতা; এবং সেই দেবতা শব্দাত্মক। বেদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সমস্ত দার্শনিক সাহিত্য বিশ্ব-জগৎকে নামরূপাত্মক বলিয়া মানিয়া লইয়া আসিয়াছে; এমন কি, নাস্তিক বৌদ্ধ পর্য্যন্ত ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহাই দর্শনশাস্ত্রের গোড়ার কথা। পাশ্চাত্য দেশেও দার্শনিক পণ্ডিতেরা প্লেটোর সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই প্রতীয়মান জগৎটা real, না conceptual, না nominal, ইহা লইয়া বিবাদ করিয়া আসিতেছেন। এক দিকে nominalist ও conceptualist, অন্য দিকে realist;—ইহাদিগের ঝগড়া আজ পর্য্যন্ত মিটে নাই। সে দার্শনিক তর্কে এখন প্রবেশ করিতে চাহি না। বেদপন্থীর ভিত্তি nominalismএর উপর প্রতিষ্ঠিত, আমার এ ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। সমস্ত existenceটা, উহার ইন্দ্রিয়গোচর এবং অতীন্দ্রিয় উভয় অংশই শব্দে নির্ম্মিত নাম মাত্র, ঋগ্বেদ-সংহিতার ভিতরে এই তত্ত্বটা আমি অত্যন্ত উজ্জ্বল ও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি। পূর্ব্বে আমি আপনাকে বলিয়াছি, এবং আমার 'কর্ম্মকথা'র অন্তর্গত "যজ্ঞ" নামক প্রবন্ধে ইহা স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, অম্ভৃণঋষিকন্যা বাগ্‌দেবতা কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও প্রচারিত দেবীসূক্তের তাৎপর্য্যই এই। ঐ সূক্তে ঋষিকন্যা বাক্ বলিতেছেন—আমিই ব্রহ্ম, অর্থাৎ শব্দই ব্রহ্ম, শব্দ হইতে সমস্ত জগতের উৎপত্তি। ব্রহ্ম যখন আপনাকে জগৎরূপে প্রকাশ করিলেন, সেই প্রকাশকে শব্দ আখ্যা দেওয়া হইল কেন, এ সম্বন্ধে আমার অনেক কথা বলিবার আছে, সময় পাইলে বলিব। বিস্ময়ের কথা এই যে, গ্রীক দর্শনেও ঈশ্বরের এই আত্মপ্রকাশকে Logos অর্থাৎ speech বা শব্দ নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহুদিদের বাইবেলে Genesisএর আরম্ভেও ঈশ্বরের শব্দ হইতে জগতের উৎপত্তি, এ কথা স্বীকার করা হইয়াছে—God said, let there be light and there was light; এখানে স্পষ্টতঃ ঈশ্বরের বাক্য হইতেই light, এবং light হইতে জগতের উৎপত্তি মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহুদিরা এ তত্ত্বটা তত অধিক ফলাইতে পারে নাই। খ্রীষ্টানের বাইবেলে চতুর্থ অর্থাৎ St. John's

Gospelএ এই তত্ত্বটাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ভিত্তি করা হইয়াছে ; স্পষ্টই বলা হইয়াছে, আদিতে শব্দ ছিলেন, শব্দ ঈশ্বরে ছিলেন, এবং শব্দই ঈশ্বর ছিলেন। খ্রীষ্টীয় বাইবেলের এই তত্ত্ব Neoplatonistদিগের নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে। Neoplatonistদিগের অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রীক দর্শনেও এই তত্ত্বটা পাওয়া যায়। বিস্ময় এই যে, গ্রীক-দর্শনের এই Logos এক দিকে যেমন Word, Speech বা শব্দ, অন্য দিকে সেইরূপ ইহা Sophia বা Reason or Wisdom অথবা ব্রহ্মবিদ্যা বা প্রজ্ঞা। কে কাহার নিকট ধার করিয়াছে, ইহার নির্দ্দেশ আপাততঃ দুঃসাধ্য। কিন্তু গ্রীক-দর্শনের জন্মের বহু পূর্ব্বে ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যে এই তত্ত্বকে অতি স্পষ্টভাবে ফুটান হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহারা মনে করেন, পিথাগোরস ভারতবর্ষ হইতে কএকটি নূতন দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা একটা ভাবিবার কথা।

"এখন গোলোকের অর্থ কি, তাহা বোধ হয় স্পষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে জাত এই জগৎই গোলোক ; প্রত্যক্ষ এবং অতীন্দ্রিয় সমস্ত জগৎই ইহার অন্তর্গত। প্রত্যেক দ্রব্য, অর্থাৎ প্রত্যেক দেবতা এবং প্রত্যেক জীব,—গোরূপী। এই তত্ত্বের উপর যখন ব্রহ্ম ও জীবের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া একটা ধর্ম্ম গঠিত করা হইয়াছে, তখন অচেতন জড়কে বাদ দিয়া প্রত্যেক চেতন জীবকে গোরূপী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই জীবকে গো বলা হইতেছে, এবং গোপও বলা হইতেছে ; এবং যিনি ভগবান্, তাঁহাকে গো ও গোপের পতি বলা হইতেছে। তিনি নিজেই গোপ, এ কথাও বলা হইয়াছে। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, এখানে কোনও একটা confusion বা গণ্ডগোল আছে ; কিন্তু ধীর ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সে রকম কিছুই নাই। কারণ, ইহা খাঁটি বেদান্ত। বেদান্ত-মতে— আমি বলিব, বেদের মতে,—

ব্রহ্ম = অহং = জীব।

পুনশ্চ—সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম ; অতএব ব্রহ্ম = জগৎ।

পুনশ্চ বেদ-মতে বাক্ = গো ; পুনশ্চ দেবীসূক্ত অনুসারে, অহং = বাক্।

যিনি জীব, তিনিই ব্রহ্ম, আবার তিনিই বাক্, অতএব তিনিই গো, এবং তিনিই গোপ ; সবই এক জিনিষেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। বেদান্তের এই চরম কথাটি religion হইতে পারে না। Religion জিনিষটা ব্যাবহারিক।

বেদান্ত অনুসারে—আমি এক মাত্র জীব, এবং আমিই ব্রহ্ম ; যেখানে এইরূপ সম্পূর্ণ অভেদ, সেখানে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ আদান-প্রদান, পূজ্য-পূজক বা সেব্য-সেবক সম্পর্ক থাকিতে পারে না। 'বোধসার' নামক গ্রন্থের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি ; তাহাতে এ সম্বন্ধে কএকটি বড় সুন্দর কথা আছে। গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন,—আমি (জীব) দেবতার (ব্রহ্মের) পূজা করিতে বসিয়া বড়ই ফাঁপরে পড়িয়াছি ; কেন না, দেবতার পরিচয় না জানিলে পূজা অসম্পূর্ণ ও নিষ্ফল হয়, কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে দেবতার পরিচয় পাই—অর্থাৎ আমাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারি, এবং আমা ভিন্ন আর কিছু নাই বুঝিতে পারি, তখন পূজার উপকরণই আর কিছু থাকে না। যাঁহাকে পূজা করিব, তাঁহাকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখিতে পাই না ; এবং যে পূজা করিবে, সেই যজমানই কোথায় পলাইয়া যায় !—অতএব এই তত্ত্বের উপর কোনরূপ religion, কোনরূপ ব্যাবহারিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা চলে না। কাজেই কোনও religionএ উপস্থিত হইতে হইলে আমার মত অন্যান্য বহু জীবের কল্পনা করিতে হয় ; এবং সেই সকল জীবের উপরে ঈশ্বর কল্পনা করিয়া তাঁহার সহিত সেব্য-সেবক, পূজ্য-পূজক সম্পর্ক পাতাইতে হয়। এই সম্পর্ক রাখিতে হইলে ভগবান্‌কে শব্দের সহিত অভিন্ন না বলিয়া শব্দের স্রষ্টা, শব্দের রক্ষাকর্ত্তা, শব্দের পতিরূপে বর্ণন করিতে হয়। এই জন্য ভগবান্ স্বয়ং গোপাল,—গোরূপী শব্দের পালনকর্ত্তা, সঙ্কীর্ণ অর্থে—গোরূপী বেদের রক্ষাকর্ত্তা ; ব্যাপক অর্থে—গোরূপী জগতের পালনকর্ত্তা ও বিধাতা। মনে রাখিবেন, শব্দ ও জগৎ একই বস্তু ; ব্রহ্ম শব্দরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। শব্দ হইতেই জগৎ নির্ম্মিত, ইহাও পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। সৃষ্টি 'করিয়াছেন' না বলিয়া সৃষ্টি 'করেন' বলিলাম, কেন না, এখানে অতীত ক্রিয়ার কোনও বিশেষ সার্থকতা নাই। সৃষ্টিক্রিয়া out of time—কোনও নির্দ্দিষ্ট কালে উহা ঘটে নাই, আমাদের ভাষায় কুলায় না বলিয়া অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহার করিতে হয়। শব্দই বলুন আর জগৎই বলুন, ব্যবহারতঃ উহা অনাদি ও অনশ্বর ; উহার প্রলয় হইতে পারে—স্থূল হইতে সূক্ষ্ম বা ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত অবস্থায় পরিণতি হইতে পারে ; সেও ব্যাবহারিক পরিণতি। কিন্তু ব্যবহারতঃও উহার ধ্বংস নাই। প্রলয়কালে ভগবান্ উহাকে রক্ষা করেন ও পুনরুদ্ধার করেন। ইহা তাঁহার ব্যাবহারিক লীলা বা খেয়াল। পুরাণে বলা হইয়াছে, ভগবান্

মীনরূপে প্রলয়পয়োধিজলে বেদকে ধারণ করিয়াছিলেন—জগৎকেও রক্ষা করিয়াছিলেন ; কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠে তুলিয়াছিলেন এবং এখনও পৃষ্ঠে রাখিয়াছেন ; বরাহরূপে প্রলয়জলমগ্ন জগৎকে দংষ্ট্রার উপরে রাখিয়াছিলেন।

"মীন অবতারের মূল শতপথ ব্রাহ্মণে পাই। Deluge প্রসঙ্গে মনুর সম্পর্কে ইহার উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে বরাহকে পাওয়া যায়। প্রজাপতি বরাহরূপে জলমধ্য হইতে পৃথিবী তুলিয়াছিলেন।

"উত্তর কালে synthesis কর্ত্তা ও exegesis কর্ত্তা ব্রাহ্মণের হাতে পড়িয়া উহা সৃষ্টিতত্ত্বের realistic বিবরণে পরিণত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বরাহ অবতারের কথা তেমন ফোটে নাই। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই। "উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা" এই পরিচিত মন্ত্র তৈত্তরীয় আরণ্যকে পাওয়া যায়। উহা পৃথিবীর বিশেষণ ; মনে রাখিবেন, পৃথিবী বা জগৎ, শব্দের সহিত অভিন্ন। নিরুক্ত-মধ্যেই পাইবেন, গো শব্দে বাক্যও বুঝায়, পৃথিবীও বুঝায়। কালিদাসের "গোরূপধরামিবোর্ব্বীম্" সকলে জানেন। বাকী থাকেন কূর্ম্ম ; ইহার মূল কোথায়, ঠিক মনে আসিতেছে না। আকাশমণ্ডলের—heavenly vaultএর—কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার curved surface দেখিয়া এই কল্পনা আসিয়াছে কি ? কূর্ম্ম অর্থে কচ্ছপ ; কচ্ছপ ও কশ্যপ একই শব্দ, তাহা শাব্দিক পণ্ডিতেরা জানেন। দেবগণকে যে পুরোডাশের আহুতি দেওয়া হইত, তাহা কূর্ম্মের বা কচ্ছপের আকারে প্রস্তুত করিতে হইত। এই প্রসঙ্গে ঐ কূর্ম্মকে মধু ও ঘৃত মাখাইবার সময় যে সকল মন্ত্র ব্যবহৃত হইত, তন্মধ্যে "মধু বাতা ঋতায়তে" প্রভৃতি বিখ্যাত মন্ত্র কয়টি বিহিত হইয়াছে। আর একটি মন্ত্রের দেবতা কূর্ম্ম। কূর্ম্মকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে, অহে কূর্ম্ম, তুমি "অপাং পতিঃ," তুমি তিন সমুদ্রে সংসর্পণ করিয়াছ। শতপথ ব্রাহ্মণে ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে বলা হইয়াছে, "কশ্যপো বৈ কূর্ম্মঃ"—কশ্যপই কূর্ম্ম। "এতদ্বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত,"—এই রূপ ধরিয়াই প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিন সমুদ্রকে তিন লোক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদসংহিতার শেষ ভাগে বলা হইয়াছে, যিনি প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই স্বয়ম্ভু ও কশ্যপ। কশ্যপ অদিতির স্বামী, আদিত্যগণের ও দেবগণের পিতা ; আকাশমণ্ডলকে দেবগণের ও আদিত্যগণের পিতারূপে কল্পনা অস্বাভাবিক নহে। তাহা হইলে কশ্যপ

বা কূর্ম্ম দেবগণের পিতা। বিষ্ণু অন্যতম আদিত্যরূপে কশ্যপের পুত্র। তিনি নিজেই আবার কূর্ম্ম হইলেন কিরূপে? আদিত্য বিষ্ণু আদিত্যগণের কনিষ্ঠ হইয়াও শেষে সকলের বড় "দেবানাং পরমঃ" হইয়াছেন; গোড়ায় কশ্যপের পুত্র হইয়াও শেষে কশ্যপত্ব পাওয়াতে হানি কি? সৃষ্টিকথায় আসিয়া এরূপ confusion পদে পদে। ব্রহ্মা বিষ্ণু অভিন্ন; অথচ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমলে উৎপন্ন। ভগবতী মহাদেবের পত্নী, অথচ তিনি ঈশানমাতা। ব্যাবহারিক ভাষায় কুলায় না বলিয়া সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণে গণ্ডগোল পদে পদে আসে; হাল ছাড়িয়া বলিতে হয়, এখানে incompatibles are compatible.

"কূর্ম্মরূপী ভগবান্ পৃথিবীকে আজিও ধরিয়া আছেন—heavenly vaultএর দিকে তাকাইলে অতি মূঢ়মতিরও এ কল্পনা জাগিবে। সমুদ্র-মন্থনের অনন্ত নাগ যদি Ecliptic হয়, আর মন্দর পর্ব্বত উহার মধ্যস্থিত pole হয়, তাহা হইলে সমুদ্র-মন্থনকালে মন্দর পর্ব্বতে কূর্ম্মরূপী বিষ্ণুর অধিষ্ঠান কল্পনায় আর তেমন হেঁয়ালি থাকে না। একটা কাছিমের পিঠে পৃথিবী আছে, সে-কালের পণ্ডিতেরা ইহাই জানিতেন, এইরূপ বলা অত্যাবশ্যক বোধ করি না। পীঠপূজা পূজা মাত্রেরই preliminary অনুষ্ঠান। প্রাত্যহিক পূজাতেও ইহা দরকার। পূজায় বসিয়া মনে করিতে হয়, আমি যে আসনে বসিয়া পূজা করিতেছি, আমার দেবতাও এইখানে প্রতিষ্ঠিত; কোথায় প্রতিষ্ঠিত? আধার-শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই আধার-শক্তিকে কমলাসন বা পদ্মরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কেহ আধার-শক্তি না বলিয়া বলেন,—প্রকৃতি। তদুপরি আছেন অনন্ত—Infinitude, শেষ নাগরূপে কল্পিত। হইতে পারে, ecliptic হইতে এই নাগ কল্পনা হইয়াছে। তদুপরি কূর্ম্ম celestial sphere,—অনন্তের পর কূর্ম্ম বা কূর্ম্মের পর অনন্ত, তাহাতে আসে যায় না। তার উপর পৃথিবী—ব্যাপক অর্থে জগৎ; তদুপরি ক্ষীর-সমুদ্র; নামান্তর সুধাম্বুধি; তার উপর শ্বেতদ্বীপ। এই ক্ষীর-সমুদ্র ও শ্বেতদ্বীপের কথা আগেই বলা হইয়াছে। ভগবান্ ক্ষীর-সমুদ্রে শয়ান; তিনি শ্বেতদ্বীপবাসী; ক্ষীর-সমুদ্রতটে শ্বেতদ্বীপ। আবার তিনি শেষ-শয্যায় বা অনন্ত নাগের উপর শয়ান; আবার তিনি কূর্ম্মরূপে পৃথিবী ধরিয়াছেন;—পৃথিবী অনন্তের উপর; আবার কূর্ম্মের উপর ধৃত পৃথিবীতে সর্ব্বভূত অবস্থিত—"পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকাঃ দেবি ত্বং

বিষ্ণুনা ধৃতা” মনে করুন। এই পীঠপূজা তন্ত্রসম্মত অনুষ্ঠান; দেবী-পূজাতেও ইহা করিতে হয়। কাজেই ক্ষীর-সমুদ্র ও শ্বেতদ্বীপ কেবল বৈষ্ণবের নহে। সেই শ্বেতদ্বীপে, মণিমণ্ডপে, চিন্তামণিগৃহে, কল্পবৃক্ষতলে, মণিবেদিকার উপর রত্নসিংহাসন কল্পনা করিয়া সেই আসনে দেবতাকে বসাইতে হয়, এবং আপনাকেও সেই দেবতা হইতে অভিন্ন মনে করিতে হয়। ইহাই তান্ত্রিক পূজা। এই যে আধিভৌতিক—realistic বিবরণ, ইহার একটা আধ্যাত্মিক conceptualistic দিক্ আছে নিশ্চয়; কেন না, তান্ত্রিক পূজায় অন্যান্য ন্যাসের সহিত পীঠন্যাসও করা হয়; ঐ প্রকৃতি বা আধার-শক্তি হইতে রত্নসিংহাসন পর্য্যন্ত সমুদয় আসন পূজকের হৃদয়-মধ্যে ন্যাস বা স্থাপন করিতে হয়। তাহার অর্থ,—ঐ সকল পদার্থ বাহিরে নাই—জীবের মধ্যেই আছে। ঐ পদ্ম, মণি, রত্ন প্রভৃতি realistic symbolগুলা Popular Hinduismকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। মহাদেবের ও বুদ্ধদেবের পদ্মাসন ও বজ্রাসন এবং জগন্নাথের রত্নবেদি হইতে তিব্বত চীন মঙ্গোলিয়ার “ওঁ মণিপদ্মে হুঁ” পর্য্যন্ত এবং সম্ভবতঃ Christian Rosicrucianদিগের symbol Rose = পদ্ম এবং Cross = স্বস্তিক = বজ্র = মণি পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব বিস্তৃত। Cross এবং স্বস্তিক উভয়ে একই জিনিষ, উভয়ের একই চিহ্ন (+), তাহা সকলেই জানেন। বজ্র (হীরক বা Diamond)এর চিহ্নও কিঞ্চিৎ বিকৃত (×) রূপ। ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত ভিতরের, বাহিরের নহে। পীঠন্যাসের পর পূজক স্পষ্টই বলিতে পারেন, “হৃদি মাঝে রচেছি আসন—জগতপতি হে, কৃপা করি হেথা করিবে আগমন।” এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় যদি কেহ হাসিতে চাহেন হাস্থন; আমি magnetism আনি নাই; কিন্তু যেখানে ঐতিহাসিক মূল পাইতেছি, সেখানে common sense বা সামান্য কাণ্ডজ্ঞান বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নহি।

“থাক্, হিন্দুর দেবতা মাছ কাছিম ও শূয়ারকে ভগবান বলিতে হিন্দুর কোনও আপত্তি নাই। গরুতেই বা থাকিবে কেন? মীন কূর্ম্ম ও বরাহরূপে তিনি গোরূপী শব্দকে অর্থাৎ বেদকে এবং গোরূপিণী পৃথিবীকে রক্ষা, উদ্ধার, ধারণ ও পালন করিয়া আসিতেছেন; এই তত্ত্বের মূল আমাদের জাতীয় জীবনের আরম্ভ হইতে পাই। অতএব তিনি গো-লোক-বাসী, গো-পাল, গোপ-সখা, গোপী-কান্ত। ইহার বৈদিক মূল আবিষ্কার অসঙ্গত নহে। বৈষ্ণবের গোলোক শব্দ-নির্ম্মিত জগৎ; এবং গো ও গোপী শব্দরূপী জীব।

ইহা আধুনিক বৈষ্ণব কর্ত্তৃক পল্লবিত হইলেও মূলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্বের মূল বেদে। খ্রীষ্টের shepherd কল্পনার মূল কত আগে পাওয়া যায়? কৃষ্ণপূজার যে বিশিষ্ট ভাব তাহা খ্রীষ্টানি হইতে গৃহীত কিরূপে বলিব? আর কৃষ্ণের গোপালত্ব বাদ দিলে পরের নিকট ধার লইবার জন্য অবশিষ্ট কতটুকু থাকে?

"এই ব্যাখ্যা গায়ের জোর বলিলে চলিবে না। আধুনিক বৈষ্ণব-সাহিত্যের সহস্র স্থলে গোপীদিগকে শ্রুতিকন্যা বলা হইয়াছে; এই ভাবে না দেখিলে ইহার সার্থকতা পাওয়া যায় না। গোপীদিগের দেবকন্যা নামও এই অর্থে সার্থক। কেন না, দেবতা মন্ত্রাত্মক বা শব্দাত্মক। বন্ধুবর হীরেন্দ্র বাবু হয়ত বলিবেন যে, মন্ত্রের যথাযথ স্বরযোগে উচ্চারণে ether বা অন্য কোনও mediumএ Vibration ঘটিয়া যে দেবতার মূর্ত্তি গঠিত হয়, সেই মন্ত্রোক্ত দেবতার সেই মূর্ত্তি, এই অর্থে দেবতার মূর্ত্তি আছে এবং দেবতা মন্ত্রাত্মক। যাঁহারা Acoustics পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, কাচে বা ধাতুফলকে বালি ছিটাইয়া বেহালার ছড় দিয়া টানিলে একটা সুর বাহির হয় ও সঙ্গে সঙ্গে ঐ ফলকের উপর Chladni's figures নামক নানাবিধ বিচিত্র মূর্ত্তি দেখা যায়—এও যেন কতকটা সেইরূপ। ইথারের vibrationএ ঐরূপ মূর্ত্তি জন্মিতে পারে বা না পারে, তাহা বৈজ্ঞানিক প্রমাণসাপেক্ষ। কেবল analogy বা উপমান বৈজ্ঞানিকের নিকট অতি দুর্ব্বল প্রমাণ। অতএব আমি তত দূর যাইতে পারি না। আমার মতে যে মন্ত্র যে concept লইয়া, যে মন্ত্রে যে conceptএর মনোমধ্যে আবির্ভাব হয়, সেই concept সেই মন্ত্রের দেবতা। সাপ ব্যাঙ এবং অশ্বমেধের ঘোড়া হইতে দিন রাত্রি, শ্রী, হ্রী এবং চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু হইতে ওঁকার, বষট্‌কার এবং যজমান জীব হইতে উপাস্য হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সকলেই দেবতা হইতে পারেন; সকলেই মন্ত্রাত্মক অর্থাৎ nominal;—নাম মাত্র ছাড়িয়া real existence কাহারও নাই; অতএব সকলেই গোরূপী। ইহাদের মধ্যে জড় দ্রব্যগুলিকে বাদ দিয়া জীবকে বিশেষ ভাবে গো, গোপ ও গোপীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং স্বয়ং ব্রহ্ম ভগবান্ বা Personal God-রূপে নানা জীবের রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তারূপে গোপাল নামে জীবগণের সহিত আনন্দময় সম্পর্কে কল্পিত হইয়াছেন।

"ভগবান্‌ জীব হইতে অভিন্ন; সুতরাং তিনিও যেমন গোপাল, জীবও সেইরূপ গোপ বা গোপাল। তিনি জীবগণের বা গোপগণের সহচর এবং সখাও বটেন, রক্ষাকর্ত্তাও বটেন। বৃন্দাবনে তিনি গো ও গোপগণকে কালিয় নাগের হস্ত হইতে রক্ষা করেন; বকাসুর, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি অসুরগণের ভীতি হইতে নিষ্কৃতি দেন; এমন কি, ইন্দ্রের মত বড় দেবতার হস্ত হইতেও তাহাদিগকে রক্ষা করেন। যদ্দ্বারা তিনি গো গোপকে আচ্ছাদন করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই শৈলটার নাম গো-বর্দ্ধন। জগৎপতি তাঁহার সৃষ্ট জগতের মধ্যে বা Natureএর মধ্যে জীবন-সংগ্রামের সৃষ্টি করিয়া মঙ্গল এবং অমঙ্গলের মধ্যে একটা বিরোধের অভিনয় করিয়া আনন্দলীলা করিতেছেন; সেই অমঙ্গলের আক্রমণ হইতে জীবকে রক্ষা করা ও তাহার মঙ্গল বিধান তাঁহার কার্য্য। পৃথিবীর যাবতীয় Religion এই একই কথা নানা আকারে বলিতেছে। ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে যদি আপনি নিতান্তই শয়তানকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহেন, ঐ কালিয় নাগই কতকটা সেই অমঙ্গলরূপী শয়তান। বেদের মধ্যে ইহাকে বৃত্র নামক অহিস্বরূপে প্রথমে দেখিতে পাই। আমার 'কর্ম্ম-কথা'র মধ্যে "প্রকৃতি পূজা" প্রবন্ধে এ বিষয়ে কিছু কিছু আভাস দিয়াছি। পারসীকদের মধ্যে এবং গ্রীকদের মধ্যে ইহাকে সর্পরূপে আমরা দেখিতে পাই। বৌদ্ধগণও কাশ্যপের গৃহে বুদ্ধদেব কর্তৃক এই কালিয় সর্পের নিগ্রহ ঘোষণার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। বেদের মধ্যে ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ অমরত্বপ্রার্থী হইয়া ইন্দ্রশত্রু বৃত্ররূপ অহির উৎপাদন করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, পারসীকদের আহ্রিমানের মূর্ত্তিও সর্পাকার।

"বৃন্দাবনলীলায় ভগবানের ঐশ্বর্য্যকে খাঁটি বৈষ্ণব চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে ঈশ্বরভাবে একেবারেই দেখিতে চাহেন না। ইহুদি, খ্রীষ্টান ও মুসলমানের সঙ্গে এইখানে তাঁহার একটা মস্ত প্রভেদ। জীবের সঙ্গে ভগবানের প্রীতির সম্বন্ধই বৈষ্ণবের অনুমোদিত। বেদান্ত জীবকেই ব্রহ্ম বলিতে চাহেন। বৈষ্ণব সে কথা ত বলিতে পারেনই না; সে কথা বলিতে গেলে religionই হয় না। অথচ ঈশ্বর বলিলে জীবের সঙ্গে যে ব্যবধানটুকু আসে, সেটুকু স্বীকার করিতেও তিনি একেবারেই নারাজ। এই জন্য বৃন্দাবনলীলায় ভগবানের ঈশ্বরত্ব বৈষ্ণবের হাতে ফুটিতে পায় নাই। বৈষ্ণব ভগবান্‌কে সখা, পতি পুত্র ভাবে মনে করিতে

চাহেন; কিন্তু প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতে চাহেন না; এমন কি, পিতা বলিয়াও তাঁহাকে পূজা করা হয় নাই। এইখানে দেখুন, মহাদেবকে আমরা বাবা বলিয়া থাকি; কিন্তু রাধাকৃষ্ণকে মা বাপ বলিয়া বোধ হয় কোনও হিন্দুই ডাকেন না; গোটা বৈষ্ণব-সাহিত্যে এ রকম মা বাপ আখ্যা খুঁজিয়া পাইবেন কি না সন্দেহ। বোধ হয়, সেই জন্যই তাঁহার বাল্য ও কৈশোর লীলায় শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা শেষ করিতে হইয়াছে; সেখানে তাঁহার পিতৃত্বের কোনও সম্ভাবনাই ঘটে নাই। মহাদেব আমাদের বাবা ভোলানাথ, তাঁহার গৃহিণী জগজ্জননী মা ভগবতী; ইঁহারা উভয়েই অন্ততঃ কালিদাসের সময় হইতে "জগতঃ পিতরৌ"; ভক্ত ইঁহাদিগকে ডাকিলেই ইঁহারা প্রসন্ন হন, দুইটা বেলপাতারও অপেক্ষা করেন না। Religion of Redemption ত তাই। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াই নিশ্চিন্তভাবে মানস-সরোবরের ধারে বসিয়া আছেন। তিনি পিতামহ—বুড়া ঠাকুরদাদা, সংসারের খোঁজ বড় রাখেন না; তবে কেহ উৎকট তপস্যা করিয়া ধরিয়া বসিলে তাহাকে বর দিয়া ফেলিয়া, পরে বিব্রত হইয়া পড়েন, এবং সামলাইবার জন্য নারায়ণের কাছে দৌড়িয়া যান। নারায়ণকেই জগৎ পালন করিতে হয়, দরকার-মত নামিতে হয়। কিন্তু তাঁহার প্রতিও পিতা সম্বোধন ভাল শুনায় না। বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যমধ্যে হয়ত তিনি প্রভু; সকলের প্রভুও বুঝি নহেন,—নারদের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল? তাঁহার ঐশ্বর্য্যময়ী লক্ষ্মীকে মা লক্ষ্মী বলা যাইতে পারে। বৈকুণ্ঠে তিনি যাহাই হউন, বৃন্দাবনে তিনি পিতা, কি প্রভু হইতেই পারেন না; সেখানে তিনি সকলের প্রিয় আদুরে গোপাল মাত্র। সেখানে তিনি কাহারও বড় নহেন, সকলেরই ছোট। বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইলেও যশোদা সর্ব্বদা ছোট ছেলেটির জন্য শঙ্কিত; দাদা বলাই তাঁহাকে শাসন করেন; সখা রাখালেরা তাঁহার ঘাড়ে চড়ে; প্রাচীন ঘোষেরা ও ঘোষাণীরা তাঁহার উৎপাতে ত্রস্ত হইয়া কেবলই নালিশ করে; গোপীরা কেবলই তাঁহার সহিত রঙ্গ করে; আর কথায় কথায় তাঁহাকে রাধিকার পায়ে ধরিতে হয়। Religion of Redemptionএর চরম development এইখানে। জীব ভগবান্‌কে কর্ম্ম দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, সাধনা দ্বারা খুঁজিবে কি? তিনি নিজেই ধরা দিবার জন্য ব্যাকুল; তাঁহারই এই জন্য সোয়াস্তি নাই। অযাচিত ভাবে তিনি Bethelhemএ অবতীর্ণ হইয়া দীনের বেশে দীন দরিদ্রকে ডাক দিয়া

বলিতেছেন—এস এস, তোমরা ঘরবাড়ী সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া আমার কাছে এস; আমার নিকট অমৃত আছে। বৃন্দাবনে তিনি বাঁশী বাজাইয়া গোপাঙ্গনাদিগকে ডাকিতেছেন—ঘর সংসার, পতি পুত্র এখন কিছু ক্ষণের জন্য থাক, তোমাদের বসনের সহিত লাজ সম্ভ্রম আমিই কাড়িয়া লইতেছি; আজি উৎফুল্লমল্লিকা শারদ পূর্ণিমা; এখন কি ঘরে থাকিতে আছে? নদীয়ার বাজারে তিনি 'আয় আয়' বলিয়া সকলকে ডাক দিতেছেন, এবং রাই কই, রাই কই বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধূলায় লুটাইতেছেন। এ-হেন ভগবান্‌কে পিতা বা প্রভু বলা চলে না। খ্রীষ্টানকেও ইহা মানিতে হইয়াছে; তাই Father নিজে নামিতে পারেন নাই; নিজেই নিজের Son হইয়া, অপিচ Son of Man সাজিয়া মর্ত্ত্য লোকে নামিয়াছেন। দ্বারকা-লীলার মধ্যে তাঁহাকে আমরা পিতৃরূপে দেখিতে পাই; কিন্তু সেখানেও তিনি নিজহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই। রাজা না হইলেও যাদবদিগের একরকম প্রভু বটেন, এবং প্রদ্যুম্নাদি বহু পুত্রের পিতাও বটেন। পূর্ব্বে যে ভাগবত বৈষ্ণবদিগের কথা বলিয়াছি, তাঁহারা দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া তাঁহাদের theory খাড়া করিয়াছেন। এই ভাগবত মতটা বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাকে বেদান্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করা একেবারেই চলে না। ভাগবত-মতের মুখ্য কথাটি হইতেছে চতুর্ব্যূহবাদ। এই মতে ভগবানের চারিটি manifestation আছে; ভগবান্ চারিটি স্বতন্ত্র রূপে প্রকটিত হইয়াছেন:—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। পুরাণ ইতিহাস-মতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বাসুদেব; সঙ্কর্ষণ তাঁহার দাদা বলরাম, অনন্ত বা শেষ নাগের অবতার:—প্রদ্যুম্ন,—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, কন্দর্পের অবতার:—অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নের পুত্র। ভাগবত-পন্থীরা এই নাম কয়টি পুরাণ হইতে লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়াছেন,—বাসুদেব স্বয়ং ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম; সঙ্কর্ষণ,—জীব; প্রদ্যুম্ন,—মন; অনিরুদ্ধ,—অহঙ্কার। আরও বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইতে জীবের, জীব হইতে মনের, মন হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি।

"এ ব্যাপারটা সাংখ্যের, বেদান্তের ও বৌদ্ধের সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে অধিক ভিন্ন নহে। বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্ব বিকৃত হইয়া এই সমস্ত দাঁড়াইয়াছে, এ রকম মনে করা যাইতে পারে। পুরাণ সঙ্কর্ষণকে অর্থাৎ বলরামকে বাসুদেবের দাদা বলিয়া অনেকটা শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক পর্য্যায়ে ফেলিয়াছে। ভাগবতেরা এতটা উঠিতে সাহস করেন না। তাঁহারা সঙ্কর্ষণকে অর্থাৎ

জীবকে বাসুদেবের সৃষ্ট পদার্থ, তাঁহা হইতে উৎপন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পুরাণের প্রদ্যুম্ন অথবা কন্দর্প শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, ইনিই সেই সৃষ্টিকর্ত্তার মানস পুত্র কাম,—মনসিজ, নাসদাসীয় সূক্তের মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ, সৃষ্টিকর্ত্তার সেই কাম বা will, যাহা হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ভাগবতেরাও ইঁহাকে মন বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রে মনকে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক বলে; উহা বাস্তবিকই will; এই will দ্বারাই বাহ্য জগৎ ব্রহ্ম বা বিষয়ী হইতে পৃথক্ হইয়া তাহার object বা বিষয়রূপে বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং বিষয় ও বিষয়ীর পরস্পর সম্পর্কে অহঙ্কার বা self-consciousness জন্মিয়া থাকে।

"বেদান্ত-মতে ব্রহ্মই জীব; তাঁহারই রসস্বরূপ আনন্দময়তা হইতে বিজ্ঞান, মন, প্রাণ ও অন্ন-নির্ম্মিত চারিটি কোষের অভিব্যক্তি হইয়াছে। এই বিজ্ঞানাদি কোষের মধ্যে সাংখ্যের মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় ও ভূতগণ রহিয়াছে। বৌদ্ধ ব্রহ্ম এবং জীব উভয়ই মানেন না; প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুসারে জগতের উৎপত্তিও অবিদ্যা হইতে; উৎপত্তির ধারা কিন্তু বেদান্তের বা সাংখ্যেরই মত। ভাগবতদিগের চতুর্ব্যূহবাদ-মতে বাসুদেব বা ব্রহ্ম সর্ব্বোপরি; কিন্তু ইনি নির্গুণ নহেন, এক জন সগুণ Person; ইঁহা হইতে সঙ্কর্ষণ বা জীব উৎপন্ন; জীব মনের (প্রদ্যুম্নের) ও অহঙ্কারের (অনিরুদ্ধের) সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। খ্রীষ্টানদের Trinity তত্ত্বেও অনেকটা এইরূপ দেখা যায়। সেখানে Father এক জন Person; তিনি খ্রীষ্টকে (জীবকে) beget করিয়াছেন; তৃতীয় পুরুষ Holy Ghostও সেই Father হইতে উৎপন্ন। এই Holy Ghost বলিতে খ্রীষ্টানরা কি বুঝেন, আমাদের পক্ষে বুঝা কঠিন। মনুষ্যে ও জগতে ঈশ্বরের immanence বুঝাইবার জন্য ইঁহাকে আনিতে হইয়াছে; ইনি কৃপা ও করুণা ও প্রেরণারূপে মানবে ও জগতে অবতীর্ণ হয়েন এবং মানবকে ও জগৎকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন। ঈশোপনিষদের ভাষায় বলা যাইতে পারে, ইঁহার ঈশিত্ব দ্বারা "ইদং সর্ব্বং" অনুপ্রবিষ্ট, আবৃত, ধৃত রহিয়াছে। Dove বা পারাবত পাখীর সহিত ইঁহার তুলনা হইয়াছে। যীশুর দীক্ষাকালে ইনি Doveরূপে নামিয়াছিলেন। বেদে ব্রহ্মের গরুত্মান্ বা সুপর্ণ রূপ কতকটা ইহারই মত। তিনি পুনঃ পুনঃ পতনশীল পক্ষী, পক্ষ দ্বারা তিনি জগৎ আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন; সোম বা অমরতা আনয়ন তাঁহার প্রধান কার্য্য; পুরাণে

ইনি নারায়ণের বাহন বা চিহ্ন। ইহারই নামান্তর হংস, যে হংস ব্রহ্মার বাহন। খ্রীষ্টানদের theology এক-আধটু যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি, মোটামুটি বলা হয়, work of the holy spirit is twofold—concerned both with the generation and the organisation of life। Lifeএর Generation বা সৃষ্টি সংকল্পাত্মক মনের কার্য্য, এবং তাহার organisation স্থূলতঃ অহঙ্কারের বা self-consciousnessএর কার্য্য, ইহা বলা যাইতে পারে। তাহা হইতে খ্রীষ্টানের Holy spiritএর ভিতরে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, ভগবানের এই দুই দেবতারই স্থান হয়। খ্রীষ্টান-মতে এই তিন মূর্ত্তি ভিন্ন হইলেও, তিন জন স্বতন্ত্র Person হইলেও সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন; ইহারা প্রত্যেকে ষোল আনা God ; অথচ there are not three Gods, but there is only one God। ভাগবতেরাও ঐ চারি মূর্ত্তি বা চারিটি ব্যূহাবতারকে কতকটা সেই ভাবে স্বতন্ত্র অথচ এক বলিয়া দেখেন। চারি জনই ভগবান্, অথচ একই ভগবান্, দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়া পরস্পর সম্পর্ক পাতাইয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিতে হইয়াছে। সঙ্কর্ষণ—ভাগবতপন্থীর হাতে বাসুদেব হইতে ছোট হইয়া পড়িয়াছেন। দার্শনিক তত্ত্বের খাতিরে এইটুকু করিতে হইয়াছে। কিন্তু উহা পুরাণ-ইতিহাসের বিরোধী। পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ উভয়েই বসুদেবপুত্র, অতএব উভয়েই বাসুদেব ; পুরাণে সঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন নহেন, বরং তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতা। ব্রহ্মের ও জীবের সম্পর্ক লইয়া এই চিরন্তন বিরোধ অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রভৃতি নানা বাদ-প্রতিবাদের জন্ম দিয়াছে। খ্রীষ্টীয় সমাজেও Arianism ও Athanasianism লইয়া বিরোধের এই গোড়ার কথা ; ইহাদের সম্পর্ক homoousia একাত্মতা, না homoiousia—সদৃশাত্মতা, ইহা লইয়া খ্রীষ্টানেরা যে রক্তারক্তি করিয়াছে, তাহার বিচিত্র ইতিহাসে আমাদের অনেক শিখিবার আছে ; যিনি এ সংবাদ রাখেন না, তাঁহাকে অন্ততঃ গিবনের সিন্ধুগর্জ্জনোপম ভাষায় এই বিরোধের বিবরণ পাঠ করিতে বলি। আমাদের দেশে বিরোধ গালাগালি পর্য্যন্ত উঠিয়াছে ; রক্তারক্তিতে দাঁড়ায় নাই। আধুনিক বৈষ্ণব পুরাণ মানিয়া লইয়াছেন। সঙ্কর্ষণ বসুদেব-পুত্র, দাদা বলাই, ছোট ভাইয়ের সহিত একমন একপ্রাণ ; বয়সে বড় হইয়াও ছোটর উপর সর্ব্বকর্ম্মে নির্ভরশীল। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ

সকলেরই ছোট ; সেখানে কেহ তাঁহাকে বাসুদেব বা বসুদেব-পুত্র বলিয়াই জানে না, অথচ তিনি সকলেরই প্রাণস্বরূপ। মধুর রসের পরিপুষ্টির ইহাতে যেমন সুবিধা হইয়াছে, অন্য কল্পনাতে তাহা হইত না।

"শ্রীকৃষ্ণকে বলরামের ছোট ভাইরূপে কল্পিত করা হইয়াছে, পাছে বড় ভাই হইলে প্রভুভাব আসিয়া পড়ে। তেমনই নন্দ যশোদার কাছে পুত্রত্ব হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকে ছোট করা হইয়াছে। বৈষ্ণব ছেলের মত তাঁহাকে লালন-পালন করিবেন ; বলাই দাদার মত তাঁহাকে স্নেহের চোখে দেখিবেন, শ্রীদামাদিরূপে তাঁহার সঙ্গে খেলা করিবেন, তাঁহার ঘাড়ে চড়িবেন ও তাঁহাকে ঘাড়ে চড়াইবেন, সুবলরূপে যুগল-মিলন করাইয়া দিবেন ; ললিতাদি গোপীরূপে মিলনের সাহায্য করিবেন ; ও সেই মিলন নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দ ভোগ করিবেন।

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই বৈষ্ণব-মতের মূল বেদান্তেই। জীব ও ব্রহ্ম এক ; কিন্তু রস বা emotion না থাকিলে religion হয় না, ঐক্যে রস নাই। সেই জন্য religionএর খাতিরে এই কথাটা স্পষ্ট না বলিয়া ঈশ্বর ও জীব উভয়কেই গোপরূপে কল্পনা করা হইয়াছে ; এবং সেই ঈশ্বরের প্রতি জীবের নানারূপ প্রীতির সম্পর্ক পাতাইবার জন্য নন্দ, যশোদা, বলরাম, শ্রীদামাদি গোপ, ললিতাদি সখী, এবং রূপমঞ্জরী প্রভৃতি সহচরী কল্পনা করা হইয়াছে। এই মধুর সম্পর্কের পূর্ণ পরিণতি শ্রীরাধিকায়। সেখানে বেদান্তবেদ্য আনন্দঘনমূর্ত্তি রসস্বরূপ ব্রহ্মের হ্লাদিনী শক্তিকে—অর্থাৎ যে আনন্দ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি জগৎ কল্পনা করিয়াছেন, এবং জীবকে আপনা হইতে ভিন্ন করিয়া পুনরায় সেই জীবকে সর্ব্বতোভাবে আপনা করিয়া লইবার জন্য লালায়িত আছেন এবং আনন্দ পাইতেছেন, সেই হ্লাদিনী শক্তিকে শ্রীরাধিকাতে মূর্ত্তিমতী করা হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে মিলনের আকাঙ্ক্ষা, মিলনে তৃপ্তি, আবার বিরহ, বিরহের পর পুনর্মিলন, এই সমস্ত ঘটাইয়া religionএর পক্ষ হইতে জীব ও ব্রহ্মের একাত্মতা যত দূর সম্ভব, ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। অন্য কোনও religion এতটা ফুটাইয়া তুলিতে সাহস করে নাই। য়ুরোপে মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় mystic সাধকদিগের মধ্যে এইরূপ চেষ্টার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। তাঁহারাও খ্রীষ্টকে আপন পতিরূপে কল্পনা করিতেন ; এবং নায়ক-নায়িকা-সম্মিলনে যে সকল হর্ষ-পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়, সেই ভাব অনুভবগম্য করিতেন ;

ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। ঈশ্বরে এই পতিত্বের আরোপ আমাদের অতি প্রাচীন সাহিত্যে—এমন কি, বৈদিক সাহিত্যেও পাওয়া যায়। বাগ্‌দেবতার সহিত গো ও গোপের সম্বন্ধ পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। বেদের সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে বাগ্‌দেবীকে ও তাঁহার তিন মূর্ত্তি ইড়া, ভারতী ও সরস্বতীকে দেবীরূপেই অর্থাৎ নারীরূপেই কল্পনা করা হইয়াছে। এই বাগ্‌দেবতাই শব্দ, এবং শব্দই বেদ। বেদের যে মন্ত্রটিকে সমস্ত বেদপন্থী সমাজ বিশ্বামিত্রের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বেদের সারাংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সেই গায়ত্রীমন্ত্রের সঙ্গে এই তত্ত্বটির সম্পর্ক রহিয়াছে। এই মন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র; ইহার ছন্দ গায়ত্রী। এই জন্য আজকাল গায়ত্রী বলিলে বিশেষতঃ এই মন্ত্রটিকেই বুঝায়,—যদিও গায়ত্রী ছন্দে আরও অনেক মন্ত্র রচিত হইয়াছে। বেদের সারভূত গায়ত্রী এই জন্য বাগ্‌দেবতার রূপ পাইয়াছে। এই মন্ত্রের দেবতা সবিতা, অর্থাৎ যিনি জীবে ধীশক্তি প্রেরণা করেন। এই সবিতা—ব্রহ্মেরই নামান্তর; এই জন্য এই মন্ত্রের নামান্তর সাবিত্রীমন্ত্র। অতএব গায়ত্রী ও সাবিত্রী উভয়েই বাগ্‌দেবতার নামান্তর। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উপাখ্যান স্মরণ করুন। সেখানে এক জায়গায় বলা হইয়াছে, বাগ্‌দেবতা সোম আনিয়াছিলেন। আবার অন্যত্র বলা হইয়াছে, গায়ত্রী দেবগণের জন্য সোম আনিয়াছিলেন। অতএব যিনিই বাগ্‌দেবতা, তিনিই গায়ত্রী। তিনিই আবার সাবিত্রী। একটি আখ্যায়িকা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়, ইহার মূলও ঋক্‌সংহিতার মধ্যে দেখিতে পাই। প্রজাপতি এক কালে আপনার কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকার মূল সম্ভবতঃ জ্যোতিষিক; অন্ততঃ শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক এই ব্যাখ্যাই দিয়াছেন। প্রজাপতি মৃগশিরা নক্ষত্র বা Orion, তাঁহার কন্যা রোহিণী নক্ষত্র বা Aldebaran; Equinox যে সময়ে মৃগশিরা হইতে অপসৃত হইয়া রোহিণীতে গিয়াছিল, সেই সময়ে সম্ভবতঃ এই গল্পটি রচিত হইয়াছিল। সংবৎসররূপী প্রজাপতি মৃগশিরা হইতে রোহিণীর মুখে ধাবন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া ঐ আখ্যায়িকা রচিত হয়। উত্তর কালে এই প্রজাপতি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মায় দাঁড়াইয়াছেন, এবং তাঁহার কন্যা রোহিণী গায়ত্রীর সঙ্গে অভিন্ন ভাবে কল্পিত হইয়াছেন। পৌরাণিক কল্পনায় গায়ত্রী ব্রহ্মার কন্যাও বটে, পত্নীও বটে; এই হেতু সাবিত্রীও ব্রহ্মার পত্নী হইয়াছেন। ক্রমে দাঁড়াইল সাবিত্রী = সরস্বতী =

ব্রহ্মার পত্নী=নারায়ণের পত্নী। নারায়ণের একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া; এই মুখরা পত্নীটি যে বাগ্‌দেবতা, তাহা বলা বাহুল্য। ঐতিহাসিক ভাবে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, লক্ষ্মীর প্রাধান্য উত্তর কালে স্থাপিত হইয়াছিল; লক্ষ্মী আসিয়া সাবিত্রীকে স্থানচ্যুত করিয়াছেন। ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যে বাক্ যত স্পষ্ট, ইনি তত স্পষ্ট নহেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত বিখ্যাত শ্রীসূক্তের মধ্যে একটি ঋক্‌মন্ত্র আছে,—

গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং।
ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপাহ্বয়ে শ্রিয়ং ॥

এই মন্ত্রের দ্বারা সর্ব্বভূতের ঈশ্বরী শ্রীকে আহ্বান করা হয়। ঐ সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রে এই শ্রীকে লক্ষ্মী, হিরণ্ময়ী, হিরণ্যবর্ণা, পদ্মিনী, পদ্মালয়া ইত্যাদি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে; স্পষ্টতঃ বিষ্ণুপ্রিয়া বলা হয় নাই; কিন্তু ফলশ্রুতি-মধ্যে তাঁহাকে বিষ্ণুপত্নী, হরিবল্লভা, মাধবপ্রিয়া বলা হইয়াছে। পুরাণে আমরা দেখিতে পাই, বৈকুণ্ঠে ইনি বিষ্ণুপ্রিয়া এবং ক্ষীর-সমুদ্রে ইনি নারায়ণের পদসেবা করিতেছেন। আরও পূর্ব্বে "শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে" ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রী ও লক্ষ্মী স্বতন্ত্র ভাবে ঈশানের পত্নীদ্বয়রূপে কল্পিত। পুরাণে বিষ্ণুর সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের চেয়ে পালনকর্ত্তৃত্ব রূপই প্রকট। সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব ব্রহ্মাতে প্রকট হইয়াছে; কাজেই সাবিত্রীরূপিণী বাগ্‌দেবতাকে ব্রহ্মার জন্য রাখিয়া, সৃষ্টিরক্ষার জন্য লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর ভাগে দেওয়া হইল; বাগ্‌দেবতার অন্য মূর্ত্তি হৈমবতী উমা গৌরী মহাদেবের ভাগে দেওয়া হইল। লক্ষ্মী বাগ্‌দেবতার সহিত পূর্ণ একত্ব পান নাই; বরং উভয়ের মধ্যে ঈর্ষাই আছে। ত্রৈলোক্য এক বার লক্ষ্মীহীন হইয়াছিল; সমুদ্রমন্থনে তিনি উঠিলে বিষ্ণু তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তদবধি তিনি বৈকুণ্ঠের অধিকারিণী।

"একটা পতিপত্নী-সম্পর্কের মূল বেদের মধ্যেই পাওয়া গেল। বৈষ্ণবেরা মধুর রস পুষ্টির জন্য এই সম্পর্ককে বৈধ সম্বন্ধের সীমা ছাড়াইয়া দিয়াছেন। আগেই বলিয়াছি, religion দুই রকম,—religion of law এবং religion of redemption; religon of lawএর ভিত্তি অনুজ্ঞাপালন; এই সকল অনুজ্ঞা বিধি বা আদেশরূপে ঋষিমুখে প্রচারিত হয়। কিন্তু যেখানে বিধি, সেইখানেই বন্ধনের ভাব প্রবল হয়; ভগবানে প্রভুভাব ও ঈশ্বরভাব প্রবল হইয়া পড়ে। Religion of Redemptionএ সে ভাবটা থাকে না। সেখানে সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জীব ও ঈশ্বর আপনাদের গোড়ার

ঐক্য সন্ধান করিতে চায়; কোনও রকম বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক আনিতে চায় না; ভগবান এখানে আপনার প্রভুত্ব ভুলিয়া জীবকে ধরা দিতে চাহেন, এমন কি, ভক্তাধীন ভগবান্ হইয়া পড়েন। এইরূপে তিনি Saviour ও Redeemerএ পরিণত হইয়া পড়েন। পূর্ব্বে যে বরণের কথা বলিয়াছি, সেই কথা স্মরণ করুন। তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমে জীবকে বরণ করিয়া লয়েন; জীবও সমস্ত বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিয়া, সর্ব্ববন্ধনমুক্ত হইয়া, সম্পূর্ণভাবে তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণ করে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মে এই redemptionএর ভাবটা পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে; সেই জন্য গোপাল ও গোপীর সম্পর্ককে বৈধ সীমা লঙ্ঘন করান হইয়াছে। যীশু খ্রীষ্টও তাঁহার ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমাকে যদি চাও, তাহা হইলে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে।"

৬

রামেন্দ্র বাবু বলিলেন—

"শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্বের এবং তাঁহার ধাম গোলোকের যে তাৎপর্য্য দিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহার প্রধান ভিত্তি নিরুক্ত। নিরুক্ত বা Etymology আশ্রয় করিয়া বুদ্ধিমান্ লোকে কোনও একটা বিষয়ের নানারূপ ব্যাখ্যা দিতে পারেন। কিন্তু সেইরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণে সর্ব্বসাধারণে বাধ্য হইবে না। কোনও একটা ideaর ঐতিহাসিক মূল দেখাইতে না পারিলে, এবং কালক্রমে উহা কিরূপে develop করিয়াছে, প্রাচীন সাহিত্য হইতে তাহার ধারা দেখাইতে না পারিলে, ঐরূপ ব্যাখ্যা প্রায়ই অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। নিরুক্ত আমার প্রধান আশ্রয়। আমি ঐতিহাসিক মূল দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। গো শব্দে বাক্ বুঝাইত; গোপতি অর্থে বাক্‌পতি বুঝাইত; বাক্ অর্থাৎ শব্দ হইতে বিশ্ব-জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে; এমন কি, এই বিশ্ব-জগৎ সেই শব্দেরই প্রকাশ মাত্র, সেই শব্দ হইতে অভিন্ন। গো শব্দে যেমন বাক্ বা শব্দ বুঝায়, সেইরূপ গো শব্দে পৃথিবী বা জগৎ বুঝায়, ইহা আমরা বেদের মধ্যেই পাই। অহং অর্থাৎ আমি যে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষণকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা, এই বৈদান্তিক মতও আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যে পাই। সৃষ্ট জগৎকে এবং সৃষ্ট পদার্থ মাত্রকে গোরূপে নির্দ্দেশ

করার মূল বেদেই রহিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে জগৎপতি সৃষ্টিকর্ত্তাকে যে গোপতি এবং গোপাল নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; সৃষ্ট জীবকে কখনও গো, কখনও বা গোপরূপে, আবার কখনও গোপীরূপে দেখান হইয়াছে; ইহার তাৎপর্য্য ঐ মূল না ধরিলে বুঝা যায় কি না সন্দেহ। বাগ্‌দেবতার নারীরূপ কল্পনাই ব্যাকরণ-মতে স্বাভাবিক। বেদের মধ্যেই তাঁহার বিবিধ নাম ও বিবিধ মূর্ত্তি দেখিতে পাই; এবং কি রূপে তিনি বিভিন্ন মূর্ত্তিতে নারায়ণ বিষ্ণুর, প্রজাপতি ব্রহ্মার, এমন কি মহাদেব মহেশ্বরের পত্নীরূপে কল্পিত হইয়াছেন,—তাহার মূলও বেদে পাওয়া গেল। জীব এক পক্ষে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; তখন জীবেরও গোরূপে, গোপরূপে এবং গোপীরূপে কল্পনা আপনা হইতে আইসে। ব্রহ্মের সহিত জীবের, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীর অনির্ব্বচনীয় ভেদাভেদ সম্পর্ক, ইহাও আপনা হইতে আইসে। শ্রীকৃষ্ণের ধাম যে গোলোক, এবং গোপ এবং গোপী ভিন্ন অপরের সেখানে প্রবেশ নাই, ইহাও স্পষ্ট হয়। এই ব্যাখ্যা সকলে গ্রহণ করেন, এইরূপ ধৃষ্টতা আমার নাই। আমি যাহা কিছু বলিতেছি, তাহা কেবল suggestion মাত্র। এই suggestion যদি কাহারও মনে লাগে, এবং তিনি তদনুকূল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া একটা মতের theory খাড়া করিতে পারেন, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব। প্রাচীন সাহিত্য ঘাঁটিয়া developmentএর ইতিহাস সঙ্কলন আমার ক্ষমতায় আর কুলাইবে না। বোধ করি, এইরূপ ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলনও বর্ত্তমান কালে অসাধ্য। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে যে সকল idea আমরা অস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, আধুনিক পৌরাণিক সাহিত্যে তাহাকে একেবারে ফলে ফুলে পল্লবে অলঙ্কৃত দেখি। ক্ষুদ্র বীজ বা চারা গাছ আমাদের পরিচিত; চারা গাছটা কিরূপে বড় গাছে পরিণত হইল, এই মাঝের ইতিহাসটা পাওয়া যায় না। বৈদিক সাহিত্য এবং পৌরাণিক সাহিত্য, এই দুইয়ের মাঝখানে একটা gap বা ব্যবধান রহিয়াছে। ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলনের পক্ষে ইহা একটা প্রধান অন্তরায়। যিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে বসিয়াছেন, তাঁহাকে পদে পদে এই অন্তরায় দেখিয়া ঠেকিতে হয়। একগাছা শিকলের গোড়ার দিক্‌টা এবং শেষের দিক্‌টা পাওয়া যায়, মাঝের খানিকটা পাওয়া যায় না। এই missing linkগুলা যত দিন অনাবিষ্কৃত থাকিবে, তত দিন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণ হইবে না। হয়ত ইহা কোনও

কালেই পাওয়া যাইবে না। "ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ" ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রের গোপা বিষ্ণুই যে এ-কালের বৈষ্ণবের গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণে পরিণত হইয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেও মাঝের যে ইতিহাসটা আবশ্যক, তাহা হয়ত কোনও কালে পাওয়া যাইবে না। যে সূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে, আমি তাহারই দুই একটা টুকরা সম্মুখে ধরিয়াছি। তাহারও সবগুলি কুড়াইয়া আনিয়া জোড়া দিবার আমার সময়ও নাই, সামর্থ্যও নাই। এই বিচিত্র প্রসঙ্গ তাহার স্থানও নহে।

"আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের মাঝে যে একটা ব্যবধান আছে, ইহার কতকটা ঐতিহাসিক হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। প্রাচীন সাহিত্য অর্থে আমি মুখ্যতঃ বৈদিক সাহিত্য বুঝিতেছি। এই বৈদিক সাহিত্যের পারিভাষিক নাম শ্রুতি। আমাদের বেদপন্থী সমাজে ইহা নিত্য এবং অপৌরুষেয় বলিয়া গৃহীত হয়। কি অর্থে নিত্য এবং অপৌরুষেয়, তাহা লইয়া নানা বিতণ্ডা আছে; তাহাতে প্রবেশ করিলে কিনারা পাইব না। অন্য দেশে যাহাকে revealed Scriptures বলে, এই শ্রুতি কতকটা তাহারই মত; কতকটা মাত্র, কেন না, বেদপন্থীরা শ্রুতিকে ঈশ্বরের কৃত বলিয়াও মানিতে চাহেন না। যে ব্রহ্মার মুখ হইতে এই বেদবাণী বহির্গত হইয়াছিল, সেই ব্রহ্মাও আমাদের নিকট অস্থায়ী পুরুষ মাত্র। আমরা যাঁহাদিগকে ঋষি বলি, তাঁহারা সেই বাণী শুনিয়াছিলেন বা দেখিয়াছিলেন মাত্র, এবং প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র; তাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা কোনও বেদপন্থী স্বীকার করিবেন না। শব্দ শোনাই যায়। ঋষিগণ কিরূপে উহা দেখিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা সময় পাইলে বলিব। এ দেশের ঋষি কতকটা অন্য দেশের inspired prophetsএর মত; কিন্তু এও কতকটা মাত্র, সম্পূর্ণ নহে। যাহাই হউক, এই শ্রুতি বা বৈদিক সাহিত্য অবলম্বন করিয়া আমাদের সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, আমাদের সমাজের ভিত্তি পত্তন এইখানে। উত্তর কালে সাহিত্যের যে কিছু শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই মূল অনুসন্ধানে এইখানে পৌঁছিতে হয়। ইহা ইতিহাসের কথা। এক কালে বেদপন্থী সমাজ এবং দ্বিজাতি সমাজ অভিন্ন ছিল; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণে বিভক্ত ছিল; চতুর্থ শূদ্রবর্ণ, এই সমাজের অনুগত বা আশ্রিত হইলেও ইহার অন্তর্গত ছিল না। শূদ্রের সহিত দ্বিজাতির কিরূপ সম্পর্ক

বা আচরণ ছিল, সে কথা এখন নাই বলিলাম। এক কালে এই বৈদিক সাহিত্য উক্ত দ্বিজাতি সমাজের সর্ব্বপ্রধান সাহিত্য ছিল; এবং এই সাহিত্যে শিক্ষালাভ করিলে highest available education হইত। হালের ভাষা অবলম্বন করিয়া সেই সমাজকে যদি আর্য্যসমাজ বলা যায়, তাহা হইলে সে-কালের আর্য্যসমাজের highest education ছিল এই বৈদিক সাহিত্যে। আমি এইখানে একটা কথা একটু জোরের সহিত বলিতে চাহি; এই বৈদিক সাহিত্যের সমগ্র অংশে সেই আর্য্যসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পূর্ণ এবং সমান অধিকার ছিল। শুধু অধিকার ছিল বলিলে চলিবে না; এই highest available education প্রত্যেকের পক্ষে compulsory ছিল। সে-কালের এই high educationএর মূল্য এ-কালের high educationএর মূল্যের তুলনায় কোথায় দাঁড়ায়, সে বিচার এখানে তুলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এ-কালে আমরা compulsory mass educationএর কথা লইয়া আলোচনা করি। বড় বড় দেশে যাহা প্রচলিত হইয়াছে, এদেশেও আমরা সম্প্রতি সেই compulsory mass educationএর স্বপ্ন দেখিতেছি; কিন্তু এই compulsory mass education সর্ব্বত্র primary education মাত্র। Compulsory high education বোধ করি এ-কালেও সর্ব্বত্র স্বপ্নাতীত। ভারতবর্ষে একটা বৃহৎ সমাজে এক কালে পূর্ব্বে (অন্যূন ২॥ হাজার বৎসর পূর্ব্বে) তৎকালোচিত high education সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে compulsory ছিল, ইহা বোধ করি পৃথিবীর ইতিহাসে একটা অসাধারণ ঘটনা। আবার বলিতে চাহি, এ-কালের সহিত সে-কালের educationএর মূল্যের তুলনার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। অন্ততঃ এইটুকু বলিতে পারি যে, ইতিপূর্ব্বে আমি যে কথাগুলি বলিয়াছি, তাহাতে যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে বেদের সমস্ত মন্ত্রগুলা সরল কৃষকের গান মাত্র নহে, এবং বেদের অন্ত্য ভাগ যে উপনিষদ্‌গুলি সেই শ্রুতি-সাহিত্যের অন্তর্গত, সেইগুলির মূল্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে এ-কালের highest literatureএর তুলনাতেও তাহাকে হটিতে হইবে না, ইহা হালের পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিবেন। যাহা হউক, মন্ত্র হইতে উপনিষদ্ পর্য্যন্ত এই সমস্ত সাহিত্যের অধ্যয়নে দ্বিজাতি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার ছিল, এবং প্রত্যেককেই উহার একদেশ-না-একদেশ অধ্যয়ন করিতে হইত। এখানে মনে রাখিবেন যে, অর্থ না বুঝিয়া

বেদ অধ্যয়ন অতি গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত; এবং বেদের অর্থ বুঝিবার জন্য শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ (orthography, etymology, prosody, grammar) প্রভৃতি যে সকল বেদাঙ্গ রচিত হইয়াছিল, তাহার Scientific value এ-কালের তুলদাঁড়িতে নিতান্ত হীন নহে। বেদাঙ্গ নহিলে বেদ বুঝা যাইত না; এবং বেদাঙ্গের সহকারে বেদের অধ্যয়ন করিতে হইত। এই অধ্যয়নটা প্রত্যেকের পক্ষে compulsory ছিল। উপনয়নের পর কিছু কাল আচার্য্যের নিকটে থাকিয়া অঙ্গ সহিত বেদ অধ্যয়ন করিতে হইত, পরে আচার্য্যের অনুমতি লইয়া সমাবর্ত্তনের পর বিবাহের অধিকার জন্মিত। বিবাহের পর অগ্নিপ্রতিষ্ঠা করিয়া গৃহস্থালী করিবার অধিকার জন্মিত। তখন সে গৃহপতি বলিয়া গণ্য হইত, সমাজের সহিত তাহার সম্পর্ক দাঁড়াইত এবং সমাজের protection এবং privileges পাইবার দাবী জন্মিত। এই উপনয়ন ব্যাপারটিকে আমরা বেদ-বিদ্যালয়ে admission বলিতে পারি; এবং সমাবর্ত্তনকে diploma বা licence লইয়া বাহির হওয়া বলিতে পারি। এই উপনয়ন এবং তৎপরবর্ত্তী সংস্কার না হইলে দ্বিজাতি সমাজেই স্থান হইত না। সমাজের বাহিরে পতিত হইয়া থাকিতে হইত। ফলে educated man না হইলে সে দ্বিজ হইতই না। ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য পর্য্যন্ত সকলের পক্ষেই এই ব্যবস্থা ছিল। ইতিহাসের প্রথম অবস্থায় এই বৈশ্যেরাই majority ছিল, অর্থাৎ mass of the free population ছিল। লাঙ্গল ধরা হইতে গরু চরান পর্য্যন্ত ইহাদেরই ব্যবসা ছিল। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে, এমন এক সময় ছিল, যখন আর্য্যসমাজের জনসাধারণের পক্ষে কিছু-না-কিছু তৎকালোচিত high education একেবারে compulsory ছিল। কোনরূপ রাজ-শাসনের সাহায্য ব্যতীত কেবল সামাজিক ব্যবস্থার সাহায্যে automatically সমস্ত সমাজে এই শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। দ্বিজের গলার পৈতাটাকে কেবল আর্য্যবংশে জন্মের পরিচয় বলিয়া গ্রহণ না করিয়া উহাকে তৎকালের university-দত্ত diploma বলিয়া গ্রহণ করিত। এ-কালে অবশ্য উপনয়ন ও সমাবর্ত্তনের তাৎপর্য্য পর্য্যন্ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। ব্যবস্থার খোসাটুকু আছে, শস্যটুকু নাই।

"যেখানে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিছু-না-কিছু বিদ্যা দান করিতে হইবে, সেখানে সেই কার্য্যের জন্য যে একটা agency, একটা organisation

ব্যবস্থা করা কত উৎকট ব্যাপার, তাহা মনে করিতেই আমরা ভয় পাই। স্কুল কলেজের মত পাকাপোক্ত যন্ত্রবদ্ধ organisation সে-কালে একেবারে ছিল কি না, তাহা বলা কঠিন। এই সকল ব্যাপার অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য; এবং পুরুষপরম্পরাক্রমে সহস্র বৎসর ধরিয়া ইহার পরিচালনা সহজসাধ্য নহে। Stateএর চেষ্টায় চালাইতে গেলে State যত দিন প্রবল থাকে, তত দিনই চলে; আবার একটুকু জবরদস্তিও আসিয়া পড়ে। আমাদের দেশে সমাজের মধ্যে একটা hereditary classএর উপর এই বেদ-বিদ্যাকে রক্ষা করিবার এবং প্রচার করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা ব্রাহ্মণের dutiesএর মধ্যে ছিল। ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য পর্য্যন্ত সকলেই অধ্যয়নে বাধ্য ছিল। এই অধ্যয়ন ঋষিঋণ। কেবল আচার্য্যের গৃহে পঠদ্দশায় অধ্যয়ন সমাপ্ত করিলে চলিত না, গৃহস্থেরও দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে উহা কর্ত্তব্য কার্য্যের ন্যায় পালন করিতে হইত। দেশসুদ্ধ সকল লোককে অধ্যাপনায় বাধ্য করা চলে না; এই কাজটা কেবল ব্রাহ্মণের উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। শাস্ত্রের theory এই যে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে অধ্যয়ন অধ্যাপনা দুই-ই করিতে হইবে, অর্থাৎ নিজেও পড়িতে হইবে এবং দুই-একটি ছাত্রকেও বিনা বেতনে পড়াইতে হইবে। বেতন লওয়াটা দোষের ছিল; কেন না, education যেখানে compulsory, সেখানে উহাকে free না করিলে চলিবে না; অথচ অধ্যাপকের জীবিকার দরকার; তজ্জন্য তিনি ছাত্রের কাছে personal service পাইতেন, এবং ব্রহ্মচারী ছাত্র গৃহস্থ-বাড়ী হইতে ভিক্ষা আনিয়া গুরুকে অর্পণ করিত। এই ভিক্ষাকে সমাজের উপর taxation-স্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে; তবে এ tax voluntary ছিল; না দিলে হয়ত প্রত্যবায় হইত, কিন্তু কোনও State officer আসিয়া ঘটি-বাটী বেচিয়া লইত না। পাঠ সমাপনান্তে আচার্য্য ছাত্রের নিকটে কিছু দক্ষিণা আদায় করিতে পারিতেন। যাগযজ্ঞে যাজন দ্বারা ব্রাহ্মণদের অন্যরূপে জীবিকা সংস্থান হইত। কোনও বড়লোক যজ্ঞ করিলে তাঁহারা ভালরূপ দক্ষিণাই পাইতেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কিংবা বৈশ্যের উপযুক্ত তৎকালে ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ না হইলেও নিন্দিত ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই, বড় বড় রাজা বড় বড় যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণা দিতেছেন। আবার দেখি, তৎকালে ব্রাহ্মণেরা as a class নির্ধন, এ কথাও বলা

হইয়াছে। অন্য দিকে ব্রাহ্মণদিগকে সমাজের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও গৌরবের স্থান এবং কতকগুলা special privilege দিতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের ব্যবসায় hereditary হওয়ায় এই সকল privilegeএর অপব্যবহার হইত সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ হইলেই যে ধার্ম্মিক এবং সদাচারী হইতে হইবে, মনুষ্যের চরিত্র এমন নহে। কিন্তু ইহা না করিলেও একটা বৃহৎ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষাদানের জন্য বহু শত বৎসর স্থায়ী এইরূপ automatically working organisation আর কিরূপে সম্ভব হইত, তাহা মনে আনা কঠিন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পর কয়েক সহস্র বৎসর গিয়াছে; এখনও আমাদের টোল চতুষ্পাঠীতে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা সেই প্রাচীন ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষ মাত্র। সেই পুরাতন খোসার ভিতর নূতন শস্য দেওয়া সম্ভব হইতে পারে কি না, তাহা এ-কালের educationistরা বিবেচনা করিতে পারেন।

"এই ব্রাহ্মণের উপর আর একটা মস্ত ভার আসিয়া পড়িয়াছিল। এই ভার সেই প্রাচীন বিদ্যাকে অর্থাৎ বেদ-বিদ্যাকে রক্ষার ভার। সে-কালে ছাপাখানা ছিল না; এমন কি, লিপির আবিষ্কারও হয়ত তখন হয় নাই। এই বিদ্যা আচার্য্যদের মুখে মুখে থাকিত, এবং মুখে মুখে পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত হইত। বেদের মন্ত্রে এবং ব্রাহ্মণে একযোগে বিপুলায়তন সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল; সেই সাহিত্যকে মুখে মুখে অবিকৃতভাবে রক্ষা করা নিতান্ত সুসাধ্য নহে, অথচ ইহা revealed Scriptures; ইহার এক বর্ণ নষ্ট বা বিকৃত হইতে দেওয়া চলিবে না। কার্যাতঃ কিয়দংশের নাশ বা বিকার অবশ্যম্ভাবী। বেদের বহু অংশ যে এক কালে লোপ পাইয়াছে, তাহার প্রমাণ সাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া যায়; অনেক বেদ লুপ্ত হইয়াছে, ইহা মীমাংসকেরা স্বীকার করেন। ধ্বংস হইতে বেদকে রক্ষার জন্যই না কি বেদব্যাসের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহা পুরাণের কথা। এই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের স্থান আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে এত উচ্চে এবং এ-কালেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সহিত ইহার এত জড়াজড়ি যে, তাঁহাকে একেবারে mythical figure মনে করা প্রায় অসম্ভব। ইহার পিতা পরাশর ঋগ্বেদের এক জন প্রধান ঋষি ছিলেন। ইহার কিন্তু মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া তেমন খ্যাতি না থাকিলেও জনসমাজের নিকট ইহার খ্যাতি পিতার খ্যাতিকেও ছাড়াইয়া আছে। ঋষি-বংশধরগণের মুখে মুখে আবদ্ধ থাকিয়া

যে বেদ লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল, পৌরাণিক আখ্যায়িকা-মতে ইনি সেই বেদ সঙ্কলন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভাগ করেন, এবং আপনার এক-এক জন শিষ্যকে এক-এক বিভাগ রক্ষার ভার দেন। ঐ শিষ্যগণের আবার শিষ্যপরম্পরাক্রমে ঐ সকল বিভাগ আবার নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। যে সাহিত্য কেবল মুখে প্রচারিত হয়, সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার পাঠভেদ ও বিকার অনিবার্য্য। কালক্রমে এই শাখাগুলিকে অবিকৃত রাখিবার জন্য নানা সম্প্রদায় চরণ বা Schoolএর উৎপত্তি হইয়াছিল। শৌনক এবং কাত্যায়ন প্রভৃতির হাতে বেদ-সাহিত্যের index এবং concordance প্রস্তুত হয়। বেদের পাঠশুদ্ধি রাখিবার জন্য নানারূপ পাঠের এবং আবৃত্তির ব্যবস্থা হইয়াছিল ; সমস্ত সংহিতার মধ্যে কত শব্দ আছে, এবং কত অক্ষর আছে, তাহা পর্য্যন্ত গণা হইয়াছিল। কোন্ মন্ত্রের কোন্ ঋষি, কোন্ ছন্দ, কোন্ দেবতা, কোন্ মন্ত্রের পর কোন্ মন্ত্র, কোন্ চরণের পর কোন্ চরণ, কোন্ পদের পর কোন্ পদ, এ সমস্তই গণিয়া বাঁধিয়া ঠিক করা হইয়াছিল। এ-কালের পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। ফলে মোটের উপর এই বৈদিক সাহিত্য যত দীর্ঘকাল ধরিয়া যেরূপ অবিকৃত রহিয়াছে, আর কোনও দেশের কোনও সাহিত্য সেরূপ অবিকৃত নাই। একটা hereditary classএর উপর কার্য্যভার না দিলে, এবং তাহাদিগকে সামাজিক সম্মান না দিলে, এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হইত কি না, তাহার প্রমাণের ভার প্রতিবাদীর উপর।

"কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নামের সহিত আর একটা কিংবদন্তী জড়িত আছে। তিনি মহাভারতের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন ; তদ্ভিন্ন তিনি পুরাণ রচনা করিয়া আপন শিষ্যদিগের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। বেদের ব্রাহ্মণ অংশের মধ্যে দেবতাদের সম্বন্ধে এবং নানা রাজা-রাজড়াদের সম্বন্ধে নানারূপ আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখিবেন, এইরূপ অনেক আখ্যায়িকা আছে। শুনঃশেফের আখ্যায়িকা তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ। এই সকল আখ্যায়িকা গদ্যে রচিত ; মাঝে মাঝে দুই দশটা পদ্য দেখা যায়, উহার নাম গাথা বা শ্লোক। পড়িয়াই বোধ হয়, তৎকালের লৌকিক সাহিত্যে ঐরূপ ছন্দোবদ্ধ গাথা বা শ্লোক বহু পরিমাণে প্রচলিত ছিল। এ-কালেও যেমন রামায়ণের গান, চণ্ডীর গান আছে, সে-কালেও সেইরূপ

দেবতাদের বা রাজা-রাজড়ার কথা সমাজে প্রচলিত ছিল, হয়ত উৎসবাদি উপলক্ষে জনসঙ্ঘমধ্যে উহা গীত হইত। রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে লব কুশ রামায়ণ গাহিয়াছিলেন। জনমেজয়ের যজ্ঞে বৈশম্পায়ন মহাভারতের কথা বলিয়াছিলেন; কুলপতি শৌনকের যজ্ঞে ঐ মহাভারত সৌতি কর্ত্তৃক পুনরুক্ত হইয়াছিল; এই সকল কিংবদন্তী ঐ অনুমানের সমর্থক। সম্ভবতঃ ঐরূপ গাথারই কিছু কিছু ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণের মধ্যে যে সব আখ্যায়িকা আছে, তাহা পুরাণ এবং ইতিহাস নাম পাইলেও revealed literatureএর অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তদ্ব্যতীত ঐ ধরণের একটা বহুবিস্তৃত popular literature ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। আমরা অনুমান করিতে পারি যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঐরূপ ছন্দোবদ্ধ বিশাল popular literatureএরও প্রধান প্রবর্ত্তক ছিলেন। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়,—শ্রুতি এবং স্মৃতি। এই শ্রুতি হালের ভাষায় বৈদিক সাহিত্য। ইহা অপৌরুষেয়, অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি-বিশেষের রচিত নহে। ঋষিগণ ইহার প্রচারকর্ত্তা মাত্র।

"তদ্ব্যতীত আর সমুদয় সাহিত্যই স্মৃতির অন্তর্গত। পুরাণ এবং ইতিহাস (এ-কালে পুরাণ এবং ইতিহাস বলিলে যাহা বুঝা যায়) কোন-না-কোন ব্যক্তির রচিত। এই সকল পুরাণ এবং ইতিহাসের মূলও কতক কতক বেদের মধ্যে আছে। উহাকেই বিস্তারিত এবং পল্লবিত করিয়া সর্ব্ব-সাধারণের বোধ্য ভাষায়, জনসাধারণের জন্য এই popular literatureএর সৃষ্টি আবশ্যক হইয়াছিল। ইহার নাম স্মৃতি; ইহার অর্থ এই যে, বৈদিক মূল স্মরণ রাখিয়া ইহা রচিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে theory এই যে, বেদের সহিত যে স্মৃতির বিরোধ দেখা যায়, সে স্মৃতি অগ্রাহ্য। যে স্মৃতির মূল কোনও বেদবাক্যে পাওয়া যায় না, সে স্মৃতি স্মৃতি নামের যোগ্য নহে। আধুনিক কালে এমন অনেক স্মৃতি আছে, যাহার বৈদিক মূল পাওয়া যায় না; এই সকল স্মৃতির প্রামাণিকতা লইয়া মীমাংসক পণ্ডিত বড় গোলে পড়িয়াছিলেন। স্মৃতি-বাক্যের সহিত বেদ-বাক্যের কোনও সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য তাঁহাদিগকে নানারূপ rules of interpretation প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। এই চেষ্টার ফলে আমাদের Jurisprudenceএর উৎপত্তি হয়। নিতান্তই যেখানে বৈদিক মূল পাওয়া যায় নাই, যেখানে

বেদের কিয়দংশ লুপ্ত হইয়াছে, মীমাংসকেরা ইহা মানিয়া লইয়াছেন ; নহিলে স্মৃতির প্রামাণিকতা থাকে না। কিন্তু কোনও স্মৃতি স্বতঃ প্রমাণ নহে। বেদের উপর basis আছে বলিয়াই উহার প্রামাণিকতা। বেদের ভাষা একে অত্যন্ত technical, তাহার পর ঐ ভাষা যখন অত্যন্ত পুরাতন এবং অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বেদের তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্য এই popular literature তৈয়ার করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। বেদের সমুদয় জ্ঞানকাণ্ড এবং কর্ম্মকাণ্ড এবং বেদের অন্তর্গত সমুদয় উপাখ্যান, কথা ও কাহিনী এতদ্দ্বারা popularise করা হইয়াছিল। এ-কালে যে সকল দর্শনশাস্ত্র প্রচলিত আছে, বেদের জ্ঞানকাণ্ড তাহার মূল। মন্বাদি-প্রণীত বলিয়া যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত আছে, বেদের কর্ম্মকাণ্ড তাহার মূল। তদ্ব্যতীত যে বিশাল সাহিত্য পুরাণ ও ইতিহাস প্রচলিত আছে, তাহাও বৈদিক মূল হইতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও পল্লবিত হইয়া ক্রমশঃ বিপুলায়তন গ্রহণ করিয়াছে। এইখানে একটা কথা বলার দরকার যে, এই সমগ্র স্মৃতি-সাহিত্যে সকলেরই সমান অধিকার। এমন কি, স্ত্রীজাতি এবং শূদ্রজাতিরও সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। এ কথা শাস্ত্রের মধ্যেই আছে যে, পুরাণ এবং ইতিহাস মুখ্যতঃ স্ত্রীজাতি এবং শূদ্রজাতির জন্যই রচিত হইয়াছিল ; স্ত্রীজাতি এবং শূদ্রজাতিকে সমুদয় বেদের, অর্থাৎ বেদের সমগ্র জ্ঞানকাণ্ডের এবং কর্ম্মকাণ্ডের তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্যই ইহার রচনা আবশ্যক হইয়াছিল। আজকাল কথায় কথায় বলা হইয়া থাকে যে, ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি নিজ হস্তে রাখিয়াছিলেন ; অন্য কাহাকেও সেখানে প্রবেশের অধিকার দেন নাই ; ইহা কত দূর ইতিহাসসঙ্গত, তাহা একটু তলাইয়া দেখা আবশ্যক। সমস্ত দ্বিজাতি সমাজের—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং কৃষিজীবী বৈশ্য, ইহাদের সকলেরই সমুদয় বেদে পূর্ণ অধিকার ছিল। শুধু অধিকার ছিল বলিলে চলিবে না, বেদ অধ্যয়ন তাহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল, নতুবা সমাজে পতিত থাকিতে হইত ; এমন কি, গৃহস্থ-ধর্ম্মেও তাহারা অধিকার পাইত না। এই জন্য প্রত্যেক দ্বিজবালককে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য আচার্য্যের বাড়ীতে গিয়া শিক্ষা লাভ করিতে হইত। যে সময় এ-কালের মত স্কুল-কলেজ উদ্ভাবনা সম্ভব হয় নাই, সে সময় বালিকার পক্ষে পরের বাড়ীতে অধিক বয়স পর্য্যন্ত থাকিয়া বেদ অধ্যয়নের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয় নাই। খুব সম্ভব, এই কারণেই স্ত্রীজাতি কালক্রমে বেদের ভাষা ব্যবহারে বঞ্চিত হইয়াছে।

বেদের ভাষা অবিকৃত না থাকিলে বেদ অধ্যয়নে কোনও ফল নাই, এ ধারণা ছিল। ইতিহাসের প্রাক্‌কালে অনার্য্য শূদ্রদিগের সহিত আর্য্য দ্বিজাতির অনেক বিষয়ে বিরোধ ছিল, তাহাতে সংশয় করিবার কারণ দেখি না। কালক্রমে আর্য্যজাতির বসতিবিস্তারের সহিত শূদ্র জাতির সংখ্যা প্রভূতরূপে বাড়িয়া গিয়াছিল ; পূর্ব্বকালের বিরোধের হেতু ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছিল। দ্বিজাতি-সমাজের আশ্রিত এবং অনুগতরূপে শূদ্রগণ সমাজে গৃহীত হইতেছিল। এই কৃষিপ্রধান দেশে এই শূদ্ররাই ক্রমশঃ বৈশ্যগণের স্থান গ্রহণ করিয়া mass of the population হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই বৃহৎ populationএর বালকগণকে উপনীত করিয়া আচার্য্য-গৃহে বাসের ব্যবস্থা করা কোনও কালেই সম্ভব হয় নাই। আচার্য্য-গৃহে শিক্ষা না পাইলে বেদের ভাষা ব্যবহারে অধিকার দিতে বেদপন্থী সমাজ স্বভাবতঃ সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিল ; কেন না, এই বৈদিক সাহিত্য আর্য্যসমাজের নিজস্ব জিনিষ। আর্য্যজাতির সমুদয় সমাজতন্ত্র ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত ; ইহার প্রত্যেক বর্ণ inspiration-লব্ধ ; ইহা কোনরূপেই বিকৃত করিতে দেওয়া চলিবে না। একটি বর্ণের ব্যত্যয় হইলেই ইহার মহিমা নষ্ট হইবে। কাজেই দ্বিজাতীয় সমাজ যক্ষের ধনের মত ইহাকে আগলাইয়া রাখিয়াছিলেন। এইরূপ আগলাইবার জন্য যে কঠিন তপস্যা করিতে হইয়াছিল, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি, এবং তাহার ফলও যাহা হইয়াছিল, তাহাও বলিয়াছি। এই যে সঙ্কোচ এবং সঙ্কীর্ণতা, তাহা কেবল বেদের ভাষার পক্ষেই। এই ভাষাটা অনুপনীত স্ত্রীজাতি এবং অনুপনীত শূদ্র জাতির নিকট হইতে যথাসম্ভব গোপন করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু বেদের তাৎপর্য্য কাহারও নিকট গোপন করা হয় নাই। বস্তুতঃ সর্ব্বসাধারণের নিকট, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতি এবং শূদ্র জাতির নিকট তাহাদের বোধ্য ভাষায় বহুলভাবে বেদবিদ্যা প্রচারের জন্যই স্মৃতিশাস্ত্রের এবং বিশেষতঃ পুরাণ ইতিহাসের রচনা অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। এইখানে মনে রাখিবেন যে, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষাদি সমুদয় বেদাঙ্গ, কপিলাদি-প্রণীত সমুদয় দর্শনশাস্ত্র, মন্বাদি-প্রণীত সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র, রামায়ণ মহাভারতাদি সমুদয় কাব্য ও ইতিহাস এবং যাবতীয় পুরাণ উপপুরাণ ঐ স্মৃতি literatureএর অন্তর্গত। এ সমুদয়ই বেদের তাৎপর্য্য "উপবৃংহণার্থ" বেদের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড সমস্তটাই popularise করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল, এবং এই সকল

শাস্ত্রের গোপনার্থ কেহ কোনরূপ চাবি তৈয়ারি করিয়া নিজের হাতে রাখেন নাই। অমুকের বেদে অধিকার নাই—ইহার অর্থ এই মাত্র যে, বেদের ভাষায় তাহার অধিকার নাই ; বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণে অধিকার নাই বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে।

"যাহা হউক, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী আছে, তাহার যদি কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকে, তাহা হইলে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, ঐ মহর্ষি একটা যুগসন্ধিতে দাঁড়াইয়া প্রাচীন কালের সাহিত্য সঙ্কলন করিয়া, edit করিয়া, তাহা রক্ষার জন্য schools স্থাপন করিয়া, এ দেশের যাহা Old Learning, যাহার উপর এ দেশের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, তাহা conserve করিয়া গিয়াছেন। অন্য দিকেও তিনি ইতিহাস ও পুরাণ রচনার প্রবর্ত্তন করিয়া জনসাধারণের সমক্ষে স্ত্রীশূদ্রনির্ব্বিশেষে জ্ঞান প্রচার দ্বারা বিপুল চেষ্টায় mass education প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন, এবং তৎকালোপযোগী New Learningএর অবতারণা করিয়াছেন। এই যুগাবতার মহর্ষিকে সমুদয় সমাজ একবাক্যে ভগবানের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত নহে। বস্তুতঃই পৃথিবীর কোনও দেশের Literary ইতিহাসে এত বড় giant figure দেখা যায় কি না সন্দেহ।

"ইতিহাস পুরাণাদি স্মৃতিশাস্ত্র পুরুষ-রচিত শাস্ত্র ; ইহার আক্ষরিক বিশুদ্ধি রক্ষার তেমন প্রয়োজন ছিল না। বেদবিৎ সর্ব্বজনমান্য ব্যক্তির প্রণীত বলিয়া ইহা সমাদৃত হইত ; এবং বেদের সহিত বিরোধ না থাকিলেই ইহা প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইত। বলা বাহুল্য, এই সাহিত্যও লোকমুখে পুরুষপরম্পরায় প্রচারিত হইয়াছিল, এবং দেশভেদে ও কালভেদে পল্লবিত ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এ-কালে যে সকল পুরাণ ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত আছে, পণ্ডিতদের মতে উহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সেরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। মূল মহাভারত, মূল রামায়ণ, মূল মনুসংহিতা প্রভৃতি যে আমরা পাই নাই, তাহার প্রমাণ ঐ সকল গ্রন্থ-মধ্যেই আছে। যাহা আমরা পাইয়াছি, তাহা খুব সম্ভব, ঐ সকল গ্রন্থের final redaction ; সম্ভবতঃ লিপি প্রচলনের পরে ঐ সকল গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এ-কালের পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ বিপ্লবের পরে ঐ সকল গ্রন্থকে স্থান দিতে চাহেন। ইহাও নিতান্ত অসম্ভব নহে। বৌদ্ধ বিপ্লবের ফলে যখন বৈদিক ধর্ম্ম নষ্ট ও বেদমূলক শাস্ত্রগ্রন্থ লুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছিল,

সেই সময়ে প্রচলিত tradition অবলম্বন করিয়া প্রাচীন শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল। বৌদ্ধেরা যেমন সঙ্গীতি ডাকিয়া আপনাদের শাস্ত্র সঙ্কলনের ও রক্ষার ব্যবস্থা করিত, বেদপন্থী সমাজেও হয়ত সেইরূপ কোনও চেষ্টা হইয়াছিল। মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন Brahmanic Revival হয়, সেই সময় হইতে নরপতিগণ হয়ত বেদপন্থীর প্রাচীন শাস্ত্র উদ্ধার করিয়া তাহার authorised version প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—এবং বহু শত বৎসর ধরিয়া সেই চেষ্টা চলিয়াছিল। এক বার লিপিবদ্ধ হইয়া গেলে আর বিকারের তত সম্ভাবনা থাকে না। কোনও একটা authorised version কোনও চক্রবর্ত্তী রাজা তাঁহার সাম্রাজ্য-মধ্যে চালাইলে তাহা টিকিয়া যায়।

"ফলে ভারতবর্ষের বিপুল স্মৃতি-সাহিত্যের ভগ্নাবশেষ যাহা আমরা পাইয়াছি, তাহা ঐরূপ final redaction মাত্র: তাহার মধ্যে কতটুকু আধুনিক, কতটুকু প্রাচীন, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলা কঠিন। ভবিষ্যতে criticismএর অপেক্ষায় এ জন্য আমাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইবে। বৈদিক সাহিত্য সমাপ্ত হওয়ার পর এবং স্মৃতি-সাহিত্যের এই সকল নূতন সঙ্কলন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে হাজারখানেক বৎসরের সাহিত্য আমাদের দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই সাহিত্য পুনরুদ্ধারের আর আশা নাই। বেদে যে সকল myth উপাখ্যান ideas ও concepts আমরা অপুষ্ট অবস্থায় দেখিতে পাই, এবং পৌরাণিক সাহিত্যে পূর্ণ পল্লবিত অবস্থায় দেখিতে পাই, মাঝের এই gapটা কোনরূপে পূর্ণ না হইলে, ইতিহাসের ধারা সঙ্কলন কাহারও সাধ্য হইবে না! এমন কি, এ-কালের পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে যে সকল নূতন কথা দেখিতে পান, এবং হিন্দু পৌরাণিক সাহিত্য তাহা বৌদ্ধ সাহিত্যের নিকট ঋণ করিয়া লইয়াছেন মনে করেন, তাহারও গোড়া হয়ত এই লুপ্ত সাহিত্যমধ্যে নিহিত ছিল। বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয়েই সেই মধ্যবর্ত্তী সাহিত্য হইতে আপন আপন সাহিত্য develop করিয়া লইয়াছে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণের tradition ধরিয়া যদি আমরা যুধিষ্ঠিরকে নন্দাভিষেকের হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ধরি, তাহা হইলে এই হাজার বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশের ইতিহাসের কয়টা missing link অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

"অথচ এই হাজার বৎসরের ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসে হয়ত অত্যন্ত ঘটনাবহুল যুগ। এই হাজার বৎসরের মধ্যে আমাদের সমাজের সর্ব্বত্র একটা পুনর্গঠন ঘটিয়াছিল। রেশমের পোকা যেমন কীটের অবস্থা ত্যাগ করিয়া কিছু দিনের জন্য গুটির মধ্যে লুকাইয়া থাকে, এবং তাহার পরে একেবারে নূতন আকৃতি গ্রহণ করিয়া প্রজাপতি সাজিয়া বাহিরে আসে, আমাদের সমাজের এটাকেও সেইরূপ গুটিপোকার অবস্থা (chrysalis stage) মনে করিতে পারি। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আর্য্য-সভ্যতা সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও সম্ভবতঃ দক্ষিণাপথও ছাইয়া ফেলিয়াছিল। পূর্ব্বে অনার্য্য শূদ্রের সহিত আর্য্য দ্বিজাতি-সমাজের যে বিরোধের সম্পর্ক ছিল, তাহা এই সময়ে অন্তর্হিত হয়,—এবং দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার সহিতও আর্য্য-সভ্যতার আদান-প্রদান ঘটিয়া বৈদিক সমাজের পুনর্গঠন ঘটে। এই যুগের শেষ ভাগেই পারসীক, গ্রীক, শক প্রভৃতি বিদেশীয়েরা তাহাদের নূতন আচার, নূতন ভাব লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, এবং ভারতবর্ষের সমাজে স্থান লাভ করিয়া মিশিয়া যায়। তৎপূর্ব্বে কোন বিদেশীর ভারতবর্ষ আক্রমণের ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। আর্য্য, শূদ্র ও দ্রাবিড়ীয় ও অবশেষে বৈদেশিক, —এই সকলকে লইয়া এক খলে পিষিয়া মাড়িয়া যে নূতন আকারের culture প্রস্তুত হইয়াছিল,—এই বিপুল synthesis এবং reconstruction ব্যাপারের ইতিহাসই ভারতবর্ষের ইতিহাস।

"এই যুগ ধরিয়া দেশের মধ্যে যে একটা বিপুল ভাবতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই ; সমাজের মধ্যে দলে দলে free thinkersএর দল দেখা দিয়াছিল। ব্রাহ্মণের সমাজতন্ত্র এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। ঐ সমাজ কস্মিন্ কালে free thinkingএর অন্তরায় হয় নাই। খাঁটি বেদপন্থী সমাজ বেদকে নিত্য অপৌরুষেয় বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে সত্য ; কিন্তু বেদের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে পুরা স্বাতন্ত্র্য ছিল। এ বিষয়ে বৌদ্ধ সমাজের মত কোনও সঙ্গীতি ডাকিয়া বেদের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির কোনরূপ চেষ্টা হইয়াছিল, এরূপ প্রমাণ নাই ; এবং সেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি রাজার আদেশে এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে সমাজ-মধ্যে চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল, ইহারও প্রমাণ নাই। ভারতবর্ষের সমাজের বেদপন্থীর জন্য কোনরূপ কাটা-ছাঁটা creed নাই ; এবং সেই creedকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে চালাইবার জন্য কোনও Pope বা কোনও Caesar

প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হয় নাই। ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সন্ন্যাস গ্রহণের প্রশ্রয় দিত না, ইহা সত্য বটে; কিন্তু কেহ কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিত; এবং কালক্রমে সন্ন্যাসীর বাঁধা দলের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সন্ন্যাসীদের উপর সামাজিক শক্তির, এমন কি, রাষ্ট্রীয় শক্তির বিশেষ প্রভুত্ব ছিল না। সমাজ কিছু বলিতে চাহিত না। গৃহীর পক্ষে যে সকল বিধি-নিষেধ ছিল, ইহাদের উপর সে সকল বিধি-নিষেধ কিছুই ছিল না।—লোকালয় হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিয়া ইহারা অনেকটা স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকিতে পারিত। ইহার ফল ভাল মন্দ দুই রকমই হইয়াছিল। সে সকল কথা এখন থাক।

"এই সকল সন্ন্যাসী-দলের মধ্যে বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসীর দল বেদপন্থী হইতে কতকটা বেশী দূরে গিয়াছিল। এই দল জগতে যেরূপ প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, অন্যের পক্ষে তাহা ঘটে নাই। এ-কালের হিন্দু সমাজের মধ্যে এবং আধুনিক খ্রীষ্টীয় সমাজে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব কতখানি ব্যাপিয়া আছে, তাহা যত দিন নিরপেক্ষ ভাবে মাপিয়া দেখা না হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন ব্যাপারের ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপিত হইবে না। অথচ বুদ্ধদেব ভারতবর্ষে খুবই একটা নূতন তত্ত্ব, নূতন কথা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। আমি যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের হাজারখানেক বৎসরের ফাঁকের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই সময়ের সাহিত্য যদি লুপ্ত না হইত, তাহা হইলে হয়ত দেখা যাইত যে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাব তৎকালে একটা অসাধারণ আকস্মিক ঘটনা অথবা একটা বিপ্লবের সূচনা বলিয়া কেহ মনে করে নাই। একটা জিনিষ তিনি নূতন আনিয়াছিলেন,—তাঁহার অলোকসামান্য Personality। ঐতিহাসিক যুগে ঐতিহাসিক মহাপুরুষগণের মধ্যে এত বড় মহাপুরুষের যে আবির্ভাব হয় নাই, ইহা নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে। মনুষ্যত্বের সকল দিক্ দিয়া দেখিলে এবং সমস্ত মানব জাতির উপর, সমস্ত মানব ইতিহাসের উপর তাঁহার প্রভাব দেখিলে এ কথা না মানিলে চলিবে না। অন্য কথা ছাড়িয়া দিয়া ঐ ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনের দিনে সমস্ত জীবের উপর যে করুণাধারার অভিষেক হইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। এই Personalityর কথা ছাড়িয়া দিয়া অন্য দিকে দেখিতে গেলে ভারতবর্ষে যে খুবই একটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমার বোধ হয় না।

জ্ঞানকাণ্ডে তিনি যে আর্য্যসত্য প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন কথা নহে। বেদান্তের অদ্বয়বাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত বলা হইয়া থাকে। ইহা কতকটা ঠিক বটে, আবার সম্পূর্ণ ঠিক নহে। এই অদ্বয়বাদ যে শঙ্করাচার্য্যই প্রথম আবিষ্কার করেন, ইহা কিছুতেই মনে করা যায় না। আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, ঋগ্বেদ-সংহিতার অন্তর্গত অম্ভৃণ-ঋষিকন্যা-দৃষ্ট বিখ্যাত দেবীসূক্তের যদি কোনও তাৎপর্য্য দেওয়া যায়, তাহা বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যে মতের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অদ্বয়বাদ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এই অদ্বয়বাদ-মতে আত্মা অথবা আমি এক মাত্র সৎ পদার্থ, যাহার সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ মাত্র হইতে পারে না; আর যাহা কিছু আমার objectরূপে প্রতীয়মান হয়, সে সমস্তই আমার পক্ষে প্রাতিভাসিক বা phenomenal মাত্র, অথবা ব্যাবহারিক বা pragmatic মাত্র। এই হিসাবে জগৎ মিথ্যা। উহার ভিতরে আমা হইতে স্বতন্ত্র, আমা হইতে নিরপেক্ষ স্বাধীন কোনও substance নাই। বুদ্ধদেবের প্রচারিত জগৎতত্ত্বে বেদান্তের এই শেষ কথাটুকু মানিয়া লওয়া হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বেদান্তী এবং বৌদ্ধ উভয়েই extreme idealistic position গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরেই বেদান্তী এবং বৌদ্ধ উভয়ের মধ্যে মস্ত প্রভেদ। প্রতীয়মান জগৎ যে প্রত্যয়ের পরম্পরা মাত্র, এইটুকু মাত্র স্বীকার করিয়াই বৌদ্ধ নিরস্ত হয়েন; এই প্রত্যয়-পরম্পরার basis কোথায়, সে সম্বন্ধে কোনও কথাই বলিতে চাহেন না। Empirical Philosophy জগৎ ব্যাপারকে বিশ্লেষণ করিয়া যত দূর যাইতে পারে, বৌদ্ধ তত দূর পর্য্যন্ত গিয়াছেন; হয়ত তাহার অধিক যাওয়া Empirical Philosophyর পক্ষে আবশ্যকও নহে, এবং উচিতও নহে। কিন্তু বেদান্ত এখানে থামিতে পারেন নাই। তিনি বৌদ্ধ-স্বীকৃত এই বিশ্ব-জগৎরূপ ভুয়া বাজির ভিতরে একটা তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন। সেই তত্ত্ব আর কিছু নহে,—আমি; ইহাকে আত্মাই বল আর ব্রহ্মই বল, Self বল, Ego বল, তাহাতে কিছু আসে যায় না। বেদান্ত এই পরম পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দিহান নহেন। ইহাই তাঁহার মতে এক মাত্র সৎ পদার্থ; যাহার সম্বন্ধে কোনরূপ সংশয় মাত্র চলে না। এই আমি কোনরূপ তর্কের বা বিচারের বিষয় নহে; ইহা একেবারে উপলব্ধির বা সাক্ষাৎকারের বিষয়। যত ক্ষণ উপলব্ধি না ঘটে,

তত ক্ষণ হাজার বিতর্কেও ইহার সন্ধান মিলিবে না। এমন কি, সাধনার পথে নামিলেও ইহার আশে-পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতে হইবে। কিন্তু এক বার কোনরূপে তাহার দেখা পাইলে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকিবে না। তখন ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। বৌদ্ধ দেখা পান নাই, তাই তাহার অস্তিত্ব মানিতে চাহেন না। তিনি ঠিকই বলিতেছেন; তর্কের দ্বারা যখন তাঁহাকে মানাইতে পারিব না, তখন তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিয়া লাভ কি?

"এইখানে উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত। বেদান্ত যাহাকে এক মাত্র সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, বৌদ্ধ তাহার কোনও প্রমাণ পান না, অতএব মানিতে চাহেন না। দুয়ের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য সাধন একেবারে অসম্ভব। দুয়ের মধ্যে গোড়ায় অনৈক্য থাকায় practical conduct ব্যাপারে উভয়কে কতকটা ভিন্ন পন্থা আশ্রয় করিতে হইয়াছে। এই practical জগৎ ব্যাপারটাকে উভয়েই অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন ধরিয়া লইয়াছেন; এই অবিদ্যা,—জ্ঞানের অভাব অথবা ভ্রান্ত জ্ঞান। কিন্তু বেদান্ত বলেন যে, সর্ব্ববন্ধনমুক্ত সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন আমি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমে আমার আনন্দের জন্য বদ্ধ সাজিয়া সুখ দুঃখ ভোগের অভিনয় করিতেছি। সুখের অভিনয়ের সহিত ইহাতে যে দুঃখের অভিনয় দেখা যায়, সেও আমার আনন্দেরই জন্য; কেন আমি আমার এই দুঃখ ভোগের অভিনয় করিতেছি, এ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে গেলেই আমার স্বাধীনতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ হয়। আমি সর্ব্ববন্ধনমুক্ত; আমার এই লীলাভিনয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

"বৌদ্ধের পক্ষে এ পথে যাওয়া অসম্ভব। তিনি এই আনন্দস্বরূপ আত্মাকে একেবারে দেখেন নাই; এবং প্রতীয়মান জগতে যে মহাদুঃখ বিদ্যমান, সেই দুঃখকেই অত্যন্ত বড় করিয়া দেখিয়াছেন। এই দুঃখকেই তিনি অন্যতম আর্য্যসত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় জীবের দুঃখ দেখিয়া যে উথলিয়া উঠিবে, তাহাতে বিস্ময় কি? বোধিদ্রুমতলে সম্বোধি লাভের সময় তিনি সেই দুঃখ নিরোধের উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

"এই দুঃখ-নিরোধের নাম,—নির্ব্বাণ। বেদান্তের মুক্তি আর বৌদ্ধের নির্ব্বাণ, এই দুইয়ের মধ্যে একটা গণ্ডগোল আছে। মানুষে স্বকৃত কর্ম্মের

ফল ভোগ করে, এটা সকলেই মানে। কেবল মানুষ কেন, জীব মাত্রকেই সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এমন কি, sentient জীবের পক্ষে সুখ লাভের এবং দুঃখ বর্জ্জনের নিরন্তর চেষ্টাই জীবন। ঐ চেষ্টার সমাপ্তিই জীবের মৃত্যু। ইহা Cosmic Processএর অন্তর্ভুক্ত। এই Cosmic Processটা মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছা মানে না; আপন মনে আপন নির্দ্দিষ্ট বিধানে চলে; ইহার উপর মানুষের প্রভুত্ব নাই, বরং মানুষ ইহার অধীন হইয়াই সুখ দুঃখ ভোগ করে। এখানে Law of Causality বিদ্যমান; তাহাকে নিয়তি বলিতে পারা যায়; উহা নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম। বেদপন্থী ও বুদ্ধপন্থী উভয়েরই ভাষায় ইহার নাম,—ঋত নিয়ম।

"মানুষ ইহার অনুগত হইয়া চলিলে সুখ পায়; প্রতিকূল ভাবে চলিলে দুঃখ পায়; ইহা সেই নিয়তির ব্যবস্থা। ঝড়-বৃষ্টি, ভূকম্পের উৎপাত হইতে আগুনে হাত পোড়া পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থা। ইহার সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের কোনরূপ সম্পর্ক নাই; সমস্ত Physical Science এই নিয়তির জটিলতা উদ্‌ঘাটনে নিযুক্ত আছে। এই নিয়তির কাছে প্রধান পাপ,—অজ্ঞতা। Physical Law সাধু অসাধু বিচার করে না; নির্ব্বিচারে সকলকেই সমান দণ্ড দেয়। Biological Law ইহারই একটা particular aspect. Physical এবং Biological Science মানুষের অজ্ঞতা দূর করিয়া মানুষের সুখ বৃদ্ধির ও দুঃখ হ্রাসের চেষ্টা করে। ব্যাপারটা Natureএর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন মাত্র। Biologyর উপর প্রতিষ্ঠিত এ-কালের Sociology নানা উপায়ে মানুষকে এ বিষয়ে পথ দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। Utilitarian Ethics এবং Evolutionary Ethics ইহার উপর উঠিতে সাহস করে না। তাহারাও এই cosmic processএর দোহাই দিয়া মানুষের কর্ত্তব্য নিরূপণের চেষ্টা করে; এমন কি, ethical conductএর ও basis এবং sanction খুঁজিবার জন্য ব্যস্ত থাকে। আমার 'কর্ম্ম-কথা' নামক পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধেই আমি এই পথে গিয়াছি; এবং Evolutionary Ethics হইতে এই সমস্যার যতটা সমাধান হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষ একাকী আত্মরক্ষা করিতে পারে না; সেই জন্য একটা tribe, community অথবা stateএর অধীনতা স্বীকার করিয়া সাধারণের হিতের জন্য আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া এবং ত্যাগ স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়; এবং যে কর্ম্ম এই সাধারণ হিতের অনুকূল, তাহা

নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের প্রতিকূল হইলেও ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়। দলের সহিত দলের, stateএর সহিত stateএর অবিরাম জীবন-যুদ্ধে natural selectionএর প্রভাবেই মানুষের যে সকল প্রবৃত্তি সমাজ-হিতের অনুকূল, তাহা আপনা হইতে evolved হইয়া উঠিতেছে। Evolutional Ethics এইরূপে মানুষের ধর্ম্মজ্ঞানের বা conscienceএর উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করেন। আমার 'কর্ম্ম-কথা'য় ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আসল কথাটার সমস্যা ইহাতে মিলে না। সমাজ-হিতের জন্য বা লোক-হিতের জন্য মনুষ্য যে ত্যাগ স্বীকার করে, তাহা খাঁটি morality নয়। গোড়াতেই যখন ধরা হইতেছে যে, সমাজবদ্ধ হইয়া না থাকিলে মানুষ কিছুতেই বাঁচিবে না, তখন সমাজের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার, তাহা শেষ পর্য্যন্ত নিজের জন্যই ত্যাগ স্বীকার। যে ত্যাগের ভিতরে স্বার্থের কিঞ্চিৎ গন্ধ মাত্র আছে, তাহা বিশুদ্ধ morality হইতে পারে না। যে goodএর জন্য মানুষ ত্যাগ স্বীকার করে, উহাকে good of the greatest number বল, আর good of humanity বল, জমকাল নামের আবরণের ভিতরে স্বার্থ প্রচ্ছন্ন থাকে। এবং স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া যে ত্যাগ,—উহা যত বড়ই হউক, উহাতে একটুকু মলিনতা থাকে। Scienceএর তরফ হইতে ইহার উপরে আর যাওয়া চলে না। কাজেই খাঁটি moralityর ব্যাখ্যা দিতে গিয়া এমন সব কথা আনিতে হয়, যাহা scienceএর আলোচনার বহির্ভূত হইয়া পড়ে, এবং science তাহা শুনিয়া ঘাড় নাড়েন। Natural selectionকে নিঙড়াইয়া cosmic process হইতে যতটা আদায় করিতে পারে, তাহা আদায়ের পর অন্য পথ আশ্রয় করিতে হয়। 'কর্ম্ম-কথা'র শেষ প্রবন্ধ "যজ্ঞে" আমি সেই নূতন পথের আভাস দিয়াছি।

"ভাল কাজের ফল ভাল না হইলে ভাল কাজের কোনও motive পাওয়া যায় না; এবং cosmic processএ মানুষের জীবনে ভাল কাজের ফল ভাল হয় না দেখিয়া বেদপন্থী ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ উভয়কেই Natureএর orderএর পাশাপাশি আর একটা Orderএর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। উহার নাম দেওয়া হইয়াছে কর্ম্মনিয়ম বা Moral order। এই জন্য বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ উভয়েই একটা অনাদি কর্ম্মপ্রবাহ স্বীকার করেন; সাধারণতঃ ইহারই নাম transmigration বা জন্মান্তর গ্রহণ। পূর্ব্বজন্মের

কর্ম্মের ফল মানুষকে ইহ জন্মে ভোগ করিতে হয়, এবং এ জন্মের কর্ম্ম-ফল পরজন্মে ভোগ করিতে হয় ; এইরূপে জন্ম-পরম্পরায় বিচরণের নাম—সংসার। Scienceএর বর্ত্তমান অবস্থায় এই জন্ম-পরম্পরার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। এ-কালের কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক পরজন্ম মানিতেছেন, কিন্তু যে প্রমাণটুকু নহিলে উহা সর্ব্বসম্মত বৈজ্ঞানিক তথ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, সে প্রমাণ এখন উপস্থিত নাই। মৃত্যুর পর কোনরূপ সূক্ষ্মতর দেহ অবলম্বন করিয়া মানুষ থাকে কি না, তাহা বিজ্ঞানেরই আলোচ্য। ভবিষ্যতের বিজ্ঞান শাস্ত্র ইহার হয়ত উত্তর দিবে ; বর্ত্তমানে সে তর্ক তুলিয়া বিশেষ কোনও লাভ নাই। হিন্দু এবং বৌদ্ধের পক্ষে moral science গড়িবার জন্য এই hypothesis আবশ্যক হইয়াছে। এ জন্মের যত কিছু কষ্ট, তাহা গত জন্মের অসৎ কর্ম্মের ফল, এবং এ জন্মের সৎকর্ম্মের পুরস্কার এ জন্মে না পাইলেও পরজন্মে নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া লইতে পারিলে moral conductএর একটা sanction পাওয়া যাইতে পারে। Natureএর orderএ যেমন একটা causationএর chain বাঁধা আছে, moral orderএও সেইরূপ একটা কর্ম্মপ্রবাহের chain বাঁধা আছে। উভয়ই মানুষ হইতে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন। উভয়কেই নিয়তি বলিতে পারা যায়। জীব মাত্রেই, দেবতারা পর্য্যন্ত,—এমন কি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্য্যন্ত এই নিয়তির অধীন ; তাঁহারাও কর্ম্মবশতঃ দুই রকমের অধীনতা, unmoral cosmic processএর অধীনতা, এবং moral ultra-cosmic processএর অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য। এই অধীনতাই জীবের পক্ষে প্রকৃত বন্ধন এবং এই বন্ধনের ফল কখনও সুখ, কখনও দুঃখ। কেবল ইহ জীবনে নহে, জীবন-পরম্পরায় ; সুখে দুঃখে মিশিয়া জীবন-পরম্পরা চলিয়া যাইতেছে। বৌদ্ধ ইহাতে দুঃখের ভাগটাই বড় করিয়া দেখিয়াছেন ; তাহাতে কিছু যায় আসে না।

"স্বকৃত কর্ম্মের ফলে এই জন্ম-জন্মান্তরের ভ্রমণ হইতে কোনরূপে খোলসা না পাইলে এ দুঃখ হইতে নিস্তার নাই। বৌদ্ধ এবং বৈদান্তিক এই নিস্তারের পথ দেখাইয়াছেন। বেদান্তী বলেন, আমি সর্ব্বতোভাবে মুক্ত পুরুষ ; কেবল নিজের আনন্দের জন্য একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া, এবং সেই জগতে যে নিয়তি দেখা যাইতেছে, সেই নিয়তির বন্ধন স্বীকার করিয়া, একটা সুখ-দুঃখ ভোগের অভিনয় করিতেছি মাত্র। আমি মুক্তই ; আমার

এই বদ্ধবৎ আচরণে আমার আনন্দ। বাহির হইতে অন্য কেহ আমাকে এই বাধ্যবাধকতায় আনে নাই। আমি পূর্ণকাম অথবা আপ্তকাম। আমার কোন কামনা না থাকিলেও কেবল মজা দেখিবার জন্য এই লীলাভিনয় করিতেছি মাত্র। কাজেই এই জন্মজন্মান্তরে পরিভ্রমণ ব্যাপারটাই একটা ভুয়াবাজি বা কৌতুক মাত্র। বাহিরের যে নিয়তির—natural orderই হউক বা moral orderই হউক—যে নিয়তির অধীনত্ব আমি স্বীকার করিয়াছি, সে নিয়তিটাও আমার এই খেলার জন্য সৃষ্ট। স্বকল্পিত নিয়মের বন্ধনে সুখ-দুঃখ ভোগের অভিনয় করিয়া আমি আনন্দ পাইতেছি ; অন্য কেহ আমাকে দুঃখ ভোগে বাধ্য করে নাই। আমি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমেই যাহাকে দুঃখ বলে, তাহাই ভোগ করিতেছি। দুঃখনিবৃত্তির solution ত আমার হাতেই রহিয়াছে। আমি দুঃখী নহি, দুঃখভোগের অভিনয়কারী মাত্র। আমি চিরমুক্তই, কাজেই আমার পক্ষে 'কিরূপে মুক্তি লাভ করিব,' সে কথাই উঠিতে পারে না।

"আমা ভিন্ন অন্য জীব কেন দুঃখ ভোগ করে, এবং কিরূপে সে দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিবে, সেরূপ প্রশ্নই বেদান্তের কাছে উঠে না ; কেন না, বেদান্ত অন্য জীবের অস্তিত্বই মানে না। মৎসদৃশ আর যে সকল জীবকে রঙ্গমঞ্চে দেখিতে পাই, আমি তাহাদিগকে আমার অভিনয়ের জন্য তৈয়ার করিয়া লইয়াছি মাত্র। তাহাদের কোনও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই।

"বৌদ্ধ যাহাকে নির্ব্বাণ বলেন, তাহা বেদান্তের এই মুক্তির সঙ্গে ঠিক এক নহে, হইতেই পারে না ; কেন না, বৌদ্ধ এই 'আমার' অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। বৌদ্ধের নিকটেও জগৎ প্রত্যয়পরম্পরা মাত্র ; কিন্তু কাহার প্রত্যয় ? এ প্রশ্ন করিলে উত্তর দেন, কাহারই নহে। প্রত্যয় আছে বটে ; কিন্তু সে প্রত্যয়ের অনুভবকর্ত্তা কেহ নাই। বেদান্তের নিকট যে আত্মা বা self বা আমি স্বতঃসিদ্ধান্ত পদার্থ, বৌদ্ধের কাছে তাহার অস্তিত্বের কোনও প্রমাণই নাই। এই selfএর যখনই তিনি অনুসন্ধান করিতে যান, তখনই তিনি selfকে দেখিতে পান না। Perceptionটাই দেখা যায় ; কে perceive করিতেছে, তাহাকে দেখা যায় না। কর্ম্ম আছে, কিন্তু কর্ম্মের কোনও কর্ত্তা নাই। দুঃখের ভোগ আছে, কিন্তু দুঃখ ভোগ করিবার কোনও লোক নাই। আমি এক জন আছি, এবং সেই আমি ইহ জন্মে এবং জন্ম-জন্মান্তরে দুঃখ ভোগ করিতেছি, ইহা মনে করাই ভুল। ইহাই অবিদ্যা।

কাজেই আমি নাই; অর্থাৎ দুঃখ ভোগ করিবার কেহ নাই, এইটা মনে করিলেই, অর্থাৎ অবিদ্যাটা দূর হইলেই দুঃখের অস্তিত্বে কিছুই যাইবে আসিবে না। ঐ ভ্রমটা বা অবিদ্যাটা গেলেই নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর মানুষের কি অবস্থা থাকে, তাহা লইয়া অনেক বাক্‌বিতণ্ডা এবং আলোচনা হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, উহা দুঃখ-নিবৃত্তির অবস্থা। তখন দুঃখ কিছুই থাকে না। দুঃখ একটা প্রত্যয় মাত্র। এবং সেই প্রত্যয়টা অবিদ্যাজাত; অর্থাৎ একটা ভ্রম মাত্র। ইহা বুঝিলে আর দুঃখ কোথায় থাকিবে? অতএব নির্ব্বাণের অবস্থা পরম শান্তির অবস্থা। কেবল এইটুকু বলিয়া অনেকে তৃপ্ত থাকিতে চাহেন না। যে অবস্থায় দুঃখ নাই বা কেবল শান্তি আছে, তৎপ্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকিতে পারে না। নিশ্চয়ই উহাতে আনন্দ থাকিবে। বৌদ্ধ শাস্ত্রেও যেখানে নির্ব্বাণের অবস্থাকে আনন্দের অবস্থা বলিয়া বর্ণনা আছে, এই দলের পণ্ডিতেরা সেই সকল স্থানকে প্রমাণ বলিয়া দেখান। কিন্তু ইহাতে logicএ বাধে। বৌদ্ধ যখন আত্মাকে বা জীবকে মানেন না, কোনরূপ অবিকারী নিত্য বস্তু মানেন না, তাঁহার কাছে Life যখন কোনরূপ Being নহে, কেবল একটা Becoming মাত্র, এবং সেই becomingএর অন্তস্তলে কোনও substance নাই, তখন নির্ব্বাণের অবস্থাকে আনন্দের অবস্থা কিরূপে বলা যাইবে, শান্তির অবস্থাই বা কিরূপে বলা যাইবে? বৌদ্ধ মতকে যে Idealistic Nihilism বলা হয়, তাহা এড়াইবার কোনও উপায় দেখি না। Nihilist বলিলে বৌদ্ধও সম্ভবতঃ দুঃখিত হইবেন না। বৌদ্ধ মতের logical পরিণতি মাধ্যমিকদের শূন্যবাদে। Life অবশ্যই becoming মাত্র; এবং সেই becomingএর ধারাটা বা courseটা ধরাবাঁধা নিয়তির অধীন। ইহা একেবারে determinate; কাহারও কোনও তোয়াক্কা না রাখিয়া আপন মনে আপন পথে চলিতেছে। কিন্তু ইহা দেখিতেও কেহ নাই, ইহা ভুগিতেও কেহ নাই। ঐরূপ যে ঘটিতেছে, ইহা মনে আনাই যখন অবিদ্যা, তখন সেই অবিদ্যা যত ক্ষণ আছে, তত ক্ষণই এই becoming। অবিদ্যা লোপের বা নির্ব্বাণের সহিত ঐ becomingটাও লুপ্ত হয়। উহা শূন্য। এই শূন্য মানে কি? মাধ্যমিক বৌদ্ধ বলিবেন—'উহা আছে, তাহা বলিব না; উহা নাই, তাহাও বলিব না।'

"কাজেই বেদান্তীকে কখনও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা চলে না। জগৎ প্রত্যয়-পরম্পরা; এবং এই প্রত্যয়পরম্পরা আপাততঃ determinismএর অধীন; এইটুকু উভয়েই স্বীকার করেন; কিন্তু বেদান্তী জোরের সহিত বলিবেন যে, প্রত্যয়-পরম্পরার সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সাক্ষী এক জন আছেন। সে আমি বই আর কেহ নহেন। আমি আমার আনন্দের জন্য এই determinismএর সৃষ্টি করিয়া এবং আপনাকে সেই বন্ধনের পাশে বদ্ধ করিয়া বদ্ধবৎ আচরণ করিতেছি, এবং বদ্ধ সাজিয়া খেলা করিতেছি।

"Physical ও moral উভয় orderই যদি এই রকম ভুয়াবাজি হয়, তাহা হইলে মানুষ কেন এবং কি উদ্দেশ্যে ভাল কাজ করিবে, এই একটা বিষম প্রশ্ন উঠিবে। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, সবই মিথ্যা হইয়া যায়। কোন-রূপ বিধি-নিষেধও থাকে না। কাজেই এই মত প্রচারের ফলে Antino-mianism বা স্বেচ্ছাচারিতা আসিয়া পড়ে। কাজেই এই মতটা শেষ পর্য্যন্ত anti-social, এমন কি, immoral হইয়া পড়ে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই মত প্রচারের ফলে যে এইরূপ কুফল ঘটিয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। বৌদ্ধের নির্ব্বাণ লাভ বা বেদান্তের মুক্তি লাভ এক হিসাবে সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ; ইহা বুঝিলে কর্ম্মে আসক্তিও থাকে না, প্রবৃত্তিও থাকে না। কিন্তু বুঝিয়াছি মনে করিলেই বুঝা হয় না। নির্ব্বাণ বা মুক্তি একটা Ideal মাত্র। জীবের যত দিন জীবন, তত দিন সে বদ্ধবৎ আচরণে বাধ্য। এই বন্ধনের অবস্থায় কর্ম্ম পরিত্যাগের কাহারও ক্ষমতা নাই; এবং cosmic processএর অধীন থাকিয়া, Physical ও Moral উভয় orderএর অধীন থাকিয়া, দুঃখ বর্জ্জনের এবং সুখ প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেকে বাধ্য। বৌদ্ধ বলেন,—আচ্ছা, কর্ম্ম যখন তোমাকে করিতেই হইবে, তাহার ফলে সুখ ইহ জন্মে না পাও, পরজন্মে নিশ্চয়ই পাইবে। কোন্ কাজটা ভাল কাজ ও তাহার ফল সুখ, ও কোন্টা মন্দ ও তাহার ফল দুঃখ, কর্ম্ম-নিয়মে তাহা নির্দ্দিষ্টই আছে। ইহাই বুদ্ধদেবের আষ্টাঙ্গিক মার্গ। ইহাই সদ্ধর্ম্ম। বৌদ্ধ মতে ইহার প্রমাণ বেদ নহে, ইহার প্রমাণ ভগবান্ তথাগতের উক্তি। এই ধর্ম্ম লুপ্ত হইবার উপক্রম হইলে ভগবান্ তথাগত মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হইয়া ইহা পুনরায় প্রচার করেন। তথাগতের মাঝে মাঝে আবির্ভাব,—ইহাও cosmic processএর সামিল; ইহার নাম ধর্ম্মনিয়ম। গাছে যেমন মাঝে মাঝে ফুল হয়, সর্ব্বদা হয় না, ইহাও তদ্রূপ। বেদান্তও ঠিক সেইরূপ

বলেন। বন্ধনের দশায় কর্ম্ম ত্যাগের কোনও উপায় নাই। কর্ম্ম যখন করিতেই হইবে, তখন ভাল কাজ কর, ভাল ফল পাইবে; এখন না হউক, পরে। মন্দ কাজ করিলেও দুঃখ পাইবে, এখন না হউক, পরে। কোন্ কাজ ভাল, জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও বলিবেন, ইহাও নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট ধরাবাঁধা রহিয়াছে; তুমি দেখিয়া লও।

"এই ধরাবাঁধা কর্ম্ম-নিয়ম সকলে স্বচক্ষে দেখিতে পায় না। যারা দেখিতে পায় না, তাহাদিগকে বলা হয়, ঋষিগণ ইহা দেখিতে পাইতেন। তাঁহারা যেরূপ আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে কাজ কর; অথবা তাঁহাদের বাক্য স্মরণে রাখিয়া মহাজনেরা যাহা বলেন, অথবা যাহা করেন, সেই মতে কাজ কর। অতএব ধর্ম্মের প্রমাণ,—শ্রুতি, স্মৃতি এবং সদাচার। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা প্রায় একবাক্যে ধর্ম্মের আর একটা চতুর্থ প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন;—উহার নাম আত্মতুষ্টি। টীকাকারদের মধ্যে অনেকে এই কথাটার সঙ্কীর্ণ অর্থ লইয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার যেখানে কর্ত্তব্য-পথ দেখায় নাই, সেখানে নিজের যাহাতে তুষ্টি হয়, সেই মতে কাজ কর। আমি কিন্তু এটাকে ছোট কথা মনে করি না। আত্মার যাহাতে পরিতোষ হয়;—এখানে আত্মা অর্থে নিশ্চয়ই বেদান্তের আমি, যিনি আনন্দের জন্য এই বিশ্ব-সৃষ্টির অভিনয় করিয়াছেন, এবং জীব সাজিয়া সেই জীবের অন্তর্যামি-রূপে জীবকে কর্ত্তব্য-পথে প্রেরণ করিতেছেন। ছোট করিয়া বলিলেই ইহাকে conscience বলা হয়, এবং এই Conscience-এর প্রেরণাই কর্ত্তব্য-পথে শেষ প্রেরণা এবং প্রধান প্রেরণা।

"হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয়েই মানিয়া লইতেছেন যে, ভাল কাজের ফল ভাল হইবেই। Physical science এ কথার কোনও প্রমাণ না দিলেও হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়ের কাছে Moral Science-এর ভিত্তিপত্তন এখানে। কোন্ কাজের ফল ভাল, কোন্ কাজের ফল মন্দ, তাহা একরকম ধরাবাঁধা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহা মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছা, মতামতের কোন অপেক্ষা করে না। মানুষকে কেবল উহার আবিষ্কার করিয়া তদনুসারে আপনার জীবনযাত্রা চালাইতে হইবে। সকলের পক্ষে উহার আবিষ্কার সাধ্য নহে; সেই জন্য অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। যাঁহাদের সেরূপ চোখ আছে, তাঁহারা নিজে দেখেন এবং অন্যকে দেখাইয়া দেন। বৌদ্ধ মতে বুদ্ধগণ ও হিন্দু মতে ঋষিগণ ইহা দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। বৌদ্ধের নিকট ভগবান্

বুদ্ধগণের যে স্থান, আমাদের নিকট বেদের দ্রষ্টা ঋষিগণের সেই স্থান। অন্যান্য সমাজের নিকট মুসা ও অন্য নবিগণ এবং মহম্মদের কতকটা সেই স্থান। এই ধর্ম্ম সাধারণতঃ বিধি-নিষেধরূপে জনসমাজে প্রচারিত হয়। ইহাকে মোটামুটি কর্ম্মের পথ, সাধনার পথ, Religion of Law এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। জনসমাজে অধিকাংশ লোকই এই পথ ধরিয়া ধর্ম্মাচরণ করে। কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই বলিবেন, কর্ম্মের পথে মুক্তি বা নির্ব্বাণ আদৌ হইতেই পারে না। কেন না, কর্ম্ম যতই সৎকর্ম্ম হউক না কেন, উহার একটা-না-একটা ভাল ফল হইবেই। সেই ফল ভোগ করিতেই হইবে; এবং ফল ভোগ মাত্রই বন্ধন। লোহার পিঁজরায় না হউক, সোনার পিঁজরায় বন্ধন। অধিকাংশ স্থলে ইহার ফল অস্থায়ী। যেখানে স্থায়ী ফল হয়, সেখানেও দেবযান-পথে, ব্রহ্মলোকে, শিবলোকে, বিষ্ণুলোকে বা গোলোকে স্থায়ী ভাবে অবস্থিতি ঘটে। ঐ সকল লোকে গেলে আর ফিরিতে হয় না। চিরস্থায়ী সুখের বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু এই চিরস্থায়ী সুখ বেদান্তের মুক্তি নহে। বোদ্ধের নির্ব্বাণও নহে। দেবলোকে, ইন্দ্রলোকে, যমলোকে বা নরলোকে বসবাস অধিকাংশ লোকের পক্ষে কর্ম্মফলে ঘটে। সেখানে সুখও আছে, দুঃখও আছে। সুখ দুঃখে মিশিয়া আছে, কিন্তু সুখ বা দুঃখ কিছুই সেখানে চিরস্থায়ী নহে। এই সকল অস্থায়ী লোকের সহিত নরলোক বা মর্ত্ত্য লোকের বিশেষ কোনও ভেদ নাই। মর্ত্ত্য লোক, ইন্দ্রলোক, যমলোক, এ সমস্তই এক পর্য্যায়ের জিনিষ। সাধু বা অসাধুকে কর্ম্মফলে এখানে বা ওখানে কিছু দিনের জন্য থাকিতে হয়। কর্ম্মানুসারে সুখ বা দুঃখ ভুগিতে হয়। সর্ব্বত্রই বন্ধন, প্রভেদ কেবল সুখ-দুঃখের duration এবং মাত্রা লইয়া। বেদের তেত্রিশ কোটি দেবতাকে বৌদ্ধেরা মানিয়া লইয়াছেন, এবং তাহার উপর আরও অনেক দেবতা চড়াইয়াছেন। অসুর, রাক্ষস প্রভৃতিকেও মানিয়া লইয়াছেন। হিন্দুর দেবতা তেত্রিশ কোটি হইলে, বৌদ্ধের দেবতা বহু তেত্রিশ কোটি হয়। ইহারা সকলেই জীব এবং কর্ম্মফলভোগী; এবং সকলেই কামলোকের অধিবাসী। বৌদ্ধেরা এই কামলোককে এগারটা কুঠুরিতে ভাগ করিয়াছিল। তাহার মধ্যে ছয়টা,—ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নিবাস বা দেবলোক। আর পাঁচটা যথাক্রমে—নরলোক, অসুরলোক, প্রেতলোক, তির্য্যক্‌লোক এবং নরকলোক। বৌদ্ধ মতে এই সমস্ত কামলোকটা মারের অধীন। জীবগণ তাঁহার অধীন থাকিয়া এ লোক

হইতে ও লোকে, এ কুঠুরি হইতে ও কুঠুরি যাতায়াত করিতেছে, এবং সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে।

"বেদপন্থী হিন্দু এই মারের আধিপত্য স্বীকার করিবে না। কিন্তু তাঁহার নিকটেও এই সমুদয় লোক বর্ত্তমান; এবং সংসারে বদ্ধ জীব এখান হইতে ওখানে যাতায়াত করে। পূর্ব্বে যে পিতৃযানের কথা কহিয়াছি, খুব সম্ভব সেই পিতৃযান হইতেই এই বিবিধ লোকের শাখা-পল্লব বাহির হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই লুপ্ত অধ্যায় কয়টা পাওয়া গেলে এই শাখা পল্লব কিরূপে কবে গজাইয়াছে, তাহা বুঝা যাইত। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা ফলে যাহারা দেবযানে যায়, তাহাদিগকে আর ফিরিতে হয় না। তাহারা মুক্তি পায় না বটে, কিন্তু তাহাদিগকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। তাহারা যেখানে যায়, সেখানে চিরস্থায়ী সুখ লাভ করে। ইহাকেই সগুণ ব্রহ্মের সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য বলা যাইতে পারে। যমের ভয় তাহাদের নাই; এমন কি, ইন্দ্রলোকাদি দেবলোকের অস্থায়ী সুখও তাহাদের পক্ষে তুচ্ছ। ব্রহ্মলোকে, শিবলোকে বা বিষ্ণুলোকে যাহারা স্থান পায়, তাহাদিগকে আর ফিরিতে হয় না। সাধারণ হিন্দুর প্রার্থনাই এই,—আমাকে যেন শমন-ভবন যাইতে না হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর,—যিনি যাহার আশ্রয়, সে তাঁহারই নিকট তাঁহারই পার্শ্বে, তাঁহারই চরণে স্থান পাইতে চায়। রথে চড়িয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠে যাইবার যে কথা শুনা যায়, সেটা এর চেয়ে কিছু বেশী। ইহাকে ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ বা সারূপ্য লাভ বলা যাইতে পারে। বেদান্ত জীব ও ঈশ্বরের যে চরম ঐক্যের কথা বলেন, ইহা সেই সম্পূর্ণ ঐক্য না হইলেও ঐক্যের অনেকটা কাছাকাছি। ভক্তের পক্ষে এতটা বোধ করি প্রার্থনীয় নহে। তিনি চরণ পাইয়া, সমীপে স্থান পাইয়া কৃতার্থ। গোলোকের কথায় এ কথা বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত পূর্ণ মিলনে কেবল শ্রীরাধারই অধিকার। অন্যে তাঁহাদের নিকটে থাকিয়া তাঁহাদের লীলা দেখিয়াই তৃপ্ত।

"আমার অনুমান হয় যে, বেদোক্ত দেবযানের মূল হইতে শাখা-পল্লব বাহির হইয়া কালক্রমে ব্রহ্মলোক হইতে গোলোক পর্য্যন্ত সমুদয় লোকের কল্পনা হইয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যের মাঝের খানিকটা লুপ্ত না হইলে আমরা এই ইতিহাসের ধারা নির্ণয় করিতে পারিতাম। বৌদ্ধগণও সেই একই মূল হইতে প্রসারিত ডাল-পালা ছাঁটিয়া লইয়াছেন। বৌদ্ধ মতে

যাহারা কর্ম্মের পথে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় অথচ নির্ব্বাণ পায় না, তাহাদিগকে ক্রমোন্নতি অনুসারে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীকে পরকালে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীকে নরলোকে এক বার আসিতে হয়। তৃতীয় শ্রেণী অনাগমী: ইহাদিগকে কামলোকে আদৌ ভিড়িতে হয় না। ইহারা মারের শাসন অতিক্রম করিয়াছে। অনাগমীদের স্থান যে লোকে, সেই লোক,—রূপলোক; ইহার নামান্তর ব্রহ্মলোক। ইহা বৌদ্ধ সাহিত্যেই পাওয়া যায়। অনাগমীদের মধ্যে শ্রেণীভেদ করিয়া বৌদ্ধেরা নানা নাম দিয়াছেন—ব্রহ্মকায়িক, ব্রহ্মপারিষদ্য, ব্রহ্মপুরোহিত, মহাব্রহ্ম ইত্যাদি। হীনযানী এবং মহাযানী, দুইয়ের মধ্যেই এ সকল নাম পাওয়া যায়। এই নাম হইতেই বুঝা যাইবে, ইহা আমাদের সগুণ ব্রহ্মের সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য প্রভৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব বৌদ্ধদের এই অনাগমীদিগের গতি আমাদের দেবযান-পথে গতি হইতে অভিন্ন। কর্ম্মপথে বৌদ্ধ মতে যাঁহাদের স্থান সকলের উচ্চে, তাঁহাদের নাম অর্হৎ। ইহারা চতুর্থ শ্রেণীর সাধক। ইহারা প্রায় সর্ব্ববন্ধনমুক্ত; ব্রহ্মলোকের উপরেও ইহাদের স্থান। পরবর্ত্তী কালে ইহাদের অবস্থানের জন্য সুখাবতীর কল্পনা হইয়াছে।

"বৌদ্ধ এবং বেদান্তী উভয়েই বিশ্ব-জগৎকে নাম-রূপাত্মক অর্থাৎ একটা নাম মাত্র ও একটা রূপ মাত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। বেদান্তী নাম-রূপের অতীত আত্মাকে মানেন। বৌদ্ধ আত্মাকে না মানিয়া তাহার জায়গায় একটা শূন্য বসাইয়া দেন। এই গূঢ় কথা জানিলেই একের মতে মুক্তি এবং অন্যের মতে নির্ব্বাণ। কিন্তু এই গূঢ় তত্ত্ব সাধারণের অধিকারের বহির্ভূত। তাহাদের জন্য কেবল কর্ম্মের পথ। কর্ম্মফলে বিভিন্ন লোকে যাতায়াত হয়, অথবা কোনও উচ্চতর লোকে চিরসুখে অবস্থিতি হয়। ব্রাহ্মণেরা মুক্তিপথ নিজের জন্য খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, আর সর্ব্বসাধারণের জন্য সে পথে চাবি দিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধেরা সর্ব্বসাধারণের জন্য নির্ব্বাণের পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন, এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা হিন্দু বা বৌদ্ধ উভয়েরই মুক্তিতত্ত্ব এবং কর্ম্মতত্ত্ব কিছুই বুঝেন নাই। উভয়ের মতেই মুক্তিতত্ত্ব জনসাধারণের অধিকারবহির্ভূত। তবে কর্ম্মপথে চলিতে চলিতে এক দিন না এক দিন, এ জন্মে বা জন্মান্তরে এমন দিন আসিতে পারে, যখন মুক্তি জ্ঞানগম্য হইবে, এবং অধিকারে আসিবে। ব্রাহ্মণের মতে সেই

অধিকার লাভে স্ত্রী এবং শূদ্রেরও কোনও বাধা নাই। বেদের text উচ্চারণে তাহাদের সামাজিক অধিকার না থাকিলেও স্মৃতিশাস্ত্রের বা পুরাণ ইতিহাসের সাহায্যে বেদান্তের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া মুক্তির তাহারা অধিকারী হইতে পারে। বেদের text পাঠে অধিকারী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যে চেষ্টা মাত্রেই বেদাধ্যয়নের ফলে বা যাগযজ্ঞ দ্বারা মুক্তির অধিকারী হইবেন, এমন কথা কোনও জায়গায় নাই। যে দ্বিজ, সে পূর্ব্বজন্মে সুকৃতির ফলে উন্নত ;—দ্বিজাতি-সমাজে জন্ম লাভ করিয়া এবং বেদ-বেদান্তের original text পাঠে সমাজদত্ত অধিকার পাইয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইবার কিঞ্চিৎ সুবিধা পাইয়াছে, এই মাত্র। যে কোনও শূদ্র বেদ পাঠে অধিকারী না হইয়াও স্মৃতি পাঠের সাহায্যে অথবা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সাধনার বলে অথবা কৃপাবলে মুক্তির অধিকারী হইতে পারেন। ব্রাহ্মণই হউক, আর শূদ্রই হউক, কাহারও পক্ষে মুক্তি অনায়াসলভ্য নহে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এবং "যমেব এষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ,"—এ কথা ব্রাহ্মণ শূদ্র উভয়েরই প্রতি, এমন কি, আর্য্যসমাজের সহিত নিঃসম্পর্ক ম্লেচ্ছদের প্রতিও প্রযোজ্য। বেদবিহিত বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে মুক্তি হইতে পারে না, কেবল সদ্‌গতি মাত্র হইতে পারে। ব্রাহ্মণের সমুদয় শাস্ত্র একবাক্যে এই কথা বলিতেছে। বেদের জ্ঞানকাণ্ডে এবং কর্ম্মকাণ্ডে এ বিষয়ে কোনও বিসংবাদ নাই। বৈধ কর্ম্মের ফলে সদ্‌গতি হইবে, কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষপাতীরা ইহার অধিক কিছুই বলেন না। সেই সদ্‌গতির নাম স্বর্গবাস ; ঐতরেয় ব্রাহ্মণাদি ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের ভাষায়,—কোনও না কোনও দেবতার সহিত একাত্মতা লাভ বা সাযুজ্য লাভ, অথবা কোনও না কোনও দেবতার প্রিয় ধামে গমন বা তাঁহার সালোক্য সামীপ্য ইত্যাদি লাভ।

"বৌদ্ধ মতেও কেবল শীল বা সৎকর্ম্ম দ্বারা নির্ব্বাণ হয় না। শীলের উপর সমাধি (যোগবল) থাকিলে অনাগমীর অবস্থা বা ব্রহ্মলোকে স্থান হয়। তদুপরি প্রজ্ঞা (জ্ঞানবল) থাকিলে অর্হতের অবস্থা, অরূপ লোকে বা সুখাবতীতে স্থান হয়। অর্হতেরা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত নহেন। এক জন্মে অর্হৎ হওয়াও সকলের সাধ্য নহে। বহু জন্মের চেষ্টায় ক্রমোন্নতি আবশ্যক।

"বৌদ্ধেরা বেদের এবং বেদ-বিহিত যাগ-যজ্ঞের বিরোধী ছিল, এ কথা কতক সত্য এবং কতক মিথ্যা। আমরা যে অর্থে বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করি, বৌদ্ধগণ অবশ্য সেরূপ করিত না। আমাদের পক্ষে ঋষিগণের

যে স্থান, বৌদ্ধদের পক্ষে বুদ্ধগণের সেই স্থান। গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধগণের মধ্যে অন্যতম মাত্র। আমরাও যেমন বলি,—কালে কালে ঈশ্বরের অবতার হয়; বৌদ্ধেরাও সেইরূপ বলিত, কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়ই যাহাকে ধর্ম্ম বলেন, সেই ধর্ম্মকে সকলে দেখিতে পায় না; ঋষিগণ বা বুদ্ধগণ তাহা দেখিতে পান ও প্রচার করেন। এই অর্থে ঋষিগণ, এবং বুদ্ধগণ "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণঃ"। আমরা ঋষিগণের উক্তিকে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, বৌদ্ধেরা বুদ্ধের বাক্যকে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; ইহার অধিক উভয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। বুদ্ধদেব বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পক্ষে যাগ-যজ্ঞের নিষেধ করিয়াছিলেন। হিন্দু সন্ন্যাসীর পক্ষেও যাগ-যজ্ঞ নিষিদ্ধ। এমন কি, আমাদের গৃহীর পক্ষে যে সকল বিধি-নিষেধ আছে, তাহার অধিকাংশই আমাদের সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রযোজ্য নহে।

"বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রতি যাগ-যজ্ঞের নিষেধে কোনও নূতনত্ব নাই। বৌদ্ধ গৃহীদের জন্য বুদ্ধদেব কোনরূপ পাকাপাকি ব্যবস্থা করেন নাই। তাহারা মোটামুটি বেদ-বিধি মানিয়াই চলিত, ইহা আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি। এ-কালের গৃহস্থের মধ্যে যাঁহারা গোঁড়া বৈষ্ণব, তাঁহারা যেমন সমাজের খাতিরে বেদ-বিধি মানিয়া চলেন, তবে বেদ-বিধির প্রতি ততটা শ্রদ্ধা দেখান না, বৌদ্ধ গৃহীর অবস্থা অনেকটা সেইরূপ ছিল। বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ গৃহস্থের নিত্য অনুষ্ঠেয়। বুদ্ধদেব এই পাঁচ মহাযজ্ঞের সম্পাদন গৃহীরও কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

"Physical আর Moral এই দুইটা স্বতন্ত্র orderএর কথা বলিয়া আসিতেছি। Physical আর moral law উভয়ের অধীনতায় যথাযোগ্য শাস্তি ভোগ করিতে হয়, ইহা লইয়া একটা গণ্ডগোল আছে। Physical lawএর অনুজ্ঞাকে কেহ moral বলে না। তজ্জন্য যে শাস্তিভোগ, তাহাকে অসৎ কার্য্যের ফল মনে করা উচিত কি না বিচার্য্য। ইহ জন্মে কর্ম্মের সহিত ফলের সঙ্গতি দেখা যায় না। যাহারা ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী বলিয়া লোককে বুঝাইতে চাহে, তাহারা এইরূপে ফাঁপরে পড়ে। কাজেই তাহাদিগকে পরলোকের কল্পনা করিয়া সেইখানে পুরস্কার ও তিরস্কারের ব্যবস্থা করিতে হয়। 'কর্ম্ম-কথা'র "ধর্ম্মের জয়" নামক প্রবন্ধে আমি এ বিষয় কিছু আলোচনা করিয়াছি। ব্রাহ্মণ বা বৌদ্ধ উভয়কেই এই গোলে পড়িতে হইয়াছে। এই জন্যই স্বর্গ ও নরকের কল্পনা দরকার হইয়াছে। হিন্দু ও

বৌদ্ধ স্বর্গের সুখ ও নরকের দুঃখ বর্ণনায় পরস্পরকে হারাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধ বোধ হয় হিন্দুর এক কাঠি উপরে গিয়াছেন। সাহিত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা—দেবলোকের ঐশ্বর্য্য ও নরকের ভীষণতা দেখাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টান ও মুসলমান এ বিষয়ে পিছুপাও হন নাই। দেবলোকের মধ্যে ইন্দ্রলোক বোধ করি শ্রেষ্ঠ। সেখানে কল্পবৃক্ষ, মন্দার, পারিজাত, কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু হিন্দু-সমাজের নিতান্ত মূর্খও জানে, ইন্দ্রলোক খুব যে একটা স্পৃহণীয় পদার্থ, তাহা নহে! দেবতাদের এই রাজাকে যখন তখন অসুরেরা আসিয়া তাড়াইয়া দিত। সেই ইন্দ্রের পার্শ্বে স্থান লাভ যে পরম পুরুষার্থ, ইহা কোনও হিন্দুই বিবেচনা করে না। ইন্দ্রলোকে অবিমিশ্র সুখ নাই; এবং সেখানে বাস চিরস্থায়ী হয় না; নহুষের মত রাজা আসিয়া যে ইন্দ্রকে তাড়াইয়া দিত, অতি মূর্খ হিন্দুও সে ইন্দ্র-পদ প্রার্থনা করে না। হিন্দু ইন্দ্রত্ব চায় না; সে সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত চায় না; সে এমন একটা স্থান চায়—যেখানে সে স্থায়ী ভাবে তিষ্ঠিতে পারে। মীমাংসা-দর্শনের আচার্য্যদের কথা কয়েক বার বলিয়াছি। ইঁহারা বেদের কর্ম্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারা সমস্ত বেদ মানিতেন, বেদকে প্রতিষ্ঠা করাই ইঁহাদের কাজ, অথচ ইঁহারা দেবতা মানিতেন না। সাধারণ লোকে দেবতা মানে। সাধারণের নিকট দেবতারা objects of perception, অথবা objects of possible perception; কিন্তু মীমাংসকদিগের নিকট তাঁহারা concepts মাত্র। মীমাংসকদের তর্ক-প্রণালীতে ইংরেজীনবিস খুশী হইবেন। তাঁহারা বলিতেন, ইন্দ্র অত বড় ঐরাবত সহ ঘটে অধিষ্ঠান করিলে ঘটে কুলায় কিরূপে? মাটির ঘট ভাঙ্গিবে না? দেবতার সম্বন্ধে যাঁহাদের এই মত, তাঁহাদের নিকট দেবলোক কি পদার্থ, বলা বাহুল্য। অথচ বেদে স্বর্গের কথা আছে। স্বর্গের অর্থ তাঁহারা করেন,—পরম সুখ, বৈধ কর্ম্ম সম্পাদনে মনের যে সুখ, সেই সুখ। কর্ম্মের একটা ফল আছে; তাহা কাহারও ইচ্ছার অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সৎ কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল যে মনের সুখ, তাহাই স্বর্গ।

"এই মতের scientific worth যতই হউক, ইহা জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। তাহারা physical pleasuresএর প্রলোভন চায়, physical painএর ভয় চায়। এই জন্যই নন্দন কাননের আর চৌষট্টি নরকের আবিষ্কার হইয়াছে।

"সুখের প্ররোচনা যতই কার্য্যকরী হউক, সুখের উদ্দেশে যে কাজ, তাহা খাঁটি moralityর অনুমোদিত নহে। নিজের সুখ না বলিয়া, সমাজ-হিত, লোকহিত, বিশ্বমানবের হিত বলিলেও চলে না ; কেন না, শেষ পর্য্যন্ত Humanityর জন্য ত্যাগ স্বীকার আত্মরক্ষার নামান্তর হইয়া দাঁড়ায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ কথা মানিতে বাধ্য হইয়াছেন। কোনরূপ উদ্দেশ্য লইয়া ত্যাগ স্বীকারে বিশুদ্ধ morality হয় না। ত্যাগের জন্য ত্যাগ স্বীকারই খাঁটি morality। এই খাঁটি ত্যাগ স্বীকারের একটি পুরস্কার অনিবার্য্য ; উহাকে সুখ না বলিয়া অন্য কোনও নাম দেওয়া উচিত। শাস্ত্রে উহাকে আনন্দ বলা হয়। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে যে আত্মতুষ্টির কথা বলা হইয়াছে, সেই আত্মতুষ্টিই এই আনন্দ। সৎকর্ম্মের ফল আত্মার পরিতোষ। পরার্থে ত্যাগ স্বীকারে এই আনন্দ পাওয়া যায় ; কিন্তু এই আনন্দ পাইব, এইরূপ হিসাব করিয়া ত্যাগে প্রবৃত্ত হইলে ইহাকে moral বলা চলিবে না। ত্যাগ স্বীকারের দ্বারাই, সর্ব্বভূতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াই যে আত্মার পরিতোষ, যে আনন্দ, ইহাতেই আত্মা যদি চরিতার্থ হয়, তাহাকে ইংরাজীতে self-realisation বলা যাইতে পারে। সর্ব্বভূতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া এই self-realisationকে আমাদের শাস্ত্রে যজ্ঞ বলা হইয়াছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ভাষা হইতে এই শব্দটি কুড়াইয়া লইয়া তদুপরি এই চরম অর্থ আরোপ করা হইয়াছে। যজ্ঞেন যজ্ঞং অযজন্ত দেবাঃ,—ইহার সঙ্কীর্ণ অর্থ যাহাই হউক,—ত্যাগের জন্যই ত্যাগ স্বীকার এই উক্তির লক্ষ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র করি না। 'কর্ম্ম-কথা'র শেষ প্রবন্ধে আমি এ কথার আলোচনা তুলিয়াছি।

"এই প্রসঙ্গে আর গোটাকতক কথা বলিতে চাহি। অনেকে বেদান্তে জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের বিরোধ কল্পনা করেন। যে মুক্ত, তাহার পক্ষে সংসারই যখন মিথ্যা, তখন তাহার কর্ম্মের প্রয়োজন কি ? কর্ম্মও তাহার পক্ষে মিথ্যা। ফলে জ্ঞানপন্থীরা অনেকে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলেন। এমন কি, পাপ পুণ্য উভয়ই তাহাদের নিকট অর্থশূন্য হওয়ায় তাহাদের মধ্যে antinomianism বা স্বেচ্ছাচারিতা আসিয়া পড়ে। বেদান্তের মধ্যে এই বিরোধ আমি স্বীকার করি না। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" ইহা বেদান্তেরই উক্তি। জীবত্ব গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম এড়াইবার আমার উপায় নাই। ভগবদ্গীতা ইহা পুনঃ পুনঃ জোরের সহিত

বলিয়াছেন। Physical lawএর অধীনতা স্বীকার করিয়া যখন ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিতেই হইবে, শ্বাস প্রশ্বাসও ফেলিতে হইবে, তখন moral lawএর অধীনতা মানিব না বলিলে চলিবে কেন? পার—দুইটাই বর্জ্জন কর, একটা রাখিয়া অন্যের বর্জ্জন চলিবে না। কাজেই বেদান্ত এবং বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিগ্রন্থ ভগবদ্‌গীতা কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলেন না। কর্ম্মের সহিত মুক্তির বিরোধ নাই। আমি ত স্বেচ্ছাক্রমে নিজের আনন্দের জন্যই জীব সাজিয়া কর্ম্মের খেলা খেলিতেছি। এই স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মের অভিনয় কি আমাকে বদ্ধ করিতে পারে? এই যে কর্ম্ম-নিয়তি, ইহা ত আমারই স্থাপিত। স্বেচ্ছাক্রমেই আমি এই নিয়তির বশ হইয়াছি। ইহা যখন আমি জানি, তখন এই সংসার হইতে, এই কর্ম্মের বন্ধন হইতে আমার ভয় কোথায়? আমার কামনা নাই, আমি পূর্ণকাম; এবং আপ্তকাম; অথচ স্বেচ্ছাক্রমেই এই কর্ম্মের লীলা করিতেছি। এই যে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া জীব সাজিয়াছি, এবং আমার হাতে-গড়া জগতের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি, বড় হইয়াও যে ছোট সাজিয়াছি, ইহাই ত আমার আনন্দ। এই বিশ্বসৃষ্টিই যজ্ঞ। আর যে সকল যজ্ঞ আমি সম্পাদন করি, সবই ত এই আদি যজ্ঞের অনুকরণ মাত্র। এতদ্দ্বারাই আমি আপনাকে চরিতার্থ করিতেছি, ইহাই আমার self-realisation; আমি ত সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিয়া সেই সর্ব্ব-ভূতের অধীন হইয়াছি, তাহাদের নিকট আপনাকে বলিদান দিতেছি। আপাততঃ মনে হয়, ইহা আমার আত্মসঙ্কোচন, কিন্তু ইহা বস্তুতঃ আমার প্রসারণ। সবই ত আমার, এবং আমিই সব্; কাহারও সহিত আমার ত বিরোধ নাই। এই ত্যাগ স্বীকারই যখন আমার আনন্দ, ত্যাগাত্মক কর্ম্ম করিয়াই যখন আমার চরিতার্থতা, তখন আমি কর্ম্ম করিব না কেন? আমি মুক্ত পুরুষ,—ইহা জানিয়াই যখন আমি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি, এবং করিতেছি, তখন আমি কর্ম্মে ভয় পাইব কেন? কর্ম্ম করিও না,—এইরূপ আদেশে আমি free agent বাধ্য হইব কেন? আমার জন্য ইহ কালের বা পরকালের কোনরূপ সুখের প্রলোভন আবশ্যক মাত্র নহে।

"কেন কর্ম্ম করিব? এ বিষয়ে আমি স্বাধীন। বিশ্বসৃষ্টিরূপ মহযজ্ঞ, তদর্থে জীবত্ব স্বীকার বা আত্মবলিদান, ইহাই আমার প্রধান এবং এক মাত্র কর্ম্ম। আর যে সকল ছোট কাজ, সবই এই কর্ম্মের অনুকূল হইলেই আমার আনন্দ। কোনরূপ ফলাফল হিসাব না করিয়া কেবল

ত্যাগের জন্য ত্যাগেই আমার চরিতার্থতা প্রাপ্তি, self-realisation, আনন্দ লাভ এবং আত্মার পরিতোষ। সেই আনন্দকে সম্মুখে রাখিয়া তদুদ্দেশে আমার কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ণকাম আমার আবার উদ্দেশ্য কি? তবে আমি মৎকল্পিত পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করি, এবং তাহাতে আনন্দই পাই, এই মাত্র। কাজেই কর্ম্ম আমাকে বন্ধন করিতে পারে না। সংসারে যাহাকে দুঃখ বলি, তাহাতে আমার শোকই বা কি, আর মোহই বা কি? আমি যখন জানি—আমি চিরমুক্ত, তখন এই বদ্ধবৎ আচরণে অথবা না জানিবার ভান করিয়া আত্মবিস্মৃতবৎ আচরণে বাধা দিবে কে? অতএব জ্ঞানের পথের সহিত কর্ম্মের পথের কোনও বিরোধ নাই। ত্যাগাত্মক কর্ম্মই আমার কর্ত্তব্য, কেন না, তাহা বিশ্বসৃষ্টিরূপ যজ্ঞের অনুকূল; স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া উহার অনুষ্ঠানে আমার আনন্দই হইবে।

"কর্ম্ম যেমনই সাধু হউক, উহাতে মুক্তি বা নির্ব্বাণ হয় না; ইহাতে হিন্দু ও বৌদ্ধ একমত। জ্ঞানী ব্যক্তি নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্মে তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। এই নিষ্কাম ধর্ম্মের কথাটা বঙ্কিম বাবুই প্রথমে স্পষ্ট করিয়া ইংরেজীনবিসদের নিকট উপস্থিত করেন। গীতায় যাহাকে কামনা, কাম, আসক্তি বলা হইয়াছে, বৌদ্ধ তাহাকে তৃষ্ণা বলেন। হিন্দু বলেন, কামনার ফলে বন্ধন; বৌদ্ধ বলেন, তৃষ্ণার ফলে সংসার। কর্ম্মত্যাগে কাহারও অধিকার নাই। নিষ্কাম নির্লিপ্ত ও ফলাফলে উদাসীন হইয়া কর্ম্ম করিবে,—গীতার এই সার উপদেশ আমরা বঙ্কিম বাবুর নিকট শিখিয়াছি। সমস্ত মহাভারতখানাকে আমরা গীতার textএর কাব্যাকারে illustration মনে করিতে পারি। অর্জ্জুনে ও ভীষ্মে আমরা নিষ্কাম কর্ত্তব্যপরতার দৃষ্টান্ত পাই। যেন কোনও একটা নিয়তি অথবা দুর্নিবার fate সমস্ত ঘটনারাশিকে তাড়িত করিয়া একটা মহাপ্রলয়ের মুখে ঠেলিয়া চলিতেছে; তাঁহারা সেই তাড়নার বশে নিজের কার্য্য করিতেছেন; তজ্জন্য তাঁহাদের শোকও নাই, দুঃখও নাই। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্; অর্জ্জুন আগাগোড়া সেইরূপ নিমিত্ত মাত্রের মত আপনাকে চালাইয়াছেন। দু-একটা স্থান ব্যতীত অর্জ্জুনকে হর্ষে, ক্রোধে বা শোকে অভিভূত হইতে দেখা যায় না; চোখের জল ফেলা তাঁহার অভ্যাস নহে। পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জ্জুনই এক হিসাবে শ্রেষ্ঠ; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলাফল তাঁহারই বীর্য্যের আয়ত্ত। তাহা তিনি জানেন, অথচ তিনি

কোনরূপ কর্তৃত্ব করেন না। তিনি যুধিষ্ঠিরের সম্পূর্ণ অধীন; যুধিষ্ঠিরকে তিনি পরামর্শও গায়ে পড়িয়া দেন না, যুধিষ্ঠিরের কাজের সমালোচনাও করেন না। তিনি soldier মাত্র; যুদ্ধ করিয়াই খালাস। অর্জ্জুনে আমরা যে দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, ভীষ্মে তাহারই পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। এত বড় প্রকাণ্ড massive পুরুষত্বের দৃষ্টান্ত আর কোনও দেশের সাহিত্যে আছে কি না জানি না। যে বীর ইচ্ছা করিলে সবই করিতে পারে, অথচ ইচ্ছা করিয়া সবই পরিত্যাগ করিয়াছে; যে সন্ন্যাসী, সংসারে তাহার কর্ত্তব্য কিছুই রাখে নাই, অথচ যে সন্ন্যাস পালনের জন্য বনে যাওয়ারও আবশ্যকতা বোধ করে নাই; নিজের কর্ত্তব্য না থাকিলেও যখন যে কর্ম্ম আপনা হইতে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা সমাধান করিয়াছে; এমন করিয়া সমাধান করিয়াছে, যাহা অন্যে পারিত না; যাহার ক্রোধ নাই, দ্বেষ নাই, কোনও অভিমান নাই, কোনও স্বার্থ-সম্পর্ক নাই, এমন কি, স্নেহ মমতা ভালবাসা পর্য্যন্তও নাই; যে জানে, আমি সকলের চেয়ে বড়—অথচ যে বিনা কারণে নিতান্ত ছোট হইয়া পরগৃহে বাস করে;—এত প্রকাণ্ড character কোনও সাহিত্যে আছে কি না, আমি জানি না। ভারতবর্ষে এক কালে ক্ষাত্র ধর্ম্মের বা chivalryর যে আদর্শ ছিল, ভীষ্মে আমরা সে আদর্শ মূর্ত্তিমান্ দেখিতে পাই। Chivalryর আনুষঙ্গিক কোনরূপ মলিনতা এ আদর্শকে স্পর্শ করে নাই। এ আপনার মাহাত্ম্যে এত বড় যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র করে না। ক্ষাত্র ধর্ম্মের এই আদর্শ সৃষ্টির জন্য ভীষ্মকে একাধারে কর্ম্মী এবং সন্ন্যাসী করিতে হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য, purity এবং chastity নহিলে বোধ হয় এই আদর্শ সম্পূর্ণ হইত না; সেই জন্যই বোধ হয় ভীষ্মকে বিবাহ করিয়া গৃহী হইবার অবসর দেওয়া হয় নাই। Arthurian Knightগণের মধ্যে Sir Galahadএ আমরা কতকটা এই চেষ্টা দেখিতে পাই। Sir Galahadএর মত ভীষ্ম বলিতে পারিতেন:

> I never felt the kiss of love,
> Nor maiden-hand in mine.

আরও বলিতে পারিতেন:

> My good blade carves the casques of men,
> My tough lance thrusteth sure,
> My strength is the strength of ten,
> Because my heart is pure

Sir Galahadই একমাত্র chaste knight, যিনি Holy Grailএর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। ভীষ্ম সেইরূপ এক মাত্র ক্ষত্রিয়বীর, মৃত্যু যাঁহার ইচ্ছাধীন ছিল। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের এই আদর্শ যতই প্রকাণ্ড হউক, ইহার মধ্যে যে একটু সঙ্কীর্ণতা আছে, তাহার জন্য আমরা ইহাকে মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের ইনি হয়ত চরম আদর্শ; এই সর্ব্বতোভাবে নিঃস্বার্থ, ফলাফলে নিস্পৃহ, রাগদ্বেষবর্জ্জিত, স্নেহ মমতা অনুরাগের ঊর্দ্ধে অবস্থিত, শোক ও মোহের অতীত, দৃঢ় বলিষ্ঠ চরিত্রের সম্মুখে আমরা প্রণত হই, এবং অভিভূত ধূল্যবলুণ্ঠিত হই; কিন্তু ইহার প্রতি অনুরাগের চেষ্টা, প্রীতির চেষ্টা আমাদের মত প্রাকৃত জনের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র।

"বঙ্কিম বাবু মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মানব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; বোধ হয়, এটা ঠিক হয় নাই। বঙ্কিম বাবু শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন, এবং ঈশ্বরের মানবরূপে অবতরণ অসম্ভব নহে, এরূপ যুক্তিতর্কও উপস্থিত করিয়াছেন। বেদপন্থী হিন্দুর পক্ষে এইরূপ যুক্তি-তর্কের কোনও প্রয়োজন দেখি না। আমিই ব্রহ্ম, ইহাই যখন বেদের চরম কথা, তখন এরূপ যুক্তিতর্কের প্রয়োজন কি? ব্যবহার-জগতে যেখানে বহু জীবের অস্তিত্ব for pragmatic reasons স্বীকার না করিলে জীবন-যাত্রা চলে না, তখন যে-কোনও ব্যক্তি আমিই ঈশ্বর, এইরূপ পরিচয় দিলে আপত্তি চলিবে না। "তৎ ত্বমসি" এই মহাবাক্যে সে কথা স্পষ্টতঃ স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব লোকস্থিতির জন্য কোনও ধর্ম্ম-উপদেষ্টা যদি কোনও মানব-চরিত্র কল্পনা করিয়া তাঁহার মুখ দিয়া বলান যে, আমিই ঈশ্বর, এবং সেই চরিত্র অবলম্বন করিয়া কাব্য, ইতিহাস বা পুরাণের সাহায্যে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করেন, তাহাতে বেদপন্থীর কোনই আপত্তি হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসী হইলেও সে কথা চাপা দিয়া মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে মানবত্বের আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় ইহা ঠিক হয় নাই; ঈশ্বর-ভাবে না দেখিলে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে না। মহাভারতের ঘটনাচক্র cosmic processএর অভিনয় মাত্র। সহস্রবিধ পাশবিক unmoral forces চারি দিক্ হইতে জটলা করিয়া একটা বিরাট্ ঝঞ্ঝাবাত্যার সৃষ্টি করিয়াছে। কোটি মানবে সহস্র বৎসরের চেষ্টায় যাহা গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা সেই

ভীষণ tornadoর আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া একেবারে চুরমার হইয়া গেল। ইহা একটা দারুণ determinism ; ক্ষুদ্র মানবের চেষ্টায় ইহার গতি রুদ্ধ হয় না ; ইহা নিষ্ঠুর ও নিষ্করুণ ব্যাপার ; মনুষ্যের সুখ দুঃখের প্রতি ইহা দৃক্‌পাতই করে না ; ইহার ভিতর মানুষের ক্ষুদ্র পাপ-পুণ্যের হিসাব খুঁজিয়া বিশেষ কিছু লাভ নাই। বহু কালের গড়ন্ত জিনিষকে ইহা এক মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করে, কোনরূপ দ্বিধা করে না ; ইহার মধ্যে কোনরূপ মঙ্গলময় উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা চলে না। বৌদ্ধ বা হিউমের মত নাস্তিকের নিকট এই নিয়তি আপনা হইতে বিদ্যমান, কেহ তজ্জন্য দায়ী নহে। আস্তিকের নিকট ইহা বিশ্ববিধাতার খেলা মাত্র ; কেন তিনি এই খেলা খেলিতেছেন, তাহা তিনিই জানেন। কুরুক্ষেত্রের ঘটনা বস্তুতঃই ভূ-ভার হরণের ব্যাপার। মানব-সমাজে লোকস্থিতি যখন out of gear হইয়া পড়ে, তখন সমাজ আপনাকে এইরূপে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া হয়ত পুনর্গঠিত করিয়া equilibrium পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লয়। সম্প্রতি য়ুরোপে যে আগুন জ্বলিয়াছে, য়ুরোপের সমুদয় culture তাহাতে পুড়িয়া ছারখার হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহাকেও সেই কুরুক্ষেত্র ব্যাপারের আরও larger scaleএ পুনরভিনয় বলিয়া মনে করিতে পারি। ব্যাপারটা cosmic processএর অন্তর্গত, এবং এই হিসাবে fully determinate অর্থাৎ নিয়তির বশ ; কিন্তু ইহার factorগুলা এত অসংখ্য এবং জটিল যে, কোনরূপ Science of History ইহার হিসাব করিতে পারে না। গীতার বিশ্বরূপ দর্শন অধ্যায়ে এ কথা স্পষ্টতঃ স্বীকার করা হইয়াছে। স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, ইহার সমস্ত ফলাফল পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট আছে, অর্জ্জুন এবং অন্যান্য অভিনেতারা নিমিত্ত মাত্র। সূত্রবিলম্বিত পুতুলের মত তাঁহারা এক জন খেলোয়াড়ের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। ঈশ্বরবাদী মহাভারতকার শ্রীকৃষ্ণকে সেই খেলোয়াড়ের স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি এই মহানাটকের এক মাত্র সূত্রধার। তিনি জানিয়া শুনিয়া সূত্র চালনা করিয়া এই প্রকাণ্ড খেলা খেলিতেছেন। তিনি আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন এবং পদে পদে আপনার সে পরিচয়ও দিয়াছেন, এবং সম্পূর্ণ নিষ্কাম ও নির্লিপ্তভাবে এই খেলা খেলিতেছেন। তিনি স্বয়ং যন্ত্রী, মহাভারতের সমস্ত যন্ত্রটা তিনি একা চালাইতেছেন ; অথচ মজা এই যে, যিনি যন্ত্রী, তিনিও যন্ত্রারূঢ় হইয়া স্বকর-চালিত চক্রভ্রমিতে আরোহণ করিয়া নিজেও

ঘুরিতেছেন। কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত সকল মহারথ এবং অতিরথ তাঁহারই চক্র-চালিত, অথচ তিনি নিতান্ত ন্যাকা সাজিয়া অর্জ্জুনের রথে সারথি মাত্র হইয়া বসিয়া আছেন। মহাভারতের শেষ ভাগে যদুবংশ-ধ্বংস-কাহিনী জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; এও সেই ভূ-ভার হরণ ব্যাপার; এও সেই বহু বৎসরের বহু চেষ্টায় বহু প্রযত্নে নিজের হাতে গড়া জিনিষ মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলা ব্যাপার। কৃষ্ণ যে উচ্ছৃঙ্খল যদুকুলকে কংসের ও জরাসন্ধের হাত হইতে বহু চেষ্টায় বাঁচাইয়া, দ্বারকায় উপনিবিষ্ট করিয়া, অজেয় এবং দুর্দ্ধর্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন, এক দিনের খেয়ালে সেই বংশ কাটাকাটি করিয়া লুপ্ত হইয়া গেল; তিনি তাহা দাঁড়াইয়া দেখিলেন; তাঁহার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল পড়িল না; হৃদয়ে একটা স্পন্দন হইল না; অবশেষে তিনি নিজেই ব্যাধের হস্তে প্রাণ দিয়া মর্ত্ত্যলীলা শেষ করিলেন। কৃষ্ণকে কেবল মানব-আকারে দেখিলে ইহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য বুঝা যায় না; তাঁহাকে ঈশ্বররূপে দেখিলে তবে ইহার ষোল আনা significance বুঝা যায়। আমার 'চরিত-কথা' পুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে এবং 'কর্ম্ম-কথা' পুস্তকে ধর্ম্মের জয় প্রসঙ্গে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি। কবি নবীনচন্দ্র তাঁহার কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস কাব্যে কৃষ্ণকে এইরূপ মানবেশ্বর ভাবে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং আমার বিবেচনায় অনেকটা সফল হইয়াছেন।

"মহাভারতের কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর; তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে জীব সাজিয়া জীবের মত বদ্ধবৎ আচরণ করিতেছেন; কিন্তু তিনি সর্ব্বতোভাবে নিষ্কাম, নির্লিপ্ত, শোক-মোহের অতীত, সুখ-দুঃখের পরপারে অবস্থিত; তাঁহার মমতা নাই, বোধ হয় করুণাও নাই। এইরূপ নিষ্কাম নির্লিপ্ত সুখ-দুঃখ-বর্জ্জিত পুরুষ আদর্শ মানব হইতে কিছুতেই পারেন না। তিনি সর্ব্বতোভাবে ইতর মানবের অনুকরণের অতীত। ভীষ্মের বা অর্জ্জুনের মত নিষ্কাম মানব তাঁহার মর্ত্ত্য বা পার্থিব reproduction হইতে পারে। কৃষ্ণই বল, আর ভীষ্মার্জ্জুনই বল, ইহাদের মধ্যে যে নিষ্কাম নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব দেখা যায়, তাহা লইয়া জনসাধারণের ethical conduct পরিচালনার আদর্শ পাওয়া যায় না। গীতার উপদিষ্ট নিষ্কাম ধর্ম্মের academic illustrationএর দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ইহাদিগকে দেখান যাইতে পারে; সাধারণ মানুষের মন ভিজাইতে যাহা দরকার, তাহা শ্রীকৃষ্ণের অতিমানুষ চরিত্রে এবং ভীষ্মার্জ্জুনের মানুষ চরিত্রে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু নিষ্কাম নির্লিপ্ত উদাসীন

পুরুষ নহেন ; তিনি সর্ব্বতোভাবে সকাম ; এমন কি, সাক্ষাৎ কামের মূর্ত্তি। তিনি নিজে হাসেন এবং কাঁদেন, এবং অন্যকে হাসান এবং কাঁদান ; নিজে চোখের জল ফেলেন। অন্যের চোখে জল ফেলাইয়া স্বহস্তে তাহা মুছাইয়া দেন। কিন্তু সকাম মানব সাজিলেও তিনি মানব নহেন ; এমন কি, তাঁহাকে ঈশ্বরও বলা যায় না। সাধারণতঃ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বলিয়া যাহা গৃহীত হয়, তাহা তাঁহাতে নাই। তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপে আনন্দময়রূপ। এই আনন্দময়তাই তাঁহাতে প্রকট ; ঈশ্বরত্ব ভাবটা তাহার নিকট পরাহত। বদনে ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত থাকিলেও তিনি তাহা দেখাইতে চাহেন না ; cosmic processএর খেলা হইতেও তিনি দূরে থাকিতে ইচ্ছুক। জগদ্ব্যাপারের বিভীষিকা যদি নিতান্তই কোনও অসুররূপে—কালিয় সর্পরূপে অথবা ইন্দ্রের ক্রোধরূপে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসে, হেলায় অঙ্গুলি তাড়নে তিনি তাহাকে সরাইয়া ফেলেন, এবং তাহাকে চাপা দিয়া আপনার হ্লাদিনী শক্তির সহিত আনন্দ-লীলার অভিনয়ে প্রবৃত্ত হন। তিনিও আপনাকে পূর্ণকাম বলিয়া জানেন ; অথচ সম্পূর্ণ সকামের মত আনন্দ-লীলার অভিনয় করেন। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণে মনুষ্যের ethical conductএর আদর্শ পাইবার কোনও আশা নাই। মহাভারতের কৃষ্ণ জানিয়া শুনিয়া বদ্ধবৎ আচরণ করেন, এবং সামাজিক মনুষ্যের মত সমুদয় বিধি মানিয়া চলেন। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ কেবল আনন্দের অভিনয় করেন, কিন্তু সে অভিনয়েও আপনাকে ধরা দেন না ; কোনরূপ সামাজিক বিধি-নিষেধের তিনি অধীন নহেন। এমন কি, তাঁহার সে আনন্দলীলার পূর্ণতা সাধনের জন্য যে বাধ্যতাটুকু আবশ্যক, সে বাধ্যতাটুকু স্বীকারেও তিনি নারাজ। রাসমণ্ডলের নৃত্য গীত উৎসবের মধ্যে তিনি সহসা অন্তর্হিত হন ; রাধিকাকে বঞ্চিত করিয়া তিনি চন্দ্রাবলীর নিকট হঠাৎ চলিয়া যান ; সমস্ত গো, গোপ ও গোপিকাকে কাঁদাইয়া, বৃন্দাবনের তরু লতা পর্য্যন্ত কাঁদাইয়া তিনি হঠাৎ এক দিন মথুরা চলিয়া যান। পূর্ণকামের এই কামাভিনয় কোনরূপ বন্ধন স্বীকার করে না ; অতএব ইহাও সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যের অনুকরণের অতীত। আত্মা যে free agent, অথচ determinismএর অধীনতার অভিনয় করে মাত্র, বৃন্দাবনের ও মহাভারতের দুই কৃষ্ণকে দিয়া এই দার্শনিক তত্ত্ব কাব্যাকারে ফুটান হইয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় দর্শনশাস্ত্র freedom ও necessity এই দুয়ের বিরোধ সমন্বয়ের জন্য অদ্যাপি মাথা খুঁড়িতেছে।

"ফলে মহাভারতে বা বৃন্দাবন-লীলায় আমরা সামাজিক জীবরূপী মানবের ethical আদর্শ পাই না; তজ্জন্য আমাদিগকে রামায়ণে আসিতে হয়। মানবের পূর্ণ আদর্শ যদি দেখিতে চান, তাহা হইলে এইখানে আসিতে হইবে। রামচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বর, এ ত ঠিকই কথা। বেদপন্থীর কাছে ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য; কিন্তু তিনি পুরাপুরি মানব। রামায়ণের মধ্যে তাঁহার ঈশ্বর-ভাবকে কোথাও প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। যেখানে তাঁহার ঈশ্বরত্বের উল্লেখ আছে, সেখানটা প্রক্ষিপ্ত মনে করিলেও হানি হইবে না। তিনি কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দেন নাই। সাধারণের মধ্যে একটা কথা আছে যে, তিনি ঈশ্বর হইলেও আত্মবিস্মৃত ছিলেন; তিনি কে, তাহা তিনি জানিতেন না; এ কথা ঠিক। তাঁহাতে জীবভাব, মানুষভাব, বদ্ধভাব পূর্ণ প্রকটিত; এবং তাঁহার মনুষ্যত্ব কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ। তিনি ইতর প্রাকৃত জনের মত আপনাকে যুগধর্ম্মে বদ্ধ করিয়াছিলেন। নির্লিপ্ত নিষ্কাম সমদুঃখসুখ প্রভৃতি বিশেষণ তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করা যায় না; তিনি দুঃখ এবং শোক ষোল আনা ভোগ করিবার জন্যই যেন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি যত দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, আর কোনও মনুষ্য তাহা করে নাই। তিনি যত কাঁদিয়াছেন, পৃথিবীতে কোন মনুষ্যই তত কাঁদে নাই। অথচ এই শোক-দুঃখের বিভীষিকা তাঁহাকে কর্ত্তব্য-পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। কর্ত্তব্য-পথ দেখিবার জন্য যুধিষ্ঠিরের মত তাঁহাকে সাবধানে পা ফেলিয়া চলিতে হয় নাই; কোনরূপ ফলাফল হিতাহিত গণনা করিতে হয় নাই। তাঁহার নরদেহের ভিতরে গুপ্তভাবে যিনি অবস্থিত ছিলেন, তিনি একবারে তাঁহাকে সরল পথ দেখাইয়া দিয়াছেন; সেই প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া কেবল আত্মপরিতোষের জন্য, আপনার চরিতার্থতা প্রাপ্তির জন্য তিনি আপনার সমস্ত জীবনটাকে পুরুষ-যজ্ঞে পরিণত করিয়াছিলেন; দ্বিধা মাত্র না করিয়া আপনার হৃৎপিণ্ডকে সেই যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন। সীতা-নির্ব্বাসন ব্যাপারটা সেই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইয়াছিল। অসঙ্কোচে পিতার আদেশ পালন করিয়া বিপদ্‌সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি যখন রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার দুঃখের সমাপ্তি কল্পিত হইতেও পারিত। কিন্তু তখনও যজ্ঞের পূর্ণাহুতি বাকী ছিল। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি নূতন বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা তৎকালোচিত রাজধর্ম্মের বন্ধন। কোনও কালে, কোনও দেশে, কোনও সমাজেই জনসাধারণের যে স্বাধীনতা আছে,

রাষ্ট্রপতি রাজার সে স্বাধীনতা নাই। রাষ্ট্রচালনার ভার গ্রহণ করিবা মাত্র রাজা রাষ্ট্রমধ্যে প্রচলিত যুগধর্ম্মের অধীন হইযা পড়েন, তদুপরি হস্তক্ষেপে তাঁহার স্বাধীনতা থাকে না। রামচন্দ্রেরও সেই স্বাধীনতা ছিল না। সীতার প্রতি চাহিয়া রাজ্যভার abdicate করিবার স্বাধীনতাও বোধ করি তাঁহার ছিল না। সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়া নরহত্যায় সঙ্কুচিত হইবার স্বাধীনতা যেমন পায় না, এমন কি, সেই যুদ্ধ ন্যায়-যুদ্ধ, কি অন্যায়-যুদ্ধ, তাহার বিচারেরও স্বাধীনতা পায় না, রাজধর্ম্মের অধীন হইয়া রামেরও সেই দশা হইয়াছিল। এই জন্য তিনি দ্বিধাহীন হইয়া কোনরূপ গণনা মাত্র না করিয়া আপনার হইতে প্রিয়তর আপনার অর্দ্ধাঙ্গকে সেই পুরুষ-যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন। ইহা সেই ছান্দোগ্যোপনিষদের পুরুষ-যজ্ঞের ব্যাপার; গীতাশাস্ত্র এই পুরুষ-যজ্ঞকে ভিত্তি করিয়া ethical শাস্ত্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মহাভারত সেই শাস্ত্রের illustration বটে, কিন্তু মহাভারতে জীবের জীবভাবের সহিত ব্রহ্মভাবকে মিশাইতে গিয়া যে সকল নিষ্কাম নির্লিপ্ত আসক্তিরহিত উদাসীন পুরুষ-চরিত্রের অবতারণা করিতে হইয়াছে, তাহাতে মানবত্বের চরম আদর্শ পূর্ণ হইতে পারে নাই; জন-সাধারণের চিত্ত তাহাতে স্নেহ-রসে এবং করুণ-রসে তেমন আর্দ্র করিতে পারে নাই। সেই জন্য ভারতবর্ষের জনসমাজে নরনারীর গার্হস্থ্য জীবনের উপর মহাভারতের চেয়ে রামায়ণের প্রভাব অনেক অধিক। আত্মজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের অতিমানুষ-চরিত্র ভারতবর্ষে পূজা পাইয়া আসিতেছে; কিন্তু আত্মবিস্মৃত শ্রীরামের মানুষ-চরিত্র ভারতবর্ষে জনসমাজের জীবনের ধারা চিরকাল ধরিয়া নানা রসে পূর্ণ করিয়া প্রবাহিত রাখিয়াছে।

"এই পুরুষ-যজ্ঞের গোড়া ঋগ্বেদ-সংহিতার পুরুষসূক্তে পাওয়া যায়। এই সূক্তে বলা হইয়াছে যে, এক সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ সহস্র-পাদ পুরুষ বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্ত্তমান ছিলেন; তিনি যজ্ঞের জন্য আপনাকে যজ্ঞে আহুতি দেন; তাঁহার দেহের খণ্ডিত অংশ হইতে বিশ্ব-জগতে যাহা কিছু আছে, সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। James Mill না কি বলিয়াছেন যে, বৈদিক ঋষির এই কল্পনা grotesque এবং hideous; Andrew Lang দেখাইয়াছেন যে, এইরূপ একটা বিকটাকার জন্তুর দেহ খণ্ডিত করিয়া জগতের উৎপত্তির কল্পনা অন্যান্য savage জাতির মধ্যেও দেখা যায়। Myth হিসাবে ইহার ঐতিহাসিক মূল্য যাহাই হউক, ব্রাহ্মণের হাতে এই

কল্পনা বেদপন্থী সমাজের ethical philosophy এবং religion of redemption দুইয়েরই ভিত্তিরূপে গৃহীত হইয়াছে। এই বিরাট্ পুরুষ আত্মারই বিশ্বমূর্ত্তি; আত্মাই আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারই যজ্ঞ; এই যজ্ঞে তিনি এক হইয়াও বহু হইয়াছেন, এবং আপনাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া জগতের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কেবল ত্যাগের জন্যই এই ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, বড় হইয়াও ছোট হইয়াছেন, মুক্ত এবং স্বাধীন হইয়াও বদ্ধ ও পরাধীন হইয়াছেন। এ সকল কথা ঐ পুরুষ-সূক্ত-মধ্যেই স্পষ্টাক্ষরে আছে। বিশ্বস্রষ্টার এই ত্যাগাত্মক কর্ম্মই সমস্ত ethical conductএর চরম আদর্শ। মনুষ্যের যে কর্ম্ম এই আদিম secrificeএর অনুরূপ ও অনুকূল, তাহাই খাঁটি moralityর অনুমোদিত। ইহা কেবল ত্যাগ মাত্র; নিজের বা পরের স্বার্থের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক মাত্র নাই। বেদপন্থী সমাজের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ছান্দোগ্যোপনিষদে পুরুষ-যজ্ঞের বিবরণে এবং গীতাশাস্ত্রে এই তত্ত্বই ফলান হইয়াছে। বৌদ্ধেরা আত্মা মানিতেন না, ঈশ্বরও মানিতেন না, তাঁহাদিগের ethical scienceএর ভিত্তি স্থাপনে তাঁহারা বড় গোলে পড়িয়াছেন। সাধু কর্ম্মের ফলে হিত হয়, যে ভাল কাজ করে, সে ভাল ফল পায়; অতএব ভাল কাজই করিবে, ইহার অধিক তাঁহারা বলিতে পারেন নাই। এইরূপ একটা কর্ম্মনিয়ম জগতে প্রতিষ্ঠিত আছে, উহা মানিলেই ফল ভাল হইবে, না মানিলে মন্দ হইবে, এইরূপ প্রলোভন সম্মুখে স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে ethical scienceএর পত্তন করিতে হইয়াছিল। কাজেই বৌদ্ধদের ethical scienceএর ভিত্তি utilitarian। ব্রাহ্মণও এই কর্ম্মনিয়মের অস্তিত্ব মানেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের চরম কথা নহে। ফলাকাঙ্ক্ষার সম্পর্ক থাকিলে কোনও কর্ম্মই purely ethical হইতে পারে না। তাহাতে সংসারের বন্ধনে জড়াইয়া পড়িতেই হয়। বৌদ্ধও যে এটুকু বুঝিতেন না, এমন নহে; sacrifice for the sake of sacrifice, যজ্ঞের জন্যই যজ্ঞ, যে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম, কোনরূপ প্রলোভনের সম্পর্কে আসিলেই উহার বিশুদ্ধি নষ্ট হয়, সেটুকু তিনিও বুঝিয়াছিলেন; তবে ইহার philosophical basis তিনি খুঁজিয়া পান নাই। আত্মাকে অস্বীকার করিয়া তিনি তাহার ভিত্তি গোড়াতেই উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছেন। Doctrinal basis দৃঢ় না

হইলেও বৌদ্ধেরা কার্য্যতঃ একটা concrete দৃষ্টান্ত সম্মুখে পাইয়াছিল, যাহার চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেহ পায় নাই। স্বয়ং বুদ্ধদেবের জীবন এই দৃষ্টান্ত। বুদ্ধদেবের পক্ষে বাহিরের কোনও প্রলোভন ছিল না; সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম ভাবে কেবল ভিতরের প্রেরণায় নিজের সমস্ত জীবনটাকে জীবলোকের দুঃখ মোচনের জন্য তিনি সমর্পণ করিয়াছিলেন। আগেই বলিয়াছি, পুরুষ-যজ্ঞের এত বড় দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর নাই; doctrineএর ভিত্তিটা তেমন দৃঢ় ছিল না বলিয়াই বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবের personalityর এই আদর্শটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল; এবং কাব্যে, কথায়, গল্পে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, সহস্র উপায়ে এই আদর্শকে জন-সমাজের চোখের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিল; এবং বুদ্ধদেবের ইহ জীবনে সন্তুষ্ট না হইয়া সহস্র পূর্ব্বজন্মের কল্পনা করিয়া, নানা জন্মে নানা অবদানের উপাখ্যান প্রচার করিয়াছিল। সর্ব্বত্রই সেই এক কথা। করুণাসিন্ধু ভগবান্ জীবহিতের জন্য আপনার দেহ এবং প্রাণ সমর্পণ করিতেছেন। করুণাসিন্ধুর দয়া অসীম; কৃমি কীট কেহই বাদ যায় না; সকলকেই রক্ষার জন্য তিনি সর্ব্বদা আপনার প্রাণ দিতে প্রস্তুত। এই জন্যই কতকটা বাধ্য হইয়া বৌদ্ধগণকে মূর্ত্তি গড়িয়া বুদ্ধপূজা প্রচলন করিতে হইয়াছিল। খ্রীষ্টানেরা এই যজ্ঞতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে বেদপন্থীর সহিত খ্রীষ্টানের মিল বরং অধিক; কেন না, খ্রীষ্টান ঈশ্বরবাদী। ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া মানব জাতির হিতার্থ আপনাকে বলি-স্বরূপে অর্পণ করিতেছেন। এই sacrificeএর জন্যই Christএর অবতরণ। খ্রীষ্টানের নিকট যে ঘটনা এক বার মাত্র ঘটিয়াছিল, হিন্দু ও বৌদ্ধের নিকট তাহা বহু বার ঘটিয়াছে ও ঘটিবে। Christian ethicsএরও ভিত্তিপত্তন এই যজ্ঞ-ব্যাপারে। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে ইহার প্রথম পরিচয় আমরা পাই; সেই পুরুষসূক্তেই আমরা Redeemerএরও প্রথম সন্ধান পাই। বিরাট্ পুরুষ স্বয়ং সেই Redeemer; তিনি জগৎ-হিতের জন্য আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন; তাঁহার সহস্র চক্ষু সেই জগতের দিকে চাহিয়া আছে; সহস্র পদ দ্বারা সেই জগতে তিনি ভ্রমণ করিতেছেন। অন্যত্র তাঁহাকে বিশ্বতশ্চক্ষুঃ উত বিশ্বতো মুখঃ, বিশ্বতঃ পাণিঃ উত বিশ্বতস্পাৎ —বলা হইয়াছে। গীতার বিশ্বরূপ-বর্ণনায় অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্র ইত্যাদি বিশেষণও মনে করিবেন। আমাদের প্রধান দেবতাগণের বহু মস্তক বহু লোচন বহু হস্ত প্রভৃতি কল্পনার গোড়া এইখানে। বৌদ্ধদিগের saviour

অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের রূপকল্পনাও এইরূপ। অবলোকিতেশ্বরের বহু হস্ত ও বহু মস্তক। অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তিতে থাকে থাকে অনেকগুলি মাথা সাজান রহিয়াছে দেখা যায়। অবলোকিতেশ্বরের অন্য নাম "সমন্তমুখ," চারি দিকে যাহার মুখ। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, চতুরানন ব্রহ্মার অনুরূপ করিয়া ইহার মূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে। বৌদ্ধ-মতে অবলোকিতেশ্বরের বাহন হংস, ইহাতেও সেই অনুমান সমর্থন করে। বেদ-মতে হংস আত্মার রূপ; বৌদ্ধ-মতে হংসের কোনও সার্থকতা নাই। অবলোকিতেশ্বর ব্রহ্মার মতই রক্তবর্ণ, এবং রক্ত পদ্মের উপরে আসীন। বৌদ্ধ Trinityর কথা আগে বলিয়াছি; ধ্যানী বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব এবং মানুষ-বুদ্ধ, এই তিন লইয়া সেই Trinity। বর্ত্তমান জগতের ধ্যানী বুদ্ধের নাম অমিতাভ; তাঁহার আনুষঙ্গিক বোধিসত্ত্বের নাম অবলোকিতেশ্বর, এবং মানুষ-বুদ্ধের নাম শাক্যমুনি। এই অমিতাভকে আমরা খ্রীষ্টানদের God the Fatherএর অনুরূপ মনে করিতে পারি। অমিতাভের সহিত অবলোকিতেশ্বরের সম্বন্ধ পিতাপুত্রের সম্বন্ধের মত; অতএব অবলোকিতেশ্বর খ্রীষ্টানদের Son of God বা Christএর স্থানীয়। এই Christ মানব-দেহ ধরিয়া যীশুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টানদের সেই যীশু বৌদ্ধদের মানুষ-বুদ্ধ শাক্যমুনির স্থানীয়। Christ তাঁহার fatherএর পার্শ্বে বসিয়া মানব জাতির জন্য সর্ব্বদা করুণা ভিক্ষা করিতেছেন। যে লোকে তিনি আছেন, সেই লোক খ্রীষ্টানদিগের Heaven: তিনি আবশ্যক-মত নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া মানব জাতির নিষ্ক্রয় বা ransom-রূপে আপনাকে বলি দিয়াছেন। অবলোকিতেশ্বরও সেইরূপ সুখাবতী নামক লোকে অমিতাভ বুদ্ধের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্ত জগতের প্রতি চারি দিকে চাহিয়া আছেন এবং সর্ব্বজীবের দুঃখ মোচনের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন। তিনি মানুষ-বুদ্ধরূপে কপিলবাস্তুতে অবতীর্ণ হইয়া জীবের উদ্ধারের পথ দেখাইয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব যে-পথ দেখাইয়াছিলেন, উহা উৎকট সাধনার পথ। পথে চলিতে চলিতে বহু জন্মের সাধনায় অবিদ্যা মোচন হইলে তবে নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়। নির্ব্বাণ অতি দুর্লভ জিনিষ, তাহা বৌদ্ধেরাই স্বীকার করিয়াছেন। অথচ সর্ব্বসাধারণের উদ্ধার লাভের একটা সহজ বন্দোবস্ত না হইলে ভগবানের করুণাময়ত্বে ব্যাঘাত ঘটে। এই জন্যই বৌদ্ধদিগকে এই অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের কল্পনা করিতে হইয়াছিল। ইনি প্রকৃত পক্ষে saviour;

জীবের উদ্ধারই ইঁহার এক মাত্র কার্য্য। ইঁহার পত্নী তারা দেবী প্রকৃতই ভবতারিণী। হিন্দুরা এই তারা দেবীকে বৌদ্ধের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন অথবা উভয়েরই কোন সাধারণ মূল ছিল, ভারত-ইতিহাসের লুপ্ত অধ্যায় আবিষ্কৃত না হইলে তাহার মীমাংসা হইবে না। খ্রীষ্টের পত্নী নাই, তবে মাতা আছেন,—Virgin Mary; তিনি কতকটা তারা দেবীর অনুরূপ।

"বৌদ্ধেরা বেদকে যতই অগ্রাহ্য করুন, এই ব্যাপারে বেদবাদের গন্ধ প্রচুর পাওয়া যায়। বুদ্ধ অমিতাভ নামেই তাহার পরিচয়। ইংরাজী তর্জ্জমায় ইঁহাকে বলা হয় Buddha of Boundless Light। এই জ্যোতির কথা বেদের কথা। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, জ্যোতিঃস্বরূপ, light; অন্যান্য দেবগণ স্বয়ংপ্রকাশ না হইলেও আত্মার জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়, এ কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। এই জ্যোতির্ম্ময়তা বাদ দিলে ব্রহ্মণ্য আদৌ টিকে না। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে এই জ্যোতিঃ পদার্থের বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই। বুদ্ধ অমিতাভের আর একটি নাম "বুদ্ধ অমিতায়ু"। বৈদিক শাস্ত্রে পদে পদে নিত্য বস্তুর উল্লেখ আছে; বৌদ্ধ-মতে সমস্তই অনিত্য ও ক্ষণিক; মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা সমস্ত বস্তুকেই শূন্যে সমাপ্ত করিয়াছেন। অথচ এই চিরজীবী "অমিতায়ু বুদ্ধ" তিব্বত হইতে চীন, জাপান, কোরিয়া ও মঙ্গোলিয়া জুড়িয়া বসিয়া আছেন। খাঁটি বৌদ্ধ-মতে eucharist ভক্ষণ বা ইড়া ভক্ষণের বিশেষ সার্থকতা থাকিতে পারে না; অথচ এশিয়া মহাদেশের উত্তর অঞ্চল ব্যাপিয়া সকলে eucharist ভক্ষণ দ্বারা অমিতায়ু বুদ্ধের একাত্মতা লাভে অমরতা পাইবার জন্য ব্যাকুল। বৌদ্ধরা বেদকে যতই অবজ্ঞা করুন, এই অমিতাভ বুদ্ধ বা অমিতায়ু বুদ্ধকে তাঁহারা বেদ হইতেই পাইয়াছেন, তাহা অস্বীকারের উপায় নাই। তৎপরে অবলোকিতেশ্বর। মহাযানী বৌদ্ধদিগের practical religionএ অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব স্বয়ং বুদ্ধকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। চীনে ভাষায় অবলোকিতেশ্বরের নাম "কোয়াং য়িং"। খ্রীষ্টান পাদরিরা চীন মুলুকে ইহার সহিত খ্রীষ্টের সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন; এবং কোনও অতীত কালে খ্রীষ্টান মিশনরীরা চীন মুলুকে প্রবেশ করিয়া খ্রীষ্ট-পূজা প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, অবলোকিতেশ্বর-পূজা তাহারই অবশেষ, এইরূপ অনুমানে কুণ্ঠিত হন নাই! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই "কোয়াং য়িং" দেবতার নানা মূর্ত্তির মধ্যে এক প্রধান মূর্ত্তির সহস্র চক্ষু এবং

সহস্র হস্ত। আরও আশ্চর্য্য যে, এই দেবতার নামান্তর "বাক্" অর্থাৎ ইনি বাগ্‌দেবতা বা শব্দব্রহ্ম। পাদরী Beal সাহেব তাঁহার Catena of Buddhist Scriptures from Chinese নামক গ্রন্থে চীন দেশের অবলোকিতেশ্বরের পূজার প্রসঙ্গে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য বুঝাইতে গিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, যে-সময়ে বুদ্ধবাক্য সঙ্কলিত হইয়া লিপিবদ্ধ হয়, সেই সময়ে সেই ঘটনার স্মরণার্থ অবলোকিতেশ্বরের বাক্য-রূপত্ব কল্পিত হইয়াছিল। বাগ্‌দেবতা এবং শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার পর ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অন্বেষণে অধিক দূর যাইতে হইবে না। মনে রাখিবেন, Christ মানবদেহধারী Logos অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম। খ্রীষ্টের সহিত অবলোকিতেশ্বরের সাদৃশ্য কোথা হইতে কিরূপে আসিল, এ সম্বন্ধে অলমতিবিস্তরেণ!

"এই বুদ্ধ অমিতায়ুঃ এবং তাঁহার পুত্র অবলোকিতেশ্বর যে-লোকে বাস করেন, সেই লোকের নাম সুখাবতী। এই সুখাবতীর ঐশ্বর্য্য বর্ণনায় বৌদ্ধ লেখনী অনন্ত নাগের মত সহস্রজিহ্ব হইয়া পড়িয়াছে। Max Mullerএর প্রকাশিত সুখাবতী ব্যূহ নামক গ্রন্থখানি আনাইয়া রাখিয়াছি, তাহার পাতা উল্টাইয়া দেখুন। স্বয়ং বুদ্ধদেব আনন্দকে বলিতেছেন, ওহে আনন্দ, যে পশ্চিম দেশে সুখাবতী নামে বুদ্ধক্ষেত্র আছে, সেখানে অসংখ্য বোধিসত্ত্বে ও শ্রাবকগণে পরিবৃত হইয়া অমিতাভ বুদ্ধ উপবিষ্ট আছেন। তিনি বজ্রাসনে আসীন; উহা diamond throne। অমিতাভ অসংখ্য প্রভা, তাহার পরিমাণ পাওয়া যায় না। অপরিমিত তাঁহার আয়ুর প্রমাণ। সুখাবতীতে কেবলই রত্নবৃক্ষ, সুবর্ণময়, রৌপ্যময়, বৈদূর্য্যময়; তাহার ফল-সকল স্ফটিকময়; সেখানকার পুষ্করিণীতে রত্ন-পদ্ম ফুটে, সেই সকল পদ্ম হইতে শত সহস্র কোটি রশ্মি বিকীর্ণ হয়। তাহার চারি দিকে রত্ন-পর্ব্বত; সেই সকল পর্ব্বতের পার্শ্বে ব্রহ্মকায়িক ব্রহ্মপুরোহিত মহাব্রহ্মা-সকল বাস করেন। সেই সকল পর্ব্বত হইতে যে সকল নদী নির্গত হইতেছে, বুদ্ধক্ষেত্র তাহাদের সুরভি বারি বহন করিতেছে; রত্নময় পুষ্প স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে; উভয় তীরে নানাজাতীয় পশু পক্ষী শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখকর শব্দ করিতেছে; সেই শব্দমধ্যে বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, পারমিতা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা প্রভৃতি শব্দ সর্ব্বদা ধ্বনিত হইতেছে। সেখানে কোনও অসুর, প্রেত, তির্য্যক্-যোনির প্রবেশ নাই। সেখানকার অধিবাসীরা রত্নময় মুকুট, কুণ্ডল, কটক,

কেয়ূর প্রভৃতি নানা অলঙ্কারে ভূষিত। সেখানে চিরকাল মৃদু মন্দ সুরভি বায়ু বহিতেছে। সে দেশ সর্ব্বদা জ্যোতির্ম্ময়; অন্ধকারের লেশ মাত্র নাই। ভগবান্ অমিতাভের চতুঃপার্শ্বে বুদ্ধগণের সংখ্যা গঙ্গানদীর বালুকাপ্রমাণ; তাঁহারা সকলেই অমিতাভের নাম-কীর্ত্তন ও গুণগান করিতেছেন। অমিতাভের চারি দিকে বোধিসত্ত্বগণের সংখ্যা গঙ্গানদীর বালুকাপ্রমাণ; তাঁহারা সেই অমিতাভকে পরিক্রমণ করিয়া তাঁহার বন্দনা ও উপাসনা করিতেছেন। তাঁহাদের গাত্র হইতে শত সহস্র কোটি প্রভা নির্গত হইতেছে। এই বোধিসত্ত্বগণের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর প্রধান। সেখানে অর্হতের সংখ্যাও অপরিমিত—শত কোটি, কি সহস্র কোটি, কি শত সহস্র কোটি তাহা গণা যায় না।

"আর পুঁথি বাড়াইতে চাহি না। বৌদ্ধদিগের এই সুখাবতীর বর্ণনার সহিত আমাদের পুরাণে ও আধুনিক বৈষ্ণব গ্রন্থে গোলোকের এবং ব্রজমণ্ডলের বর্ণনা মিলাইয়া দেখিবেন। সর্ব্বত্রই দেখিবেন, মণি রত্ন বৈদূর্য্য প্রবালের ছড়াছড়ি, সর্ব্বত্রই নদীতে রত্ন-পুষ্প ভাসিতেছে। রত্ন-বৃক্ষে মাণিকের ফল ঝুলিতেছে; রত্ন-সজ্জায় ভূষিত নরনারী ক্রীড়া করিতেছে। সর্ব্বত্রই গান এবং বাদ্য এবং উৎসব। সর্ব্বত্রই সেই একই কথা—আলো আর আলো আর আলো; আনন্দ আর আনন্দ আর আনন্দ। সুখাবতীর বোধিসত্ত্বগণের ও অর্হৎগণের স্থলে গোলোকে গোপগণ ও গোপীগণকে বসাইবেন। এক এক যূথেশ্বরী গোপীর শত সহস্র অনুচরীকে বসাইবেন। ফলে একের বর্ণনা অন্যের বর্ণনার সহিত মিলিয়া যাইবে। বৌদ্ধ আর বৈষ্ণব,—কে কাহার নিকট ধার করিয়াছেন, তাহা আমি বলিতে চাহি না; তবে মূল অন্বেষণ কোথায় করিতে হইবে, তাহাও খুলিয়া বলা অনাবশ্যক।

"বৌদ্ধেরা একবাক্যে এই সুখাবতীর অবস্থান "পশ্চিমায়াং দিশি" কল্পনা করিয়াছেন। সে কোথায়? পৌরাণিকের কল্পনায় ক্ষীর-সমুদ্রের তটে শ্বেতদ্বীপ—সেও ত পশ্চিমে। King Arthur তাঁহার তিরোভাবের পর যে Avallon দ্বীপে গিয়াছেন, আর ফিরেন নাই, সে দ্বীপও ত পশ্চিমে। সেই island valley of Avallon,—

> Where falls not hail, or rain, or any snow,
> Nor ever blows wind loudly, but it lies
> Deep meadowed, fair with orchard lawns.

এই বর্ণনা কি সুখাবতীর দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি মাত্র ?

"আর পারেন যদি, খ্রীষ্টানদের Heavenএর সহিতও এই সুখাবতীর এক বার তুলনা করিয়া লইবেন। হাতের কাছে Paradise Lostখানা খুলিয়া দেখুন। দেখুন, সেখানে "above the starry spheres" Father God বসিয়া আছেন—তিনি immortal Eternal (অমিতায়ু) এবং Fountain of light (অমিতাভ) জ্যোতির্ম্ময় "Invisible amidst the glorious brightness"; সেইখানে জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে বসিয়া তিনি চারি দিকে চাহিয়া আছেন—

> From the pure empyrean where he sits
> High-throned above all highth, bent down his eye.
> His own works and their works at once to view.

তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার পুত্র Son-God বসিয়া আছেন—

> And in the face
> Divine compassion visibly appear'd,
> Love without end, and without measure grace.

তাঁহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য archangels ও angels সর্ব্বদা তাঁহার স্তুতি গায়িতেছেন—

> ... ... Heav'n rung
> With jubilee, and loud hosannas fill'd
> Th' eternal regions : Lowly reverent
> Towards either throne they blow. and to the ground
> With solemn adoration down they cast
> Their crowns inwove with amaranth and gold,
> And flow'rs aloft shading the fount of life,
> And where the river of bliss through midst of Heaven
> Rolls o'er Elysian flowers her amber stream,
> ... ... The bright
> Pavement, that like a sea of Jasper shone,
> Impurpled with celestial roses smiled.

আর দরকার নাই। সুখাবতীর অক্ষরে অক্ষরে ইংরেজী তর্জ্জমার মত শুনায় না কি ?

মানুষের "ransom"—বেদের ভাষায় নিষ্ক্রয়—দরকার, তজ্জন্য Son-God প্রার্থনা করিলেন—

> Behold me then ; me for him, life for life
> I offer, on me let Thine anger fall ;

Account me Man ; I for his sake will leave
Thy bosom, and this glory next to Thee
Freely put off, and for him lastly die
Well pleased, on me let Death wreak all his rage.

"পুরুষ-সূক্তের প্রার্থনা মনে করিয়া এই প্রার্থনার সহিত বুদ্ধদেবের প্রার্থনাটাও মিলাইয়া যাইবেন—"কলিকলুষকৃতানি যানি লোকে, ময়ি নিপতন্তু বিমুচ্যতাং তু লোকঃ"—কলি রূপলোকে যত পাপ আচরণ করিয়াছে, তাহা আমার উপর পতিত হউক, লোক তাহা হইতে মুক্তি লাভ করুক।

"কথার জঙ্গলে পথহারা হইয়াছেন নিশ্চয় ; শেষে একবার sum up করা যাউক। বেদপন্থীর মুক্তি, বুদ্ধপন্থীর নির্ব্বাণ—উভয়ের পক্ষে জগৎ মিথ্যা—ইহ-পরকাল নাস্তি, স্বর্গ নরক নাস্তি ; চিত্রে repesentation হয় না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গাঙ্গুলীও সে দিন বলিয়াছিলেন—হিন্দুর মন্দিরের অভ্যন্তরে কোনও ভাস্কর্য্য ও চিত্র থাকে না, ইহাই সাধারণ নিয়ম। মুক্তি বা নির্ব্বাণের অনুরূপ কোনও অবস্থা খ্রীষ্টানিতে নাই। সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাকালে দেবযানে গতি, আর দেবতার সহিত একাত্মতা লাভের চেষ্টায় দেবতার সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য, সারূপ্য লাভ—ইহা হইতে পৌরাণিক হিন্দুর ব্রহ্মলোকে, শিবলোকে, বিষ্ণুলোকে গতি ; উহা মুখ্যতর ভক্তিমার্গে প্রাপ্য—ওখান হইতে সংসারে ফিরিতে হয় না। সাধারণ হিন্দুর পক্ষে উহা ভবসংসার হইতে নিষ্কৃতি—শমন-ভয় হইতে নিষ্কৃতি। বৌদ্ধমতে ইহা অনাগমীর অবস্থা—অনাগমীরা শীল (সৎকর্ম্ম) ও সমাধি (যোগবল) দ্বারা এই অবস্থা পান ; ফলে রূপলোকে বা ব্রহ্মলোকে গতি হয়—সেখান হইতে ফিরিতে হয় না। হিন্দুর পক্ষে ইহার চরম পরিণতি গোলোকে—বিষ্ণুলোকেরও উর্দ্ধে ; সেখানে যুগল-উপাসকদের স্থান। বৌদ্ধগণের চরম পরিণতি সুখাবতীতে—সেখানে বোধিসত্ত্বগণের ও অর্হৎগণের স্থান। শীল ও সমাধির উপরে প্রজ্ঞা (জ্ঞানবল) দ্বারা অর্হতেরা এই লোকে স্থান পান। কিন্তু গোলোকবাসীও মুক্ত নহেন, সুখাবতীবাসীও নির্ব্বাণ পান নাই।

"হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের ভিতরে যদি কোনও representation থাকে, তাহা এই অবস্থায়। মন্দিরের ভিতরের দেওয়ালে paintingগুলি এই অবস্থাজ্ঞাপক।

"বেদের পিতৃযানের পরিণতি নরলোক হইতে দেবলোকে, যমলোকে বা নরকে যাতায়াত। সাধু বা অসাধু কর্ম্মের ফলে এই সকল লোকে কিছু দিনের

জন্য যাতায়াত করিতে হয়। ইহাই সুখদুঃখের বন্ধন; অতএব ইহা বদ্ধাবস্থা। হিন্দুর ভাষায় ফলকামনা, বৌদ্ধের ভাষায় তৃষ্ণা এই গতায়াতের হেতু। বৌদ্ধ-মতে এই সমুদয় লোক মারের অধীন। মারের নামান্তর কাম। দেবলোক, নরলোক, যমলোক, নরক, সমুদয়ই কামলোকের অন্তর্গত—এক পর্য্যায়ের জিনিষ—কেবল এ-ঘর আর ও-ঘর। এ বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ একমত।

"মন্দিরের বাহিরের দেওয়ালে এই কামলোকের চিত্র পাইবেন। অমরাবতীর ঐশ্বর্য্য হইতে নরলোকের সুখ-দুঃখ এবং নরকের যাতনা, সবই চিত্রিত দেখিবেন। দেবতাদের নানা খেলার সহিত মানব-জীবনের সমুদয় খেলা পর্য্যন্ত দেখিবেন। রাজারাজড়ার কাণ্ড হইতে গরিব গৃহস্থের গৃহস্থালী পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবেন। এমন কি, ভগবান্ বুদ্ধের মর্ত্ত্যলীলার চিত্র হইতে মানবদেহধারী রামচন্দ্রের, শ্রীকৃষ্ণের লীলা পর্য্যন্ত দেখিবেন। সবই কামলোকের ব্যাপার। বৌদ্ধেরা ইহার জঘন্য দিক্‌টা চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল—কেন না, দুঃখবাদী বৌদ্ধের নিকট কামলোক বর্জ্জনীয়, জঘন্য, কুৎসিত। আনন্দবাদী ব্রাহ্মণ ইহাকে কুৎসিত ভাবেন না। হিন্দুমন্দিরে জঘন্য চিত্র দেখিলে তাহা বৌদ্ধ প্রভাবের ফল বুঝিবেন।

"খ্রীষ্টানের Heavenকে আমরা গোলোক ও সুখাবতীর অনুরূপ মনে করিতে পারি। খ্রীষ্টান transmigration মানেন না; কাজেই পিতৃযানের অনুরূপ কিছু খ্রীষ্টানিতে নাই। Heavenএর পরে একেবারে Hell; Heaven খ্রীষ্টের রাজ্য, ওখানে অনন্ত সুখ; Hell শয়তানের রাজ্য, সেখানে অনন্ত দুঃখ। মাঝামাঝি কিছু নাই। কাজেই খ্রীষ্টানের নিকট পরকালটাই সব—ইহ কাল কিছুই নহে। বৌদ্ধ ইহা অবৈজ্ঞানিক বলিবেন। Roman Catholic Christianরা একটা Purgatory মানেন; সেখানে পাপী শাস্তিভোগ করিয়া কতকটা বিশুদ্ধি পায়। Protestantরা সেই Purgatoryও উঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট যে-পাপী খ্রীষ্টের শরণ লয় নাই, তাহার কোনও আশাই নাই। আর খ্রীষ্টানদের Doctrine of Predestination—তদনুরূপ কোনও কিছু হিন্দু বা বৌদ্ধ-মতে পাইবেন না। আর না। এইখানে কথা ইতি করা যাক।"

বিচিত্র প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় পর্য্যায়

[১৯২৭ সনে প্রথম মুদ্রিত]

নিবেদন

বিচিত্র প্রসঙ্গের সহিত ৺আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ঘটনাচক্রে সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার তিরোভাব হইল। ভণিতা-স্বরূপ যে কয়টি বিষয়ের অবতারণা হইয়াছিল, সেগুলি এই পুস্তকের প্রথম স্তবকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।...

১লা আষাঢ়, ১৩৩৪ — শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত

জীব-বিজ্ঞান

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এখন [অগ্রহায়ণ ১৩২০] অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। আজ কথায় কথায় তাঁহাকে বলিলাম, "সম্প্রতি ডাক্তার কর্ণেল ইউ. এন. মুখার্জ্জি (উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) মহাশয়ের সহিত সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলাম। কর্ণেল মুখার্জ্জি বলেন, "সমস্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করিয়া দেখিলে একটা বিষয় বেশ বুঝা যায়, পাশ্চাত্য ভাব-বন্যায় আমাদের সাহিত্য আমাদের সমাজ হইতে বহু দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; সমাজ রহিল এক দিকে, সাহিত্য গড়িয়া উঠিল আর এক দিকে; উভয়ের মধ্যে একটা নাড়ীর যোগ নাই। সাহিত্যের মধ্যে যে সকল ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে সকল কোনও কাজেই আসিল না; বিপুল হিন্দুসমাজের প্রান্তস্থ বেলাভূমিতে আছাড় খাইয়া যেখান হইতে উদ্ভব, সেইখানেই ফিরিয়া গেল; কয়েকটি মুষ্টিমেয় শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালীকে ঘিরিয়া ফেনিল হইয়া আবর্ত্তিত হইতে লাগিল মাত্র; কেবলই উচ্ছ্বাস, কেবলই ফেনা, কেবলই আলোড়ন, কেবলই গর্জ্জন। বাঙ্গালার লক্ষ পল্লী স্তব্ধ হইয়া রহিল; রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ কি কথা বলিতে চাহিলেন, কি গান শুনাইলেন, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। এ ভাব যেন তাহাদের নয়, এ ভাষা যেন তাহাদের নিজের সুরে বাঁধা নয়; তাহাদের মর্ম্মকথা, তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র, তাহাদের কর্ম্মজীবন এ সাহিত্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল না। মহাকাল নির্নিমেষ নেত্রে গত শত বর্ষের এই করুণ ট্র্যাজেডির অভিনয় দেখিলেন; দেখিলেন, বাঙ্গালী সন্তান Zeit Geistএর সম্মুখে, Time Spiritএর সম্মুখে, যুগধর্ম্মের সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়াছেন; ভুলিয়া গিয়াছেন যে, Zeit Geist ছাড়া আর একটা জিনিষ আছে,—Folk Geist, নারায়ণী শক্তি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত সমস্ত বাঙ্গালী-সাহিত্য এই Folk Geist হইতে উদ্ভূত। উদ্যতফণা ভুজঙ্গের সম্মুখে নীড়স্থ পক্ষিশাবকের যে অবস্থা, প্রতীচ্য সভ্যতার সম্মুখে বাঙ্গালী হিন্দুরও সেই অবস্থা; সে ছট্‌ফট্ করিতেছে, কিন্তু পলাইতে পারে না।" মুখার্জ্জি সাহেব চুপ করিলেন। আমি বলিলাম,—"সুখের বিষয় এই যে, আমাদের অনেকের এখন এ বিষয়ে চোখ ফুটিয়াছে; পাশ্চাত্য

ভাব-বন্যার প্রথম ধাক্কাটা সামলাইতে আমাদের এক শত বৎসর লাগিল বটে, কিন্তু এই শত বর্ষও বোধ হয় ব্যর্থ যায় নাই ; আমাদের সমাজের প্রান্তস্থ বেলাভূমিতে একটা পলি পড়িয়াছে। যুগধর্ম্মের সম্মুখে কে না মাথা হেঁট করে ? কিন্তু—The moving finger writes, and having writ moves on. এই চেতনা, এই জাগরণই আমাদের নবজীবন, আমাদের Renaissance।"

রামেন্দ্র বাবু বলিলেন, "কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন 'মানসী' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় আজকালকার বিদেশীয় শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা প্রসঙ্গে দেশের কথা তুলিয়াছিলাম, তখন কেহই আমার কথায় সায় দিলেন না। বরং কেহ কেহ আমার মস্তিষ্কবিকৃতির আশঙ্কায় আক্ষেপ করিয়াছিলেন। আজ দেখিতেছি, আপনারা অনেকেই বলিতেছেন, 'এবার ফিরাও মোরে'।"

আমি বলিলাম, "কাল রবিবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। অন্যান্য অনেক কথার পর বিলাতের সাহিত্য ও সমাজের কথা তুলিলাম। বলিলাম, 'আমাদের সাহিত্য ও আমাদের সমাজ ত আপনি বরাবরই দেখিতেছেন ; বিরাট্ সমাজদেহটা কোথায় পড়িয়া রহিল, আর হাওয়ার উপরে রামধনুর মত একটা সাতরঙা সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। আচ্ছা, বলুন দেখি, আজকালকার বিলাতের সাহিত্য ও সমাজ আপনার কেমন লাগিল ? সেখানে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাব-তরঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, এই রকমই ত আমার মনে হয়। সেখানকার সাহিত্য Folk Geist হইতে উদ্ভূত ; দেশের লোক যাহা চায়, দেশের সাহিত্যের মধ্যে ভেরী বাজাইয়া তাহা ঘোষিত হইতেছে ; নারী-বিদ্রোহই বলুন, আর ধনি-নির্ধনের দ্বন্দ্বই বলুন, তাহাদের সাহিত্যে তাহার ছাপ পড়িতেছে। ব্যাভার্ষ্টক্ (Baverstock), এইচ. জি. ওয়েল্‌স (H. G. Wells), চেষ্টার্টন (G. K. Chesterton), হিলেয়ার বেলক্ (Hillaire Belloc) বার্ণার্ড্ শ (Bernard Shaw) ক্যাথ্‌রিন্ টাইনান (Catherine Tynan) প্রভৃতি লেখক-লেখিকারা যে সকল কথা ছোট গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, সন্দর্ভে বলিতেছেন, সে সকল তাঁহাদের নিজের দেশের কথা, নিজের সমাজের কথা। এই যে সাময়িক উত্তেজনায় সংক্ষুব্ধ সমাজের সহিত সাহিত্যের নিবিড় সংস্রব, ইহা কি সাহিত্যকে খর্ব্ব করিতেছে না ?' রবিবাবু বলিলেন,— 'ইহার মধ্যেও একটা নিত্য, শাশ্বত, সনাতন সামগ্রী আছে। এদের সমাজ

জাগ্রত, সাহিত্য জাগ্রত; সাহিত্যের উপর সমাজ যে রেখাপাত করিয়া যাইতেছে, সেইটাই আজকালকার এ দেশের ইতিহাসকে জীবন্ত করিয়া রাখিবে।'"

রামেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এই বিষয়টা বেশ ভাল করিয়া আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। ইংলণ্ডে উপন্যাস-সাহিত্য এখন আসর জমাইয়া বসিয়া আছে, সামাজিক ভাব পুষ্টির যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। ডিস্রেলি (Disraeli) যখন উপন্যাসকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তির অনুকূল করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তখন আর কেহ সে পথ অবলম্বন করিতে বড় সাহস করে নাই। এখন দেখুন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্ত কথাই উপন্যাসের ভিতর দিয়া আলোচিত হইতেছে; দেশের লোককে শিক্ষা দিবার, প্রবুদ্ধ করিবার ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সোশ্যালিজম্, হোমরুল, নারীজাতির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার, এ সমস্তই উপন্যাসে প্রতিফলিত হইতেছে। আমাদের দেশেও উপন্যাস অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। এখন দেখিতে হইবে, সেই উপন্যাসের ভিতর কি কি সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে। আদৌ কোনও সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে কি না, বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

"ছেলেবেলায় অনেক বাঙ্গালা উপন্যাস পড়িয়াছিলাম। ইদানীং রবিবাবুর রচিত উপন্যাস ব্যতীত আর কিছু পড়ি না। তাঁহার 'গোরা'কে অবলম্বন করিয়া আমার বক্তব্য আরম্ভ করিতে চাহি। 'গোরা'য় বরাবর আনন্দ পাইয়াছি; শেষটায় কিন্তু সে আনন্দ হঠাৎ নষ্ট হইয়া গেল। গোরা এক জন আইরিশম্যানের ছেলে। ঘটনাচক্রে সে এক জন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের ঘরে প্রতিপালিত হইয়া আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিত। ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজতন্ত্রে যাহা কিছু আছে, তাহার প্রতি গোরার একটা উৎকট ভক্তি জন্মিয়াছিল; এমন কি, আমাদের ধর্ম্মে, সমাজে, আচারে যে কিছু সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতা আছে, গোরা সেগুলিকেই আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল; যেন ভারতের, এবং ভারতের হিন্দুসমাজের সেইগুলোই বিশিষ্ট ভাব; যেন সেগুলো না থাকিলে সমাজ টিকিবে না। গোরার এই ভাবটা এত উৎকট ও উগ্র যে, বোধ হয় খাঁটি ব্রাহ্মণের ছেলে হইলে অত উৎকট হইত না। আইরিশম্যানের ছেলে বলিয়াই তাহার এই ভাবটা অত উৎকট হইয়াছিল। হিন্দুসমাজের এই বিশিষ্টতার সম্বন্ধে, এই সঙ্কীর্ণতার পক্ষে সে যেমন ওকালতি

করিয়াছে, অথবা তাহার মুখ দিয়া উপন্যাসের লেখক যেরূপ ওকালতি করিয়াছেন, সে রকম বোধ হয় আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। হঠাৎ এক দিন সে দেখিল যে, সে হিন্দুর ছেলে নহে, হিন্দুসমাজে তাহার কোনও স্থানই নাই; যে আশ্রয় সে সম্পূর্ণভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল, সেখানে তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই; তাহার সমস্ত জীবনটা যেন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; যেন আর তাহার কোনও কর্ম্মই নাই; সে জগতের মধ্যে নিরাশ্রয়, একাকী; যত দিন বাঁচিবে, উদ্দেশ্যহীন ও কর্ম্মহীন জীবনের বোঝা লইয়া একাকী মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। একটা অত্যন্ত করুণ ট্র্যাজিডি সংঘটিত হইয়া গেল; অথচ সমাজতন্ত্রের যে সঙ্কীর্ণতার দরুন এত বড় কাণ্ডটা ঘটিল, তাহার বিরুদ্ধে একটিও কথা বলিবার রহিল না; সে চিরজীবন ধরিয়া এইটাকেই সমর্থন করিয়া আসিয়াছে। ইটের পর ইট দিয়া, চুন সুরকী মসলা দিয়া যে দিন সুরম্য হর্ম্ম্যটি গড়িয়া উঠিল, হঠাৎ ভূমিকম্পে সমস্তটা চূরমার হইয়া গেল। উপন্যাসের নায়কের পঞ্জরাস্থি চূর্ণ হইয়া গেল; পাঠকেরও বুক ধসিয়া গেল; স্বয়ং লেখকেরও সেই দশা হয় নাই কি?

"গোরার এই করুণ ট্র্যাজেডি আধুনিক হিন্দুসমাজের একটা বড় সমস্যা নহে কি? ভগিনী নিবেদিতাও ত এক দিন বাহির হইতে আসিয়া কায়মনোবাক্যে হিন্দু হইয়াছিলেন; একান্তভাবে, সম্পূর্ণভাবে আপনাকে এই হিন্দুসমাজের কার্য্যে নিবেদন করিয়াছিলেন। সমাজ কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। লোকবিশ্রুত ডাক্তার কুমারস্বামীকেও আমরা সম্পূর্ণ আমাদের লোক বলিয়া পরিচয় দিতে পারি কি? যে জাপানী ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত কিমুরা এখানকার সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন, তিনিও বহু চেষ্টায় কোনও হিন্দুর গৃহে থাকিবার স্থান পান নাই। হিন্দুসমাজে এই ট্র্যাজেডি বোধ হয় এখন নিত্য অভিনীত হইতে চলিল। যত দিন ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যেই আমরা আবদ্ধ ছিলাম, তত দিন এ সমস্যাটি তত উগ্র হয় নাই। কিন্তু যে দিন হইতে বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাইতে হইয়াছে, সেই দিন হইতেই এই ব্যাপার চলিতেছে, পরকে আপন করিয়া লইতে পারিতেছি না; সমাজের মধ্যে এবং বাহিরে যাঁহারা আমাদের কল্যাণকামী আছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই ব্যাপারটি যে খুব ক্ষোভের কারণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি বাহির

হইতে আসিয়া আমাদের একান্ত আপনার হইতে চায়, ব্যক্তিগতভাবে তাহাকে আমার নিজের ঘরের ভিতর আনিয়া নিঃসঙ্কোচে তাহার সহিত একত্র বসিয়া আহার পর্য্যন্ত করিতে পারি না। ইহাতে যে ব্যথা উপস্থিত হয় না, এমন কথা বলি না। সমাজ-সংস্কারক ব্যথিত হন, এবং এই ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান্ হন; ইহা বুঝিতে পারি। আমি কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসে ইহার কারণ অন্বেষণ করিয়া মনকে যেন তেন প্রবোধ দিবার চেষ্টা করি।

"এই যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার প্রবল চেষ্টা, এই যে সামাজিক exclusiveness আমাদের আছে, ইহা অস্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু কেন এমন হইল, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক; সমাজ কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিল, তাহার অতীত ইতিহাসটা কি, কি কি কারণে এই সকল আচার-বিচার সমাজের অঙ্গীভূত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিচার দরকার বোধ করি। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সেই বিচার করিতে হইবে, Scientific study of history আবশ্যক। আবার সেই সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে অর্থাৎ তুলনামূলক আলোচনাও করিতে হইবে। অন্যান্য সমাজে এ রকম ঘটনা ঘটিয়াছে কি না, তাহার comparative study আবশ্যক। যদি দেখি যে, অন্যত্রও এইরূপ ঘটিয়াছে, তাহা হইলে আমাদের মনকে কতকটা প্রবোধ দিতে পারিব; এ রকম ঘটনা সত্ত্বেও যদি অন্যান্য জাতি নষ্ট না হইয়া থাকে বা উন্নতি করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের আশা আছে। ব্যক্তিগতভাবে আমিও বলিতে চাহি যে, এই রকম করিয়া আমি মনকে প্রবোধ দিয়া থাকি। আমার নিজের এইরূপ স্বভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিঞ্চিৎ বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলেই হউক, অথবা আর কিছু হউক, আমার ব্যক্তিগত ঝোঁক এইরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানচর্চ্চায় রাগ-ক্ষোভের স্থান নাই; মঙ্গল-অমঙ্গল, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত না দেখিয়া Science অন্বেষণ করিয়া কারণ-নির্দ্দেশে রত থাকে। সমাজ-ব্যবস্থাপক বা সমাজ-সংস্কারক মঙ্গল-অমঙ্গল, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখুন; science, যাহা আছে তাহা কিরূপে হইল, তাহা দেখিবে, পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় দ্বারা কার্য্য-কারণ-সম্পর্ক নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিবে, এই মাত্র। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান জটিল না হইয়া সরল হইলে ভাল

হইত, এরূপ ক্ষোভ প্রকাশের সময় scienceএর নাই। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল।

"স্পেনের এক রাজা জ্যোতিষ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সৌর জগতের অন্তর্গত সূর্য্য, চন্দ্র এবং গ্রহগণের গতিবিধি অত্যন্ত জটিল বলিয়া বোধ হয়; বিজ্ঞান এই জটিলতার গ্রন্থিগুলি উন্মোচন করিতে চাহে, এবং ইহার মধ্যে সরল শৃঙ্খলা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। গ্রীস দেশে টলেমি নামক এক পণ্ডিত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার বহু শত বৎসর পরে টাইকো ব্রাহি আরও একটু সরল করিয়া যে ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপে বুঝাইতে পারি। তিনি কল্পনা করিলেন যে, পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া সূর্য্য তাহার চারি দিকে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করিতেছে। যেন একখানি বৃহৎ অদৃশ্য চক্র আছে, তাহার নাভি হইল পৃথিবী, আর তাহার নেমিতে অর্থাৎ পরিধিতে সূর্য্য বেড়াইতেছে। আবার সেই সূর্য্যকে কেন্দ্র অথবা নাভি করিয়া ছোট বড় আরও অনেকগুলি অদৃশ্য চাকা আছে। সেই এক-একখানি চক্রের পরিধিতে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি এক-একটি গ্রহ ঘুরিতেছে। পৃথিবী এবং সূর্য্য উভয়েই যদি স্থির থাকিত, তাহা হইলে বুধাদি গ্রহের আপনাপন চক্রোপরি গতি তত জটিল দেখাইত না। কিন্তু বুধাদি গ্রহ যে সকল চক্রে ঘুরিতেছে, তাহাদের নাভিস্থিত সূর্য্য স্থির না থাকিয়া নিজেও এক বৃহৎ চক্রোপরি ঘুরিতেছেন। ঘুরন্ত চাকার উপরে চাকা ঘুরিতেছে; পৃথিবী স্বস্থানে স্থির থাকিয়া গ্রহগণের এই গতিবিধি দেখিতেছে; কাজেই পৃথিবীর চোখে গ্রহগণের গতিবিধি অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে। টলেমি (এবং তাঁহার পরবর্ত্তী জ্যোতিষীরা) এইরূপ কল্পনা করিয়া গ্রহগণের গতিবিধির মধ্যে কতকটা শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল যে, গতিবিধির জটিলতার সব কথা ইহাতেও পরিষ্কার হয় না। গ্রহগুলি যে-সূর্য্যকেন্দ্রক চক্রে ঘুরিতেছে, সেই চাকার উপরে আরও ছোট ছোট চাকা কল্পনা করিতে হয়; তাহাতেও যদি না কুলায়, তাহা হইলে আরও ছোট চাকার কল্পনা করিতে হয়। পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা তাহাই করিয়াছেন।...এই পর্য্যন্ত শুনিয়া রাজা বলিলেন যে, বড় চাকার (cycle) উপরে ছোট চাকা (epicycle) বসাইয়া ভগবান্ জিনিষটাকে অত্যন্ত

জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন ; সৃষ্টির সময় তিনি উপস্থিত থাকিলে সৃষ্টিকর্ত্তাকে সৎপরামর্শ দিতে পারিতেন।

"বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সর্ব্বত্রই চাকার উপর চাকা বসাইয়া শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে। বৈজ্ঞানিক বিধাতাপুরুষকে পরামর্শ দেন না, কেমন করিয়া জটিল না করিয়া সরল করা যাইত। পদে পদে বাধা পাইতে হয়, প্রতিহত হইতে হয় ; কিন্তু বৈজ্ঞানিক ক্ষোভ প্রকাশ করেন না, বিধাতা-পুরুষের জবাবদিহি চাহেন না। বস্তুতঃ এরূপ না হইলে ভাল হইত, এরূপ নির্দ্দেশ বিজ্ঞানবিদ্যার কাজ নহে ; উহা বলিবার তাহার অধিকার পর্য্যন্ত নাই।

"আজকাল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মনুষ্য-সমাজকে যন্ত্র হিসাবে দেখিতেছেন ; জড় যন্ত্র নহে, জীবন্ত যন্ত্র হিসাবে দেখাই এখন রীতি। ঘড়ি, এঞ্জিন, সৌর জগৎ প্রভৃতি জড় যন্ত্র ; গাছ, লতা, জন্তুদেহ প্রভৃতি জীবন্ত যন্ত্র। পিপীলিকার বা জীবাণুর শরীরের মধ্যে যে জটিলতা আছে, তাহা অত বড় সৌর জগৎটায় নাই। জীবদেহের সহিত তুলনা করিয়া মনুষ্যসমাজ-দেহকেও যন্ত্রবদ্ধ organised structure বলা হয়। জীবের যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, অস্থি, মজ্জা, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি আছে, সমাজ-দেহেরও সেই রকম আছে। জীবদেহের প্রত্যেক অঙ্গের যেমন এক-একটা কাজ বা function আছে, সমাজ-দেহেরও তাই। জীবদেহের মত সমাজেরও জন্ম, বৃদ্ধি, জরা, মরণ প্রভৃতি কল্পনা করা হয়। জীবন জিনিষটা কি, তাহা বলা কঠিন। হার্ব্বার্ট স্পেন্সরের definitionএ কাজ চলিতে পারে। তিনি বলেন, জীবনটা আর কিছু নহে, a continuous adjustment of internal relations to external relations, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার অবিরাম চেষ্টা। এই যে external relations, বাহিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আজকাল ইহাকে environment বলে। জীব অবিরত আপনাকে সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সমঞ্জস করিবার জন্য ব্যস্ত। এই অবিরাম, ধারাবাহিক চেষ্টার পরম্পরাই জীবন ; এই চেষ্টার এক মাত্র উদ্দেশ্য, জীবনটাকে যত দিন পারে রক্ষা করা। যে দিন এই চেষ্টার আরম্ভ, সেই দিন জীবের জন্ম হয় ; যে দিন এই চেষ্টার অবসান, সেই দিন তাহার মৃত্যু। জীবনের রক্ষা, পুষ্টি, বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সে সমস্তই বাহিরের পারিপার্শ্বিক জগৎ

হইতে আহরণ করিয়া লইতে হয়; জল, বায়ু, খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি সমস্ত উপকরণই বাহ্য জগৎ হইতে গ্রহণ করা হইতেছে। অন্য দিকে জীবের environment কিন্তু ক্রমাগতই জীবকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে; রৌদ্র, বৃষ্টি, শীতাতপ, অগ্নিদাহ, ভূমিকম্প, স্বজাতীয় বিজাতীয় নানা শত্রু জীবনটাকে নষ্ট করিতে চাহে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি শত্রু জড়, আর কতকগুলি জীব। জড় শত্রু ও জীব শত্রু হইতে আত্মরক্ষা আবশ্যক। শুধু তাহাই নহে; আপনাকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া, যতটা পারা যায়, সেই সব শত্রুকে মিত্র-রূপে পরিণত করিতে হইবে। জীবদেহের সমস্ত যন্ত্রগুলি এই উদ্দেশ্যের অনুযায়ী হইয়া গঠিত হইয়াছে; তাহা না হইলে তাহাদের কোনও সার্থকতা নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, এই সামঞ্জস্য কোনও কালেই সম্পূর্ণ হয় না; যদি হইত, তাহা হইলে বোধ হয় জরা, মরণ, দুঃখের কোনও কারণই থাকিত না। সামঞ্জস্য নাই বলিয়াই উন্নত জীবের যত কিছু ক্লেশ; এবং বার্দ্ধক্যপ্রাপ্তি ও মরণ। আবহমান কাল ধরিয়া এই সামঞ্জস্য সাধনের দিকে একটা গতি আছে, চেষ্টা আছে; কিন্তু পুরা সামঞ্জস্য হয় না। এই ষোল আনা সামঞ্জস্য কখনও ঘটে না অথচ ক্রমাগত একটা চেষ্টা আছে; এইটাকেই জীবনের প্রধান লক্ষণ বলিয়া ধরিতে পারা যায়। জড় যন্ত্রের সামঞ্জস্য প্রায় ষোল আনাই দেওয়া হইতে পারে; এমন কি, সৌর জগতের এত জটিলতা সত্ত্বেও প্রায় ষোল আনা সামঞ্জস্য আছে; লাপ্লাস প্রতিপন্ন করেন যে, এত জটিলতা সত্ত্বেও সৌর জগৎ কখনও ভাঙ্গিয়া পড়িবে না। আজকালকার পণ্ডিতেরা এতটা সাহস করেন না; তাঁহারা বলেন যে, অন্যান্য জড় যন্ত্রের মত সৌর জগৎটাও কালক্রমে এক দিন অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতে পারে।

"জীবদেহের সামঞ্জস্যের অভাব খুব বেশী। দেহযন্ত্রের গঠনপ্রণালীর ও কার্য্যপ্রণালীর পর্য্যালোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু যাঁহারা শরীর-বিদ্যা আলোচনা করেন, তাঁহারা জানেন যে, এই দেহযন্ত্রের মধ্যে কোনও যন্ত্রই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে। Optical যন্ত্র হিসাবে চক্ষুতে নানা দোষ বর্ত্তমান। হেলম্‌হোল্‌জ তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, যন্ত্র হিসাবে মানুষের চোখে এত দোষ বর্ত্তমান আছে যে, যদি কোনও যন্ত্র-নির্ম্মাতা এই রকম একটা যন্ত্র তৈয়ার করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া আসিত, তাহা হইলে তিনি সেটাকে কখনই গ্রহণ করিতেন না; স্পেনের সেই

রাজার মত বলিতে পারিতেন যে, সৃষ্টিকালে উপস্থিত থাকিলে এ রকম যন্ত্র হইতে দিতেন না। চক্ষুর মত অন্যান্য যন্ত্রগুলাও সামান্য কারণে বিকৃত হয়, অনেক সময় ডাক্তার কিছুই করিতে পারেন না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার, Environmentএর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবের দেহযন্ত্র সমঞ্জস রাখিতে পারা যায় না। এই যে maladjustment অসামঞ্জস্য, ইহাই সমস্ত ব্যাধির, সমস্ত ক্লেশের, সমস্ত দুঃখের, অমঙ্গলের এবং শেষ পর্য্যন্ত মরণের হেতু।

"পারিসের পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ জীববিদ্যাবিৎ মেচ্‌নিকফ্ (Metchnikoff) জীবদেহে নানা ব্যাধির উৎপত্তি সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগান্তর আনিয়াছেন। Bacteriology জীবাণু-বিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ নাই। তাঁহার Nature of Man পুস্তকখানি সরল সুবোধ্য ভাষায় লিখিত; সকলেরই উহা পাঠ করা উচিত। ঐ পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল Origin of Evil, অমঙ্গলের হেতু কি? তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মানুষের যাবতীয় অমঙ্গল বাহ্য জগতের সঙ্গে মানব-দেহের পূর্ণ সামঞ্জস্যের অভাব হইতে উদ্ভূত; এই অসামঞ্জস্যই সমস্ত অমঙ্গলের, ক্লেশের, দুঃখের হেতু। দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিজ নিজ কর্ত্তব্যের কতকটা উপযোগী বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে; বাহ্য জগতে কোনও রকম পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইলে আপনাদিগকে তাহার অনুযায়ী করিয়া লইবার ক্ষমতা কতকটা আছে, কতকটা নাই; বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিরাকরণের ক্ষমতা কতকটা আছে, কতকটা নাই। আবার শরীরের মধ্যে এমন যন্ত্র আছে, যাহাদের অস্তিত্ব অনাবশ্যক; শুধু যে অনাবশ্যক, তাহা নহে, অনেক সময়ে তাহারা অনিষ্ট করিয়া বসে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে,—Vermiform appendix। ইহার কোনও কাজ (function) নাই, অথচ ইহা মারাত্মক ব্যাধির স্থান; পেটের মধ্যে মোটা অন্ত্রের (large intestines) সহিত সরু অন্ত্রের (small intestines) সংযোগস্থলে ওটা আছে, জোঁকের মত ঝুলিয়া আছে; তাই উহার ঐ রকম নামকরণ হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের পর তাহার বর্জ্জনীয় অংশ মোটা অন্ত্রের মধ্যে যাইবার সময় কখনও কখনও ঐ appendixএর মধ্যে প্রবেশ করে; তাহার ফলে মারাত্মক appendicitis ব্যারাম হয়। এইরূপ যন্ত্র আরও আছে। এই অনাবশ্যক যন্ত্রটির সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত স্পেনের রাজা কি বলিতেন?

"মানুষের সকল ভয়ের মধ্যে প্রধান ভয়—জরা ও মরণ; এই দুইটা তাহাকে যতটা অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, ততটা আর কিছুতে নহে। রাজপথে ভ্রমণ করিবার সময় বুদ্ধদেব জরা-মরণ দেখিতে পান; মানুষকে এই জরা-মরণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার মহাভিনিষ্ক্রমণ হইল। এই মরণটা কিরূপে এবং কেন পৃথিবীতে আসিল, এই প্রশ্নই ইহুদি ধর্ম্মশাস্ত্রের গোড়ার কথা। এই মরণ-ভয়ের হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য যীশু খ্রীষ্ট অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মেচ্‌নিকফ্‌ ঐ পুস্তকে যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রও আলোচনা করিয়াছেন; বেদান্ত, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়, ইস্‌লাম ধর্ম্ম Theism, pantheism; এবং প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া কাণ্ট্‌, হেগেল প্রভৃতি যাবতীয় দর্শনশাস্ত্রও আলোচনা করিয়াছেন; তিনি বলেন যে, সমস্ত ধর্ম্ম এবং সমস্ত দর্শনশাস্ত্র এই মরণের ভয় নিবারণের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছে। মরণ-ভয় হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই দেখিয়া এই সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও দর্শনপ্রবর্ত্তক কল্পনা করিয়া লইয়াছেন যে, মানুষ মরিয়াও মরে না; দেহ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু মানুষটা কোনও রকমে চিরকালের জন্য টিকিয়া যায়, কিংবা জন্মান্তর পরিগ্রহ করে। তাঁহার মতে ইঁহারা সকলেই আত্ম-প্রতারণা করিয়াছেন। ধর্ম্ম বা দর্শনশাস্ত্র মানুষকে অভয় দিতে পারে না; বিজ্ঞান বরং কিছু অভয় দিতে পারে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ওয়াইজমান মরণ হইতে নিষ্কৃতির আশা জীবকে দেন না; অতি নিম্ন পর্য্যায়ের জীব, যাহাদের শরীর কেবল একটি মাত্র কোষে (cell) নির্ম্মিত, তাহারা মরিতে বাধ্য নয়। কিন্তু একটু উচ্চ স্তরের জীব (যাহাদের দেহ বহু কোষে নির্ম্মিত) মরিতে বাধ্য। তাহারা মৃত্যুরূপ মূল্য স্বীকার করিয়া এই উচ্চ পদবী লাভ করিয়াছে। মেচ্‌নিকফ্‌ কিন্তু এতটা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তবে তিনিও এখন পর্য্যন্ত মৃত্যুর হাত এড়াইবার উপায় আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, কিংবা কোনও আশা দিতেও পারেন নাই। তিনি বলেন যে, মরণটা তত ভয়ের জিনিষ নহে; কাল পূর্ণ হইলে ক্লেশহীন মরণ ভয়ঙ্কর নহে। মানুষ মরণকে ভয় করে না; জরা ও অকাল-মরণকে ভয় করে। এ দুইটা অনেকটা নিবারণ করা যাইতে পারে। এখনই কিছু কিছু সাধ্য হইয়াছে; ভবিষ্যতে আরও হইবে। মানুষের রক্তে কতকগুলা লাল ও শ্বেত কণিকা সঞ্চরণ করে; লাল কণিকা বাতাসের Oxygen লইয়া শরীরকে শোধন করে, শ্বেত কণিকা দেহকে রক্ষা করে;

বাহির হইতে কোনও অনিষ্টকর দ্রব্য বা রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করিলেই ঝাঁকে ঝাঁকে শ্বেত কণিকা সেখানে আসিয়া সেটাকে নষ্ট ও জীর্ণ করিতে চায়। সমাজ-দেহের তুলনায় ইহারা পুলিস ও সৈনিকের কাজ করে। ইহাদের স্বভাব কতকটা রাক্ষসের মত। ইহারা রোগের বীজকে খাইয়া ফেলে ও জীর্ণ করিবার চেষ্টা করে। জীব যখন যৌবন অতিক্রম করে, তখন এই সকল রক্ষকেরাই ভক্ষক হইয়া দাঁড়ায়; বাহিরের শত্রু ধ্বংস করার সঙ্গে শরীরের tissueও ধ্বংস করে। বার্দ্ধক্যে যে শরীর ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ উপস্থিত হয়, ইহাই তাহার একটা কারণ। দেহযন্ত্রের সামঞ্জস্যের এই এক গোলযোগ যে, যন্ত্রের এক অংশ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আর এক অংশকে নষ্ট করিতে চায়।

"জরার আর একটা কারণেরও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে,—উল্লিখিত মোটা অন্ত্রটা। এটা অনাবশ্যক পরিমাণে দীর্ঘ। খাদ্য পরিপাকের পর বর্জ্জনীয় অংশ এইখানে সঞ্চিত থাকে। খাদ্য দুই রকম,—জন্তুজ ও উদ্ভিজ্জ। মাংসাদি জন্তুজ খাদ্য সহজে হজম হয়, বর্জ্জনীয় অংশও অল্প; কাজেই অল্প পরিমাণ হইলেও দেহরক্ষায় সমর্থ; উদ্ভিজ্জ খাদ্য সহজে হজম হয় না, বর্জ্জনীয় ভাগও বেশী; তাই বেশী পরিমাণে খাইতেও হয়। মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বানর বা বনমানুষ-জাতীয় ছিল; তাহারা মুখ্যতঃ উদ্ভিজ্জভোজী ছিল; তাহাদের অন্ত্রটাকে বোঝাই করিবার জন্য ও শরীর রক্ষার জন্য বেশী খাদ্য আবশ্যক ছিল; কাজেই অন্ত্র সেই পরিমাণে দীর্ঘ ছিল। মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে সেই দীর্ঘ অন্ত্র লাভ করিয়াছে; অথচ মানুষ জন্তুজ খাদ্য হজম করিতে পারে; কাজেই মানুষের পক্ষে অত লম্বা অন্ত্র অনাবশ্যক। মাংস সহজে হজম হয়, অল্প মাত্রায় চলে, উদ্ভিজ্জের চেয়ে পুষ্টিকর; এ সকল সত্ত্বেও কেবল অন্ত্রটাকে বোঝাই করিবার জন্য মানুষকে বহু পরিমাণে উদ্ভিজ্জ খাদ্য খাইতে হয়। কেবল যে চাল, গম, যব প্রভৃতি উদ্ভিজ্জের মধ্যে সার পদার্থ খাইতে আরম্ভ করা হয়, তাহা নহে; শাক পাতা তরকারি প্রভৃতি জিনিষ, যাহার অধিকাংশই বর্জ্জনীয়, শরীর-পুষ্টির পক্ষে যাহা প্রায় কোনও কাজেই লাগে না, তদ্দ্বারা মোটা অন্ত্রকে বোঝাই করিতে হয়। অন্ত্রমধ্যে এই আবশ্যক আবর্জ্জনা-বহন যে কেবল মাত্র ভার বহন, তাহা নহে; ইহা নানাবিধ রোগেরও নিদান; জরার ইহা একটা প্রধান হেতু। অন্ত্রনাড়ীর ভিতরে নানা জীবই বাস করে। ইহাদিগের অধিকাংশই উদ্ভিজ্জ-শ্রেণীভুক্ত;

ইহারা সঞ্চিত আবর্জ্জনা পাইলেই একটা যেন মহোৎসবে মাতিয়া যায়। প্রচুর খাদ্য পাইয়া একটা জীবাণু হইতে কোটি জীবাণু উৎপন্ন হয়। যত সংখ্যায় বাড়িতে থাকে, ততই তাহারা একটা বিষময় পদার্থ উদ্গিরণ করিতে থাকে ; বিষটা উগ্র না হইলেও অতি ধীরে ধীরে সমস্ত শরীরে বিস্তার লাভ করিয়া শরীরের অন্যান্য tissueকে ও ধাতুকে আক্রমণ করিতে থাকে। প্রধানতঃ এই সমস্ত বিষাক্ত পদার্থেরই বহু দিনের ক্রিয়ার ফলে বার্দ্ধক্যের নানাপ্রকার বিকার আসিয়া উপস্থিত হয়। যে সকল নাড়ীর ভিতর দিয়া রক্ত সঞ্চালিত হয়, সেগুলি ক্রমশঃ কাঠিন্য প্রাপ্ত হয় ; রক্ত তাহার ভিতর দিয়া জোর করিয়া ঠেলিয়া প্রবাহিত হইতে চেষ্টা করে ; খুব বেশী টান পড়িলে নাড়ী ছিঁড়িয়া পক্ষাঘাত হয় ; ক্রমশঃ স্নায়ুযন্ত্রের তারেরও স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হইয়া যায়। এইগুলি বার্দ্ধক্যের, বিশেষতঃ অকাল-বার্দ্ধক্যের সাধারণ লক্ষণ ; বার্দ্ধক্যের, জরার ও অকাল-মৃত্যুর সাধারণ কারণ। যত দিন না ঐ অনাবশ্যক বড় অন্ত্রটা ছোট হইয়া যায়, তত দিন উহা রোগের আকর হইয়া থাকিবে। আপাততঃ এই ব্যাধির হাত এড়াইবার জন্য মেচ্‌নিকফ্‌ একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। রীতিমত দধি সেবন করিলে ঐ দুষ্ট জীবাণুগুলি মরিয়া যায় ; অতএব বাল্যকাল হইতে দই খাইলে বার্দ্ধক্যের ও অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। অতএব যদি মৃত্যুভয় হইতে মুক্তি চাও, তবে বুদ্ধ, প্লেটো, খ্রীষ্টের বুজরুকির দরকার নাই ; দই খাও।"

* * * *

রামেন্দ্রবাবু চুপ করিলেন। কোথায় রবিবাবুর 'গোরা,' আর কোথায় Metchnicoffএর দই খাওয়ার ব্যবস্থা! কিন্তু বিচিত্র প্রসঙ্গে কোনও কিছুরই অসামঞ্জস্য নাই। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতেছিলাম। চমক ভাঙ্গিয়া গেলে দেখিলাম, সম্মুখে এক বাটি—দই নহে, চা। হায় মেচ্‌নিকফ্‌! তোমার বড় অন্ত্রের কথায় আমার অন্ত্রস্থ জীবাণুগুলি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল ; রক্তবহ নাড়ী ক্রমশঃ কাঠিন্য প্রাপ্ত হইতেছিল। অনাবশ্যক বড় অন্ত্রটাকে যখন বহন করিতেই হইবে, তখন দধি অভাবে অন্ততঃ চা খাওয়াটাই প্রশস্ত।

* * * *

রামেন্দ্রবাবু পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত আভ্যন্তরীণ অবস্থার সামঞ্জস্য যদি একেবারেই না হয়, তাহা হইলে

জীবের মৃত্যু। আবার পূরা ষোল আনা সামঞ্জস্য হইলে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা থাকে না; তাহারও ফল মৃত্যুর তুল্য, জড়ত্ব; কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই সামঞ্জস্যের চেষ্টার পরম্পরাই জীবনের নামান্তর মাত্র। এই ষোল আনা সামঞ্জস্য জড় পদার্থেই সম্ভব; জীবে নহে। জড়ও বোধ করি পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারে না।

"সামঞ্জস্য স্থাপিত হইলেও তাহা বেশী দিন স্থায়ী হয় না; কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা পরিবর্ত্তনশীল। একই দেশের নানা পরিবর্ত্তন; দেশ-ভেদে পরিবর্ত্তন ত আছেই; তদ্ব্যতীত ভূমিকম্প, জলপ্লাবন প্রভৃতি আকস্মিক পরিবর্ত্তনও আছে; ভূপৃষ্ঠের যুগব্যাপী পরিবর্ত্তন আছে। এক কালে মেরুপ্রদেশেও হয়ত মনুষ্য বাস করিত; তখন য়ুরোপের উত্তর খণ্ডে সিংহ শার্দ্দূল বিচরণ করিত। Glacial Epoch বা হিমানী-যুগ আসিল; সমস্ত মহাদেশটা বরফে মণ্ডিত হইয়া গেল। আবার নূতন যুগ আসিল; সেই বরফের আস্তরণ সরিয়া গেল। এই সকল আকস্মিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে জীবের পরিবর্ত্তন হয়; নহিলে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারে, সে লোপ পায়; ম্যামথ্, ম্যাষ্টডন লোপ পাইয়াছে।

"কিন্তু জীবের প্রধান শত্রু জীব। খাবার কাড়াকাড়ি করিতে সকলেই ব্যস্ত। আবার জীবের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধও রহিয়াছে। আবার নূতন জীবের আবির্ভাবে অন্যান্য জীবের জীবন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত হয়; প্রাণি-বিদ্যার অনুশীলন করিলে ইহার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ায় আগে খরগোস ছিল না। যখন উপনিবেশ স্থাপিত হয়, বিদেশী মানুষের সঙ্গে শশকও প্রবেশ লাভ করে। এখন শশকের এত বংশবৃদ্ধি হইয়াছে যে, ক্ষেতের ফসল রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিয়াছে; অন্নের জন্য শশকের সহিত মানুষের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে।

"জীবের ব্যক্তিগত জীবনটা যেমন তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস, তাহার জাতিগত জীবনটাও সেইরূপ পরিবর্ত্তনশীল environmentএর সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এইরূপ হইতেছে। ইহার ফলে নূতন নূতন জাতির উদ্ভব হয়। যে জাতি অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিল, সেই জাতিই টিকিয়া গেল; যে পারিল না, সে মরিল। যে টিকিয়া গেল, সে হয়ত নূতন চেহারায় দেখা দিল, নূতন অবয়ব প্রাপ্ত হইল।

"তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে, বাহিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে, জীবের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক নহে ; জীব তখন রক্ষণশীল, Conservative। বাহিরের পরিবর্ত্তন হইলে এই রক্ষণশীলতার ব্যতিক্রম আবশ্যক হয়, Variation আসিয়া পড়ে ; নহিলে সামঞ্জস্য-রক্ষা হয় না। প্রথমটাকে বলা যাইতে পারে—স্থিতিশীলতা, Principle of stability ; অপরটাকে বলা যাইতে পারে—সামঞ্জস্যপ্রয়াস, liberalism or principle of adaptability। জীববিদ্যায় (Biology) প্রথমটার নাম—Heredity, বংশানুক্রম ; অপরটার নাম Variation, ব্যতিক্রম। Heredityর ফলে ছেলে ঠিক বাপের মত হইত, যদি Variation, ব্যতিক্রম না ঘটিত। এই দুইটি principleকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া assume করিয়া ইদানীং জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলী অভিব্যক্তিবাদের (Evolution) ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। এই Variation কেন হয়, সে সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এখানে জীববিদ্যা-সংক্রান্ত কয়েকটি মতের উল্লেখ করা যাইতে পারে—তাহাতে বিচিত্র প্রসঙ্গের বৈচিত্র্য বর্দ্ধিতই হইবে।

লামার্ক্

"প্রথমেই লামার্ক্‌কে লইয়া আরম্ভ করিতে হয়। তিনি গোড়া হইতে ধরিয়া লইলেন যে, জীব আপনার চেষ্টা ও অভ্যাসের দ্বারা আপনার আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে ; এবং সেই চেষ্টার দ্বারা যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হয়। বহুযুগব্যাপী পুরুষপরম্পরাগত পরিবর্ত্তনের ফলে সেই জীবের আগাগোড়া বদলাইয়া যাইতে পারে ; সে একটা নূতন জীব দাঁড়াইয়া যায়। কর্ম্মকার আজীবন হাতুড়ি পিটিয়া গেল ; তাহার পুত্র-পৌত্রাদিও হাতুড়ি পিটিয়া জীবন কাটাইল ; পরে ক্রমশঃ তাহার বংশধর শক্ত পেশী লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। এই রকমে মানুষের মধ্যে একটা শক্ত পেশীওয়ালা কামার জাতির উদ্ভব হইতে পারে। জিরাফ্ (Giraffe) দেখিতে এক কালে হরিণের মতই ছিল ; হয়ত কোন বিস্মৃত Geologic যুগে বনের গাছগুলা ক্রমশঃ কিছু লম্বা হওয়ায় Giraffe গলা বাড়াইয়া গাছের পাতা খাইতে চেষ্টা করিল। প্রত্যেক পুরুষের চেষ্টার ফল পরপুরুষে সংক্রান্ত হইয়া পুরুষপরম্পরাক্রমে গলা লম্বা

হইয়া গিয়াছে। যে গলা লম্বা ছিল না, বহু পুরুষের চেষ্টায় তাহা অত্যন্ত লম্বা হইয়া হরিণ জিরাফে পরিণত হইল।

২। ডারুইন্

"সমস্যাটা এই যে, জীবের যে আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন হইল, সেটা পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হয় কি না? কামারের শক্ত পেশী তাহার ছেলে পায় কি না? ডারুইন্ তাহা অস্বীকার করিতেন না; কিন্তু ডারুইন্ বলিলেন, জীব-দেহের পরিবর্ত্তনের আরও প্রবল হেতু বিদ্যমান আছে। অন্নের জন্য জীবের মধ্যে কাড়াকাড়ি ব্যাপার চলিয়াছে; কারণ, অন্নের পরিমাণের চেয়ে জীবের সংখ্যাই বেশী। যে সমর্থ, তারই অন্ন জুটিবে; অসমর্থের জুটিবে না। প্রকৃতি যেন চালুনি হাতে করিয়া বসিয়া আছেন; যে সমর্থ, সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যাইতেছে; যে অসমর্থ, তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া নষ্ট করা হইতেছে; প্রকৃতির এই বাছাই কাজের নাম দেওয়া হইয়াছে Natural Selection বা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন; এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের হেতুর নাম দেওয়া হইয়াছে Struggle for existence বা জীবন-সংগ্রাম। যে বেশী সমর্থ, সেই টিকিয়া যায়,—গায়ের জোরেই হউক, বুদ্ধির জোরেই হউক, কৌশলের জোরেই হউক, অথবা ভীরুতার দরুনই হউক। যে Variationগুলি এই প্রবল জীবন-সংগ্রামে জীবের অনুকূল, সেইগুলিই টিকিয়া যায়; নূতন জাতির (Species) সৃষ্টি হয়। বহু যুগ ধরিয়া বংশানুক্রমে নানা ব্যতিক্রম হওয়ায় এক পূর্ব্বপুরুষ হইতে বাঘ ও বিড়াল দুইটা স্বতন্ত্র জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। হয়ত অন্য Variationগুলিও হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে টিকিল না। যে আদিম জন্তু হইতে উহারা উদ্ভূত, সেও লুপ্ত হইয়াছে। এখনকার বানর, বনমানুষ ও মানুষ এখনকার environmentএর উপযোগী হইয়া আছে; যে আদিম ape হইতে ইহারা উৎপন্ন, সে লোপ পাইয়াছে; হয়ত অন্যান্য শাখা-প্রশাখাও হইয়াছিল, তাহারাও টিকিল না; মাঝে মাঝে সেই সকল জন্তুর কিছু কিছু চিহ্ন মাটির ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। প্রকৃতির এই ভাঙ্গা-গড়ার কথা ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ভাঙ্গে বেশী, গড়িয়া উঠে অতি অল্প। এই উগ্র জীবন-সংগ্রামে অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। শতকরা একটা হয়ত কোনও রকমে টিকিয়া

যায় বা যায় না। জীবের উন্নতি লাভের একটা প্রধান উপায়—একটা কাড়াকাড়ি, মারামারি, রক্তারক্তি ব্যাপার; এবং ইহার মত wasteful বা অপব্যয়াত্মক ব্যাপার জগতে নাই। একটা জীবের একটুকু উন্নতি সাধনের জন্য লক্ষ লক্ষ জীবকে সংহার করিয়া ফেলিতে হয়। সৃষ্টিকালে উপস্থিত থাকিলে ডারুইন্ বিধাতাপুরুষকে সৎপরামর্শ দিতেন কি না, তাহা কোথাও বলেন নাই।

"কেন এই বংশানুক্রমের Variation হয়, ডারুইন্ সে সম্বন্ধে বড় একটা আলোচনা করেন নাই; তিনি গোড়া হইতে ধরিয়া লইয়াছেন যে, অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে ব্যতিক্রম হইতে থাকে; ইহারই ফলে বহু যুগ পরে বহু ধ্বংসকার্য্য সমাধানের পরে একটা নূতন জাতি (Species) গড়িয়া উঠিতে পারে। উচ্চ শ্রেণীর জীবের মধ্যে Variation অবশ্যম্ভাবী; কারণ, তাহারা স্ত্রীপুরুষ-সংসর্গজনিত। এই Variationএর একটা কারণ চোখের উপর দেখা যায়। পুং-বীজ ও স্ত্রী-বীজ একযোগে সন্তান উৎপাদন করে; কিন্তু পিতা ও মাতা যখন সর্ব্বাংশে একপ্রকৃতির নহে, তখন পিতা মাতা উভয়েরই ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট ধর্ম্ম সন্তানে সংক্রান্ত হইয়া সন্তানকেও পিতা ও মাতা হইতে কিছু-না-কিছু ভিন্নরূপ করিবে।

৩। গ্যাল্‌টন

"আরও সূক্ষ্ম করিয়া বলিলেন যে, সন্তান যে শুধু নিজের বাপ-মায়ের 'ধাত' (character) পায়, তাহা নহে; সে তাহার পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ প্রভৃতি যাবতীয় পূর্ব্বপুরুষেরও 'ধাত' পায়; সুতরাং এতগুলি পূর্ব্বপুরুষের বিশিষ্ট ভাব পর-পুরুষে সংক্রামিত হইয়া একটা নূতন পরিবর্ত্তন ঘটাইবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

৪। ওয়াইজমান

"লামার্ককে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি বলেন, পিতার স্বোপার্জ্জিত 'ধাত' সন্তানে সংক্রামিত হয়, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। ডারুইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই জীবের উন্নতির কারণ। জীবের সমস্ত দেহটা বিশেষ কিছু নহে; সন্তানোৎপাদক বীজটাই দেহের সারভাগ। সমস্ত

দেহ ঐ বীজটুকুকে রক্ষা করিবার জন্য ঐ বীজ কর্ত্তৃকই নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা যেন একটা কৌটা ; উহার অভ্যন্তরে বীজরূপ নিধিটুকু সযত্নে রক্ষিত আছে। মৃত্যু হয় দেহের, বীজের নহে। এই বীজ (germ-plasm) আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য আপনা হইতে আপনার দেহ নির্ম্মাণ করিয়া লয়। এই দেহের এক মাত্র কাজ, সেই বীজকে রক্ষা করা। জীব সেই germ-plasm মাত্র ; সে অবিনশ্বর। যথাকালে জীবের বীজ (germ-plasm) আপনার কিয়দংশ বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় ; সেই নিক্ষিপ্ত অংশ আবার আপনার দেহ আপনি গঠন করিয়া সন্তানরূপে পরিণত হয়। পিতার দেহাংশ পুত্র পাইল না ; বীজের (germ-plasm) অংশ পাইল। বাহ্য জগতের যত কিছু উপদ্রব, তাহা দেহাংশের উপর, বীজের উপর নহে ; কেন না, বীজ দেহের ভিতর গুপ্ত থাকে ; কাজেই দেহের বিকারে বীজের বিকার হয় না।

"সন্তান যখন পৈতৃক দেহাংশ পায় না, তখন সেই দেহের Variation তাহাতে সংক্রামিত হইতে পারে না। পিতার চেষ্টায় দেহের যে বিকার ঘটে, বীজ তাহাতেও বিকৃত হয় না। কাজেই লামার্কের সিদ্ধান্তে গোড়ায় গলদ। বাপের উপার্জ্জিত বা চেষ্টালব্ধ কোন গুণ সন্তান একেবারেই পায় না। এই Germ-plasm লইয়াই বংশানুক্রম, heredity ; দেহ লইয়া নহে। তবে, Variationএর একটা কারণ আছে ;—সেটা দেহঘটিত নহে, germ-plasm ঘটিত। পিতামাতার germ-plasm বিভিন্ন ; এই জন্য উভয়ের সংযোগে সন্তানের germ-plasmএ variation হইয়া থাকে ; বিভিন্ন germ-plasmএ উভয় বীজের সংমিশ্রণ না হইলে বংশানুক্রমের ব্যতিক্রম হইত না। ওয়াইজমান বলেন, পিতামাতা একযোগে এক বা একাধিক সন্তানের জন্ম দিয়া নিজেরা মরিতে শিখিয়াছেন ; সন্তানের সহিত জীবন-যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য বোধ করেন না। সন্তানের ইহাতে জীবন-যুদ্ধে লাভ হইয়াছে। পিতামাতা নিজে মরিয়া বংশধরের হিত করিয়াছেন ; বংশরক্ষার উপায় করিয়াছেন ; মৃত্যুরূপ মূল্য দিয়া বংশরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৫। ডি. ভ্রিস্

"এমন অনেক সময়ে হয় যে, সন্তানে হঠাৎ খুব বেশী Variation দেখা যায়। ডারুইন্ এটাকে বড় বেশী আমলে আনেন নাই ; তিনি ইহাকে

প্রকৃতির খেয়াল (sport) বলিয়াছেন ; প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে এই খেয়াল ডারুইনের মতে বড় বেশী কাজে আসে না। ডি. ভ্রিস্ বলেন, এগুলাকে ফেলিয়া দেওয়া চলে না ; ইহারাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে বেশী কাজ করে ; ইহাদিগের mutations বলা যাউক। ডারুইন্ বলেন যে, Variation অতি ধীরে ধীরে হয় ; ডি. ভ্রিস্ বলেন, তা নহে, লাফিয়ে লাফিয়ে হয়। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে অনুকূল হইলে, এই সকল বড় Variation স্থায়ী হইয়া যায়। এ-কালে এই মতটাই ক্রমে যেন দৃঢ় হইতেছে। জীবের উন্নতি যত ধীরে হইতেছে, ডারুইন্ মনে করিতেন, উহা তত ধীর নহে ; উহা বরং দ্রুতই হইতেছে।

৬। মেণ্ডেল

"মেণ্ডেল এই Variation এর প্রণালী সরল করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। একটা জাতির (species) অনেক 'জাত' (variety) থাকে ; যেমন কুকুর জাতির মধ্যে নানা জাতের কুকুর আছে। দুই জাতের জন্তু কিংবা উদ্ভিদ যদি পরস্পর (Cross) সঙ্গত হয়, তাহা হইলে সন্তান কোন্ জাতের হইবে ? যে সকল ধর্ম্ম লইয়া এই জাতের পার্থক্য, তাহার মধ্যে কোনও কোনও ধর্ম্ম প্রবল হইয়া আপনাকে প্রকাশিত করে। আর কোনও কোনও ধর্ম্ম দুর্ব্বল হইয়া আপনাকে গোপন করে। যে পুং-বীজ ও স্ত্রী-বীজ মিলিত হইয়া সন্তান উৎপন্ন হয়, মনে করুন—তাহার প্রত্যেকের মধ্যেই এই প্রবল ও দুর্ব্বল ধাতু একটি করিয়া বর্ত্তমান আছে। প্রবলকে বলা হয়—dominant ; দুর্ব্বল আত্মগোপন করে, এই জন্য তাহার নাম হইয়াছে—recessive। এখন এই স্ত্রী ও পুং-বীজের মিশ্রণে কি কি ফল পাওয়া যায় দেখা যাউক। দেখুন, এই স্ত্রী-পুং-বীজের মিশ্রণে চার প্রকারের সম্মিলন হইতে পারে ; যথা—প্রথম নিভাঁজ প্রবল ; চতুর্থ নিভাঁজ দুর্ব্বল ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবল ও দুর্ব্বলের সঙ্কর। প্রথমটির সন্তান প্রবল ধর্ম্মান্বিত হইবে ; চতুর্থটি দুর্ব্বল ধর্ম্মান্বিত ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্কর হইলেও দেখিতে প্রবলের মত হইবে ; কারণ, প্রবল ধর্ম্মই আত্মপ্রকাশ করে, দুর্ব্বল আত্মগোপন করে। মনে করুন, লোমশতা কোনও জন্তুর প্রবল ধর্ম্ম, নির্লোমতা দুর্ব্বল ধর্ম্ম। যদি তাহার চারিটা ছানা হয়, তাহা হইলে একটা লোমশ, একটা নির্লোম, বাকী দুইটা সঙ্কর হইলেও দেখিতে ঠিক লোমশই হইবে। ইহাদের

সন্তান আবার কিরূপ হইবে? যদি সঙ্করের স্পর্শে থাকিতে দেওয়া না যায়, তাহা হইলে খাঁটি লোমশের পরবর্ত্তী পুরুষপরম্পরাও খাঁটি লোমশ, খাঁটি নির্লোমের পুরুষপরম্পরা নির্লোম হইবে। কিন্তু সঙ্কর লোমশ পরস্পর সহযোগে কতক খাঁটি লোমশ, কতক নির্লোম ও কতক সঙ্কর-লোমশ, এই ত্রিবিধ সন্তানের জন্ম দিবে। জনক জননী বাছাই করিয়া লইয়া জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে আজকাল সন্তানোৎপাদন পরীক্ষা হইতেছে; তাহাতে মেণ্ডেলের তত্ত্ব ক্রমেই সমর্থিত হইতেছে।"

একটু চুপ করিয়া রামেন্দ্র বাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"যাঁহারা মানবজাতিতত্ত্ব (Ethnology) অনুশীলন করেন, তাঁহারা জীববিদ্যার (Biology) এই সকল নিয়ম প্রয়োগ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না। কেহ কেহ মানুষকে কতিপয় Raceএ বিভক্ত করিয়াছেন,—শ্বেত, পীত, লাল, কাল। কেহ কেহ মাথার খুলি দেখিয়া মানুষকে দীর্ঘ-কপাল (Dolichocephallic) ও খর্ব্ব-কপাল (Brachycephallic) শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ মুখের গঠন, চুলের রং, চুলের ধরণ, চোখের তারা ইত্যাদি দেখিয়া মানুষের নানা বিভাগ করিয়াছেন। এই সকল জাতির মিশ্রণে কি দাঁড়ায়, সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এক জাতির মধ্যেই বিভিন্ন বর্ণমিশ্রণের ফলাফল নির্ণয় করিতে অনেকে ব্যস্ত হইয়াছেন। আমাদের এই ভারতবর্ষে আর্য্য—কোলারীয়—দ্রাবিড়ীয় মিশ্রণ কিরূপে হইয়াছে, তাহা দেখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। হিন্দুর মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণে কি ফল হইতে পারে; একই বর্ণের মধ্যে নানা গোত্রের ও কুলের মিশ্রণে কি দাঁড়াইতে পারে; এ সকল বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হইয়াছে। কতকগুলা স্থূল সিদ্ধান্ত প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া গৃহীত। পিতামাতার মধ্যে যদি রক্তসম্পর্ক খুব নিকট হয়, উভয়ের বীজ প্রায় সমানধর্ম্ম হওয়াতে Variation কম হয়; তাহার ফলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের সামর্থ্য কমিয়া যায়; সন্তানের পক্ষে ইহা মঙ্গলকর নহে। প্রায় সকল সভ্য জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈজ্ঞানিক আলোচনার বহু পূর্ব্বে মানুষ আপন অভিজ্ঞতার ফলে অত্যন্ত নিকট-সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ যে অকল্যাণকর, তাহা মানিয়া লইয়াছিল। আমাদের হিন্দুসমাজ এ সম্বন্ধে যতটা সাবধান, ততটা বোধ হয় আর কোনও সমাজ নহে। এ দেশে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। অসভ্যদিগের মধ্যে

exogamy প্রচলিত ; তাহারা নিজের tribe বা কুলের বাহিরে অন্য কুল হইতে জোর করিয়া বা মূল্য দিয়া কন্যা লইয়া আসে। এই হইতে Marriage by Capture (হরণ করিয়া বিবাহ) এবং Marriage by Purchase (পণ দিয়া বধূলাভ) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পণগ্রহণ-প্রথা অনেক সভ্য সমাজে বর্ত্তমান। হরণ-ব্যাপারটা এখন আর নাই বটে ; কিন্তু হাতী, ঘোড়া, ঢোল, লোকজন আশাশোটা লইয়া মহাসমারোহে আমাদের দেশে যে বরযাত্র-প্রথা প্রচলিত আছে, দেখিয়া মনে হয়, যেন ইহা কোনও বিস্মৃত যুগের যুদ্ধযাত্রার শেষ স্মৃতি, Survival মাত্র। অন্য কুল হইতে কন্যা লইয়া আসিবার কালে উভয়ের মধ্যে বিরোধ ও সন্ধির কথা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের ইতিহাসেও এই ভিন্ন ভিন্ন কুলের সম্মিলন একটা বড় কথা। স্বকুল হইতে কন্যাগ্রহণও (Endogamy) পাশাপাশি রহিয়াছে। এই উপলক্ষে কুলীনতা বিচার করিতে হয়। আমাদের কৌলীন্য-প্রথায় কতটুকু ভাল ও কতটা মন্দ হইয়াছে, তাহা বিচার করিবার জন্য অনেক পণ্ডিত মাথা ঘামাইয়াছেন। ওয়াইজমান ও মেণ্ডেলের তথ্যাবিষ্কারের ফলে বুঝা যায় যে, এ সকল বিষয়ে এখন কোন স্থির-সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিছু দিন পূর্ব্বেও Ethnologist পণ্ডিতমণ্ডলী যত দূর বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন, এখন আর ততটা করেন না। মেণ্ডেলের পরে এখন জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, Ethnologyর এখন সবে মাত্র ক খ আরম্ভ হইয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর জন্তু ও উদ্ভিদ লইয়া বহু কাল নাড়াচাড়া না করিলে প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে না ; তখন জীব-বিদ্যা (Biology) কি বলিবে, এখন সে সম্বন্ধে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না ; এখন বহু দিন ধরিয়া মালমসলা ও statistics সংগ্রহ করিতে হইবে। যখন তথ্যগুলি আবিষ্কৃত হইবে, তখন সরল সমস্যা ছাড়িয়া জটিলতর সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যত দিন পর্য্যন্ত বংশানুক্রম (heredity) ও তাহার ব্যতিক্রমগুলার (variations) মূল তত্ত্বগুলি আরও সুস্পষ্ট না হইতেছে, তত দিন মানবজাতিতত্ত্ব (Ethnology) দুর্ব্বোধ থাকিবে। এখন যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রশংসা বা নিন্দা করা চলে না। মানবজাতি-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত আশা করেন যে, ভবিষ্যতে জীব-বিদ্যার সাহায্যে মনুষ্যজাতির উৎকর্ষ সাধন করা যাইবে। আর যে একটা নূতন শাস্ত্র গঠিত হইয়া উঠিতেছে, গ্যাল্‌টনকে তাহার জন্মদাতা বলা যাইতে পারে। তিনি ইহার নাম

দিয়াছেন Eugenics বা জাতীয় উৎকর্ষ-সাধন বিদ্যা। ঘোড়া, গরু, ভেড়া প্রভৃতি জন্তুরও নানা উদ্ভিদের বিমিশ্রণে নানাপ্রকার জাতি তৈয়ার করিবার চেষ্টা হইয়াছে। গ্যাল্‌টনের শিষ্যগণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন কুলের মিশ্রণে একটা উচ্চ-জাতীয় মানুষ করিতে চান; কিন্তু প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার এখনও হয় নাই; যত দিন না হয়, তত দিন Ethnology কোনও স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবে না।

"জীববিদ্যাঘটিত এই সকল অসম্পূর্ণ তত্ত্ব যে কেবল মানবজাতিতত্ত্বেই প্রয়োগ করা হইয়াছিল, এমন নহে; সমাজতত্ত্বেও (sociology) হইয়াছিল। মানুষের দেহ যে একটা যন্ত্র (organism), এ কথা বহু দিন হইতে শোনা যাইতেছে। তাহার সমাজ-দেহটাও একটা যন্ত্র organism; সে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য নানাপ্রকার organ আপনা হইতে সৃষ্টি করিয়া লয়,—যথা শাসনযন্ত্র, শিক্ষাযন্ত্র ইত্যাদি। প্রত্যেক যন্ত্রেরই এক বা একাধিক function থাকে। এই স্থূল সূত্রটি মোটামুটি মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। সমাজ-বিদ্যা (Sociology) গোড়া হইতেই এই কথাটি স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অনেকে কোঁৎকে (Comte) সমাজ-বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মনে করেন। বাক্‌ল্ (Buckle) তাঁহার 'সভ্যতার ইতিহাস' পুস্তকে (History of Civilization) এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পুস্তকে যতটা আস্ফালন ছিল, ফল তদনুরূপ হয় নাই। Environment শব্দটা তিনি অতি সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন; মুখ্যতঃ তিনি জড় ও অচেতন environmentই বুঝিয়াছিলেন; দেশের ভৌগোলিক অবস্থা, অর্থাৎ নদী পাহাড় জল বায়ু শস্যাদি দেখিয়া সেই দেশের মানব-প্রকৃতি নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। জড়ের চেয়ে চেতন environmentএর প্রভাব যে খুব বেশী, ইহা তিনি ধরেন নাই; অথচ Biology জীব-বিদ্যা এইটারই প্রাধান্য দেয়। সমাজকে শুধু ভৌগোলিক অবস্থার অনুযায়ী করিলে চলিবে না; পার্শ্বস্থ জাতির ও সমাজের ঘাত-প্রতিঘাত ইতিহাসের প্রধান কথা। তিনি ভারতবর্ষের বড় বড় পর্ব্বত ও নদী দেখিয়া বলেন যে, এ দেশের লোক কল্পনাপ্রবণ হইবে, দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া নাড়াচাড়া করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? এ দেশের লোক ভাত খায়, মাংস খায় না; অতএব ভীরু, দুর্ব্বল, পরাধীন হইবেই। স্কট্‌ল্যাণ্ডে অনেক পাহাড়; সেখানকার লোক

অন্ধকুসংস্কারের বশীভূত হইতে বাধ্য। স্পেনের লোকে গোঁড়া ধর্ম্মান্ধ হইবেই ইত্যাদি। এ রকমে কোনও জাতির ইতিহাস অনুশীলন করা উচিত নহে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সর সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন; সমাজদেহ বিশ্লেষণ করিয়া তাহার কোন্ কোন্ অংশে জীবদেহের সহিত মিল আছে, অতিসূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার Study of Sociology এবং Principles of Sociology নামক গ্রন্থদ্বয় অত্যন্ত উপাদেয়। জীবধর্ম্মী সমাজদেহ কিরূপে আপনাকে আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী করিবার চেষ্টা করে; এবং সেই উদ্দেশ্যে কেমন করিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক institutions গঠন করিয়া লয়, তাহার ধারাবাহিক আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার সময়ে Biology জীব-বিদ্যা যেরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্ত করিতে গেলেই ভুলের সম্ভাবনা বেশী। ঘটিয়াছেও তাই। জীব-বিদ্যার তদানীন্তন অবস্থায় তাড়াতাড়ি তাহার উপর সমাজ-বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া অনেকে ব্যর্থ হইয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

"দুইটা সমাজের মধ্যে পার্থক্য অনেক সময়ে Racial type বা cultural type লইয়া হয়। এখন প্রশ্ন উঠে এই যে, এই রকম ভিন্ন ভিন্ন typeএর সম্মিলনে কি দাঁড়ায়? জীব-বিদ্যা (Biology) বলে যে, পিতা মাতা নিকট-সম্পর্কের হইলে সন্তান দুর্ব্বল হইবে; খুব তফাৎ হইলে, বিভিন্ন জাতি (species) হইলে সঙ্কর সন্তান বন্ধ্যাত্ব-দোষ পায়। ঘোড়ায় গাধায় মিলিত হইয়া যে অশ্বতর হয়, তাহার সন্তান হয় না। সে বন্ধ্য। এই মোটা সূত্র অবলম্বন করিয়া হার্ব্বার্ট স্পেন্সর সিদ্ধান্ত করিলেন যে, দুটো প্রায় এক রকমের Racial type বা cultural type পরস্পর মিশ্রিত হইলে বড় বিশেষ লাভ নাই; অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য-বিধান বড় বেশী হয় না, উৎপাদিকা-শক্তিও কমিয়া যায়। য়ুরোপের ইতিহাসে দেখা যায় যে, রোমক ও গ্রীসীয় cultureএর সংমিশ্রণে বড় বেশী সুবিধা হয় নাই; বর্ব্বরের আক্রমণ ইহার সহ্য হইল না। কিন্তু রোমক ও বর্ব্বর cultureএর মিশ্রণে প্রথমটা কিছু গোলমাল হইয়াছিল বটে; পরে দেখা গেল যে, ফল শুভ হইয়াছে; নূতন জাতির শক্তি বাড়িয়াছে। উভয় জাতির পার্থক্য গ্রীক ও রোমানের পার্থক্য অপেক্ষা বেশী ছিল, তাই

শক্তিবৃদ্ধি হইল। কিন্তু দক্ষিণ-আমেরিকায় ও মেক্সিকোতে য়ুরোপের খ্রীষ্টীয় সভ্যতা প্রবেশ লাভ করিয়া বড়-একটা সুবিধা করিতে পারিল না। যে সকল সঙ্করজাতি উৎপন্ন হইল, জগতের কোনও বিশেষ উপকারে তাহারা এ পর্য্যন্ত আসিল না। এ ক্ষেত্রে পার্থক্য এত অধিক যে, সম্মিলনের ফল বন্ধ্য হইল। স্পেন্সর যখন লিখিতেছিলেন, সেই সময়ে জাপান য়ুরোপের সভ্যতায় ওতপ্রোত; তিনি বলিলেন, ইহার ফল ভবিষ্যতে ভাল হইবে না; কিন্তু আপাততঃ ঠিক তাহার উলটা দাঁড়াইয়াছে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সুদূর ভবিষ্যতে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে কি না বলা যায় না। যাহা হউক, তাড়াতাড়ি জীব-বিদ্যার অসম্পূর্ণ তত্ত্বগুলি সমাজতত্ত্বে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

"ব্যর্থ হইবে বটে, কিন্তু সমাজতত্ত্বের আলোচনায় জীব-বিদ্যার আশ্রয় না লইলে চলে না; অন্য কোনও সদুপায় এখনও উদ্ভাবিত হয় নাই। সমাজকে যন্ত্রবদ্ধ organised structure ধরিয়া না লইলে বৈজ্ঞানিক আলোচনা অসম্ভব; আর কিছু না হউক, সমাজ যে জীবন্ত, এটুকু গোড়া হইতে মানিয়া লইতে হইবে।

"জীবন্ত সমাজ? সে কাহাকে বলে? জীবনের কার্য্য কি? একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, জীবের পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। জীব কখনও বা তাহার সহিত সন্ধি করিয়া, কখনও বা বিরোধ করিয়া সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করিতেছে। এই অবিরাম চেষ্টাই জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ। এই চেষ্টা যাহার যতটা সাফল্য লাভ করিয়াছে, জীবন-সংগ্রামে সে-ই ততটা জিতিয়াছে। সমাজ আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য, বাহিরের অবস্থার কতটুকু উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিবে, কতটুকু হেয় বলিয়া দূরে রাখিবে, এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করাই আমার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক সমাজ স্বতন্ত্র থাকিবার চেষ্টা করে; কিন্তু কেবল মাত্র বিরোধে সে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হয় না; কারণ, আমার প্রতিবেশী আমার চেয়ে প্রবলতর হইলে আমাকে নষ্ট করিবে। কেবল মাত্র সন্ধিতেও হয় না; কারণ, অন্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশিলে আমাদের জাতীয় প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্য রকম হইয়া যাইবে, স্বাতন্ত্র্য শব্দটাই অর্থহীন হইবে।

"এই স্বাতন্ত্র্য কথাটার অর্থ আরও পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক; তাহাও জীব-বিদ্যার সাহায্যে করিতে হইবে। উচ্চ শ্রেণীর জীবের পক্ষে, স্বাতন্ত্র্য কাহাকে বলে, বুঝিতে পারি; মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর আমরণ সে জীব-হিসাবে স্বতন্ত্র। উচ্চ শ্রেণীর জরায়ুজ বা অণ্ডজ জন্তুর সম্বন্ধে সহজেই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। গাছের বীজ হইতে স্বতন্ত্র গাছ জন্মায়, কিন্তু সেই গাছের ডালপালা তাহার Organ মাত্র; তাহারই অংশ-বিশেষ; তাহারই সহিত একাঙ্গীভূত; তাহাদের বিশিষ্ট স্বতন্ত্র সত্তা আছে বলিয়া অনুমিত হয় না; বৃক্ষকাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহারা শুকাইয়া মরিয়া যাইবে; কিন্তু একটা ডাল কাটিয়া মাটিতে লাগাইয়া দিলে যদি সে শিকড় বাহির করিয়া মাটি হইতে রস লইয়া আত্মরক্ষার্থ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করে, নূতন নূতন Organএর সৃষ্টি করে, তাহা হইলে তাহার স্বতন্ত্র সত্তা হইল না কি? কিন্তু তাহার এই স্বাতন্ত্র্যটা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইল না। তাহাকে পূর্ব্ব-বৃক্ষের শাখা মাত্র বলিব না; সন্তান বলিব। কেন না দেখুন, এমন গাছ আছে, যাহার শাখা লতাইয়া ভূপৃষ্ঠে বিলম্বিত হইয়া নূতন নূতন শিকড় জন্মাইয়া মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরে; সেই শাখার উপকার হইল, বড় গাছটারও হইল। কিন্তু এখানে কি সেই শাখাকে স্বতন্ত্র বলা যায়? এখানেও ত সেই শাখা স্বাধীন ভাবে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করিল, অথচ তাহাদিগকে স্বতন্ত্র মনে করা যায় না কেন? কুঠারাঘাতের মত একটা আকস্মিক ঘটনায় মূল কাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইলেই বুঝি সেই শাখা স্বতন্ত্র হইবে? আবার দেখুন, বটগাছ শত শাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান; একটি শাখাও ভূমি স্পর্শ করে না; কিন্তু সেই ডালপালাগুলার মধ্য হইতে শিকড় বাহির হইয়া ভূমধ্যে প্রবেশ করে। এখানে কি ডালগুলা স্বতন্ত্র জীব?

"একটা জীবের দেহও ত লক্ষ জীবের সমষ্টি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; কারণ, তাহার মধ্যে অসংখ্য জীবকোষ (cell) আছে। একটা প্রবালকে এক বলিব, না বহু বলিব? তাহার ক্ষুদ্র অংশ (coral polyp) কোনও কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও তাহার স্বতন্ত্র জীবন আরম্ভ হয়; আবার নূতন করিয়া তাহার গাছের মত ডালপালা বাহির হয়। ইহার কোন্‌খানে স্বাতন্ত্র্য? জীবনের আরম্ভ ও শেষ কোথায়? Hydraকে

(চারুপাঠের পুরুভুজ) যত টুকরা করা যায়, প্রত্যেক টুকরাই নূতন করিয়া জীবনযাত্রা আরম্ভ করে। তবে কি এই টুকরাগুলাকে স্বতন্ত্র জীব বলিব ?

"কিসে স্বাতন্ত্র্য হয় ? কখন্ স্বাতন্ত্র্য হয় ? কেনই বা হয় ? নিম্নতম এককোষক (unicellular) জীবের কথা ভাবিয়া দেখুন দেখি। একটি মাত্র কোষের (cell) মধ্যে সমস্ত জীবটি সংহত। কোষের বহিরাবরণ অপেক্ষাকৃত শক্ত ; কোষের মধ্যে তরল Protoplasm। Protoplasmএর কেন্দ্রস্থ ক্ষুদ্র পদার্থটিকে nucleus বলা যায়। যেন ঐ তরল (Semi-fluid) প্রোটোপ্লাজম মাঝখানে একটু জমাট বাঁধিয়া nucleus করিয়াছে ও নিজের পিঠটাকেও জমাইয়া আপনার আবরণ করিয়া লইয়াছে। যেন একটা ice-bag, উহার ভিতর জলপূর্ণ ; মাঝে এক কুচি বরফ ; আর ব্যাগটাও চামড়ার বা বরফের নহে ; উহাও যেন বরফেরই একটা আস্তরণ। Ice-bagটা বৃহৎ জিনিষ ; আর এই জীবকোষ অতি ক্ষুদ্র ; চর্ম্মচক্ষুতে প্রায় অদৃশ্য। এই কোষ ক্রমশঃ ডিম্বাকৃতি ধারণ করে ; ক্রমে ক্ষীণকটি dumb-bellএর আকার প্রাপ্ত হয় ; nucleusও সেই ক্ষীয়মান কটিদেশে একটু লম্বা হইতে থাকে ; সহসা এক দিন সেই কোষ কটিদেশে ছিঁড়িয়া যায় এবং সেই কোষ বিভক্ত হইয়া দুইটা স্বতন্ত্র কোষে পরিণত হয় ; ভিতরে দুইটা স্বতন্ত্র nucleusও হইয়া যায় ; কিন্তু protoplasmএর পরিবর্ত্তন হইল না। ইহাদের মধ্যে জনকই বা কে, জন্ম হইলই বা কাহার ? আবার কখনও জীবকোষের মধ্যে protoplasm জমাট হইয়া স্থানে স্থানে দানা (Spore) বাঁধিতে থাকে ; অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে আঁচড়ের (Specks) মত দেখায় ; যখন দানা বাঁধা সম্পূর্ণ হয়, কোষের বহিরাবরণ ফাটিয়া যায় ; একটি কোষ ফাটিয়া ভিতরের দানা (Spore) চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এক-একটি দানা আবার এক-এক কোষ গড়িয়া নব জীবন আরম্ভ করে। ইহাদের মধ্যে জনকই বা কে, জন্ম হইলই বা কাহার ? জনকের মৃত্যুই বা হইল কখন ? এই জন্যই ওয়াইজমান বলিয়াছেন যে, এককোষক (Unicellular) জীব মরিতে বাধ্য নহে। যাহারা উচ্চ পর্য্যায়ের জীব, তাহারাই আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য মৃত্যুরূপ মূল্য দিয়াছে। তাই, অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীতে পিতা-পুত্রের স্বাতন্ত্র্য, জন্ম-মৃত্যুর সমস্যা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর।

"বিভাগের দিক্ দিয়া যেমন দেখা গেল, সংযোগের দিক্ দিয়াও সেইরূপ দেখা যাইতে পারে। উচ্চ শ্রেণীর জীবের মধ্যে এক জনের একটা বিশিষ্ট দেহযন্ত্র আর এক জনের শরীরে বসান যায় না; এক জনের ধড়ে আর এক জনের মাথা বসাইয়া দেওয়া যায় না। এক জনের শরীরের একটু আধটু চামড়া আর এক জনের দেহে ডাক্তাররা লাগাইয়া দেন; এক জনের রক্তও অন্যের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু বিশিষ্ট দেহযন্ত্রের (highly differentiated organs) পক্ষে এরূপ ব্যাপার অসম্ভব। দেহমধ্যস্থ এই সকল যন্ত্র (organs) আপনার কর্ম্মের উপযোগী হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। যেখানে জীবের স্বাতন্ত্র্য খুব পরিস্ফুট, সেখানে এক জীবের উপযোগী অবয়বকে অন্য জীবের উপযোগী করিয়া লওয়া একপ্রকার অসম্ভব। গাছের গুঁড়ি অনেক সময় অন্য গাছের ডালকে আপনার করিয়া লইতে পারে; উৎকৃষ্ট আমগাছের ডাল নিকৃষ্ট গাছে লাগাইলে অনেক সময়ে শেষোক্ত গাছের উৎকর্ষ সাধন হয়, কিন্তু গাছের পক্ষে ইহা উৎকর্ষের পরিচয় নহে। একটা কুকুরে অন্য কুকুরের কলম বাঁধা যায় না। খুব নিম্ন শ্রেণীর দুইটা জীবকোষ মিলিয়া এক হইয়া যায়। উচ্চ শ্রেণীতেও পুং-স্ত্রী-বীজের সংযোগ ব্যতীত নূতন জীবের আবির্ভাব হয় না। এই যে নূতন জীব, ইহাকে এক হিসাবে স্বতন্ত্র বলা যাইতে পারে, এক হিসাবে বলা যাইতে পারে না; তাহাকে তাহার পিতা মাতার germ-plasm হইতে বিভিন্ন মনে করা যায় না।

"এইরূপে স্বাতন্ত্র্যের মাত্রাভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও জায়গায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করাটাই জীবনের অনুকূল; কোনও জায়গায় পরের সঙ্গে মিশ্রণই জীবনের অনুকূল। মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, উচ্চ পর্য্যায়ের জীবে স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; নিম্ন পর্য্যায়ে সেটা অপরিস্ফুট। উচ্চ শ্রেণীর জীব সহজে পরকে আপন করিতে পারে না; যদি আপন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্বতন্ত্র থাকিতে দিলে চলিবে না। বাঘের পক্ষে ছাগলকে আত্মসাৎ করা দরকার; কিন্তু তাহাকে মারিয়া, খাইয়া, নিজের পাকস্থলীতে পরিপাক করিয়া তাহাকে unorganised fluidএ পরিণত করিয়া সে নিজদেহে সঞ্চারিত করে; নিজের উপযোগী গঠন দিয়া, নূতন জীবকোষ নির্ম্মাণ করিয়া আপনার শরীরের পুষ্টিসাধন করে।

"আরও একটু খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখা গেল যে, কতকগুলা cell (জীবকোষ) একত্র জমাট বাঁধিয়া দেহ তৈয়ার করে। এই যে জমাট বাঁধা, এই যে কোষগুলির সংহতি, হার্বার্ট স্পেন্সর ইহার নাম দিয়াছেন—Integration। যত দিন স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট না হয়, তত দিন এই জমাট বাঁধাও একটু আলগা রকম থাকে; অল্পেই বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে। আবার দেখা যায় যে, সমপ্রকৃতিক দুইটা দেহ মিশিয়া গিয়া (fused) সমপ্রকৃতিক আর একটা দেহ নির্ম্মাণ করে। এ অবস্থায় জনক ও সন্তানের, এবং জন্ম-মৃত্যুর পার্থক্য বিচার করা কঠিন: কোন্‌টা দেহ, কোন্‌টা অঙ্গ, নিরূপণ করা কঠিন; সকল কোষই (cell) তখন সমাকার, একধর্ম্মী; অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গই অন্য অঙ্গের কাজ করিতে পারে; কাহারও নির্দ্দিষ্ট function থাকে না; এমন কি, জননেন্দ্রিয় (reproductive organ) কিছু একটা নির্দ্দিষ্ট থাকে না,—যে কোনও অঙ্গ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার দেহটা reproduce করিতে পারে। স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সংহতি (integration) যখন বেশী মাত্রায় হয়, তখন দেহের ভিতরের যন্ত্রগুলা (organs) পৃথক্ হইতে থাকে; প্রত্যেক অঙ্গ অন্য অঙ্গ হইতে পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র কাজ (function) পায়, এবং সেই function অনুসারে আপনাদের আকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করে; স্পেন্সরের ভাষায় ইহাকে বলে—Differentiation। জীবের স্বাতন্ত্র্য যত ফুটিয়া উঠে, সে ততই বাহিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া যেমন জমাট বাঁধে, তেমনই ভিতরেও অবয়বগুলির শ্রম-বিভাগ (division of labour) দ্বারা (differentiation) হয়। যুগপৎ এই সংহতি (integration) ও শ্রম-বিভাগ (differentiation) হইতে জীবের উৎপত্তি হয়; স্পেন্সরের ভাষায় এইটাই Evolution (অভিব্যক্তি)। এই Evolution-তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য তিনি গোটা Synthetic Philosophyর গ্রন্থগুলা লিখিয়াছেন।

"পূর্ব্বে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, নিম্নতম প্রাণীতে ও নিম্নতম উদ্ভিদে যন্ত্রের (organs) পার্থক্য ও ক্রিয়ার (function) পার্থক্য হয় না; কোনও একটা ব্যক্তির দেহের evolutionএও আমরা ইহার প্রমাণ পাই। জরায়ুর মধ্যে যখন প্রথম ভ্রূণের বিকাশ হয়, তখন কোনও রকম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাওয়া যায় না, সকল কোষই দেখিতে একরকম ও একধর্ম্মী; এমন কি,

ভ্রূণটা মানুষের, কি কুকুরের বুঝা যায় না, তাহার স্বাতন্ত্র্য তখনও ফুটে নাই। ক্রমে যত উন্নতির সোপানে উঠে, ততই ক্রমশঃ সঙ্গে সঙ্গে integration ও differentiation হয়, অবয়ব (organs) গড়িয়া উঠে, তাহাদের functions নির্দ্দিষ্ট হয়, একটা অবয়ব আর একটার কাজ করিতে পারে না। কোনও একটা উন্নত জীবের দেহে একটা বিশিষ্ট অঙ্গের পরিবর্ত্তে অন্য জীবের সেই অঙ্গ দেওয়া যায় না ; তেমনই দেহের ভিতরেও একটা যন্ত্রের কাজ আর একটা যন্ত্র করিতে পারে না। জীবের কোনও একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ছিন্ন হইলে, সে আর সেটাকে গড়িয়া লইতে পারে না, সম্ভবতঃ তাহার মৃত্যু হইতে পারে। অবয়বগুলা নির্দ্দিষ্ট পৃথক্ কাজ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সবগুলাকে একযোগে সবটার জন্য কাজ করিতে হয় ; সকলে পরস্পর অবিরোধে কাজ করিবে। হাত, পা, চোখ, মুখ যদি পেটের উপর বিদ্রোহী হইয়া কাজ করে, তাহারাও মরিবে, সমস্ত individualটাও মরিবে ; তাহাদের নিজের স্বতন্ত্র জীবন আছে বটে, কিন্তু তাহা সমগ্রটার জীবনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী এই সমস্ত অবয়বকে অবিরোধে ও একযোগে চালাইবার জন্য একটা যন্ত্রের বা অবয়বের সৃষ্টি করিয়াছে ; সেটাকে শাসনযন্ত্র বলা যাইতে পারে। তাহার নাম—Nervous System.

"এই যে Nervous System, ইহার আর একটা কাজ আছে :—বাহিরের environment হইতে খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া পুষ্টি-সাধনের জন্য ও বাহিরের শত্রু হইতে আত্মরক্ষার জন্য যে সকল অবয়ব নির্দ্দিষ্ট আছে, এই স্নায়ুযন্ত্র সকলকে পরিচালিত ও স্বকর্ম্মে প্রেরিত করিতেছে। এই সকল কাজের জন্য বহির্জ্জগতের সংবাদ আনিতে হয়, অতএব ইহাকে টেলিগ্রাফের, ডাকঘরের, spyএর কাজ করিতে হয় ; সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে এই সংবাদানয়নের কার্য্যে ব্যাপৃত রাখা হয়, সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে আত্মরক্ষার ও আত্মপুষ্টির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই যন্ত্রটা শাসন ও রক্ষণ, এই উভয়বিধ ব্যাপারের সম্পূর্ণ উপযোগী। ইহাই দেহের পক্ষে গভর্ণমেণ্ট।

"উচ্চ শ্রেণীর জীবের মধ্যে এই যন্ত্রটা যখন গড়িয়া উঠে, তখন তাহার স্বাতন্ত্র্যটাও খুব ফুটিয়া উঠে। এই যন্ত্রটাকে অবলম্বন করিয়া জীবের আর একটা ধর্ম্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে—consciousness বা চেতনা। এটি জীবের

স্বাতন্ত্র্যের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য জীবের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন হইয়াছে। এই চেতনা জীবনকে আশ্রয় করিয়া আছে বটে, কিন্তু তথাপি ইহা জীবনের অতিরিক্ত একটা কিছু জিনিষ। কেমন করিয়া ইহার উৎপত্তি হইল, বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানশাস্ত্র সে সম্বন্ধে একেবারে মূক। কেমন করিয়া ইহার উৎপত্তি হইল, science তাহা বলিতে পারে না বটে; কিন্তু কি উদ্দেশ্যে হইল, ডারুইনের শিষ্যেরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। দেহের ভিতরে কোনও গোলযোগ হইল কি না, বাহির হইতে শত্রুর আশঙ্কা আছে কি না, ইহা জানিবার প্রধান উপায়,—চেতনা। এই চেতনার লক্ষণ,—সুখ ও দুঃখবুদ্ধি। ভিতরের ও বাহিরের ব্যাপার অনুকূল হইলে জীবের সুখবুদ্ধি হয়, প্রতিকূল হইলে দুঃখবুদ্ধি হয়। এই সুখবুদ্ধি ও দুঃখবুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া কোন্‌টা হেয় এবং কোন্‌টা উপাদেয়, স্থির করিয়া কাজ করা হইয়া থাকে। ইহাতে জীবন-সংগ্রামের খুব লাভ; যে রকম করিয়াই হউক, জীব চেতনা লাভ করিলে তাহার টিকিয়া যাইবার সম্ভাবনা বাড়িয়া গেল। চেতনা জিনিষটা প্রত্যক্ষ নয়; অপরের চেতনা তাহার অঙ্গভঙ্গী ও আচরণ দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে হয়। তোমার আনন্দ আমি তোমার মুখের হাসি দেখিয়া অনুমান করি, তোমার মনের শোক তোমার কান্না দেখিয়া অনুমান করি; কোনটাই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি না। কাজেই অন্য জীবের চেতনা আছে কি না, সেটা সকল সময়ে জোর করিয়া বলিতে পারি না; একটা মোটামুটি ঠিক করিয়া লই, কোন্ জীব চেতন, কে বা অচেতন, কে বা অস্ফুটচেতন। গাছ যখন কাটিয়া ফেলি, তাহার চেতনা নাই এইরূপ অনুমান করি; কিন্তু একটা পোকা যখন ধরিতে যাই, সে পলায়ন করে, বুঝিতে পারি যে, তাহার চেতনা আছে। লজ্জাবতী লতার সঙ্কোচে হয়ত এইটুকু প্রমাণ হয় যে, তাহার nervous system আছে; সে respond করে, কিন্তু সে সজ্ঞানে consciously করে কি না, বলা কঠিন। মাংসাশী গাছ পোকাকে ধরিয়া হজম করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। এ ক্ষেত্রে তাহার যন্ত্রগুলি প্রায় জন্তুর মত খুব জটিল উপায়ে আত্মপুষ্টির চেষ্টা করে, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা কলের ব্যাপার হইতে পারে। ঘড়ির একটা কল নাড়িলেই টং টং করিয়া বাজিয়া উঠে। সে কি সচেতনভাবে বাজে? এই মাংসাশী গাছের প্রকৃতি হয়ত ইঁদুর-কলের মত

হইতে পারে। ইঁদুরের প্রবেশ মাত্রেই কল তাহাকে ধরিয়া ফেলে, চাপিয়া মারে; কিন্তু কল তাহা জানিতে পারে কি?

"নিম্নতম শ্রেণীর জীবের মধ্যে Nervous systemও নাই, চেতনাও নাই। উচ্চ পর্য্যায়ে উঠিলে ঐ দুটোকে পাওয়া যায়। যেখানে Nervous system একটা মস্তিষ্ক গড়িয়া ফেলিয়াছে, সেইখানেই চেতনা খুব পরিস্ফুট। চেতনাকে মস্তিষ্কের ধর্ম্ম বলা ভুল। সে মস্তিষ্করূপ যন্ত্রটাকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করে মাত্র। চেতনার কাজ হইল জানা। ইহার চরম পরিণতি,—Self-consciousness, অর্থাৎ আপনাকে জানা [দার্শনিক পরিভাষা—অহঙ্কার]।

"কেঁচো বা জোঁক আলো-আঁধারের ভেদ বুঝিতে পারে, বাহিরের জিনিষের পার্থক্য অনুভব করিতে পারে, কিন্তু তাহার "আমি"-জ্ঞান হয় কি না, বলা শক্ত। আলো-আঁধার-বোধ, ঠাণ্ডা-গরম-বোধ, সুখ-দুঃখ-বোধ, শত্রু-মিত্র-বোধ, এগুলা সব থাকিতে পারে; কিন্তু এ সকল বুদ্ধি যে আমার বুদ্ধি, এই "আমি" নামক একটা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্বের জ্ঞান, কেঁচো জোঁকের ত নাই; হাতী ঘোড়া বাঘেরও ষোল আনা জাগ্রত হয় কি না তাহা সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মানুষের মধ্যেই বোধ হয় এই অহং-জ্ঞানের বা "আমি"র পূর্ণ পরিণতি হইয়াছে। ইহারই বলে মানুষ সমস্ত জগৎ হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া সেই জগৎটাকে নিজেরই জ্ঞানের ও ভোগের বিষয় এবং কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া মনে করে। জীব-বিদ্যার হিসাবে বলিতে পারি যে, এই অহং-জ্ঞানটাই জীবের স্বাতন্ত্র্যের চরম পরিণতির পরিচায়ক। দার্শনিক ঠিক উলটা পথে চলেন। তিনি এই 'আমি'টাকে গোড়ায় স্বীকার (Postulate) করিয়া লন; এবং তাহা হইতে জগৎ-ব্যাপারের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। আমরা দার্শনিক আলোচনা করিতেছি না; সমাজতত্ত্বের জন্য আমাদিগকে জীব-বিদ্যা প্রয়োগ করিতে হইবে।

"পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, Heredity, Variation প্রভৃতি তত্ত্ব এখনও এত অপূর্ণ অবস্থায় আছে যে, তাহা সমাজ-বিদ্যায় প্রয়োগ করার সময় এখনও আসে নাই। তবে যেটা জীবনের সাধারণ লক্ষণ,—পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে সমঞ্জস করিয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার চেষ্টা, এবং এই আত্মরক্ষার ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষার উদ্দেশ্যে জীবন-সংগ্রাম ও তদ্দ্বারা জীবনের

ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি ও অভিব্যক্তি, সেটাকে আমরা নির্ভয়ে সহায়রূপে গ্রহণ করিয়া সমাজ-বিদ্যার আলোচনায় প্রয়োগ করিতে পারি। জীবনের স্বাতন্ত্র্য-লাভটাই উচ্চ জীবের জীবনের লক্ষণ; ইহার সাহায্যে জীবনদ্বন্দ্বে সফলতা লাভ করা যায়।

"এই সফলতা কাহাকে বলে? কেবল কি জীবের স্থিতি (duration) দেখিয়া ইহার পরিমাপ করা যায়? তবে কি যে যত বেশী দিন বাঁচে, সে-ই তত বেশী উন্নত ও সফল-প্রযত্ন? পরমায়ু দেখিয়া যদি জীবের উৎকর্ষাপকর্ষ স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে মানুষের চেয়ে হাতী শ্রেষ্ঠ। শুনিতে পাওয়া যায় যে, যে-ওক্‌গাছের তলা দিয়া রোমের সেনাগণ গিয়াছিল, আজও না কি তাহার দু-চারিটা জীবিত আছে। তবে কি Oak গাছ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত? শুধু পরমায়ু দেখিলে চলিবে না। এমন কি, বংশের পরমায়ু ধরিয়া পরিমাপ করিলেও চলিবে না। ভূপৃষ্ঠের স্তর উদ্‌ঘাটিত করিয়া না কি দেখা গিয়াছে যে, অতি প্রাচীন কালে আরশোলা বর্ত্তমান ছিল; সে সময়ে মেরুদণ্ডী জীব, এমন কি, মাছ পর্য্যন্ত ছিল না। কত কাল পরে মাছ ও সরীসৃপের উদ্ভব হইল; আরও কত যুগ পরে অতিকায় ম্যামথ্‌ ও ম্যাষ্টডনের জন্ম হইল। এই অতিকায় জীবগুলাও লুপ্ত হইয়া গেল, আরশোলা এখনও বাঁচিয়া আছে। তবে কি আরশোলা এই সকল জীবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ?

"কেবল পরমায়ুর উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, অন্যান্য বিষয়ও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। জড় পদার্থের মধ্যে বড় ছোট বিচার করিতে হইলে যেমন শুধু তাহার দীর্ঘত্ব দেখিলে চলিবে না, তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার হিসাব লইতে হইবে; তেমনই জীবনের উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার করিতে হইলে Quantity of life বিবেচনা করিতে হয়। পরমায়ুটাকে জড়ের দৈর্ঘ্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তারকে (range of activity) প্রস্থ বলা যাইতে পারে। Oak গাছের পরমায়ু খুব বেশী বটে, কিন্তু তাহার কার্য্যের ব্যাপকতা (range) কম; সে এক জায়গায় বসিয়া ডাল-পালা ফল প্রসব করে মাত্র। একটা প্রজাপতির পরমায়ু কম, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্র গাছের চেয়ে ঢের বেশী। মানুষের ক্রিয়ার ব্যাপ্তি অপরিসীম। Intensity of Lifeকে কর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রম, উগ্রতা ও তীব্রতাকে জড় পদার্থের উচ্চতার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকা অল্প পরিসরের মধ্যে অল্প পরমায়ু লইয়া যে intensity of life এর, কর্ম্মপটুতার

পরিচয় দেয়, তাহার নিকটে মানুষও হয়ত পরাস্ত হয়; অন্ততঃ শিশুপাঠ্য গ্রন্থে মানুষের পক্ষে মক্ষিকা আদর্শস্বরূপ বিবেচিত হইয়াছে,—

'মক্ষিকা সামান্য প্রাণী, কিন্তু তারে শ্রেষ্ঠ মানি
উপদেশ লও পরিশ্রমে।'

"এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন factor একত্র যাচাই করিয়া জীবনের সফলতা স্থির করিতে হইবে।

"মানব-সমাজে দেখিতে পাই যে, আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরে যে সকল জাতি বাস করে, তাহারা বহু যুগ ধরিয়া বাঁচিয়া আছে; সভ্যতর সমাজ অপেক্ষা ইহাদের পরমায়ু বেশী। কিন্তু ইহাদের কর্ম্মক্ষেত্র স্বল্পপরিসর, অর্থাৎ কাজের পরিসর (Variety) অল্প,—জীবনের কর্ম্মপটুতা, উগ্রতাও অধিক নহে। গ্রীসের এক-একটি নগরে অধিবাসীদিগের range ও activity দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়; তাহারা Science, Arts, Philosophy, Polity প্রভৃতিতে যেরূপ জীবনীশক্তির ক্রিয়ার পরিচয় দিয়াছে, সেরূপ অন্যত্র দেখা যায় না; কিন্তু সেই নগরগুলির পরমায়ু অল্প ছিল। রোমের পরমায়ু গ্রীসীয় নগরের চেয়ে বেশী ছিল, কিন্তু গ্রীকদিগের তুলনায় তাহার কর্ম্মের ক্ষেত্র অল্প ছিল; সে শুধু শাসন ও ব্যবস্থাকার্য্যেই তাহার অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত করিয়াছিল, আর কিছু বড়-একটা করিতে পারে নাই। ইহুদির জাতীয় জীবনের ইতিহাস হাজারখানেক বছরের মধ্যেই পর্য্যবসিত। তাহার চিন্তার rangeও যৎসামান্য; সে কেবল একটা ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়াস পাইয়াছে; বেশী কিছু জগৎকে দিতে পারে নাই। কিন্তু জীবন-সংগ্রামে যে চেষ্টার, অবিশ্রান্ত কর্ম্মশীলতার intensityর পরিচয় সে দিয়াছে, তাহার নিকট গ্রীককেও বোধ করি পরাস্ত হইতে হয়।

"মানুষের ইতিহাস আলোচনা করিতে বসিয়া কেবল তাহার স্বাতন্ত্র্যের মাত্রা দেখিলেই চলিবে না; তাহার উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার করিতে হইবে।"

রামেন্দ্রবাবু চুপ করিলেন। আমি বলিলাম, "বোধ হয়, Scientific study of History সম্বন্ধে আর কিছু বলা আবশ্যক নাই।" তিনি বলিলেন, "না; এইবার আমি জীব-বিস্তার উক্ত স্থূল তত্ত্বগুলি যথাসম্ভব আশ্রয় করিয়া য়ুডীয়, গ্রীক, রোমক ও ইসলাম-সভ্যতার আলোচনা করিয়া, তৎপরে ভারতবর্ষের সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করিব। এ কথা

এখানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখি, এটা ভাল এটা মন্দ, এটা উচিত এটা অনুচিত, এরূপ না হইয়া এরূপ হওয়া উচিত ছিল, এটাকে ভাঙ্গিয়া এটাকে গড়া উচিত, এই সকল বিচার আমার কাজ নহে। সে সাহস আমার নাই। জগৎ-ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতায় অন্যান্য জীবের মত ব্যথা পাইয়া থাকি ; তবে সেই ব্যথার ঔচিত্য-বিচারে আমার সাহস নাই। কি করিলে কোন্ পথে গেলে সেই ব্যথা কমিবে, সে উপদেশ দিবার ধৃষ্টতাও আমার নাই। সৃষ্টিক্রিয়ার সময় উপস্থিত থাকিলে কাহাকেও কোন পরামর্শ দিতে আমি পারিতাম না।"

হিব্রু

আজ কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া কথোপকথন আরব্ধ হইল। অপরাহ্ণকাল। আকাশ অল্প মেঘাচ্ছন্ন।

আমি।—আসুন, আমরা ইহুদি জাতির ইতিহাসের আলোচনা করি। জগতের সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে হিব্রুদিগের মত করুণ tragedy আর কোথাও বোধ হয় সংঘটিত হয় নাই। অনেকগুলা স্বতন্ত্র দলবদ্ধ যাযাবর-সম্প্রদায় কেমন করিয়া একটা জাতিতে পরিণত হইল, এবং সেই জাতি জগৎকে কিছু দিয়া গেল কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। কেমন করিয়া সে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল; কেমন করিয়া সে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত বিরোধ করিতে বাধ্য হইয়াও একটা সামঞ্জস্য-বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিল; কেমন করিয়া বিভিন্ন হিব্রু tribeগুলি সংহত হইয়া একটা নেশনে পরিণত হইতে গিয়া বিচ্ছিন্ন (disintegrated) হইয়া গেল; জীব-বিদ্যার (Biology) মৌলিক তত্ত্বগুলির সূত্র ধরিয়া আপনি এই কথার আলোচনা করুন।

রামেন্দ্রবাবু।—জীব-বিদ্যার সাহায্যে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই গোটাকতক সাধারণ সত্য ধরিয়া লইতে হইবে। সমাজদেহ ও জীবদেহ উভয়েই যন্ত্রবদ্ধ পদার্থ। উভয়েরই কতকটা স্বাতন্ত্র্য আছে। একটা সমাজদেহকে অন্যান্য সমাজদেহ হইতে এবং তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র বিবেচনা করিতে হইবে; কারণ, জীবনের উদ্দেশ্য, ঐ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী করিয়া লইয়া সেই স্বাতন্ত্র্যকে পুষ্ট করা; সেই স্বাতন্ত্র্যের উৎকর্ষ দেখিয়া আমরা জীবনের সফলতার পরিমাপ করি। সমাজদেহ কাহাকে বলিব? পাঁচ জন লোক এক জায়গায় দল বাঁধিয়া বসিলেই কি তাহাকে সমাজ বলিব? গোটা সমাজটার সঙ্গে তার ব্যষ্টির কি সম্বন্ধ? Societyর জন্য Individual, না Individualএর জন্য Society? জীব-বিদ্যায় কি এ প্রশ্ন উঠে? দেহের অঙ্গগুলি (organs) তাহার কোন-না-কোন কাজে লাগে; নহিলে তাহাদের কোনও সার্থকতা নাই। কিন্তু সমাজে যে-individual কোনও কাজে আসিল না, তাহাকে কি উচ্ছেদ করিতে হইবে? জীব-বিদ্যায় দয়ামায়ার স্থান নাই,

সমাজবিদ্যায়ও কি অকেজো ব্যক্তির প্রতি দয়ামায়ার লেশ মাত্র থাকিবে না ? উন্নত সমাজে কি এরূপ মনে করা চলে ? জীবদেহে প্রত্যেক কোষের স্বাতন্ত্র্য নাই ; কিন্তু সমাজদেহের প্রত্যেক ব্যক্তিরও কি স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না ? সমাজ-বিদ্যার এত বড় কথাটা সম্বন্ধে জীব-বিদ্যা খাঁটি উত্তর দিতে পারিবে না। উত্তর পাইতে হইলে আরও অন্য scienceএর সাহায্য লইতে হইবে—যথা চারিত্র দর্শন (moral science); কিন্তু এই moral scienceএর সহিত biologyর কিছু মাত্র সম্পর্ক নাই। হক্‌স্‌লি এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া বলিয়াছেন যে, জীব-জগতে যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়, সে সমুদয় সম্পূর্ণরূপে moral scienceএর বহির্ভূত ;—moralও (সুনীতি-মূলক) নহে ; immoralও (দুর্নীতিমূলক) নহে ; একেবারে unmoral (অনীতিমূলক)। তাই বলিতেছি, ঐতিহাসিক আলোচনায় জীব-বিদ্যার তত্ত্বগুলি একটু সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে।

আরও অনেক প্রশ্ন উঠিতে পারে। মনে করুন, মানিয়া লওয়া গেল যে, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য খর্ব্ব করিয়া সমাজ রক্ষা করা সমাজ-বিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয়। তখনই প্রশ্ন উঠে, সমাজের গোড়ার unit কি,—Individual, না Family ?

আমি।—Family, Tribe, Clan প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের বাঙ্গালা পরিভাষা করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয় না ?

রামেন্দ্রবাবু।—Familyর পরিবর্ত্তে আমি 'গৃহ' শব্দটি ব্যবহার করিতে চাই। 'পরিবার' শব্দটা আমাদের এই প্রসঙ্গে বোধ হয় ঠিক যে-জিনিষটি আমরা চাই, তাহা বুঝাইবে না। 'গৃহ' শব্দটা আমাদের নিজস্ব জিনিষ। বৈদিক যুগে Head of the familyকে 'গৃহপতি' বলা হইত ; যে অগ্নি তিনি জ্বালিয়া রাখিতেন, তাহাকে গার্হপত্য বলা যাইত। ব্রাহ্মণ যত দিন গুরুগৃহে থাকিতেন, তত দিন তিনি গৃহী নহেন, ব্রহ্মচারী। গুরুগৃহ পরিত্যাগের পর সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইলে তিনি স্নাতক ; তখন তাঁহার বিবাহে অধিকার জন্মিয়াছে ; বিবাহান্তে সস্ত্রীক যে অগ্নিপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহাই গার্হপত্য অগ্নি ; শ্রৌত অগ্নি স্থাপনের পর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আরব্ধ ; তখন সেই ব্রাহ্মণ,—গৃহী বা গৃহস্থ, সেই গৃহের গৃহপতি ; পত্নী হইলেন—গৃহিণী। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে যখন বলা হইল, তখন পত্নী বড় হইয়া গেলেন। শ্রৌত, স্মার্ত্ত এবং communal বা Personal, যে-কোনও কাজ করিতে

হইবে, তাহা সস্ত্রীক করা চাই ; শ্রীরামের স্বর্ণসীতা আবশ্যক হইয়াছিল। পতি ও পত্নী উভয়ে কর্ম্মফলে তুল্যরূপে ভাগী হইবেন।

Clanকে গোত্র বলিব, না গোষ্ঠী বলিব ? শব্দ দুইটির বুৎপত্তিলব্ধ অর্থ কিন্তু বড় বেশী তফাৎ নহে। আদিম আর্য্যদিগের প্রধান সম্পত্তি ছিল গোধন ; সেই গরুগুলিকে যতটা জায়গার মধ্যে বেড়া দিয়া রক্ষা করা হইত, সেই বেড়া বোধ করি গোত্র, এবং সেই জায়গায় যে কয়টি পরিবার থাকিতেন, তাঁহারা সগোত্র ; একটি গোষ্ঠের চারি দিকে যাঁহারা থাকিতেন, তাঁহারা একই গোষ্ঠীভুক্ত। হিন্দুসমাজে গোত্র খুব বড় জিনিষ। বেদের ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে গোত্রপ্রবর্ত্তক কয়েক জন ঋষির নাম আছে ; আধুনিক হিন্দুসমাজের সকলেই যে সেই কয় জন ঋষির বংশধর, এরূপ মনে করা যায় না। কালক্রমে অনেক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিকে খাড়া করা হইয়াছে। কোনও কোনও যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানে যজমানের গোত্রভেদে মন্ত্রের তারতম্য হইত। এখনও আমাদের কোনও অনুষ্ঠানেই নিজের গোত্র-পরিচয় না দিলে চলে না। এক এক গোত্রের বংশগুলি চারি দিকে এত ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, গোত্র এখন Clan অপেক্ষা বড় জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গোষ্ঠী বরং অনেকটা সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ। গোষ্ঠী শব্দটা গ্রহণ করিলে বোধ করি অন্যায় হইবে না।

Tribeএর ঠিক বাঙ্গালা পরিভাষা পাওয়া কঠিন। 'কুল' শব্দটি Tribe অর্থে এদেশে প্রচলিত আছে ; ছত্রিশকুল রাজপুতের কথা শুনিতে পাই। আমাদের ঐতিহাসিক আলোচনায় Tribeএর পরিবর্ত্তে 'কুল' শব্দটি ব্যবহার করিলে যে বিশেষ সুবিধা হইবে, এমন ত বোধ হয় না। হঠাৎ নূতন নূতন পরিভাষা চালাইতে চেষ্টা করিলে গোলযোগের সম্ভাবনা আছে। এখন আমরা ইহুদিদিগের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে বসিয়া যদি আমরা হিব্রু tribeগুলাকে হিব্রুকুল বলিয়া অনুবাদ করিয়া চালাইতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের নিজেরই কেমন কেমন ঠেকিবে। অতএব পরিভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে একটু স্বাধীন না থাকিলে চলিবে না।

এইবার আসুন, হিব্রুদিগের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখি। প্রথমটা কি দেখিতে পাই ? অনেকগুলি স্বতন্ত্র Tribe। কোথা হইতে তাহারা আসিল, কেহ তাহা বলিতে পারে না ; আরবের মরুভূমিতে বা মেসোপটেমিয়ার উর্ব্বর ভূমিতে তাহাদের জন্ম কি না, সে রহস্য এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। সহসা কতকগুলি যাযাবর Tribe আমাদের নয়ন-

গোচর হয়। তাহারা সকলেই এব্রাহামের পুত্র, ইস্রায়েলের বংশধর বলিয়া পরিচিত ছিল; তাহাদের কৌলিক ইতিহাসের ধারা সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে একই ভাবে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে; সকলেই এক ভাষায় কথা কহিত; একই দেবতা এলোহিমকে পূজা করিত, অথচ প্রত্যেক tribeএর স্বতন্ত্র কৌলিক দেবতাও ছিল; কাহারও নির্দ্দিষ্ট আবাসভূমি ছিল না। এই সকল যাযাবর-দল হয়ত মিশর দেশে গিয়াছিল; মূসার নেতৃত্বাধীনে হয়ত তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আমি।—হয়ত বলিতেছেন কেন? মূসা নামধেয় কোনও ব্যক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে; কিন্তু Exodus সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে কি?

রামেন্দ্রবাবু।—অনেকে ত সন্দেহ করিয়া থাকেন। আমরাই বা ঐ ব্যাপারটিকে অভ্রান্ত ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিয়া লইব কেন? তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া গেল যে, হিব্রু-দলগুলি মিশর দেশ হইতে পলাইয়া আসিল। প্রত্যাবর্ত্তনের পর সাইনে (Sinai) পাহাড়ের উপর মূসার ভগবদ্দর্শন ঘটে। কেনাইট (Kenite) নামক একটি নূতন tribeএর সহিত তাঁহারা মিলিত হইলেন; ইহারা জাভে (Jahveh) নামক দেবতার পূজা করিত। মূসা এই Jahveh দেবতাকে হিব্রুদিগের প্রাচীন দেবতা এলোহিমের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; Jahvehর নিকট হিব্রুরা চুক্তিবদ্ধ (Covenant) হইল যে, তাহারা এক মাত্র জাভের পূজা করিবে, এবং অন্য সমস্ত দেবতার উপাসকদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবে। এই Jahveh দেবতার পূজার বার্ত্তা বহন করিয়া মূসা হিব্রুদিগকে প্যালেষ্টাইনে প্রেরণ করিলেন। 'জাহবে' সোজা করিয়া বলিলে জেহোবা হয়।

আমি।—হিব্রুদিগের প্রাচীনতম ধর্ম্মে ত আর একটা covenant ছিল।

রামেন্দ্রবাবু।—হাঁ, ছিল বটে, ভগবানের সঙ্গে Noahর Covenant। যাহাকে Ark of the Covenant বলা হইত, সেটি একটি বাক্সবিশেষ; হিব্রুরা মূসার অনুজ্ঞাক্রমে সেই বাক্সটি ঘাড়ে করিয়া ঘুরিত। এই Arkটিও একটি ঐতিহাসিক রহস্য; কখন্ ইহার প্রথম আবির্ভাব এবং কখন্ ইহার তিরোভাব হইল, কেহ তাহা ঠিক বলিতে পারে না। বাইবেলে আছে, জেহোবার সহিত মূসার চুক্তিবন্ধনের পর এই বাক্স নির্ম্মিত হইয়াছিল। জেহোবা এই বাক্সের উপর আবির্ভূত হইয়া আদেশ দিতেন। সে যাহা

হউক, মূসা তাঁহার নূতন দেবতাকে লইয়া নূতন দেশে আগমন করিলেন। কতকগুলি নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল।

১। এক মাত্র Jahvehকে পূজা করিতে হইবে।

২। ছুন্নৎ (Circumcision) অনুষ্ঠিত হইল।

৩। পশুবলি প্রবর্ত্তিত হইল।

Jahvehর পৌরোহিত্য মূসার ভাই Aaronএর বংশধর ভিন্ন আর কেহ করিতে পাইবে না। অন্য কেহ সেই পূজার বিধিব্যবস্থা অবগত ছিলেন না। এমনই করিয়া একটা স্বতন্ত্র পুরোহিত-বংশ সৃষ্ট হইল।

যখন তাঁহারা প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহারা আর যাযাবর রহিলেন না; Canaanএ নির্দ্দিষ্ট জমি দখল করিয়া বসিলেন। আশে-পাশে অনেক tribe ছিল,—Moabite, Philistine, Amalekite ইত্যাদি। তাহাদের সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী; কারণ, তাহারা অন্যান্য দেবতার ভক্ত উপাসক ছিল; তাহাদিগের উচ্ছেদ সাধন না করিলে হিব্রুদিগের সত্যরক্ষা হয় না।

Exodusএর কাল-নিরূপণ কঠিন; আন্দাজ খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।

আমি।—তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে, হিব্রুদিগের মধ্যে মূসাই সর্ব্বপ্রথম একেশ্বরবাদ প্রচারিত করিলেন?

রামেন্দ্রবাবু।—সাধারণতঃ এই রকমই বলা হয় বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটু মজা আছে। মিশর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর যে দিন হইতে তাহাদিগের মধ্যে মূসা জাভেকে (Jahveh) প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার প্রধান চেষ্টা দাঁড়াইল যে, সমগ্র দেশের মধ্যে এক মাত্র Jahvehকেই সকলে যেন পূজা করেন। অন্যান্য tribeএর অন্যান্য দেবতা ছিলেন, তাহা অস্বীকার করা হইত না; সেই সকল দেবতার উপাসককে নির্ম্মূল করিতে হইবে; এই মর্ম্মে জাভের সঙ্গে গোড়া হইতে একটা সর্ত্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। অন্য tribeএর দেবতাকে নষ্ট করিয়া আমার tribeএর দেবতাকে উপাস্য করিতে হইবে,—ইহাকে monotheism বলিতে হয় বলুন। এ রকম monotheism ত আশে-পাশের tribeগুলির মধ্যেও দৃষ্ট হয়; তাহাদেরও স্ব স্ব কৌলিক দেবতাকে সকলেরই উপাস্য করিবার প্রয়াস ছিল। তাহারা যদি বলবত্তর হইত, যদি তাহারা নেশন

কিংবা রাষ্ট্র গঠিত করিতে পারিত, তাহা হইলে হিব্রুদিগের এই একেশ্বরবাদের কথা এমন ভাবে জাহির হইয়া পড়িত কি না বলা যায় না। কানানের (Canaan) আদিম অধিবাসী Moabiteদিগের কথাই ধরুন। তাহাদের ত নিজের দেবতা ছিল,—চেমশ্। হিব্রুদিগের প্রতি জাভের যেরূপ আদেশ, মোআবাইটদিগের প্রতি চেমশেরও আদেশ তদ্রূপ কঠোর ছিল। হিব্রু জাতির সম্পর্কে এক মাত্র উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহাকে বলে Moabite Inscription; প্যারিস নগরে উহা রক্ষিত হইতেছে। তাহাতে কি দেখিতে পাই? Moabএর রাজা তাঁহার দেবতা চেমশের তুষ্টি সাধনের জন্য ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে নিহত করিয়াছেন। মেশা নামে Moabএর এক রাজা ছিলেন; তাঁহার প্রজাপুঞ্জের উপর দেবতা চেমশের কোপদৃষ্টি নিপতিত হইল; সেই দেবরোষের ফল হইল এই যে, ইস্রায়েলের রাজা ওম্রি Moabiteদিগকে বিধ্বস্ত করিল; ওম্রির পুত্রও ঐ পন্থা অবলম্বন করিবেন, এইরূপ বুঝা গেল; অমনই Moabiteএর দেবতা চেমশ্ ইস্রায়েলের উপর রোষকষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; মোআবের রাজা সাত হাজার জেহোবা-পূজককে নিহত করিয়া দেবতাকে পরিতুষ্ট করিলেন। উৎকীর্ণ লিপির ইংরেজী অনুবাদ এই দেখুন,—

Omri was king of Israel, and oppressed Moab for a long time because Chemosh was angered against his people. The son of Omri also wished to oppress Moab. Chemosh said to me 'I will cast my eyes on him and over his house, and Israel shall perish for ever.' I, Mesha, king of Moab, accordingly took the town of Ataroh and killed all the people in honour of Chemosh. I killed all, 7000 men, for they had been interdicted, in honour of Chemosh. I carried away the people of Jahveh, and I dragged them along the ground before Chemosh.

এখন বলুন দেখি, ইস্রায়েলের দেবতা Jahveh আর মোআবাইটের চেমশ্ স্ব স্ব উপাসকদিগের প্রতি প্রায় একই প্রকার আদেশ জাহির করিয়াছিল কি না? মূসার হিব্রু-দলগুলি কালক্রমে তাহাদের দেবতা জাভেকে কেন্দ্র করিয়া আপনাদিগকে একটা নেশনে পরিণত করিল, একটা

State গড়িয়া তুলিল; মোআবাইটরা তাহা পারিল না। ইস্রায়েলের জয় হইল; সেই সঙ্গে ইস্রায়েলের দেবতাও সর্ব্বত্র আপনাকে জাহির করিবার অবসর পাইল। Jahvehর পসার-প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন হিব্রু tribeগুলা তাহাদের কৌলিক দেবতাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নাই; বর্জ্জন করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া কৌলিক দেবতার পূজা হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা হইত; এই প্রকার ভয় প্রদর্শনের জন্যই নবীদিগের (Prophets) আবির্ভাব। তাঁহারা কটূক্তি করিয়া, বিভীষিকা দেখাইয়া জনসাধারণের মন Javehর দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন। ইহুদির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, মূসা-প্রবর্ত্তিত জেহোবা দেবতার পূজা ব্যতিরেকে অন্যান্য ছোটখাটো দেবতাও হিব্রুদিগের পূজা পাইত।

সে যাহা হউক, তাঁহারা নূতন ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপর তাঁহাদের জাতীয় জীবন সংহত করিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন; ধীরে ধীরে বিভিন্ন tribeগুলি জমাট বাঁধিবার দিকে অগ্রসর হইল; প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া সুফীদিগের (Judges) নেতৃত্বে কৌলিক স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া একটা বড়-গোছ নেশনে সংহত হইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল।

আমি।—Canaanএ মোটামুটি বারটা tribeই ত আসিয়া বসিল; তখনও তাহাদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বতোভাবে পরিহৃত হয় নাই; আমি গোড়ায় যে tragedyর কথা বলিলাম, এইবার তাহার প্রথম অঙ্ক হইল।

রামেন্দ্রবাবু।—সুফীদিগের নেতৃত্বে এই ১২টা tribe জমাট বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; সকলেই বাহিরের tribeগুলিকে ঘৃণা করিত; তাহাদের সহিত যুদ্ধ হইত; কখনও কিন্তু সব tribeগুলা এক জনের নেতৃত্বে চালিত হইতে রাজী হইত না। আবার নিজেদের স্বতন্ত্র কৌলিক দেবতাগুলিকে তাহারা সকলে ছাড়িতে পারে নাই; সুফীরা এই সকল দেবতা-পূজকদিগকে শাস্তি দিবার চেষ্টা করিত। এইরূপে দিন যায়। পরিশেষে এক জন সুফীর আবির্ভাব হইল, তাঁহার নাম স্যামুয়েল (Samuel)। তিনি দেখিলেন যে, এরূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিলে সফলতা লাভ করা যাইবে না। তথাপি এক জন রাজা প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না; জনসাধারণ বলিল,—আমাদের রাজা চাই। প্রথমে

তিনি তাহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই; কিন্তু শেষে ভাবিলেন, রাজা আবশ্যক। তিনি সল্‌কে (Saul) খুঁজিয়া বাহির করিয়া anoint করিয়া রাজা করিয়া দিলেন।

আমি।—দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে দুই শত বৎসর কতটুকু! সুফী চলিয়া গেলেন; রাজা আসিলেন।

রামেন্দ্রবাবু।—রাজা আসিলেন; তিনি যে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, সে কার্য্যে তিনি prophetদিগের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন; এই prophet-সম্প্রদায়কে স্যামুয়েল একটি যন্ত্রবদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিণত করিয়াছিলেন। এই নবী-সম্প্রদায় (prophetএর হিব্রু পরিভাষা—নবী) জাভের অনুগৃহীত; জাভের দিকে সমস্ত tribeগুলির মন আকৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইলেন।

সলের (Saul) পর দায়ুদ্ (David); দায়ুদের পর সলোমন (Solomon the magnificent) রাজা হইলেন। দায়ুদ রাষ্ট্রের কেন্দ্র-স্বরূপ রাজধানী জেরুসালেম স্থাপিত করিলেন। সলোমন জাভের পূজার জন্য Mount Zionএর উপর দেবমন্দির গঠিত করিলেন। হিব্রুরা মন্দির নির্ম্মাণ করিতে জানিত না; টায়র (Tyre) হইতে মিস্ত্রী আনাইয়া লেবেননে (Lebanon) দেবদারু (cedar) বৃক্ষ কাটিয়া মন্দির তৈয়ারী করা হইল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল যে, সকলে ছোট ছোট গ্রাম্য কৌলিক দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া এই বড় মন্দিরে আসিয়া পূজা করিবে। মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ ছিল না; মূসার সেই অতি প্রাচীন সনাতন বাক্সটি (Ark of the Covenant) সযত্নে রক্ষিত হইল। পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট পুরোহিত-বংশ ছিল; নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান ছিল।

হিব্রু জাতি এখন একটা রাষ্ট্রে পরিণত হইল। রাজার একেশ্বর প্রভুত্ব, অখণ্ড প্রতাপ। রাজ্যের বাহিরে Moabite প্রভৃতি দলগুলা তখনও কৌলিক অবস্থা (tribal stage) হইতে উন্নত হইতে পারে নাই। দূরে বড় বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল,—আসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, মিশর। আবার টায়র (Tyre), সিডন্ (Sidon) প্রভৃতি কয়েকটি প্রবল ফিনীসিয় নগর ছিল। ইহাদিগের মধ্যে আত্মরক্ষা করিতে হইবে; পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে; সেই সঙ্গে জাভে-পূজাকে কেন্দ্রে রাখিয়া সমাজ-দেহে সংহতি রক্ষা

করিতে হইবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত বিরোধ ও সন্ধি করিয়া চলিতে হইয়াছিল। ফিনীসিয়দিগের সহিত সন্ধি করিয়া ইহারা তাহাদের জাহাজে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিল; রাজ্য বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। সলোমনের অতুল ঐশ্বর্য্য; তিনি বিদেশের বহু রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার না কি এক সহস্র মহিষী ছিল। সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত হইল। সংহত সমাজ ভাঙ্গিবার (disintegrated) লক্ষণ প্রকাশ পাইল।

সে পরে বলিতেছি। সল্ দায়ুদ ও সলোমন প্রায় শত বর্ষ রাজত্ব করিলেন। সলোমনের মৃত্যুর পর গোলযোগ বাধিয়া গেল। সমাজের প্রবীণ গৃহপতিরা মিলিয়া স্যামুয়েলকে সমস্বরে বলিয়াছিলেন,—আমাদের রাজা চাই; তাঁহারা রাজা পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। সলের মৃত্যু হইলে তাঁহারা দায়ুদকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; রাষ্ট্র জমাট হইয়া বাঁধিয়া উঠিল; সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা পাইলেন; কবিবর নবীন সেনের ভাষায় বলিতে গেলে, তাঁহাদের তখন "এক রাজ্য, এক ধর্ম্ম, এক নারায়ণ।" রাজা দায়ুদ জাভের উপাসনায় যে একাগ্রতার, তন্ময়তার, উন্মাদনার ভাব প্রকাশ করিতেন, তাহাতে প্রজাপুঞ্জের আনন্দের সীমা থাকিত না। মন্দিরের সম্মুখে তিনি নৃত্য করিতেন, ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন, গায়ে কাদা মাখিতেন। রাজা সলোমনের মতি-গতি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরূপ। বিদেশিনী রাজকন্যা সলোমনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সেই সঙ্গে টীরিয়, আসীরিয়, মিশরীয় দেবতারা Canaanএ শুভাগমন করিলেন। সহস্র-মহিষীপরিবেষ্টিত রাজা সলোমন অনেকগুলি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া নবাগত দেবতাদিগকে তন্মধ্যে স্থাপিত করিলেন। হয়ত ভারতবর্ষে আকবর শাহের মত সলোমন উদারধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হইবার বাসনা করিয়াছিলেন। চেমশ্, আষ্টার্ট, মোলক প্রভৃতি দেবতা Canaanএ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

প্রবীণ গৃহপতিরা প্রমাদ গণিল। এ কি হইল? মূসা জাভের সহিত যে সর্ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষিত হইল না কেন? তিনি ত নিশ্চয় রুষ্ট হইবেন; তাঁহার কোপ হইতে হিব্রু জাতিকে কে রক্ষা করিবে? এখনও মূসার Ark of the Covenant জাভের মন্দিরে রক্ষিত হইতেছে; রাজা কি তাহা ভুলিয়া গেলেন? অন্য জাতির দেবতা আসিয়া আমাদের দেবতার পূজায় ভাগ বসাইতে আসিল কেন? জাভের পুরোহিতগণ বিচলিত

হইলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ Aaronএর কথা স্মরণ হইল। মনে পড়িল, সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনার প্রথম যুগের কথা, যখন মূসার সম্মুখে জাভে আবির্ভূত হইয়া মূসাকে আদেশ করিলেন,—"এক মাত্র আমাকে পূজা করিতে হইবে; যদি করিতে পার, আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব; আমি এক মাত্র তোমাদেরই পূজা গ্রহণ করিব; তোমরাই আমার chosen people; কিন্তু তোমরা অন্য দেবতার উপাসকদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিবে; তাহাদের দেশে যেন কোনও প্রাণী জীবিত থাকে না।" মূসা আসিয়া Aaronকে বলিলেন, সমবেত হিব্রু দলপতিদিগকে বলিলেন, জাভের আদেশ শিরোধার্য্য করিতে হইবে। তাঁহার প্রস্তাব সকলে অনুমোদন করিলেন। তখন হইতেই ত জাভের পূজা চলিয়া আসিতেছে। তাই কি? পুরোহিতের মনে পড়িল Aaronএর পদস্খলনের কথা; লজ্জায় পুরোহিত মাথা হেঁট করিলেন। সেই এক মুহূর্ত্তের বিশ্বাসঘাতকতার ফল কি আজ তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে? তিনিও কি আজ Aaronএর মত কর্ত্তব্যচ্যুত হইবেন? Aaronএর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দেবতা ক্ষমা করিয়াছিলেন। এক মাত্র তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা জাভের উপাসনায় পৌরোহিত্য করিতে পারিবেন, ইহা প্রথম হইতেই স্থির হইয়াছিল। পুরোহিতেরা ভাবিলেন, Canaanএ অন্য দেবতার পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়া রাজা কি অনর্থের সূত্রপাত করিলেন!

নবীগণ (Prophets) ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন। হিব্রু-সমাজ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে জাভের আদেশ কেমন করিয়া বিস্মৃত হইবেন! মূসা যখন দ্বিতীয় বার আদিষ্ট হইয়া জেহোবা-দর্শনাভিলাষে পাহাড়ে চলিয়া যান, দলপতিরা তাঁহার পথ চাহিয়া রহিয়াছিলেন; দিনের পর দিন অতিবাহিত হইল, তিনি প্রত্যাগমন করিলেন না। সকলে মনে করিল, তিনি আর ফিরিবেন না; হয়ত তিনি জীবিত নাই। Aaron বলিলেন,—"মূসা নাই; জাভের প্রত্যাদেশ ত ভাল করিয়া বুঝা গেল না; এস, আমরা আমাদের সনাতন মূর্ত্তিপূজায় মন দি।" এই বলিয়া তিনি একটি স্বর্ণবৃষ গড়িয়া তুলিলেন। দেবতাকে বৃষরূপে পূজা করিবার আয়োজন হইতেছে, এমন সময়ে মূসা সহসা উপস্থিত হইলেন। সকলকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"আর এমন কাজ করিও না। জাভে ক্রুদ্ধ হইলে তোমাদিগের সর্ব্বনাশ হইবে। তাঁহার প্রত্যাদেশ পাইয়াছি। তাঁহার সহিত চুক্তির নিদর্শন-স্বরূপ একটি কাষ্ঠের বাক্স নির্ম্মাণ করিতে

হইবে,—আড়াই ফুট লম্বা, দেড় ফুট চওড়া, দেড় ফুট খাড়াই। সেইটিই Ark of the Covenant।" এত দিন ধরিয়া সেই Arkটিকে কেন্দ্রে রাখিয়া হিব্রু-সমাজ ঘন হইয়া দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। আজ তাহার বুকের উপরে অন্য দেবতা চাপিয়া বসিল।

জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সলোমনের মৃত্যুর পরে তাঁহার রাজ্য দ্বিধা বিভক্ত হইল। উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য আবির্ভূত হইল। উত্তরের নাম হইল—ইস্রায়েল (Israel); দশটা tribe সেখানকার অধিবাসী হইয়া রহিল। দক্ষিণের নাম হইল—যুডা (Judah); দুইটি tribe মাত্র সেখানে রহিল।

আমি।—"এক ধর্ম্ম, এক নারায়ণে"র জন্য "এক রাজ্য" রহিল না। শত বর্ষ কাটিয়া গেল। দুইটা স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য লইয়া হিব্রুর জাতীয় জীবনের ট্র্যাজেডির তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল।

রামেন্দ্রবাবু।—ইস্রায়েল দুই শত বৎসর স্বীয় রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল; এই দুই শতাব্দীর মধ্যে যুডার সহিত অনেক বার তাহার যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। "এক রাজ্য" ত রহিলই না; পরন্তু দুইটা খণ্ডিত অংশের মধ্যে পরস্পরের সহিত বিরোধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। Canaanএ রাষ্ট্রীয় জীবনযাত্রার যে পাথেয় লইয়া তাহারা চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা নিঃশেষিত হইতে না হইতেই তাহারা দুই খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। একটা পুরুভুজ যেমন দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র, দুইটি পৃথক্ পুরুভুজে পরিণত হয় ও হয়ত পরস্পর বিরোধ আরম্ভ করে, তেমনই দুইটা স্বতন্ত্র ধর্ম্মভাবকে কেন্দ্রে রাখিয়া হিব্রু জাতি দুইটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইল।

ইস্রায়েলের প্রথম রাজা জেরোবোয়াম জাভেকে বৃষরূপে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। নূতন পুরোহিত-সম্প্রদায় আবির্ভূত হইল। নবী আহিযা (Prophet Ahijah) এই মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া রাজার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী রাজারা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। ষষ্ঠ রাজা ওম্রি (Omri) সামারিয়াতে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই ওম্রির সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত Moabite Inscriptionএ উল্লেখ রহিয়াছে। সপ্তম রাজা আহাব (Ahab) টায়র (Tyre) নগর হইতে বেয়ালের (Baal) পূজা আমদানি করিলেন।

Baalএর সহিত Jahvehর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল। লোকবিশ্রুত নবী ইলাইজা (Elijah) ও তাঁহার শিষ্য ইলাইশা (Elisha) পুনঃ পুনঃ অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। দশম রাজা কিন্তু Baalএর উপাসকদিগকে উচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য জাভের জয় হইল। পঞ্চদশ রাজা জেরোবোয়াম (Jeroboam II) বেশ শান্তিতে রাজত্ব করিলেন; দেশের শ্রী ফিরিল; বহু দেবতাপূজার উপর নবীগণের অভিশাপ বর্ষিত হইল। উনবিংশ রাজা হোশিয়ার রাজত্বকালে একেবারে সব ফুরাইল।

আসীরিয়াধিপতি দ্বিতীয় সার্গন্ (Sargon II) সামারিয়া দখল করিয়া ইস্রায়েলের সমস্ত নরনারীকে য়ুফ্রেটিস নদীর পরপারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। ইস্রায়েল আসীরিয়-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

আমি।—তার পর?

রামেন্দ্রবাবু।—তার পর যাহা ঘটিল, তাহার তুলনা ইতিহাসে পাওয়া যায় কি? দশটা tribe একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল; জগতে কুত্রাপি তাহাদের একটু চিহ্নমাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। তাহাদের কি হইল, সে সম্বন্ধে ইতিহাস একেবারে মূক। এমন tragedy বোধ হয় আর কোথাও অভিনীত হয় নাই। পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন; বুঝিতে পারি যে, তিনি ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন; তাহা দু-এক বারে পারেন নাই, একুশ বার চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই দশটা হিব্রু tribeএর কি হইল, তাহা যে জানিতেই পারা গেল না। তাহাদের জাতীয় জীবনের চতুর্থ অঙ্কের উপর যে যবনিকা পড়িল, তাহা এখন পর্য্যন্ত উত্তোলিত হইল না; চিরন্তন রহস্যই রহিয়া গেল।

ইস্রায়েলের রাষ্ট্রীয় জীবনের স্থিতিকাল দুই শত বৎসর খ্রীঃ পূঃ ৯৩০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৭২২ পর্য্যন্ত।

আমি।—ইস্রায়েল গেল। দক্ষিণের যুডা-রাজ্য কিন্তু আরও কিছু দিন ত টিকিয়া গেল। প্রথম রাজা রেহোবোয়ামের পর—

রামেন্দ্রবাবু।—রেহোবোয়ামের (Rehoboam) পর কেন, তাঁহারই রাজত্বকালে ধর্ম্মবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল; বহু দেবতার পূজা হইতে লাগিল; ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইল; কোনও প্রকারেই রাষ্ট্রশক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না। আসীরিয়া যখন ইস্রায়েলকে গ্রাস করিল, যুডা তাহার

সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাঁচিয়া গেল। অতিকষ্টে কিছু দিন তাহার রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল।

এমন সময়ে আসীরিয়ার সৌভাগ্যসূর্য্য সহসা অস্তমিত হইল। সদ্যোত্থিত ব্যাবিলনের প্রচণ্ড শক্তি আসীরিয়ার মহাশ্মশানের উপর দিয়া যুডার সিংহাসন কম্পিত করিল। সম্রাট্ নেবুকাড্‌নেজর (Nebuchadnezzar) জেরুসালেম অধিকার করিয়া বসিলেন (খ্রীঃ পূঃ ৫৯৭); অনেকগুলি বন্দী লইয়া ব্যাবিলনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

আরও দশ বৎসর কাটিয়া গেল। সম্রাটের দ্বিতীয় অভিযান হইল। যুডার দুইটা tribeএর সমস্ত নরনারীকে বন্দী করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। এই Babylonish captivityতেই তাহাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিসমাপ্তি হইল।

আমি।—ট্র্যাজেডির পঞ্চমাঙ্কের উপর যবনিকা পতিত হইল।

রামেন্দ্রবাবু।—হইল বটে, কিন্তু এই ট্র্যাজেডির একটি after piece আছে; কপালকুণ্ডলা শেষ হইল, কিন্তু মৃন্ময়ী আছে; Three Musketeers শেষ হইল, কিন্তু Twenty years After আছে; হিব্রু নেশনের ইতিহাস শেষ হইল, কিন্তু Judaismএর ইতিহাস আবার সুরু হইবে।

* * *

পঞ্চাশ বৎসর কাটিয়া গেল। ব্যাবিলনের হিব্রু বন্দীদিগের দিনগুলি কেমন করিয়া কাটিতে লাগিল কে জানে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইল; আর কি দেশে ফিরিবার আশা আছে? নবী এজেকীয়েল (Ezekiel) বলিলেন, আশা আছে; নিরুৎসাহ হইলে চলিবে কেন? তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, কেন তাঁহাদের এই সর্ব্বনাশ হইল? জাতীয় জীবনের পুরাতন কথাগুলি একে একে মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িল, কেমন করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া বিপথে চলিয়া গিয়াছিল; সত্যভ্রষ্ট হইয়া দেবতাকে ভুলিয়াছিল; তাই জাভে তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন না। পুরুষানুক্রমে যে শাপ সঞ্চিত হইয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে বৈ কি। দেবতা কি প্রসন্ন হইবেন না? এত বড় প্রকাণ্ড ব্যাবিলন-সাম্রাজ্যে তাহারা কি নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিবে না! সম্রাট্ ত তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনে হস্তক্ষেপ করেন না। ধর্ম্মের অনুশাসন মানিতে হইবে। মুসা-

প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মশাস্ত্র নূতন করিয়া রচিত হইল ; সমস্ত আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পূজা-পদ্ধতি পুনরুজ্জীবিত হইল। পঞ্চাশৎ বৎসরব্যাপিনী অগ্নি-পরীক্ষার পর দেবতা প্রসন্ন হইলেন। পারস্যাধিপতি সাইরাস (Cyrus) ব্যাবিলন-সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া হিব্রু বন্দীদিগকে দেশে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন।

কিন্তু এত কালের বাস কি সহজে উঠাইয়া দেওয়া যায় ? হিব্রুরা অল্পে অল্পে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্যালেষ্টাইন তখন পারস্য-সাম্রাজ্যভুক্ত। নূতন করিয়া জাভের মন্দির গঠিত করা হইল। ব্যাবিলন হইতে কিছু দিন পরে নবী এজ্রা (Ezra) আসিয়া সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পর এই কয় বৎসরের মধ্যে অনেক হিব্রু যুবক বাহিরের tribe হইতে কন্যা আনিয়া বিবাহ করিয়াছিল। নবী এজ্রা বলিলেন, এ কি হইয়াছে ? অজ্ঞাতকুলশীলা কন্যার সংস্পর্শে আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে না। উহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হউক। তাহাই হইল। স্বীয় শিশুসন্তানদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া বিদেশিনীরা চিরদিনের মত চলিয়া গেল।

নেহেমিয়া (Nehemiah) ব্যাবিলন হইতে আসিয়া ধর্ম্মের অনুশাসন প্রচারিত করিলেন। প্রত্যেক ইস্রায়েল-সন্তান এখন হিব্রু-ধর্ম্মের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, পূজা-পদ্ধতি অবগত হইল। নবী নেহেমিয়া নূতন করিয়া Covenant করিলেন ;—অন্য জাতির সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইব না, সপ্তাহের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট দিন (Sabbath) কাজকর্ম্ম হইতে বিরত থাকিব। মানুষের প্রথম সন্তান, গৃহপালিত পশুর প্রথম শাবক ও বৎসরের প্রথম শস্য ও ফল দেবতাকে সমর্পণ করিতে হইবে ; পুরোহিতদিগের ও তাঁহাদের আজ্ঞাকারী Levitoদিগের ভরণপোষণের জন্য কর দিতে হইবে।

এই নবীন হিব্রু-ধর্ম্মের (Judaism) মধ্যে একটি নূতন জিনিষ দেখিতে পাই ; যথা angel প্রভৃতি দেবযোনি, অপদেবতা ও সয়তানে বিশ্বাস ; এবং মৃতের পুনরুত্থানে বিশ্বাস। এগুলি পারস্য দেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, এমনই করিয়া হিব্রু জাতি আপনাদিগকে এক দুর্ভেদ্য অচলায়তনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার প্রয়াস

পাইল। সমস্ত আচার-ব্যবহারকে তাহারা আঁকড়াইয়া ধরিল। দেবতাকে প্রসন্ন রাখিবার জন্য পশুযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল; মেষ বৃষ ছাগশিশুর যথারীতি বলি হইতে লাগিল; প্রথম পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর এক মাস অতিবাহিত হইলে, তাহাকে দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করা হইত, তৎক্ষণাৎ আবার কিছু মূল্য দিয়া তাহাকে দেবতার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লওয়া হইত। সপ্তাহের সপ্তম দিবস Sabbath বলিয়া গণ্য করা হইত। ছয় বৎসর অন্তর পূরা এক বৎসর পৃথিবীর Sabbath হইত। সে বৎসর ভূমিকর্ষণ, খাল খনন, বৃক্ষ ছেদন নিষিদ্ধ ছিল; যে সকল খাদ্য দ্রব্য আপনা আপনি জন্মিত, সেগুলি ভূস্বামী, দীন-দুঃখীদিগের মধ্যে অধিকাংশই বণ্টন করিয়া দিতেন। হিব্রু-সঙ্ঘের অচলায়তন দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। যাজকতন্ত্র রাষ্ট্রতন্ত্রের স্থান অধিকার করিল।

* * *

দুই শত বৎসর কাটিয়া গেল। ম্যাসিডনের দিগ্বিজয়ী বীর পারস্য-সাম্রাজ্য ধ্বংস করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যুডা বহু কাল গ্রীক সীরিয়া-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রহিল। সে কি বিষম দিন, যখন আন্তিওকস (Antiochos Epiphanes) যুডার যাজকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া হিব্রু জাতিকে নির্দ্দয়ভাবে নিপীড়িত করিল। আদেশ প্রচারিত হইল যে, হিব্রু ভাষার অনুশীলন করিতে দেওয়া হইবে না, গ্রীসীয় ক্রীড়ারঙ্গে (Games) যুডার নরনারী যোগদান করিতে বাধ্য হইবে; মন্দিরে জাভে-পূজার পরিবর্ত্তে গ্রীক-দেবতার পূজা করিতে হইবে; Zeus দেবের মূর্ত্তি মন্দির-মধ্যে স্থাপিত হইবে; ছুন্নদনুষ্ঠানের জন্য মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ক্ষিপ্ত হিব্রু জাতি মাকাবিয়সের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। পঁচিশ বৎসর তাহারা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল। সীরিয়ার রাজা তাহাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না। তাহারা নাম মাত্র তাঁহার অধীন হইয়া রহিল।

কিন্তু যুডার মধ্যেই যাজক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আর একটি সম্প্রদায় মাথা তুলিল; তাহারা ফ্যারিসী (Pharisee) নামে পরিচিত হইল। সমাজের মধ্যে এই অন্তর্বিদ্রোহের ফলে এক দল রোমের সাহায্য প্রার্থনা করিল। পম্পি (Pompey) আসিলেন। রোমের কর্ম্মচারী Procurator ইহুদি জাতির প্রভু হইয়া বসিল।

* * *

রোমের সম্রাট্ বলিলেন, আমাকে দেবতার মত পূজা করিতে হইবে। হিব্রু বলিল, "আমরা সীজরের Cæsar প্রাপ্য সীজরকে দিব ; জাভের প্রাপ্য জাভেকে দিব।" সীজরের ভ্রূকুটি দেখিয়া হিব্রু শিহরিল না। অত্যাচার উৎপীড়ন চলিতে লাগিল। নানা সম্প্রদায় আবির্ভূত হইল। এক দল (Zealots) ধর্ম্মের নামে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা নরহত্যা করিতে আরম্ভ করিল, আর এক দল (Sadducees) গ্রীসীয় হিব্রু ধর্ম্মের (Hellenistic Judaism) দিকে প্রবণতা প্রদর্শন করিল ; Phariseeগণ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ গোঁড়া হিব্রু বলিয়া পরিচিত হইবার প্রয়াস পাইল ; খ্রীষ্টান-সম্প্রদায় বিশ্বপ্রেমের বার্ত্তা ঘোষণা করিল ; এসীনি ও থেরাপিউট সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় আবির্ভূত হইল ; খ্রীষ্টের প্রতিদ্বন্দ্বী সাইমন (Simon the Magus) হেলেন নাম্নী রমণীকে লইয়া তান্ত্রিক উপাসনা আরম্ভ করিলেন। সম্রাট্ ভিস্পেশিয়ন (Vespasion) এবং টিটস্ (Titus) আসিয়া জেরুসালেম ধ্বংস করিয়া দিলেন। যাজক-তন্ত্র হিব্রু জাতির ইতিহাস শেষ হইয়া গেল।

কিন্তু হিব্রু জাতি মরিয়াও মরিল না। তাহারা উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু সর্ব্বত্রই হিব্রু তাহার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নিজেকে অচলায়তনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রবল খ্রীষ্টীয় সমাজের মধ্যে থাকিয়া প্রায় দুই সহস্র বৎসর সে আপনাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। তাহাকে কি না সহ্য করিতে হইয়াছে! খ্রীষ্টানের উৎপীড়নে, মুসলমানের অত্যাচারে সে এক দিনের জন্যও আচারভ্রষ্ট হয় নাই। য়ুরোপের রাজন্যবর্গ, রোমের পোপ তাহার নিকট কত ঋণী!

কোথায় গেল আসীরিয়, ব্যাবিলনীয়, মিশরীয়, পারস্য, ম্যাসিডোনীয়, রোমক সাম্রাজ্য! কোথায় গেল বোগ্দাদের ও কর্ডোভার খলিফা সাম্রাজ্য! কোথায় গেল মোআবাইট্, আমালাকাইট্ কুলসমূহ!

কিন্তু হিব্রু এখনও বাঁচিয়া আছে ; স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে বাঁচিয়া আছে ; তাহার দেবতা আচার-অনুষ্ঠান লইয়া বাঁচিয়া আছে। শুধু যে বাঁচিয়া আছে, তাহা নহে ; সর্ব্বত্রই সে নিজের শির উন্নত করিয়া চলিতেছে। ড্রেফু-ব্যাপারে সে বিচলিত হয় না, Pogromএ উৎসন্ন যায় নাই। তাহার সমাজের এই জীবনীশক্তি কোথায় সঞ্চিত, পুঞ্জীভূত হইয়া আছে?—তাহার অচলায়তনে।

ইহুদি ও গ্রীক

রামেন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন,—"হিব্রুরা বাঁচিয়া গেল।

'চিরদিন আছি ভিখারীর মত
জগতের পথপাশে ;
যা'রা চলে যায়, কৃপাচক্ষে চায়,
পদধূলা উড়ে আসে !'—

"কবির এই কথাগুলি হিব্রুর সম্বন্ধে খাটে না। হিব্রু 'ষ্টেট্' নাই, হিব্রু 'নেশন্' নাই, কিন্তু হিব্রু জাতি (People) সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিয়া আছে। একবার তাহার দেবতার সহিত তাহার সম্পর্কটা ভাবিয়া দেখুন দেখি। সে বলিতেছে,—এ দেবতা আমার, আমিও এ দেবতার, আমার দেবতার উপর অন্যের অধিকার নাই, আমার দেবতা অন্য কাহাকেও দিব না ; আমার দেবতার আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য যে সকল অনুষ্ঠানের বিধান হইয়াছে, সেগুলি এক মাত্র আমাদেরই জাতীয় উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যেই হইয়াছে, অন্য কাহারও নহে ; সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আমরাই জাভের (Jahveh) একমাত্র Chosen poeple, আমরাই তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আছি যে, অন্য দেবতার উপাসককে নির্ম্মূল ও নষ্ট করিব ; আমাদের ধর্ম্মবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা নাই ; কেন আমরা বিধর্ম্মীদিগকে Chosen peopleএর অন্তর্ভুক্ত করিব ? ব্যাবিলন্ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম যে, আমাদের যুডায় ও ইস্রায়েলে বিদেশী Samaritanরা আমাদের অনুপস্থিতিকালে আমাদের আচারানুষ্ঠান গ্রহণ করিয়া, আমাদেরই মত Chosen people হইবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছিল। তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া দিলাম। মন্দির-নির্ম্মাণকার্য্যে তাহারা আমাদের সাহায্য করিতে চাহিলে, আমরা তাহা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলাম। আমরা দুনিয়ার কাহারও সহিত মিশিতে চাহি না। একবার State হিসাবে রাষ্ট্রীয় ভাবে, ঘন হইয়া জমাট বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, পারিলাম না ; প্রবল State হইয়া পরধর্ম্মের উচ্ছেদ করিতে পারিলাম না ; আমাদের মধ্যেই অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে আমাদের জাতীয় শক্তি পুষ্টি লাভ করিল না ; খণ্ডিত হইয়া গেল। হয়ত আমাদের জাতীয়

ইতিহাসে গৃহপতিদিগের এইটিই সর্ব্বপ্রধান ভুল। আমাদের যিনি দেবতা, তিনিই রাজা ; জাভে (Jahveh) ব্যতীত অন্য রাজা আমাদের নাই ও হইতে পারে না ; কিন্তু বোধ হয়, অন্যের দেখাদেখি তাঁহারা রাজা করিলেন। এই সকল রাজা জাভের অপমান করিয়া অন্যান্য দেবতার পূজা প্রচলনের চেষ্টা করিলেন। জাভের কোপদৃষ্টি আমাদের উপর পতিত হইল। রাজাও গেল, রাজ্যও গেল। তদবধি আর আমরা রাষ্ট্রগঠনের চেষ্টা করি নাই ; আপন দেবতাকেই রাজা করিয়া বসিলাম। কিন্তু সেই দেবতার নিকট আমরা পদে পদে অপরাধ করিয়াছি ; তাঁহার আদেশবাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে সমর্থ হই নাই। আমাদের সমাজতন্ত্রের সামাজিক অনুষ্ঠানের তৎপরতা লইয়া আমরা পরস্পর বিসংবাদ করিয়াছি। আমরা বিধর্ম্মী গ্রীককে জাভের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিয়াছি ; বিধর্ম্মী রোমানকে গৃহ-বিবাদ মিটাইবার জন্য আমাদের ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছি। সেই অপরাধের ফল ফলিয়াছে : জাভে আমাদিগকে ক্ষমা করেন নাই। আমাদের দেশ হইতে আমরা বিতাড়িত হইয়াছি, আমাদের দেবমন্দির বিচূর্ণিত হইয়াছে। আমাদেরই ভিতর হইতে একটা নূতন সম্প্রদায় মাথা তুলিল, তাহারা আমাদের পুরাতন ধর্ম্ম (Law) মানিতে চাহিল না, হিব্রুকে Chosen poeple বলিয়া স্বীকার করিল না, Jew ও Gentileকে সমান আসন প্রদান করিল। তাহাদেরই অনুবর্ত্তিগণ এখন পৃথিবীর অধিকারী ; আর আমরা এত বড় পৃথিবীর মধ্যে Wandering Jews ! তাহাদের নেতা বলিয়াছিলেন—আমিই ঈশ্বর। সে কথায় হিব্রু কানে আঙ্গুল দিয়াছিল। আজ তাঁহারই দলভুক্তেরা পৃথিবীর ঈশ্বর। আমাদের গত দুই সহস্র বৎসরের জাতীয় ইতিহাস এই খ্রীষ্টানদেরই অত্যাচার-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ইহুদির নাম লোপ করিতে ইহারা না করিয়াছেন, এমন বর্ব্বরতা নাই। অথচ সময়ে অসময়ে রাজা, পোপ, সম্রাট্ আমাদের শরণাপন্ন হইয়াছেন। মুসলমানের হাত হইতে জেরুসালেম্ উদ্ধার করিবার জন্য ক্রুসেডে অভিযান করিতে হইবে। টাকা চাই ; রোমের পোপ আমাদের নিকট হাত পাতিলেন ! ইটালির নগরগুলির সমৃদ্ধিরক্ষা আমরাই করিয়া আসিয়াছি। ইংলণ্ডের রাজারা বিপদে পড়িলে আমাদের নিকট টাকা কর্জ্জ লইতেন। খ্রীষ্টান প্রজাপুঞ্জের চোখ টাটাইল। প্রথম এড্‌ওয়ার্ড National King হইবার বাসনা করিলেন ; প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনের জন্য বিনা-দোষে

আমাদিগকে সাগরপারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। কত শত বৎসর-পরে আমরা আবার ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার আদেশ পাইলাম। খ্রীষ্টান-য়ুরোপের নগরে নগরে রাজপথ দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া ভূয়োভূয়ঃ আবালবৃদ্ধবনিতা ইহুদির রক্তে কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। এখন আমাদের দেশ নাই, রাষ্ট্র নাই, দেবমন্দির নাই; এমন কি, পুরোহিত পর্য্যন্ত নাই; কিন্তু আমরা স্বধর্ম্মে মরণ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া আমাদের দেবতা, আমাদের আচারানুষ্ঠান, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় যত দূর সাধ্য আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া আছি। দূর সাইনে পর্ব্বতের শিখরদেশে যে অভয়বাণী ধ্বনিত হইয়া মূসার মুখ দিয়া প্রেরিত হইয়াছিল, আজ তিন সহস্র বৎসর পরেও আমরা তাহা স্বকর্ণে শুনিতে পাইতেছি। খ্রীষ্টান-য়ুরোপের অতিকায় কলেবর তাহার মুষ্টিবন্ধনে আবদ্ধ ইহুদি জাতিকে দলিয়া পিষিয়া মারিয়া গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিতে যুগ-ব্যাপিয়া চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু ইহুদি দলিত হয় নাই, পিষ্ট হয় নাই, আত্মরক্ষার জন্য লুকাইতে পর্য্যন্ত বাধ্য হয় নাই; সগর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্য-কলা ও ঐশ্বর্য্যের সমৃদ্ধিতে য়ুরোপের খ্রীষ্টীয় জনসাধারণের বর্ব্বরতাকে বিদ্রূপ করিতেছে। * * যে দেবতাকে লইয়া সমগ্র মানব-সমাজের সহিত আমাদের মর্ম্মান্তিক বিরোধ; যে দেবতা আমাদের, এবং আমরা যে দেবতার; যিনি আমাদিগকে বর ও অভয় দান করিয়াছেন; তাঁহার বাণী কি সফল হইবে না? তবে বসিয়া থাকা যাক তাঁহার বাণীর সাফল্যের প্রতীক্ষায়; কর্ম্ম করা যাক তাঁহার মহিমার প্রতিষ্ঠাকল্পে; ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া পথ চাহিয়া থাকা যাক কবে মেশায়া (Messiah) আসিবেন! তিনি আসিবেন; কবে আসিবেন জানি না; নাই বা জানিলাম; তিনি আসিবা মাত্রই তাঁহার Chosen peopleকে চিনিয়া লইতে পারিবেন; ইস্রায়েলের সন্তানদিগের ধমনীতে হিব্রুরক্ত নিষ্কলুষভাবে প্রবাহিত হইতে থাকুক;—বিধর্ম্মীদিগের রাষ্ট্রতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াও তাহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইবে। দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া বিপুল মানব-সমাজের সহিত বিরোধ করিয়া যখন আমরা ধর্ম্মে-কর্ম্মে, আচারে-অনুষ্ঠানে আমাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছি, তখন আমাদের ভাবনা কি? মেশায়া আসিবেন। আমাদিগকেই উপলক্ষ্য করিয়া জাভের মহিমা আবার প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা যেন সে কার্য্যের অনুপযুক্ত না হই। আবার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত

হইবে। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে গিয়া এক বার আমরা ভুল করিয়াছিলাম; ধর্ম্মের চেয়ে রাষ্ট্রকে বড় করিয়া দেখিয়াছিলাম; সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। আমাদের জাতীয় জীবনের সেই বিচিত্র স্বপ্ন "এক রাজ্য, এক ধর্ম্ম, এক নারায়ণ," বিলীন হইয়া গেল! সে কি নিষ্ঠুর জাগরণ! রাজ্য গেল; ধর্ম্ম লইয়া দাঁড়াই কোথায়! মন্দির গেল; দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করি কোথায়! এত বড় বিরাট্ বিশ্বে আমাদের নিজের বলিয়া পরিচয় দিবার এক তিল স্থান নাই; Ark of the Covenantকে স্থাপিত করি কোথায়? সে যে আমাদেরই দেবতার সঙ্গে আমাদের চুক্তির নিদর্শন; সেটিকে লইয়া ক্রূর বিধর্ম্মী * * আমাদের অক্ষম আক্ষেপে কি হইবে? সহসা সেই Ark of the Covenant অন্তর্হিত হইল! সেই দিন হইতে আমরা দিন গণিতেছি। জেরুসালেম্ গিয়াছে; নব-জেরুসালেম্ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এক বার ভুল করিয়াছি; এবার আর ভুল হইবে না। আমরা বাঁচিতে চাহি; We mean to live,—we will to live,—আমরা বাঁচিবই। জাভের আদেশবাণীর নিকট আমরা আমাদের মতামত, আমাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য সমস্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছি। এই সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনই আমাদের ধর্ম্ম—আমাদের যজ্ঞ—এই যজ্ঞে আমরা আমাদিগকে আহুতি দিয়াছি। ফলে আমরা নব জীবন পাইবই—আমরা বাঁচিয়া আছি এবং বাঁচিবই!"

রামেন্দ্রবাবু যেন একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন,—"এমন ব্যাপার আর কোথাও সংঘটিত হইয়াছে কি? জীব-বিদ্যার মৌলিক তত্ত্বগুলির কথা মনে পড়ে কি? পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া বিরোধ চলিয়াছে, অত্যাচার উৎপীড়নের বিরাম নাই; দেশ নাই, রাষ্ট্র নাই; অথচ তিক্ক লুপ্ত হইল না। Biologyর মূল সূত্রগুলি ধরিয়া বিচার করিবার চেষ্টা করিলে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাইবেন না। সর্ব্বত্র মানব-সমাজ একটা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বাতন্ত্র্য ও আত্মরক্ষার জন্য একটা শাসনযন্ত্র বা Government গড়িয়া লইয়া দৃঢ়বদ্ধ রাষ্ট্র বা Stateএ পরিণত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। এই রাষ্ট্রের বলে বলীয়ান্ হইয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা পাইয়াছে; নতুবা সে শত্রু-হস্তে দলিত ও পিষ্ট হইয়া জীবন হারাইয়াছে, অথবা পরের দেহে মিশিয়া গিয়া আত্মলোপ করিয়াছে। ইহুদি সেরূপ পারে নাই, অথচ ইহুদি বাঁচিয়া আছে। সাধারণ জীবধর্ম্মের পশ্চাতে মানুষের আর একটা

কিছু আছে, যেটা সাধারণ জীব-বিদ্যায় ধরা পড়ে না। সেইটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে।

"এই Will to live কোথা হইতে আসিল, কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহার হিসাব দিতে না পারিলে LIFE—জীবের জীবন—কি, তাহা বুঝা যাইবে না। জীব-বিদ্যা ইহার হিসাব দিতে এ পর্য্যন্ত পারে নাই; সম্ভবতঃ পারিবেও না। অতি অল্প দিন হইল—আজ বলিলেও চলে—য়ুরোপের সুধীগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহা ধরিতেছেন। অথচ এইটুকু না বুঝিলে প্রাণি-জীবনের ও উদ্ভিদ্-জীবনের শেষ কথা জানা হইবে না;—মানুষের সামাজিক জীবনের, রাষ্ট্রীয় জীবনের. ধর্ম্মজীবনেরও হিসাব-নিকাশ মিলিবে না। এই বিচিত্র প্রসঙ্গ উপলক্ষ্য করিয়া যদি মানুষের সামাজিক ইতিহাসের সেই চরম কথা একটু স্পষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে আমি ধন্য হইব—আমার ক্ষুদ্র জীবনের একটা কাজ হইবে; এবং আপনাকে যে ভূতের বেগার খাটাইতেছি, আপনারও এই অযথাপ্রযুক্ত পরিশ্রমও হয়ত কতকটা সার্থক হইবে।

"আর একটি জাতিও উল্লেখযোগ্য। মুসলমান আক্রমণে ইহুদির সহিত তুলনায় স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য এক দল পার্শী ভারতবর্ষে আসিয়া হিন্দু রাজার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন; প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। তাঁহারা নিজের ধর্ম্ম, আচার, অনুষ্ঠান লইয়া একটি ছোটখাটো উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। আজ তের শত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এবং কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতশির হইয়া বিচরণ করিতেছেন। একত্রিশ কোটি হিন্দু-মুসলমান-পরিবেষ্টিত মুষ্টিমেয় পার্শী-সমাজ সগৌরবে স্বতন্ত্র হইয়া রহিয়াছে। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহুদির মত তাহাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত বিরোধ করিতে হয় নাই। কারণ, যে-দেশে তাহারা আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা অতিথির পীড়ন কখনই করে না। পর-ধর্ম্মে বিদ্বেষ তাহাদের নাই। বিরোধ না থাকিলেও এত বৃহৎ ভিন্নধর্ম্মী সমাজের মধ্যে এত কাল বাস করিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা জনকতক পার্শীর পক্ষে সাধ্য হইত না। কিন্তু তবুও সে প্রবলতর সমাজের মধ্যে আপনাকে লুপ্ত করিয়া দেয় নাই। ইহুদির মত সে নিজের ধর্ম্ম, নিজের Culture নিজেই পুষ্ট করিয়া আসিতেছে। তাহাদের বিশিষ্ট রীতি-নীতি, বিশিষ্ট অনুষ্ঠানগুলিকে অন্ধভাবে জড়াইয়া না থাকিলে, এই বিস্তীর্ণ আর্য্যভূমি

ভারতবর্ষের আর্য্যজাতির মধ্যে বাস করিয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর হইত না; পার্শী লুপ্ত হইত। তখন পার্শী জাতির ইতিবৃত্ত অন্বেষণ করিতে হইলে, জরথুস্ত্রের ধর্ম্মের কথা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে, হেরোডোটসের ইতিহাসের পাতাই এক মাত্র অবলম্বন হইত। গ্রীকের সহিত পারসীকের জীবনযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিচিত্র অধ্যায়। সেই যুদ্ধে কেহ কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করে নাই। সর্ব্বগ্রাসী ইস্‌লাম, পারসীক জাতিকে ও পারসীক সভ্যতাকে আত্মসাৎ করিয়াছে; স্বদেশে পারসীকের চিহ্ন মাত্রও রাখে নাই। ভারতবর্ষের আশ্রয় লইয়াও মুষ্টিমেয় পার্শী বেদপন্থী সমাজের বিপুল দেহে আত্মলোপ করে নাই। স্বধর্ম্মকে জড়াইয়া না থাকিলে ইহা সম্ভব হইত কি? নতুবা পার্শীর নাম উদ্ধারের জন্য তাহার শত্রু গ্রীকের সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর থাকিত না।"

একটু চুপ করিয়া রামেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"গ্রীকদিগের কথা আসিয়া পড়িল; গ্রীক-সভ্যতার কথা না বলিলে মানবের ইতিহাস বুঝা যাইবে না। গ্রীসীয় বা হেলেনীয় সভ্যতার অর্থ কি? বাহির হইতে একটা নূতন জাতি আসিয়া গ্রীসের আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া নূতন সভ্যতা বিস্তার করিল, পুরাতনের বিশেষ কিছুই রহিল না, এই রকম একটা ধারণা ইতিহাস-রচয়িতৃদিগের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত বদ্ধমূল হইয়াছিল। গত কয়েক বৎসরের অনুসন্ধানে একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব সাগর-বংশের কথা (Mediterranean Race) জানিতে পারা গিয়াছে; উহাদের পর Pelasgian Race, পরে Achaean Race, এই সকল বিভিন্ন জাতি ঐতিহাসিকের চোখে অস্পষ্ট ভাবে দেখা দিতেছে। গ্রীসের এই পুরাতন সভ্যতাকে Minoan culture নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাহা কোনও সাহিত্য রাখিয়া যায় নাই, কিন্তু সভ্যতার নানা নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। দিন দিন নূতন নূতন নিদর্শন ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়া গ্রীক জাতির ইতিহাসের পুনর্গঠনের সাহায্য করিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে স্থির হইয়াছিল যে, গ্রীক জাতি আর্য্যজাতির এক শাখা; ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বাংশের আদিম নিবাসীদিগকে দলিত, পিষ্ট ও আত্মসাৎ করিয়া গ্রীক জাতির স্বতন্ত্র সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন দেখা যাইতেছে, উহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। পুরাতন Minoan ও মাইকিনীয় সভ্যতাকে ভিত্তি করিয়া, এমন

কি, তাহারই মালমসলা লইয়া, গ্রীক-সভ্যতা পুনর্গঠিত হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু এইরূপে যে সভ্যতা বিকশিত হইল, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অতি অদ্ভুত পদার্থ; বোধ করি তাহার তুলনা নাই!

"এই অদ্ভুত গ্রীক-সভ্যতা—Hellenic culture বুঝিতে হইলে এই সভ্যতার বিশিষ্ট ভাব কি, তাহা বুঝা আবশ্যক। কয়েকটি বিষয়ে এই বিশিষ্ট ভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম, গ্রীকের জাতীয় ভাব। সে আপনাকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া জানিত। তাহার নানা দেবতা ছিল, নানা পৌরাণিক Hero ছিল। দেবতাদিগের সহিত Heroদিগের নিত্য কারবার হইত; সর্ব্বদা আদান-প্রদান চলিত। দেবতারা মানবীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিতেন; মানুষেরা দেবতাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিত। ঐ সকল মানুষ গ্রীক জাতির প্রতিষ্ঠাতা; তাহাদের সমাজতন্ত্রের ও রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও বিধানকর্ত্তা। উহাদের পূজা ও প্রীতিসাধন গ্রীক-সমাজের প্রধান অনুষ্ঠান; উহাদের পরামর্শ লইয়া গ্রীকের রাষ্ট্রতন্ত্র চালিত হইত; উহাদের স্তুতি ও উহাদের অবদান কীর্ত্তন লইয়াই অলৌকিক গ্রীক-সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি। ঐ সকল দেবতা ও অতিমানুষ পুরুষদিগকে (Heroes) অবলম্বন করিয়া গ্রীকের জাতীয় ভাব (Nationalism) স্ফূর্ত্তি পাইল; এক ভাষা, এক সাহিত্য, এক Tradition ও Folklore, এই জাতীয় ভাবের অবলম্বন। সহস্র মন্দির ও Sanctuary অবলম্বন করিয়া এই সকল Tradition মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। উহা সমস্ত গ্রীক জাতির সাধারণ সম্পত্তি। ট্রয়ের লড়াই, হোমর্, হিসীয়ড্, ডেল্‌ফাইয়ের Oracle, অলিম্পীয় ক্রীড়োৎসব, আপোলো দেবের Mysteries, আম্ফিক্‌টিয়ন্ সভা, এ সমস্তই গ্রীকদিগের জাতীয় সম্পত্তি; সকল গ্রীকের এই সকল বিষয়ে সমান অধিকার। যাহারা এই সমাজতন্ত্রের অধীন, তাহারাই গ্রীক। অন্য সকলে গ্রীক নহে,—Barbarian বা ম্লেচ্ছ; তাহাদিগের ভাষা গ্রীক বুঝে না; গ্রীক-সমাজতন্ত্রে তাহাদের স্থান নাই বা অধিকার নাই; তাহাদিগের প্রতি গ্রীকের কোন কর্ত্তব্য নাই; তাহারা অবজ্ঞাস্পদ বা হেয়; এত অবজ্ঞাত যে, তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিবার কোনও প্রয়োজন নাই! গ্রীক তাহাদিগকে দয়া করিত না; তাহাদিগকে হিংসা করা ও ধ্বংস করাও নিতান্ত আবশ্যক মনে করিত না! পর-জাতিকে ধ্বংস করা যেমন হিব্রুর কর্ত্তব্য ছিল, ম্লেচ্ছকে নিধন করা গ্রীকের তেমন কর্ত্তব্য ছিল না; গায়ে

পড়িয়া তাহাদিগের সহিত লড়াই করা গ্রীকের কর্ত্তব্য ছিল না; গ্রীক তাহাদিগকে নগণ্য মনে করিত, ignore করিত মাত্র; তাহার ধর্ম্মশাস্ত্রে ও রাষ্ট্রিক শাস্ত্রে ম্লেচ্ছের প্রতি কোনও কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সে আপনার প্রতিভায়, আপনার শক্তিতে ও মাহাত্ম্যে এত গর্ব্বিত ছিল যে, পর-জাতিকে উৎপীড়ন করা সে আবশ্যক বোধ করে নাই। এই জন্যই হিব্রুর তুলনায় গ্রীক tolerant: কিন্তু এই toleration কোনরূপ প্রীতি হইতে উদ্ভূত হয় নাই; উহা কেবল মাত্র গ্রীকের আত্মসম্পর্কে উৎকট দম্ভের পরিচায়ক।

"এত বড় গর্ব্বিত ও অসামান্য ক্ষমতাপন্ন জাতির নেশনরূপে দল বাঁধিয়া সমাজবদ্ধ হইবার যেমন সুবিধা ছিল, তেমন বোধ হয় ইতিহাসে আর কোনও জাতির ছিল না। ইহারা এক দেশে অবস্থান করিয়া এক নেশনে পরিণত হইলে পৃথিবীতে অজেয় ও অধৃষ্য হইতে পারিত; কিন্তু তাহা ঘটিল না। গ্রীক জাতি একটা রাষ্ট্রে পরিণত হইল না। একটা কারণ ছিল,—তাহাদের দেশের ভৌগোলিক অবস্থা। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বাংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে বিভক্ত; গ্রীস দেশটা পাহাড়-পর্ব্বতে অসংখ্য উপত্যকায় বিভক্ত। এই সকল দ্বীপ ও উপত্যকা আশ্রয় করিয়া গ্রীকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ বাঁধিল; কয়েক বর্গমাইল জমি লইয়া এক-একটা নগর বা পুরী প্রতিষ্ঠা করিল। পুরীগুলি পর্ব্বতের ও সমুদ্রের ব্যবধানে জমাট বাঁধিল না; জমাট বাঁধিতে পারিত, কিন্তু তাহার প্রধান অন্তরায় হইল গ্রীকের চরিত্র। গ্রীক আপনাকে খুব বড় বলিয়া জানে; নিজের শক্তিতে ও মাহাত্ম্যে নিজে মুগ্ধ; কিন্তু সেই মোহই তাহার জাতীয়তার বন্ধনে প্রধান অন্তরায় হইল। সে কাহারও নিকট মাথা নোয়াইতে জানে না; কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে না। স্বজাতির বশ্যতা স্বীকারও তাহার স্বভাব নহে। এমন স্বার্থপর, আত্মসর্ব্বস্ব জাতি আর পৃথিবীতে জন্মে নাই। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে বড় বলিয়া জানে, এবং কিসে নিজে বড় হইবে, সেই চেষ্টাই তাহার জীবনের প্রধান চেষ্টা। পরের জন্য স্বার্থত্যাগ গ্রীকের ধাতুতে ছিল না। স্বার্থ-সংহারের প্রবৃত্তিকে যদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলা যায়, সে প্রবৃত্তি জাতীয় স্বভাবরূপে গ্রীকের একেবারে জাগে নাই। তাহার জাতীয় ইতিহাসের গোড়া হইতেই গ্রীকের সহিত গ্রীকের মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হইল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরীগুলি কেবলই পরস্পরের শত্রুতাচরণ করিতে লাগিল। কেবল বিবাদ ও রক্তপাত। কেহ কাহাকেও মানিতে চাহে না; সকলেই আপনাকে বড়

করিতে চায় ও অন্যকে নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। গ্রীকের সহিতই গ্রীকের বিরোধ ইতিহাসের আগাগোড়া ব্যাপিয়া দেখা যায়। ম্লেচ্ছের সহিত গ্রীকের বিরোধ প্রথম প্রথম দেখিতে পাওয়া যায় না। ম্লেচ্ছ ত নগণ্য, বিসংবাদের অনুপযুক্ত। গ্রীসের আদিম নিবাসীর সহিতও তাহার বিবাদ নাই; তাহারা ত দলিত হইয়া দাস-জাতিতে পরিণত হইয়াছে; তাহাদিগকে কেবল বলদের মত খাটাইয়া লইতে হইবে। গ্রীকের সহিত গ্রীকের এই চিরন্তন বিরোধ, তাহার নেশন গড়িয়া উঠিবার পক্ষে প্রধান বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইল। একটা জমাট নেশন, Organismএ পরিণত হইল না। গ্রীকভূমি সহস্র স্বাধীন, স্বতন্ত্র পরস্পর-বিবদমান পুরীতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিল। পরে যখন বিশাল পারসীক সাম্রাজ্যের সমবেত শক্তি সমুদয় পশ্চিম-এশিয়া গ্রাস করিয়া গ্রীকভূমিকে ও গ্রীক জাতিকে গ্রাস করিতে আসিল, তখন গ্রীক পুরীগুলি সেই প্রবল আততায়ীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য দল বাঁধিয়া জমাট বাঁধিতে সমর্থ হইল না। দরিয়ায়ুশের সেনা যখন গ্রীসে উপস্থিত, স্পার্টা তখন এথেন্সের সহিত যোগ দিল না; এথেন্স প্রায় একাকী দাঁড়াইয়া মারাথনে লড়াই করিল। Xerxesএর বাহিনী যখন জলে স্থলে চারি দিকে আক্রমণ করিয়া গ্রীক জাতিকে অভিভূত করিতে আসিল, তখন বহু গ্রীক নগর-শত্রুর সহিত যোগ দিল। কতকগুলি নগর একত্রিত হইয়া জলে স্থলে শত্রুকে পরাজিত করিল বটে; কিন্তু বিদেশী ম্লেচ্ছ আততায়ী পশ্চাৎপদ হইবা মাত্র, গ্রীক আবার গ্রীকের সহিত লড়াই আরম্ভ করিয়া দিল। প্রবল পারসীক আবার আসিতে পারে, আসিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, এ সম্ভাবনা স্পষ্ট সত্ত্বেও গ্রীকের গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হইল; সেই রেষারেষি, দ্বেষাদ্বেষি, রক্তারক্তি, পরস্পর ছলনা, গুপ্ত ছুরির চালাচালি চলিল।

"বিদেশের আততায়ীর আক্রমণ, সমাজের দৃঢ়বদ্ধ হইবার প্রধান সুযোগ;—জীববিদ্যানুসারে সমাজবিদ্যার ইহা একটা গোড়ার কথা। আততায়ী হইতে, Environment হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য জীবদেহ জমাট বাঁধে; জীবদেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপন আপন ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া সমগ্র দেহের স্বার্থে আপনাকে সমর্পণ করে, ইহাই হইল Biologyর মূল সূত্র। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বত্র জীব-বিদ্যার এই মূল সূত্রের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রীক ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন

করিতে পারে নাই; সাধারণ স্বার্থে আত্মস্বার্থ নিমজ্জিত করিতে পারে নাই। উহাদের স্বদেশপ্রীতি (Patriotism) ছিল; কিন্তু তাহাও স্বার্থপ্রণোদিত। নিজের ক্ষতিলাভ গণনা পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া, কর্ত্তব্য-মাত্রবোধে স্বার্থত্যাগ গ্রীক-চরিত্রে অপ্রকটিত রহিয়া গেল। গ্রীক যজ্ঞার্থে আত্মাহুতি জানিত না।

"আততায়ী পারসীকের ভয়ে গ্রীক ডেলস্ দ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া একটা রাষ্ট্রীয় মিত্রসঙ্ঘ (Confederacy) গঠন করিল; কিন্তু সে সন্ধিবন্ধন টিকিল না। এথেন্স সঙ্ঘভুক্ত গ্রীকরাষ্ট্রগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির প্রয়াস পাইল; ছোটখাটো একটি সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল; অল্পে অল্পে দ্বীপ ও নগরগুলির স্বাধীনতা হরণ করিয়া সেগুলিকে নিজের বশতাপন্ন করিল। পারসীকের সহিত যুদ্ধ চালাইবার জন্য যে চাঁদা অঙ্গীকৃত হইয়াছিল, এথেন্স তাহা করস্বরূপ আদায় করিয়া নিজের সৌষ্ঠব ও শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই অন্যায় প্রভুত্ব স্বাতন্ত্র্যাভিমানী গ্রীক কত দিন সহ্য করিতে পারে? সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইল। সমস্ত গ্রীকভূমি ব্যাপিয়া মহাকুরুক্ষেত্রের অভিনয় হইল। সেই কুরুক্ষেত্রে গ্রীকের রাষ্ট্রতন্ত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। অবশেষে দেখিতে পাই যে, গ্রীক, পারস্য-সম্রাটের উৎকোচ গ্রহণ করিয়া স্বজাতিকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছে; পারস্য-সম্রাটের ইঙ্গিতে ও অর্থে গ্রীকদিগের পরস্পর সন্ধিবিগ্রহকার্য্য চলিতেছে। গ্রীকের চিরশত্রু ম্লেচ্ছ পারস্য-সম্রাট গ্রীক-রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভাগ্যবিধাতা সাজিয়া পারস্যের রাজধানীতে বসিয়া ষড়যন্ত্র করিতেছেন, এবং গ্রীক-রাষ্ট্রগুলি সেই সূত্রে চালিত হইয়া পুতুলনাচ নাচিতেছে। গ্রীক-রাষ্ট্রতন্ত্র চুরমার হইয়া গেল; গ্রীক-সভ্যতা, গ্রীক Culture তাহার ভিত্তি হারাইয়া ভূকম্প-পাতিত অট্টালিকার মত জীর্ণ স্তূপে পরিণত হইল; এথেন্সকে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞানের ও রূপের যে উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল সে জ্যোতিতে আজ পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎ মুগ্ধ—সে প্রদীপ নির্ব্বাণপ্রায় হইল। * * * কোথা হইতে অর্দ্ধগ্রীক অর্দ্ধম্লেচ্ছ ম্যাসিডনপতি জোর করিয়া গ্রীক-সমাজতন্ত্রে প্রবেশ করিয়া, গ্রীক-রাষ্ট্রতন্ত্রকে দলিত করিয়া, গ্রীক Cultureএর মশাল কাড়িয়া লইয়া, গ্রীক জাতির নেতৃরূপে পারসীক সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়া পূর্ব্বদেশে গ্রীক-সভ্যতার আলোক বিকীরিত করিয়া দিলেন। মিশর, সীরিয়া, আর্ম্মীনিয়, পার্থিয়, বাকৃত্রিয় প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতি সেই গ্রীক-সভ্যতার

আলোকে দীপ্ত হইয়া কিছু দিনের জন্য ইতিহাসে জাগিয়া উঠিল। * * * আলেকজান্দ্রিয়ার মত কোনও কোনও নগরে রাষ্ট্রপতিগণের সাহায্যে সময়ে সময়ে গ্রীক Culture পুনরুদ্দীপিত হইয়াছিল; কিন্তু অবশেষে পশ্চিমে রোমক সাম্রাজ্যে ও পূর্ব্বে ইস্‌লাম-প্রতিষ্ঠিত নূতন সাম্রাজ্যে আত্মবিলোপ সাধন করিয়া সে জগতের ইতিহাসে নির্ব্বাণ লাভ করিল। এখন আর গ্রীক জাতি নাই। গ্রীক Culture নাই,—এ কথা বলিতে সাহস করিব না; গ্রীক Culture অবিনাশী, অনশ্বর। অন্য ক্ষেত্রে অন্য জাতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গ্রীক Cultureএর বীজ যে শাখাপল্লবে, ফুলফলে প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা আজি পৃথিবী ছাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে।

"গ্রীকের মত আত্মসর্ব্বস্ব, আত্মকেন্দ্র মানুষ পৃথিবীতে জন্মে নাই। এত অসাধারণ ধীশক্তি ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধি লইয়া আর কেহ বোধ করি পৃথিবীর পৃষ্ঠে আবির্ভূত হয় নাই; কিন্তু এই আত্মকেন্দ্রগততাই, এই individualismই গ্রীকের সর্ব্বনাশের মূল। গ্রীকের মত লঘুচিত্ত, চপলমতি, volatile মানুষ জগতে জন্মে নাই। তাহাকে কিছুতেই সংহত করিয়া জমাট বাঁধিয়া রাখা চলিত না। এত সুযোগ ছিল—অসাধারণ, অনন্যসাধারণ সুযোগ;—কিন্তু বৃহৎ গ্রীক-নেশন্ ঘন হইয়া দানা বাঁধিয়া উঠিল না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীক-রাষ্ট্রও স্থায়ী হইয়া রহিল না। যাহার ভিতর বারুদে ও ডাইনামাইটে পূর্ণ, তাহার স্থায়িত্বের আশা করা যায় না।

"সমগ্র গ্রীক জাতি একটা বিরাট্ রাষ্ট্ররূপে পরিণত হয় নাই বটে, কিন্তু গ্রীক নগরগুলি পরস্পর লড়াই করিবার জন্য রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। গ্রীকের ইতিবৃত্তে আধুনিক রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাসের সকল কথাই পাওয়া যায়। প্রত্যেক নগর, আপনার প্রতিবেশীর নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্য government বা শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই শাসনযন্ত্র জীবদেহে মস্তিষ্কের অনুরূপ। মস্তিষ্ক জীবদেহকে পরের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য এবং পরকে আক্রমণ করিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক ও সচেষ্ট থাকে; এমন কি, জীব-দেহকে এইরূপে প্রস্তুত রাখিবার জন্য দেহের আভ্যন্তরীণ সমুদয় যন্ত্রের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে চায়। ইহারই অধীন থাকিয়া জীবদেহ সর্ব্বদা আত্মরক্ষায় উদ্যত থাকে। শ্রেষ্ঠ পর্য্যায়ের জীব, এই মস্তিষ্করূপ যন্ত্রের সাহায্যে সর্ব্বদা জাগ্রত ও সচেতন থাকিয়া বিচারবিতর্কপূর্ব্বক নূতন নূতন

আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করে; এই Conscious effort যে তাহার উৎকর্ষের লক্ষণ, তাহা গোড়ায় বলিয়াছি। মনুষ্য-সমাজ যখন শাসনযন্ত্রের সৃষ্টি ও উদ্ভাবনা করিয়া রাষ্ট্রে বা Stateএ পরিণত হয়, তখন উহাও জ্ঞাতসারে বিচারপূর্ব্বক (Consciously) নূতন আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নূতন উপায়—নূতন অবস্থার প্রতি নূতন ব্যবস্থার প্রয়োগ করিতে পারে। কাজেই জীববিজ্ঞানুসারে রাষ্ট্রগঠন, সমাজের উৎকর্ষেরই লক্ষণ। ঐ শাসনযন্ত্র গ্রীক নগরগুলিতে যেমন পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তেমন আর কুত্রাপি করে নাই। রাষ্ট্রযন্ত্রের যতরূপ প্রকারভেদ হইতে পারে, Monarchy, Oligarchy, Aristocracy, Democracy ইত্যাদি যত ভেদ আছে, গ্রীকেরা সে সমস্ত লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন; আবার দল বাঁধিয়া বা আত্মপ্রসার করিয়া আত্মরক্ষার জন্য বলবৃদ্ধির যত উপায় আছে,—Colony, Confederacy, Empire, সমস্তই তাহারা উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত Experiment ব্যর্থ হইয়াছিল;—গ্রীক State বা রাষ্ট্রগুলি আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। এইখানে গ্রীকের জাতীয় ইতিহাসের গোড়ায় গলদ। কেন পারে নাই, জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিব,—ইহার কারণ গ্রীকের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, গ্রীকের মজ্জাগত স্বার্থপরতা, গ্রীক individualism; গ্রীক আপনাকে ভুলিতে জানিত না। গ্রীকের ধর্ম্মবুদ্ধি ছিল না। গ্রীক পণ্ডিতেরা একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর Theory of State খাড়া করিয়াছিলেন; সেই Theory সর্ব্বাংশে জীব-বিজ্ঞান অনুগত। রাষ্ট্রই সর্ব্বেসর্ব্বা, রাষ্ট্রই প্রভু; ব্যক্তিগণের স্বার্থ রাষ্ট্রের স্বার্থের সহিত অভিন্ন, রাষ্ট্রস্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকিতেই পারে না; রাষ্ট্র, ব্যক্তিকে লইয়া যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে পারে; ব্যক্তির কোনও স্বাধীনতা নাই। দেহ যেমন আত্মরক্ষার জন্য তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে, তাহার Unit cellগুলিকে রাখিতে বা ছাঁটিতে পারে, রাষ্ট্র সেইরূপ ব্যক্তিকে যথেচ্ছভাবে রাখিতে বা ছাঁটিতে পারে। রাষ্ট্রমধ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের স্থান নাই। প্লেটোর Republic ও আরিষ্টটলের politicsএ এই থিয়োরি পূর্ণ প্রকটিত। এই থিয়োরি-মতে রাষ্ট্রের আদেশ চূড়ান্ত আদেশ; মানব-জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি, আচার-বিচার, ধর্ম্মকর্ম্ম, সর্ব্ব বিষয়ে রাষ্ট্রের আদেশ চূড়ান্ত আদেশ। প্লেটো তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্রে বিবাহ-প্রণালীর উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—পুরুষেরা পঞ্চান্ন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সন্তান উৎপাদন

করিতে পারিবে, স্ত্রীলোকেরা চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণ করিতে পারিবে; উক্ত বয়সের মধ্যে ভূমিষ্ঠ সন্তানই রাষ্ট্রের অনুমোদিত ব্যক্তি হইবে; চল্লিশ বৎসর বয়সের পরে স্ত্রী যদি নিতান্তই স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া গর্ভ ধারণ করে, তাহা হইলে সেই ভ্রূণকে ভূমিষ্ঠ হইতে দিবে না; যদিই বা ভূমিষ্ঠ হয়, সেই সন্তানকে বাঁচিতে দিবে না, পালন করিবে না। দুর্ব্বল সন্তানকে বাঁচাইয়া রাখিলে রাষ্ট্রের ক্ষতি বই লাভ নাই। স্পার্টাতে এই আদর্শ রাষ্ট্রনীতি অনুসৃত হইয়া ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য একেবারে নষ্ট করিবার চেষ্টা হইয়াছিল! লাইকর্গস্ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কি না, তাহা লইয়া পণ্ডিতগণ তর্ক করুন; কিন্তু তাঁহার নামে যে সকল সমাজবিধান চলিয়াছিল, তাহাতে মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে একেবারে পিষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। ব্যক্তির স্ফূর্ত্তি সেখানে ঘটিতে পায় নাই। জোর করিয়া সেখানে ব্যক্তিগত ভাব নষ্ট করা হইয়াছিল;—স্পার্টান্ ইচ্ছা করিয়া, ধর্ম্মবুদ্ধি-চালিত হইয়া অপর ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়াছিল বলিলে ভুল হইবে। এথেন্সে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য উদ্দাম দেখা যায়—ব্যক্তির উৎকর্ষ সেখানে পরাকাষ্ঠা পাইয়াছিল। কিন্তু উহা ঘটিয়াছিল গ্রীক থিয়োরির বিরুদ্ধে। এই বিরোধের ইতিহাসটাই গ্রীক ইতিহাস। এই বিরোধের সমন্বয় করিতে না পারিয়া গ্রীক-রাষ্ট্র ও গ্রীক-ব্যক্তি উভয়ই নষ্ট হইয়া গেল।

"গ্রীক-চরিত্রের গোড়ায় গলদ এইখানে দেখা যায়। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, গ্রীকের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের মূল সূত্র কি? আমি বলিব—তাহার কথার সহিত কাজের অসামঞ্জস্য, তাহার Theoryর সহিত Practiceএর বিরোধ। স্পার্টা ও এথেন্স উভয় স্থলেই রাষ্ট্র সম্বন্ধে থিয়োরি একই। Theory বলিতেছে, ব্যক্তির কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে না; গ্রীকের চরিত্র বলিতেছে,—আমি আমার স্বাতন্ত্র্য রাখিবই রাখিব; রাষ্ট্র থাকে থাকুক, কিন্তু উহা ত আমাকে রক্ষার জন্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে; উহাকে যেমন করিয়া পারি, আপন স্বার্থে বিনিয়োগ করিব; ছলে বলে রাষ্ট্রযন্ত্রকে আমি আপনার অধীন করিয়া লইব। ইহার ফলে রাষ্ট্রমধ্যে দলে দলে, জনে জনে বিরোধ; এবং রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির চিরন্তন বিরোধ। কোথাও রাষ্ট্রের জয়, কোথাও দল-বিশেষের জয়। কোথাও ব্যক্তি-বিশেষের জয়; কিন্তু কোনও জয়ই স্থায়ী নহে; কেবলই রেষারেষি, কাটাকাটি। কোথাও বা এক জন নানা উপায় অবলম্বন করিয়া ছলে-বলে-কৌশলে রাষ্ট্রের

একাধিপতি হইয়া Tyrant হইতেছেন ; কোথাও একটা দল আর সকলকে জখম করিয়া Oligarchyর প্রতিষ্ঠা করিতেছে ; কোথাও বা পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রচালনার ভার ভিন্ন ভিন্ন দলের বা সমস্ত ব্যক্তির উপর ভাগ করিয়া অর্পণ করা হইতেছে, সকলকেই কিছু কিছু দিয়া আপাততঃ ঠাণ্ডা করা হইতেছে— ইহাই Democracy।

"উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে Individualism ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের জয়জয়কার পড়িয়াছিল। গ্রোট ও ফ্রীম্যান্—এথেন্সে Democracyর মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ফ্রীম্যান্ গদ্‌গদ স্বরে বলিতেছেন—এমন কি আর হয়? এথেন্সে সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান ; প্রত্যেক ব্যক্তি রাজা, প্রত্যেকে মন্ত্রী, প্রত্যেকে প্রজা, প্রত্যেকে ব্রাহ্মণ, প্রত্যেকে ক্ষত্রিয়, প্রত্যেকে জজ, প্রত্যেকে ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রত্যেকে জুরর, প্রত্যেকে উকিল। ফ্রীম্যান্ আরও একটু বলিতে পারিতেন, প্রত্যেকেই এখানে আসামী বা Criminal। এথেন্সের প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রতন্ত্রে প্রভুত্ব করিত, কিন্তু কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিত না ; প্রত্যেকেই অপরকে বাগ্‌বিতণ্ডায়, বাগ্মিতায় পরাস্ত করিয়া ও ভুলাইয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পাইত ; প্রত্যেকেই অপরকে ঠকাইতে প্রস্তুত। এই জন্যই এথেন্সের Oratory, Rhetoric, Sophistry, এবং বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক Comedy প্রভৃতির উৎপত্তি ও উৎকর্ষ। কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না। যে দল বাঁধিয়া বড় হইয়া পড়ে, তাহাকেই রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া রাষ্ট্ররক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। এথেন্সের যত দলপতি, যত প্রধান পুরুষ, সকলকেই এইরূপে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছে ; কাহাকেও বা হত্যা করা হইয়াছে। অন্যান্য লোকের কথা ছাড়িয়া দিই। যিনি এথেন্সের মুকুটমণি, এথেন্সকে যিনি গ্রীক-সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছিলেন, এথেন্সকে কেন্দ্র করিয়া সমুদয় গ্রীক নগরকে একতা-সূত্রে গ্রথিত করিয়া একটা প্রকাণ্ড গ্রীক নেশন গঠিত করিবার কল্পনা যাঁহার মস্তিষ্কে উদিত হইয়াছিল, সেই পেরিক্লিসের কথা ভাবুন। তাঁহার চোর অপবাদ ঘোষিত হইল ; তিনি না কি Stateএর তহবিল চুরি করিতেন ; তাঁহার প্রিয় শিল্পী ফীডিয়স,—জগতে অতুল্য ফীডিয়স না কি সোনার দেবমূর্ত্তি গড়িতে গিয়া সোনা চুরি করিয়াছিলেন। তাঁহার আস্পেশিয়ার মান রক্ষার জন্য তাঁহাকে এথেন্সের জনসাধারণের সম্মুখে মাথা নোয়াইয়া চোখের জল ফেলিতে হইয়াছিল।

"এই তরলপ্রকৃতি স্বার্থপর Patriotism কেবল মাত্র কথার কথা; অতি সহজেই ইহা সমাজদ্রোহে পরিণত হইত। মিল্টিয়াডিস্, থেমিষ্টক্লিস্, পসেনিয়স্, এই তিনটা নামই লওয়া যাক—আলকিবিয়াডিস প্রভৃতির নাম নাই বা বলিলাম। ঐ তিন জন গ্রীসের রক্ষাকর্ত্তা, গ্রীক Cultureএর রক্ষাকর্ত্তা; ঐ তিন জন না থাকিলে গ্রীক নামই হয়ত জগতের ইতিহাসে থাকিত না। দেশের লোকে ইঁহাদিগকে নেতৃত্বে বরণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহার প্রতিদানস্বরূপ দেশ পাইল কি? দেশকে তাঁহারাই রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু কি তুচ্ছ স্বার্থের জন্য তাঁহারাই আবার স্বদেশদ্রোহী হইলেন, মনে করিলে হৃৎকম্প হয় না কি? ম্যারাথন্-বিজেতা মিল্টিয়াডিস্; কেন তাঁহার অধঃপতন হইল? ক্ষুদ্র প্যারস্ দ্বীপের বিরুদ্ধে কি আক্রোশে তিনি অভিযান করিলেন? পরাজিত পারসীক বাহিনী ফিরিয়া যাইতে না যাইতেই কেন তিনি তুচ্ছ স্বার্থের জন্য রাষ্ট্রের ধনবল সেনাবল নষ্ট করিয়া অপমানিত হইলেন? গৃহের বিজন কক্ষে শয্যাতলে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাঁহাকে গুরু অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া জরিমানা করিয়াছে, ম্যারাথন্-বিজেতার প্রাণদণ্ড নিতান্তই অসঙ্গত মনে করিয়া প্রাণদণ্ডের বদলে অর্থদণ্ডে নিষ্কৃতি দিয়াছে, তখন তাঁহার কি মনে হইয়াছিল? সেই এক দিন, যখন কয়েকটি অশ্বারোহী শত্রুসৈন্য তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া হেলেস্‌পণ্টের সমীপস্থ গ্রীক সেনানীগণকে বলিল, 'সসৈন্য দরিয়ায়ুস ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া আসিতেছে; তোমরা এই সেতুটি ভাঙ্গিয়া দেও; সম্রাট্‌কে আমরা ধ্বংস করিয়া ফেলিব; তোমরাও স্বাধীন হইয়া যাইবে।' একা মিল্টিয়াডিস্ জোর করিয়া বলিয়াছিলেন,—'এস, সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়া আমরা স্বাধীন হই।' আর সকলে কিন্তু ভয় পাইল। সেতু ভাঙ্গা হইল না। দরিয়ায়ুস ফিরিয়া আসিলেন। তার পর গ্রীক সেনাপতি মিল্টিয়াডিস্ দরিয়ায়ুসের বিরাট্ বাহিনীকে যে দিন ম্যারাথনে পরাজিত করিলেন, সে-দিনকার গৌরবকাহিনী আজ আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া ইতিহাসের Whispering galleryর ভিতর দিয়া ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। তিনি গুরু অপরাধে স্বদেশবাসী কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত! এথেন্সের অধিবাসিগণ এথেন্সের রক্ষাকর্ত্তাকে প্রাণ ভিক্ষা দিয়া অপমানিত করিল। কাহার দোষ? দেশ কি তাঁহার প্রতি অবিচার করিল? ইতিহাস-রচয়িতা বলেন যে, এথেন্সে

'ম্যারাথন্' শব্দটা যেন একটা যাদুমন্ত্রের মত দাঁড়াইয়া গেল—Marathon became a magic word at Athens ;—কিন্তু ক্ষুব্ধ এথেন্সবাসী সেই যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া স্বজাতিদ্রোহী মিল্টিয়াডিসকে ক্ষমা করিল না। যে জাতির 'ম্যারাথন্' আছে, সে জাতি কখনই পরাধীন হইতে পারে না ;—এক জন ইংরাজ এই কথা জোর করিয়া বলিয়াছেন,—

"The mountain looks on Marathon,
And Marathon looks on the sea ;
And musing there as I stood alone.
I dreamed that Greece might still be free ;
For standing on the Persian's grave,
I could not deem myself a slave."

"ইংরাজ কবি কল্পনাবলে নিজেকে গ্রীক মনে করিয়া এমন কথা বলিতে পারিয়াছেন ; কিন্তু গ্রীক পসেনিয়স্ কি করিলেন ? গ্রীক থেমিষ্টক্লিস্ কি করিলেন ? মিল্টিয়াডিস্ আরও কিছু দিন জীবিত থাকিলে তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শক হইতেন কি না, জানি না। কিন্তু প্লেটিয়াবিজয়ী পসেনিয়স্ সমগ্র গ্রীক জাতিকে পারস্য-সম্রাটের পদানত করিতে চাহিলেন কেন ? স্পার্টার কর্তৃপুরুষ হইয়া তাঁহার আশা মিটিল না ; যে পারসীককে প্লেটিয়া-ক্ষেত্রে তিনি পরাজিত করিলেন, সেই শত্রুর হস্তে সমস্ত গ্রীক-রাষ্ট্রগুলি সমর্পণ করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আমাকে রাজ্য ও রাজকন্যা দাও, সমস্ত গ্রীক জাতিকে তোমার অধীন করিয়া দিব—এই হীন প্রস্তাব তিনি নিঃসঙ্কোচে পারস্য-সম্রাটের নিকট পাঠাইলেন। ঘটনাচক্রে তিনি ধরা পড়িয়া গেলেন। যে স্পার্টান্ বীর প্লেটিয়া-ক্ষেত্রে পারস্যের বিপুল বাহিনী ছিন্ন ও পর্য্যুদস্ত করিয়া গ্রীক জাতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি স্বদেশদ্রোহে ধরা পড়িয়া স্পার্টার দেবমন্দিরে প্রাণের জন্য আশ্রয় লইলেন ; স্পার্টানেরা মন্দিরের দ্বার গাঁথিয়া তাঁহাকে অনশনে মারিয়া ফেলিল। আর থেমিষ্টক্লিস্ ? স্যালামিসে অন্যান্য নৌসেনাধ্যক্ষদিগের সহিত ঝগড়া করিয়া গভীর নিশীথে পারস্য-সম্রাটের সমীপে তিনি জানাইলেন যে, গ্রীকরা নিজেদের মধ্যে কলহ করিতেছে ; সম্রাটের সহস্র নৌকা যদি রাতারাতি আসিয়া গ্রীক-নৌকাগুলিকে ঘিরিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাঁহার বিজয় অবশ্যম্ভাবী।—হইতে পারে, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু ছিল ; তিনি হয়ত জানিতেন, সত্বর সম্মুখ-যুদ্ধ ব্যতীত গ্রীক জাতির রক্ষা নাই। ঘটনাচক্রে গ্রীক যুদ্ধ জিতিল। কিন্তু তিন শত গ্রীক-নৌকায় এক সহস্র পারসীক নৌকা বিধ্বস্ত করিবার সম্ভাবনা

ছিল কি ? পারস্য-সম্রাটের রাজতক্তের সম্মুখে পারসীকের মত বেশভূষাপরিহিত থেমিষ্টক্লিস্ যখন জানু পাতিয়া বসিয়া থাকিতেন, তখন কি সাগরপারে দূরে স্বদেশের কথা তাঁহার মনে পড়িত না ? কি কৌশলে এথেন্স ও পিরিয়স্ বন্দরকে বেষ্টন করিয়া সুদৃঢ় প্রাচীর গঠন করাইয়াছিলেন, সে কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইত না কি ? কেন তবে 'মজালি সোনার লঙ্কা, মজিলি আপনি' ?—রাজা হইবার মোহে ? ম্লেচ্ছ পারসীক রাজকন্যার রূপের মোহে ? অর্দ্ধেক রাজত্ব ও একটি রাজকন্যা কেবল মাত্র রূপকথার জিনিষ নয় ! গ্রীসের সিংহদ্বার দিয়া যে শত্রু প্রবেশ করিতে পারিল না, কেন তাহাকে প্রহরীরা গুপ্ত দ্বার দিয়া আনয়ন করিতে চেষ্টা করিল ? যে দেশে তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কেন সেখানে অতিমাত্রায় ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির বিরোধ, সমাজের সহিত ব্যক্তির বিরোধ, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দলাদলি মারামারি কাটাকাটি ? কি অভিসম্পাত ! অমাবস্যার নিশীথে তুবড়ি বাজির মত ফুল কাটিয়া গ্রীক জাতির ইতিহাস বিলীন হইয়া গেল। সহস্র বৎসরের দুঃসাধ্য সাধনালভ্য সঞ্জীবনী মন্ত্র লাভ করিয়া কচরূপী গ্রীক বিদায় গ্রহণ করিল, রাষ্ট্ররূপিণী দেবযানীর অভিশাপ তাহার শিরে বর্ষিত হইল,—গ্রীক Culture, তুমি অপরকে 'শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।' কোথায় সে চলিয়া গেল ? কোন্ রহস্যপুর হইতে সে আসিয়াছিল ; ইতিহাসের ঘন কুজ্ঝটিকার মধ্যে কোন্ রহস্যপুরে সে ফিরিয়া গেল ? কাহাকে সে নিজের সঞ্জীবনী মন্ত্র শিখাইয়াছিল ? য়ুরোপের ইতিহাসের মধ্যযুগে কে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া য়ুরোপকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল ? ম্লেচ্ছ মুসলমানের হস্ত হইতে খ্রীষ্টান-য়ুরোপ গ্রীক-প্রদীপ গ্রহণ করিয়া আপনার আঁধার ঘর আলো করিল, মানবের ইতিহাসে ইহা অদ্ভুত দৃশ্য !

"সে সুন্দরকে ধরিতে চাহিয়াছিল। আজ তাহার 'সকল গীত গান হয়েছে অবসান' : কিন্তু এক দিন তাহার সর্ব্বাঙ্গের পুলকপ্রবাহ সঙ্গীতে, চিত্রে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে হিল্লোলিত হইয়া গিয়াছিল। তরুণ দেবতার করুণ বংশীধ্বনির তালে তালে তালে ট্রয় নগরী স্তরে স্তরে স্তরে গড়িয়া উঠিয়াছিল ; আবার মোহিনী নটীর ও নর্ত্তকীর সঙ্গীত-নর্ত্তনের তালে তালে তালে এথেন্স নগরীর প্রাচীর স্তরে স্তরে স্তরে ভাঙ্গা হইয়াছিল। ট্রয় নগরী হেলেন্‌কে বন্দিনী করিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল ; এথেন্স নগরী হেলেনীয় সভ্যতার যৌবন-মদিরায় আত্মবঞ্চনা করিয়া নষ্ট হইল।